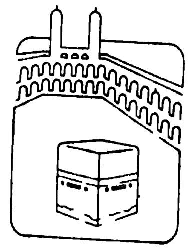


কাবার পথে কাবার পথে

আবদুল আজীজ আল্-আমান

হরফ প্রকাশনী। এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।
কলকাতা-৭।। মুদ্রণঃ স্বদেশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
প্রাইভেট লিমিটেড। ৫৮ এ/বি লোয়ার রেঞ্জ।
কলকাতা-১৯।। প্রচ্ছদঃ অমিয় ভট্টাচার্য।।
গ্রন্থনঃ বাঁধাই। ২ সি কালিসোম স্ট্রীট। কলকাতা-৯।।
প্রথম প্রকাশঃ শনিবার। ১২ রবিয়ল আউয়ল ১৩০৭।।
১৫ নভেম্বর ১৯৫৮। ২৮ কার্তিক ১৩৬৫।।

উৎসর্গ

কাবার পথে
প্রতি মুহূর্তে প্রতি অনুভবে
যিনি ছায়াসংগিনী হয়ে
আমার চেতনার সঙ্গে ছিলেন

নিবেদন

কাবার পথে প্রকাশিত হল।

আলহামদো লিল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা বিশ্বনিখিলের প্রতিপালক মহান আল্লাহর!

'কাবার পথেঃ মক্কা পর্ব' প্রকাশের আনন্দিত মুহূর্তে কত কথাই মনে পড়ছে! এই ত সেদিন আল্লাহর রহমত সম্বল করে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবদের দোওয়া নিয়ে হজ উপলক্ষে সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লাম কাবার পথে। কয়েকদিন বোম্বাইয়ে অবস্থানের পর এক পুণ্য প্রত্যুষে বিমান বন্দর থেকে মাত্র চার ঘণ্টায় উড়ে এসে পৌঁছে গেলাম আশ্চর্য এক স্বপ্নের দেশে—যে দেশ আমার ধ্যানে ছিল, চিন্তা এবং চেতনায় ছিল, রসুলুল্লাহ স-এর সেই মুবারক দেশের মৃত্তিকা স্পর্শ করলাম। তারপর শুরু হল একের পর এক সেই রহস্যময় পবিত্র প্রান্তরসমূহের রহস্যোন্মোচন, স্পর্শ করলাম সেই সব ভূখণ্ডের অন্তর্বেদনা, অনুভব করলাম সেই মূক মৃত্তিকার উল্লাস মুখরতা, মুখোমুখী দাঁড়ালাম বিপুল ইতিহাসের। আর সে ইতিহাস কখনো রক্তাক্ত ও রোদনমুখী, কখনো বেদনাহত ও বৈপ্লবিক, কখনো আত্মস্থ ও আলোকময়, কখনো জীবনসঞ্চারী ও জান্নাত-স্পর্শী। হজব্রত পালনের সঙ্গে সঙ্গে আমি এই সব ভূমিখণ্ডের

নিবেদন

অন্তর্প্রবাহের সঙ্গে মিশে গেছি আর তখন মনে হয়েছে এই মহান মৃত্তিকার প্রতিটি ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে আমাদের ধর্মসংস্কৃতির উজ্জ্বল স্বর্ণরেণু। কাবার পথের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমি ছড়িয়ে থাকা সেই সব আশ্চর্য স্বর্ণরেণুকে সঞ্চয় করার চেষ্টা করেছি।

সুতরাং কাবার পথে নিছক একটি ভ্রমণ কাহিনী নয়, একাধারে রসুলুল্লাহ স-এর বিস্তারিত জীবনী, ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাস, মুসলিম কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক, মহাতীর্থ কাবা শরীফ এবং হজ সংক্রান্ত সকল তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে বৈশিষ্ট্যময়। একটি গ্রন্থের মধ্যে বহু ঘটনার সমাবেশ কিন্তু বহুর মধ্যে এক আল্লাহর কথা বাঙময় হয়ে উঠেছে বার বার। রসুলুল্লাহ স-এর সকল ক্রিয়াকর্মের মধ্যে আল্লাহর প্রতি যে গভীর বিশ্বাস এবং সেই মহান প্রতিপালকের নিকট সমর্পিত আত্মার যে অলৌকিক আকুলতা ফুটেছিল, সমর্পিত হৃদয়ের সেই অনাবিল আর্তিকে আমি বারে বারে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছি। কাবার পথে রচনার সময় আমার সীমাবদ্ধ চেতনার গভীরে গিয়ে আমি বারে বারে শিহরিত হয়েছি, হৃদয়াবেগে আপ্লুত হয়েছি এবং বহু পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি অনায়াস অশ্রুপাতে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এসবই আমার দুর্বলতা এবং একান্ত ব্যক্তিগত। কখনো কখনো এমনও মনে হয়েছে যে এ রচনা বোধহয় আমি

নিবেদন

শেষ করে যেতে পারব না, সে যোগ্যতা নেই আমার, সে ক্ষমতাও না। আল্লাহর অসীম রহমত, শেষ পর্যন্ত কাবার পথের শেষ পৃষ্ঠার সর্বশেষ শব্দটি লিখে ফেললাম একদিন এবং তা প্রকাশিতও হল। হজযাত্রা ছিল স্বপ্নের মানসাভিসার, এ গ্রন্থরচনাও যেন তেমনি এক স্বপ্ন মনে হয়। আমি একজন মূর্খ মানুষ। এ গ্রন্থের যে বিশাল ব্যাপ্তি, আমার সীমাবন্ধ জ্ঞানের জন্য নিশ্চয়ই সেখানে তথ্যগত অনেক ভুলত্রুটি থেকে গেছে কিন্তু আল্লাহ ত জানেন আমার আন্তরিকতায় কোন ফাঁকি ছিল না।

ধারাবাহিক ভাবে কাফেলায় প্রকাশ মুহূর্তে পাঠক সমাজে যে বিপুল সাড়া জেগেছিল, আমার মত দীনহীনকে অসংখ্য সুধী পাঠক যে ভাবে অভিনন্দনে আপ্লুত করেছেন, তা সারা জীবনের সম্পদ হয়ে রইল। গ্রন্থের প্রকাশ মুহূর্তে সেই সব উদারচিত্ত সহৃদয় পাঠক পাঠিকার কথা আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। যে মহামানবের কথা আমি কাবার পথে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, 'বিশ্ববাসীর জন্য সুন্দরতম আদর্শ' সেই মহান পুরুষের জীবনাচরণ ও বাণী থেকে যদি কেউ সামান্য পরিমাণ অনুপ্রেরণা লাভ করেন, আমার পরিশ্রম ধন্য হবে, নিজের অনেক দীনতাকে ভুলে যাব। ইতি

আবদুল আজীজ আল-আমান

১.

দূর আরবের স্বপ্ন !

শ্যামল বাংলার নির্জন এক প্রান্তে বসে কতদিন ধরেই তো এ মধুর স্বপ্ন দেখছি !

চোখ বন্ধ করলেই চোখের পাতায় নিবিড় হয়ে ভেসে ওঠে আল্লাহর ঘর কাবা, নবীজীর দেশ আল্‌ মদিনা আল্‌ মনোয়ারা, বর্ষাণসিক্ত নিশীথে স্বপ্ন দেখি মসজিদ নববীর।

স্বপ্ন ভাঙে, আবার স্বপ্ন দেখি এবং স্বপ্ন দেখতেই থাকি।

কোনোদিন এমন সৌভাগ্য হবে কিঃ আমি চলে যাব পবিত্র আল মক্কা আল মোকাররমায়, দু'চোখ ভরে দেখব আল্‌ কাবা আল হারাম,[১] দেখব হাজরে আসোয়াদ—কৃষ্ণ পাথর, মাকামে ইবরাহিম, দেখব মা ফাতেমার কুটির প্রাঙ্গণ, কোন আঙিনার ধূলোয় বসে কিশোর নবী সুগোল হাত দুটি আন্দোলিত করে খেলা করতেন, কোন পথ ধরে যেতেন বায়তুল্লায়, কোথায় দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতেন সাহাবাদের, অহী নিয়ে জিবরাইল আ আসমান থেকে নেমে আসতেন কোন পথে, জমজম কোথায়, দেখব সাফা-মারোয়া, দেখব জবলে নূরের—হেরা পর্বতের—কোন নিভৃত গুহায় সাধনা করতেন আমার নবীজী...

এ স্বপ্ন যে কোন দিন বাস্তবে রূপ পাবে তা ভাবতেই পারিনি। অথচ এই অসম্ভবকে আল্লাহ সম্ভব করলেন একদিন। সম্ভব

---

১. কাবা শরীফের মত পবিত্রতম গৃহকে আল হারাম বলা হয় কেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। হারাম অর্থ বিশেষ ভাবে পরিত্যাজ্য বা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী কাবা শরীফের নির্দিষ্ট এলাকায় সর্বপ্রকার প্রাণ-হত্যা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ বা হারাম বলে এই গৃহকে আল্‌-হারাম বলা হয়।

করলেন এক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এই পরীক্ষার ব্যাপারটি একান্তই আমার ব্যক্তিগত, একান্তভাবে আমার জীবনে ঘটেছে এবং এতদিন ঘটনাটি জীবনের অনেক গোপনীয় বিষয়ের মত, শুক্তি যেমন আপন বক্ষে মুক্তাকে গোপন রাখে, অব্যক্ত রেখেছিলাম। আজ বিষয়টি আনুপূর্বিক আমি অকপটে স্বীকার করে যাচ্ছি। কারণ আমার বিশ্বাস, এর থেকে হয়ত কেউ কেউ—সামান্য কিছু হলেও —শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন, স্ফুলিঙ্গের মত হলেও কিঞ্চিৎ আলোক পেতে পারেন। যেমন সূর্য থেকে আলোকিত হয় চন্দ্র, চন্দ্র থেকে পৃথিবী, এবং পৃথিবী থেকে আভাসিত আলোকে আমাদের গৃহাভ্যন্তরের জমাট অন্ধকার।

পরীক্ষাটি ছিল আল্লাহ-নির্ভরতার পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষাও। আজ আমাকে স্বীকার করতেই হবে এই পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হতে পারিনি। আমি অপরাধী।

স্বপ্ন দেখছিলাম বহুদিন থেকে। ১৯৩১ সালে আমি মনে মনে স্থির করে ফেললাম এ বছরেই আল্লাহর মেহমান হয়ে চলে যাব কাবায়। আমার স্ত্রীকেও সে সংকল্পের কথা জানালাম। তিনি মহৎ মনের মানুষ। সঙ্গে সঙ্গে কি খুশিই না হলেন! আমাদের এই সংকল্পের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানলেন না, বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এমন কি আমার দুই পুত্রকেও এ বিষয়ে কিছুই বললাম না।

দিন যত এগিয়ে যায় আমি ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হতে থাকি। একদিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ হজ অফিসে চলে গেলাম খোঁজ খবর নিতে। একজন অফিসার আমাকে বললেন, যদি প্লেনে যান, ঈদউল ফিতর এর পরে আসবেন। এখন যাঁরা জাহাজে যাবেন তাঁদের টাকা জমা নেওয়া হচ্ছে।

আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় ফিরে এলাম। রমযানের মধ্যে এ ব্যাপারে আর কোন রকম খোঁজ নেবার প্রয়োজনই অনুভব করলাম না। তাছাড়া এসময় ঈদ-সংখ্যার কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত ছিলাম। যথাসময় ঈদ-সংখ্যা কাফেলা আত্মপ্রকাশ করল, পবিত্র ঈদ উৎসবও

উদ্‌যাপিত হল। তিন দিন পর হজ অফিসে ফর্ম আনতে গিয়ে শুনলুম, বিমানযাত্রীদের ফর্ম জমা দেবার শেষ তারিখ ছিল ২৭ রমযান, এ ব্যাপারে যা কিছু করার সব চুকে গেছে।

এখানকারই একজন লোক আমাকে ঈদের পর আসতে বলেছিলেন —এ-কথা জানাতেই একজন অফিসার প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যেন আমিই অপরাধী। বললেন ঃ এ ব্যাপারে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—দেখেননি ? আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। কি বলব বা কি করব কোন কিছুই তখন আমার মাথায় আসছিল না। আরো শুনলাম ঃ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিমানযাত্রীর নির্দিষ্ট কোটা পূর্ণ হয়নি। আগ্রহী যাত্রী পাওয়া যায়নি। ফলে ২৭ রমযানের পর সেই অসম্পূর্ণ তালিকাই সেণ্ট্রাল হজ কমিটি বোম্বেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং এখান থেকে কোন কিছু হবার শেষ সম্ভাবনাটুকুও বিলীন হয়ে গেছে।

খুবই আশাহত হলাম। চোখে মুখে তার চিহ্ন সুস্পষ্ট। নিজেকে অপরাধী মনে হল। মনে হল ঃ আমার নিয়েত ঠিক নেই। আল্লাহ আমার উপর প্রসন্ন নন। দু-আড়াই মাস আগে দায়সারা গোছের সংবাদ জেনে চুপচাপ বসে রইলাম বাড়িতে, মাঝে আরো দু-একবার কেন এলাম না হজ অফিসে খোঁজ নিতে। বাড়িতে বসে বসেই সব পুণ্য সঞ্চয় করে নেব—এ হয় না। পুণ্যের পথ এত সহজ নয়।

তখন জুলাই মাস।

কদিন খুবই কষ্টে কাটল। সব সময় মনমরা হয়ে থাকি। তারপর এই ভাবটা ধীরে ধীরে কিছুটা কেটে গেল ; কিন্তু প্রচণ্ড অপরাধবোধ থেকে কিছুতেই মুক্তি পেলাম না।

দিন যায়।

এবার যখন হজে যাওয়া হবেই না, আমি দৈনন্দিন কর্মতালিকার মধ্যে ডুবে গেলাম। অনেকগুলি স্কুল বই প্রকাশের ব্যাপারে, পূর্বাপেক্ষা অধিক ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বইগুলি নতুন আঙ্গিকে

অফসেটে মুদ্রিত হয়ে বেরুবে—এমন পরিকল্পনাও নেওয়া হল। আগাগোড়া দু'রঙে ছাপা হবে। সুতরাং একাধিক অফসেটে কাজ জানা দক্ষ শিল্পী চাই, আর্ট পুল চাই, ভাল অফসেট প্রেস চাই—ইতিপূর্বে কোন অফসেট প্রেসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেনি, চাই আর্টওয়ার্ক থেকে পজেটিভ মেকার। অর্থাৎ একটা বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়ে গেলাম। ঠিক মত বইগুলি বার করে ক্যানভাস করতে পারলে একটা বিরাট অংকের টাকা যে ঘরে আসবে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম এর মধ্যেই।

কাজ এগিয়ে চলল।

একদিন প্রেসে যাবার পথে নেদায়ে ইসলাম সম্পাদক জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেনের (আল্লাহ পৃথিবী এবং আখেরাতের সর্ববিষয়ে তাঁর মঙ্গল করুন) সঙ্গে দেখা। সে সময় তাঁকে হজ যাত্রীদের কোন একটি বিষয়ে খুব ব্যস্ত দেখলাম, পরে শুনলাম পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা হজ করতে যান প্রায় অর্ধেকাংশের ব্যবস্থা আশরাফ হোসেন সাহেবই করে থাকেন। তাঁকে আমি আমার ব্যর্থতার কথা জানাতেই তিনি বোম্বে হজ কমিটির ঠিকানা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটি রেজিস্ট্রী চিঠি লিখতে বললেন এবং জানালেন যে বোম্বে থেকে ওরা দু জনের হজে যাবার ব্যবস্থা করেও দিতে পারেন, কেননা অনেক সময় বিমানে যাবার যাত্রীর কিছু কিছু অভাব থেকে যায়। তিনি আরো জানালেন যদি সীট পাওয়া যায় পনের দিনের মধ্যে জবাব আসবে এবং আমরা যেন টাকা পয়সা সব মওজুদ রাখি, গ্রীন সিগন্যাল পেলেই সঙ্গে সঙ্গে জমা দিতে হবে।

বাড়িতে ফিরে এসেই চিঠি লিখলাম এবং পরের দিন ডাকে পাঠিয়ে দিলাম। চিঠি ছেড়ে দিয়েই শুরু হল পরীক্ষা, আল্লাহ-নির্ভরতার পরীক্ষা, ঈমানের পরীক্ষা।

চিঠি ডাকে দেবার পর থেকে কেমন যেন ভাবান্তর উপস্থিত হল আমার মধ্যে, দেখলাম মনটা যেন দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে। একটি মন বলছে ঃ উত্তর এলেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে চলে যাব আল্লাহর পথে, সংসার তো চিরদিনের। আর একটি মন মাথা

নেড়ে বলছে ঃ না—তা হয় না। চিঠি দিয়ে ভাল করনি। প্রথমেই বাধা পড়েছে, এবারে না হয় হজে নাই যেতে। তাছাড়া এতগুলো নতুন বই বার করবে, হাজার হাজার টাকার ঝুঁকি নিয়েছ—এগুলি দেখবে কে, তোমার তো উপযুক্ত আর কেউ নেই। সুতরাং......

এই দ্বিতীয় মনটা ধীরে ধীরে প্রথম মনের অনেক উপরে উঠে গেল এবং শেষে তার উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করে ফেলল। এখন সে নির্লজ্জের মত সরব ঃ এবারে হজে গেলে সমূহ ক্ষতি। ইতিমধ্যে অনেক ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে, বইগুলি বার করতেই হবে, আর বার করলেই হাজার হাজার টাকা, চাই কি লাখ টাকাও হতে পারে। সুতরাং নিবিষ্ট চিত্তে বই প্রকাশের দিকে মন দাও—হজে নয়।

বোম্বে থেকে উত্তর আসার সম্ভাব্য দিন যত এগিয়ে আসছে উপলব্ধি করলাম, আমি ততই আল্লাহ নির্ভরতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। দেখলাম, লোভ-লালসার ফাঁদ পেতে শয়তান আমাকে দুর্বল করে ফেলেছে, বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। দু-একবার ক্ষীণভাবে মনে হচ্ছে সব কিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে হজেই যাব, পরক্ষণেই রাহুর গ্রাস এবং অন্ধকার। চিত্তের এমন দীন-দশা আমার জীবনে আর কখনো ঘটেছে বলে মনেই পড়ে না। এক সময় এমন অবস্থা হল যে, আমি মনে-প্রাণে কামনা করে বসলাম ঃ বোম্বে থেকে যেন আর উত্তর না আসে। দশটার পর থেকে প্রার্থনা করতে থাকি যেন পিয়ন এ পথে না আসে, শঙ্কিত হই ঃ এই বুঝি এসে কড়া নাড়ল—সাব একঠো রেজস্ট্রী।

কোরআন শরীফের আয়াতের কথা মনে পড়ল। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলছেন যে, যুদ্ধ সম্পর্কে আয়াত অবতীর্ণ হলে মৃত্যুভয়ে মুনাফিকদের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করে আর মুমেনগণ আনন্দে উল্লসিত হন কেননা যুদ্ধে গিয়ে মৃত্যু বরণ করলে তাঁরা শহীদ হবেন আর বিজয়ী হলে গাজী হবেন। সুতরাং এঁদের মুখে কোন ভীতির চিহ্ন থাকে না। অনেক মুনাফিক আবার রসুলুল্লাহর সম্মুখে তাঁর মন যুগিয়ে কথা বলত আবার পেছনে গিয়ে তাঁর

বিরুদ্ধে নানান চক্রান্ত করত। সর্বশক্তিমান আল্লাহ এদের গোপন পরামর্শের কথা অহী-মারফত নবীজীকে জানিয়ে দিতেন। এ ধরনের অহী সম্পর্কে এইসব মুনাফিকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ত। সুরা তওবার চৌষট্টি সংখ্যক আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ "মুনা-ফেকরা ভয় করে এমন এক সুরা অবতীর্ণ না হয় যা ওদের অন্তরের কথা ব্যক্ত করে দেবে !"

বলতে দ্বিধা নেই, এ-সময় আমার অবস্থা এই মুনাফিকদের মত হয়েছিল। হয়ত আমার ঈমান ছিল না, আয়াত নাজেল হবার মত পত্রপ্রাপ্তির শঙ্কায় আমিও ক্ষণে ক্ষণে ভীত হয়ে পড়ছিলাম। বার বারই মনে হচ্ছিলঃ আমি হজে গেলে এ-সব বই বেরুবে না, যেন এসব বই বার করার একমাত্র মালিক আমি, আর বই না বেরুলে ব্যবসায়ে এমন ক্ষতি হবে যা কোনদিনই পূরণ হবার নয়।

আমি একটি বারও সম্পূর্ণরূপে সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম না। আমি আমার জীবনে এমন মারাত্মক ভ্রম আব দ্বিতীয়বার করেছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ভুলেরই শিকার হয়ে গেলাম। আমি গন্দম ভক্ষণ করলাম। পার্থিব সম্পদ আমার কাছে অনেক বড় হয়ে দেখা দিল। আমি লোভ-লালসার পাঁকে তলিয়ে গেলাম।

উত্তর আসার সম্ভাব্য দিন যখন শেষ হয়ে গেল, আমি ধীরে ধীরে আবার বিশ্বাসের জগতে ফিরে আসতে শুরু করলাম। শেষে এমন হল যে প্রতিজ্ঞা করলামঃ যাই ঘটুক—এখন চিঠি এলে সব ছেড়ে দিয়ে আমি আল্লাহর পথেই বেরিয়ে যাব।

তখন চিঠি আসার আর কোনই সম্ভাবনা নেই, কেননা সেণ্ট্রাল হজ কমিটিতে ফর্ম জমা দেবার শেষ দিন ইতিমধ্যেই গত হয়ে গেছে। দু-একটি প্লেন প্রতিদিন হজযাত্রীদের নিয়ে জেদ্দার পথে উড়তে শুরু করেছে। বুঝলামঃ এই বিশ্বাসহীন প্রতিজ্ঞায় আমি নিজেকে মিথ্যা প্রবোধ দিতে চাইছি, এতে আত্মা হয়ত অধিকতর কলুষিত হচ্ছে। এই প্রতিজ্ঞায় সাধু হয়ে আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

এ যেন জান-কবজের মুহূর্তে ডুবন্ত ফেরাউনের আল্লাহ-স্বীকৃতি।

শেষ পর্যন্ত বোম্বে থেকে চিঠি এল না।

সামান্য কয়েক সপ্তার ব্যাপার। এর ভিতরে মনে হল আমার জন্মান্তর ঘটে গেল। আল্লাহ-নির্ভরতায় আমি হেরে গেলাম। ঈমানের পরীক্ষায় আমি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

এ আমি কি করলাম !

এরপর শুরু হল অনুশোচনা। সারা জীবন জুড়ে লু-হাওয়ার দাপট শুরু হল। মরূদ্যান পুড়ে ভস্মে পরিণত। মরুর আয়তন বেড়ে গেল অবিশ্বাস্য রকমে। শোকের মাতম শুরু হল। উদ্দাম সীমুমে দিগন্ত উথাল-পাতাল।

হায়, আমি এ কি করলাম ! রহমানুর রহীম আল্লাহ—আপনি ক্ষমা না করলে আমার ক্ষমা নেই ! আপনি সান্তনা না দিলে আমার কোন সান্ত্বনা নেই ! আমি আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করলাম।

শুরু হল বুকফাটা হাহাকার, অপরিসীম বেদনাবোধ আর—আর এর পরের ইতিহাসটি অশ্রুজলের ইতিহাস। সে অন্য জগতের কথা।...

কাবার পথে-র পাঠকদের আমি এ বছরের ব্যবসার ফলাফলটা জানিয়ে দিতে চাই। আমি বার বার স্বীকার করছি যে কিছুদিনের জন্য হলেও আল্লাহর উপর বিশ্বাস হারিয়ে আমি পার্থিব লোভ-লালসার খতিয়ান তৈরী করেছিলাম জাবদা খাতায়। আল্লাহও তার সমুচিত শিক্ষা দিলেন। ঈমানহীন কর্মে বরকত হয় না, হয়ও নি। শতচেষ্টা করেও যথাসময়ে বইগুলি বার করতে পারিনি। যখন বেরুল তখন ক্যানভাসিং-এর কাজ শেষ। সুতরাং এ বই আমার কোন কাজেই এল না। কারুণের সম্পদের মত অহেতুক শোভা হয়ে থাকল।

অথচ আশ্চর্য, এই বইগুলির জন্যই আমি আমার ঈমানকে কি জঘন্যভাবেই না কলুষিত করে ফেললাম !

বইগুলি থেকে আমি কিছুই পেলাম না উপরন্তু এগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ জমা অর্থের অপচয় হল। আর এগুলির পিছনে ব্যস্ত থাকায় অন্যান্য বইয়ের প্রচারও ঠিকমত হল না। ফলে ব্যবসা এত খারাপ হল যা কল্পনা করা চলে না। আমার ষোল বছর ব্যবসায়ী জীবনে এমন দুর্বৎসর আর একটি বারও আসেনি। সাল তামামিতে দেখা গেল লাভ তো হয়ই নি, এমনকি আমার যে জমা তহবিল ছিল তাও প্রায় শেষ। শুধু তাই-ই নয়ঃ বাজারে তখন বিপুল পরিমাণ দেনা বর্তমান। এ টাকা কিভাবে কোথা থেকে শোধ করব তা ভেবে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। রাতের ঘুম প্রায় উঠে গেল। পাগলের মত অবস্থা।

এ ব্যবসা ছাড়াও আমার অন্য ব্যবসাতেও প্রচণ্ডভাবে আঘাত নেমে এল। এমন আঘাত যা আমি ভাবতেই পারিনি। জীবনে আরো নানান ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দিল। সেগুলির উল্লেখ এখানে অনাবশ্যক। দিবালোকের মত আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম, সম্ভবতঃ আল্লাহ আমার প্রতি প্রসন্ন নন।

এ অবস্থায় আমি আল্লাহর শুকর গোজারি করলাম। আমার জন্য এই আঘাতের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। আমার জন্য এই আঘাত যেন হোনাইনের[৩] যুদ্ধের মত, কেননা এই যুদ্ধের মুসলিম সৈনিকদের মত, আমি আল্লাহ-নির্ভরতা থেকে সরে আত্ম-নির্ভর হয়ে উঠেছিলাম। আল্লাহ আমাকে তার পরিণতি দেখিয়ে দিলেন।

---

৩. মক্কা-বিজয়ের অব্যবহিত পরেই হোনাইন প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিপক্ষের (হাওয়াজিন ও বনি-শকীফ গোত্রের) সৈন্য সংখ্যা মাত্র চার-পাঁচ হাজার আর সদ্য মক্কাজয়ী মুসলিম সৈন্য সংখ্যা বার মতান্তরে চৌদ্দ হাজার। এই বিপুল সংখ্যক সৈন্য দেখে মুসলিমদের অনেকেই গর্বিত হন, যেমন বদরের যুদ্ধে সৈন্যাধিক্যে গর্বিত ছিল আবু জেহেল। মুসলিম সৈন্যদের অনেকেই ভাবতে থাকেন যে তাঁরা তুড়ি মেরে স্বল্প সংখ্যক বিপক্ষীয় সৈন্যদের তুলোর মত উড়িয়ে দেবেন। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ শেষ মুহূর্তে অবগত হয়ে অত্যন্ত বেদনাবোধ করেন। হোনাইন প্রান্তরে সসৈন্যে

অবশ্যই আল্লাহ সব শিক্ষকের বড় শিক্ষক।

অতি সংক্ষেপে এই দুঃখজনক ঘটনাটিকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি। আমি চিঠি পেতে ভয় পাচ্ছিলাম তার কারণ

ক. চিঠি পেলে আমাকে হজে যেতে হবে

খ. আমি চলে গেলে বই বেরুবে না

গ. বই না বেরুলে ক্যানভাসিং হবে না

ঘ. অনেক টাকা লোকসান হবে

ঙ. থাকলে বই বেরুবে এবং বহু টাকা ঘরে আসবে

এর একটিও সফল হয়েছে কি ? মাঝ থেকে বেড়েছে দেনা, চিন্তা, ব্লাডপ্রেসার, দুর্নাম এবং অন্যান্য রোগ। আল্লাহকে ভুলে দিনে দিনে এত আত্মবিশ্বাসী ও আত্মগর্বী হয়ে পড়ছিলাম যে, এই অবস্থা আর কিছুদিন চললে আমি হয়ত কাফেরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়তাম।

রসুলুল্লাহর পেঁছানোর সংবাদ পেয়ে বিপক্ষ তীরন্দাজ সৈন্যগণ সংকীর্ণ গিরিপথের দুধারে নানান গুহায় আত্মগোপন করে থাকে, মুসলিম সৈন্যদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তারা উভয় দিক থেকে অতর্কিতে বৃষ্টিধারার মত অবিরাম তীর বর্ষণ শুরু করে, ফলে সংখ্যা গর্বে গর্বিত মুসলিম সৈন্যরা পরাজিত হয়ে পিছু হঠতে বাধ্য হন। আল্লাহ্‌র রহমতের উপর নির্ভর না করে যাঁরা কেবল বাহুবলের অহংকারে অন্ধ হয়েছিলেন তাঁরা তখন উপলব্ধি করেন যে কি মারাত্মক ভুলই তাঁরা করেছেন। সর্ব অবস্থাতে সকল কাজে আল্লাহর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই অগ্রসর হতে হয়—এ-শিক্ষা ইসলামের এক মৌলিক অবদান। যা হোক, সৈন্যদের গর্বোদ্ধত শির ভুলুণ্ঠিত হলে, আল্লাহ্‌র সাহায্য নেমে আসে—তখন যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। অবিশ্বাসীরা পর্যুদস্ত ও পরাজিত হয়ে কিছু পালিয়ে যায় এবং অধিকাংশ বন্দী হয়। এ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্‌কোরানের ঘোষণা এই : "হোনাইনের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়েছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। অতঃপর আল্লাহ্‌ তাঁর নিকট হতে তাঁর রসুল ও বিশ্বাসীদের উপর দয়া বর্ষণ করেন যাতে ওদের চিত্তে প্রশান্ত হয়...।" সুরা তওবা : পঁচিশ ও ছাব্বিশ সংখ্যক আয়াত।

এই দুর্ঘটনার পর যে উপলব্ধি আমার হয়েছে এবং যে কথা আমি বার বার সকলকে অশ্রুজলে সিক্ত করে বলতে চাই তা আল্ কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ং আল্লাহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

ক. তোমাদের উপাস্য তো একমাত্র আল্লাহ, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর ২২ ঃ ৩৪

খ. এবং বিশ্বাসিগণের আল্লাহর উপর নির্ভর করা উচিত। ৩ ঃ ১৬০

গ. যদি তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করে থাক, যদি তোমবা আত্মসমর্পণকারী হও তবে তোমরা তাঁরই উপর নির্ভর কর। ১০ ঃ ৮৪

ঘ. বিশ্বাসীদের কর্তব্য আল্লাহর উপর নির্ভর করা। ৫৮ ঃ ১০

ঙ. আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনোপকরণ দাতা। ৬২ ঃ ১১

চ. আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবিকা দান করেন। ২৪ ঃ ৩৮

ছ. তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন, তিনি তাঁর দাসদের ভালভাবে জানেন ও দেখেন। ১৭ ঃ ৩০

এ-সব আয়াতের পর আর কোন কথা চলে না। সূর্য যেমন আকাশকে আশ্রয় করে স্থির, পৃথিবীকে আশ্রয় করে হিমালয় যেমন নিশ্চল—সুদৃঢ় ঈমানের উপর ভিত্তি করে আমরাও যেন আল্লাহতে পরিপূর্ণরূপে সমর্পিত হই, নির্ভর করি, বিলীন হই মিশে যাই।

২.

সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব বলেছিলেনঃ আপনাদের হজে যাবার কথা যখন আমি জানতে পেরেছি, নিশ্চিন্ত থাকুন, ইনশা আল্লাহ্ ১৯৩১ সালে হজ-যাত্রার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা আমি করে দেব। এরজন্যে আপনাদের এতটুকু ব্যস্ত হতে হবে না।

ব্যস্ত হলাম না কিন্তু গতবারের ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যে তওবা করলাম, সংকল্প স্থির করে পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর উপর তওয়াক্কাল করলাম। আল্লাহর নির্দেশকে সকল সময় মনে রেখেছিলামঃ "তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নির্ভরশীলদের ভালবাসেন।" ৩ঃ ১৫৯

এবারেও অসংখ্য সমস্যা জটিলতর আকার ধারণ করে পথ অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করল, শয়তান অধিকতর শক্তি অর্জ্জন করে আমাকে ফাঁদে ফেলার নানান উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল কিন্তু কোন কিছুকেই আমল দিলাম না। লাভ-লোকসান, বিপদ-আপদ যা আল্লাহ্ তকদীরে রেখেছেন তাই হবে, সুতরাং কোন পার্থিব সমস্যাই আমাকে আমার সংকল্প থেকে টলাতে পারল না। আমি কেবল, সকল কাজের মধ্যে একান্ত সংগোপনে আল্লাহর সম্মতির প্রতীক্ষায় সকাতর প্রার্থনায় নিমগ্ন রইলাম।

ইতিমধ্যে বোম্বে থেকে একাধিকবার চিঠিপত্র এল, অবশেষে হজ —মহাভিসারে যাবার অনুমতি পত্র পাওয়া গেল। প্রাণ উজাড় করে আল্লাহকে শুকরিয়া জানালাম। মনে হলঃ রহমানুর রহীম ক্ষমা করেছেন, তাঁর অনন্ত রহমতের এক কণা হয়ত আমার উপর বর্ষিত হয়েছে।

বহুদিন পর মন সত্যই প্রসন্ন হয়ে উঠল। এতদিন যেন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গম কয়েদখানায় বন্দী ছিলাম, আজ মুক্তি পেয়ে উদার আকাশ তলে নির্মল আলো-হাওয়ায় এসে দাঁড়ালাম।

শেষ চিঠিতে জানলাম ৫ সেপ্টেম্বর ৮২-তে আমাদের প্লেন, ফ্লাইট সকালের দিকেই। নির্দেশ ছিল অন্ততঃ পাঁচ দিন পূর্বে যেন আমরা বোম্বে পৌঁছে সেণ্ট্রাল হজ কমিটিতে রিপোর্ট করি। নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনের টিকিট পাওয়া গেল না, সুতরাং তিন দিন আগে পৌঁছানোর ঝুঁকি নিয়ে ৩১ আগস্টের টিকিট আমাদের হাতে দিয়ে গেলেন জনাব আশরাফ হোসেন।

আমরা অধীর আগ্রহে ৩১ আগস্টের প্রতীক্ষায় রইলাম। আগের মত এবারেও আমি বিষয়টা নিয়ে কানাকানি করলাম না, এমন কি সেণ্ট্রাল হজ কমিটি থেকে পাকা এবং শেষ চিঠি আসার পরও আমাদের জীবনযাত্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু মনোজগতে যেন ঝড় বইতে শুরু করল। আর এক মুহূর্ত বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না, কবে যাব সেই পবিত্র শহরে, কখন দাঁড়াব সেই পাক জমিনে, কখন দেখব দু চোখ ভরে পৃথিবীর সেই পবিত্রতম গৃহ বায়তুল্লাহ—কাবাশরীফ, এই অপবিত্র হাত দিয়ে সেই আলোকিত গৃহ স্পর্শ করতে পারব কি ? বুক কেঁপে ওঠে, সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়, পৃথিবী ভুলে যাই, কতক্ষণ এমনই তন্ময়তায় এমনই ভাবের ঘোরে কাটে, তারপর এক-সময় বাস্তবে ফিরে আসি। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আপনা থেকেই। বলি ঃ আল্লাহ সবই আপনার ইচ্ছা। কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে কাবা শরীফ অথচ আমি এখানে বাংলার এই নির্জন কুটিরে বসে উল্লাসে উত্তেজনায় ভয়ে সম্ভ্রমে কেঁপে কেঁপে অস্থির।

বিদেশে যাবার জন্যে যে সব জিনিসের প্রয়োজন হয় তার কিছু আগেই সংগৃহীত হয়েছিল, যা বাকি ছিল প্রতিদিন কিছু না কিছু ক্রয় করতে শুরু করলাম। এমনি করে সবার দৃষ্টির আড়ালে আমাদের যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এল।

আয়োজন বলতে সামান্যই, একেবারে যেগুলি সঙ্গে না নিলেই নয়। বিলাসিতাও যেমন নেই, তেমনি অনটনও নেই আমাদের আয়োজনে। অনেকেই বলে থাকেন ঃ হজ-যাত্রায় যত কষ্ট হয় ততই

ভাল, অর্থাৎ দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করে আল্লাহর সমীপবর্তী হওয়াকেই তাঁরা অনেক বেশি মূল্যবান মনে করেন। গূঢ় কথা এবং নিশ্চয়ই মূল্যবান। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে কাবায় গিয়ে যাঁরা সেখানকার কাজগুলিও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন তাঁরা মহাভাগ্যবান। কিন্তু আমরা যারা সাধারণ, এবং এ ধরণের লোকের সংখ্যা হাজারে ন শো নিরানব্বই, তাদের পক্ষে পথের ক্লান্তি যত কম হয় ততই মঙ্গল। কেননা পথের কষ্ট স্বীকার নয় কাবা শরীফের তওয়াফ এবং জিয়ারতই আমাদের লক্ষ্য, হজ আমাদের মাকসাদ। পথের ধকল সইতে না পেরে অনেকেই পবিত্র শহর মক্কাতে উপস্থিত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, এঁদের অনেকেই ঠিক মত ওমরাহ্ করতে পারেন না, তওয়াফ করতে পারেন না, যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে সামিল হওয়া এঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, এমন কি কারও কারও পক্ষে ঠিক মত হজ করাটাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। গোলাপ কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া নয়, গোলাপ ফুলের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। পথের ক্লান্তি কম হলে সঠিক ভাবে মূল লক্ষ্যে পৌঁছান সহজ হয়।

আল্লাহর পথে মহা অভিসারে যাবার পূর্বে কয়েকটি কাজ সমাপ্ত করা বিশেষ জরুরী মনে হল, কেবল আমাদের জন্য নয়, যাঁরাই এ পথের পথিক হবেন তাঁদের সকলের জন্যই জরুরী। এই আশু করণীয় কর্তব্যগুলির প্রধান একটি হল সর্বপ্রকার ঋণ মিটিয়ে ফেলা। কদিন ধরে মনে মনে আমি কেবল ঋণের চিন্তা করলাম, দেখলাম দুটি বিষয়ে আমি মানসিকতার দিক থেকে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছি। বাড়িতে পানির সংযোগ লাইনটি খারাপ হয়েছিল, সেটা সারিয়ে ছিল একজন উড়ে মিস্ত্রি। তাকে আমি বলেছিলাম পানি ঠিক মত পাওয়া গেলে পাঁচ টাকা বেশি দেব, এক সপ্তাহ পরে এসে সে যেন দেখা করে। কিন্তু দীর্ঘদিন সে আর দেখা করেনি অথচ পানি পাচ্ছিলাম পর্যাপ্ত পরিমাণে। এ সময় তার কথা বিশেষ করে মনে পড়ল। দারোয়ানকে দিয়ে দু দিন সংবাদ পাঠালাম। অবশেষে তার দেখা মিলল। পাঁচটা টাকা হাতে পেয়ে সে ভীষণ খুশি।

আর এই প্রতিশ্রুতি রাখা ও ঋণ পরিশোধ করতে পারায়, এতদিন পর আমার বুক থেকে যেন মস্ত একটা পাহাড় নেমে গেল।

একজনের একটি ডট পেন এনেছিলাম, মনে পড়ল। নজরুলের কয়েকটি গান জেরক্স করাতে গিয়ে এই কলমটার প্রয়োজন হয়েছিল, কোম্পানীই দিয়েছিল আমাকে অথচ আর ফেরত দেওয়া হয়নি। লোয়ার সার্কুলার রোডের সেই জেরক্স কোম্পানীতে গিয়ে হাজির হলাম একদিন। পাঁচটা টাকা সামনে ধরে, সব ঘটনাটা স্মরণ করিয়ে দাম কেটে নিতে বললাম। সব শুনে তারা তো হেসেই অস্থির, আচ্ছা মানুষ তো আপনি, এই দেশেই বাড়ি না ?

ও'রাও টাকা নেবেন না, আমিও ছাড়ব না। শেষ পর্যন্ত আমিই হেরে গেলাম। বললেন, আপনি মাঝে মাঝে আসবেন—তা হলেই আমরা খুশি হব।

কালি বাবু মারা গেছেন, অত্যন্ত সৎ আর বিনয়ী মানুষ। যতবার গেছি সুন্দর একটা অনুচ্চ পবিত্র হাসি হেসে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতেন, আসুন আসুন। তিনি মারা গেছেন কিন্তু তাঁর বিখ্যাত কালি প্রসেস বর্তমান। এখান থেকেই আমি স্টিরিও করাতাম। উনি আমায় এত বিশ্বাস করতেন যে হরফের কাছে জিনিষ সরবরাহ করেও আর চালান করতেন না, নিজের মত করে কোথায় যেন সংক্ষেপে টুকে রাখতেন। শেষে দীর্ঘদিন পর প্রয়োজন পড়লে টাকার অঙ্ক বলতেন আমি দিয়ে দিতাম। এই অবস্থায় চলছিল, হঠাৎ মারা গেলেন। ইতিমধ্যে কিছু কাজ হয়েছিল, কিছু পূর্বেকার জের ছিল। কিন্তু সেটা কত তা বলার মত আজ আর কেউ নেই। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা তাঁর ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে বলব, কম হলেও তারা যেন আমার কাছে দাবী না রাখে আর বেশি হলেও আমি তাদের কাছে কিছুই দাবী করব না, অর্থাৎ এই টাকাতেই শোধবোধ। কিন্তু অত্যন্ত ব্যস্ততার জন্যে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ করা হয়নি। মক্কা শরীফে বসে ঘটনাটা হঠাৎ মনে পড়ল এবং আমি দারুন ব্যথা পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে বিষয়টা ছেলেদের গোচর

আনলাম। এখানে আমার এন্তেকাল হলে তারা যেন বিষয়টি মিটিয়ে দেয়। ব্যবসায়ে আর যে সব চলতি দেনা-পাওনা ছিল সেগুলি আমি ছেলেদের বুঝিয়ে দিলাম এবং কি ভাবে শোধ করবে তাও বলে দিলাম। হজ থেকে ফিরে এসে দেখি, রহমত আল্লাহর, তারা এই দৈনন্দিন দেনার প্রায় সবটাই শোধ করে ফেলেছে।

আর একটি বড় কাজ হল কারও আমানত যদি কিছু জমা থাকে তা মালিককে প্রত্যার্পণ করা। আমার স্ত্রী আত্মীয়-স্বজন এবং প্রতিবেশী সকলের কাছে অত্যন্ত বিশ্বাসী, আমি নিজে দেখেছি অনেকেই তাঁকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন, অনেকেই অলঙ্কারাদি, জমা রাখেন, অনেকে আবার নগদ টাকাও। একদিন রাত্রে দেখি তিনি আমাকে বলছেন ঃ এতো ভারি মুস্কিল হল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ? তিনি বললেন, কেউ তাদের গচ্ছিত সম্পদ ফেরৎ নিতে চাইছে না, সকলেই বলছে—ও তো আমার আয়রন সেফে জমা আছে—আমি বললাম, তবুও আর একবার চেষ্টা করা উচিত—দ্বিতীয় বারের চেষ্টাতেও সফল হওয়া গেল না, সকলের এক কথা, আমাদের জন্যে ভেব না—তোমরা নিশ্চিন্ত মনে চলে যাও হজে—

একটি বিশেষ কাজ বাকি ছিল, সেটা এবার সম্পূর্ণ করতে মনস্থ করলাম। হজের জন্য টাকা জমা দেবার সময় একদিন ছেলেদের ডেকে তাদের অনুমতি নিয়ে নিলাম। আব্বা-আম্মা জীবিত থাকলে তাঁদের অনুমতি আগে নিতে হয়। কিন্তু এই কর্তব্যই আমাদের মধ্যে অনেকেই সম্পাদন করেন না। আব্বা-আম্মার অনুমতি কেউ কেউ নিলেও, সন্তানদের অনুমতি নেবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেন না। এটি একটি মারাত্মক ভ্রম। আমার দুই পুত্র, আমার বক্তব্য শুনে বিশেষ করে আমরা দু জনে একত্রে যাব শুনে, ভীষণ খুশি। দেখলাম তাদের চোখ মুখ দিয়ে একটি আবেগ আলোর ঝরণার মত অবিরাম ঝরে পড়ছে।

তাদের দু জনকেই, আমার দুই পুত্রকে, মিরাজ-উল আজীজ এবং মনির-উল আজীজ, আজ ডাকলাম একটু গভীর রাতেই। তখন আগস্টের শেষ সপ্তাহ, আমাদের যাত্রার আর সাত দিনও বাকি

নেই। তারা কাছে এলে আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম। স্থাবর অস্থাবর এবং অন্যান্য সকল সম্পত্তির একটি তালিকা তুলে ধরলাম এবং কে কোনটি নেবে সে সম্পর্কে মোটামুটি একটি অসিয়াত করে গেলাম। বার বার তাদের একটি বিষয়ের উপর জোর দিলাম ঃ এ ভাগবাটোয়ারার ব্যাপারে কোন মতান্তর উপস্থিত হলে তারা যেন সম্পূর্ণ বাইরের কারো প্ররোচনায় প্ররোচিত না হয় বরং উভয়েই অল্প-বিস্তর ত্যাগ স্বীকার করে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিজেরাই মিটিয়ে নেয়।

মিরাজ এবং মনির মৌনতার ভিতর দিয়ে সে সম্মতিই আমাদের দিল। আসলে এসব জটিলতার জন্য তারা আদৌ তৈরী ছিল না, এই পড়াশুনার বয়সে সম্ভবতঃ কেউ তৈরী হতেও পারে না। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা তাদের কাছে কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছিল। এ সব বিষয়-আশায়-এর থেকে কদিন পর আমরা চলে যাব এবং দীর্ঘ দিন আর দেখা হবে না এ ব্যাপারটাই তাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছিল। তবুও আমি আমার কর্তব্য করে গেলাম।

প্রত্যেক হজ যাত্রীর উচিত ওরিশানদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা সম্পূর্ণ করে যাওয়া যাতে পরবর্তীকালে কোন রকম বিবাদের সৃষ্টি না হয়।

হজে যাবার ব্যাপারটি অনেক আগে থেকে সকলের মধ্যে প্রচারিত হোক এটা আমরা একেবারেই চাইনি এবং সেজন্যই আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত এবং মাফ চেয়ে নেবার ব্যাপারটা শেষের দিকে রেখেছিলাম। মানুষের পক্ষে ভুল করা স্বাভাবিক, ছোট বড় সকলের কাছে মানুষ নানান সময় ভুল বশতঃ স্বেচ্ছায় হোক নানান রকম ত্রুটি ও অপরাধ করে থাকে। সেই সব পূর্বকৃত অপরাধ মাফ চাইতে গিয়ে যাঁর বাড়িতেই উপস্থিত হলাম, দেখলাম কেমন করে যেন তাঁরা ব্যাপারটি সকলেই জেনে গেছেন। আল্লাহ যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই। ক্ষমা চাওয়া এবং বিদায় নেওয়ার ব্যাপারটি আমরা তিন দিনের মধ্যেই সেরে ফেললাম। একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম ঃ আমাদের হজে যাবার ব্যাপারে সকলেই বেশ খুশি,

ব্যাপারটি তাঁরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে নিয়েছেন। আমরা সকলেরই স্বতঃস্ফূর্ত দোয়া পেলাম। বাড়ি ফিরে মহান আল্লাহ তায়ালাকে সহস্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

আগস্টের শেষ রোববারে ছিল ঊনত্রিশ তারিখ, কাফেলা অফিসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সাহিত্য মজলিশ। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম মোল্লা সেই অনুষ্ঠানে আমাদের আল্লাহর পথে অভিসারের কথা ঘোষণা করলেন এবং তার স্বভাবসুলভ ভংগিতে একটা আবেগপ্রবণ বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। রফিউল্লাহ্ও বললেন কিছু কথা। আমি স্বেচ্ছায় সকলের সালাম নবীজীর দরবারে পেঁৗছে দেবার দায়িত্ব নিলাম এবং উপস্থিত কবি-সাহিত্যিক বন্ধুদের নিকটে ক্ষমাও চেয়ে নিলাম। দীর্ঘ সময় যে এই মজলিশের অনুষ্ঠানগুলিতে উপস্থিত থাকতে পারব না তার জন্যে বেদনাবোধ করছিলাম।

আমার এক আত্মীয়, যিনি বছর চারেক আগে হজ করে এসেছিলেন, বার বার নানান বিষয়ে উপদেশ দিলেন। কি কি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, কোথায় কোথায় কষ্টের সম্ভবনা, কোন কোন বিষয় সতর্ক থাকতে হবে ইত্যাদি নানান বিষয় তাঁর আলোচনার মধ্যে ছিল। একটি বিষয়ে তিনি অনেকবার অনুরোধ জানালেন ঃ আমরা যেন রসুলুল্লাহর কাছে তাঁর সালাম পেঁৗছে দিই এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন আমরা বাসায় ফিরছিলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। তিনি দু তলা থেকে নেমে সেই অন্ধকারেও আমাদের সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলেন এবং বার বার একই অনুরোধ জানালেন। সেদিন তাঁর মধ্যে এক অদ্ভুত আকুলি-বিকুলি লক্ষ্য করেছিলাম। হজ থেকে ফিরে এসে শুনলাম আমার এই আত্মীয়টি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ তাঁর জান্নাত নসীব করুন !

দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সেই মহালগ্নের আর বেশি দেরী নেই। মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে সোবেহ সাদেকের ইশারা। ঘন তমিস্রায় যেন এক অপার্থিব আলোকের শব্দহীন বিচ্ছুরণ ঘটতে চাইছে। আমি দেহে মনে আত্মায় বার বার এক আশ্চর্য

অনুভূতির পরশ পাচ্ছি, বার বার শিহরিত হচ্ছি—কিন্তু বাইরে তার কোনই প্রকাশ ঘটল না। আমি পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহতেই আত্মসমর্পিত হলাম।

হজ যাত্রার একদিন আগে এলেন মৌলানা মুহম্মদ তাহের সাহেব। এই পরম শুভ মুহূর্তে এই শ্রদ্ধাস্পদ মানুষটিও যে আমার মত নগণ্যজনকে মনে রেখেছেন এরজন্য আল্লাহকে শুকরিয়া জানালাম। তিনি দোয়া করলেন এবং আসল উপদেশটি দিলেন। ঠিক দু বছর আগেই তিনি মহান হজ ব্রত সপুত্র সম্পন্ন করে এসেছেন। বললেন, থাকা-খাওয়ায় শরীরে অহেতুক কষ্ট দেবেন না— কষ্ট দেবেন আল্লাহর এবাদাতে আর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করবেন যত বেশি পারেন যত সাধ্যে কুলায় এবং মদিনায় রওজা পাকে বসে করবেন দরুদ শরীফ পাঠ ও কোরআন তেলায়ত।

বলতে দ্বিধা নেই, এই উপদেশ আমাদের সমগ্র হজে যেন নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে।

কাবা শরীফের সামনে যাঁরা রাকাতের পর রাকাত নফল নামায পড়েন কিংবা কালাম পাক তেলায়ত করেন তাঁদের আমি দোষ দেব না কিন্তু নফল নামায বা তেলায়তের থেকে যে তওয়াফ বেশি সওয়াবের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়া নফল নামায বা তেলায়ত বাড়িতে বসে সারাজীবন করা যাবে কিন্তু হজ থেকে ফিরে নিজ মাতৃভূমিতে তওয়াফের জন্য কাবা শরীফকে পাওয়া যাবে না।

অবশেষে এসে গেল সেই বহু প্রতীক্ষিত একত্রিশ আগষ্ট, মঙ্গলবার, প্রেমের পথে মহা অভিসারের শুভ লগ্ন। সকাল থেকেই বাড়িতে ভিড়—চেনা-অচেনা, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী—একে একে আসছেন, চলে যাচ্ছেন। সকলের মুখেই এক কথা, সকলেই মিনতি জানাচ্ছেন ঃ আমার জন্যে দোওয়া করবেন। দেখলাম সকলেই দোওয়ার প্রার্থী। বুঝলাম সংসার-জীবনে এঁরা নানান ভাবে বিপর্যস্ত, নানান বিপদ-আপদের সম্মুখীন, রোগে-শোকে জীর্ণ, অর্থনীতিক অবস্থায় বেসামাল, মানসিক দ্বন্দ্বে অস্থির। স্বচ্ছলতা চাই, শান্তি চাই—সুতরাং এঁরা দোওয়ার

প্রার্থী। এ'দের কথা ভেবে আমি ব্যথা পাই, আহত হই। এ'রা সকলেই নগদ বিদায়ে বিশ্বাসী। এ'রা প্রত্যেকেই সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে জয়ী হতে চান। অথচ এই অসম্ভব ব্যাপারটি কখনই সম্ভব হতে পারে না। এ'দের মধ্যে ঈমান কতটা আছে তা আল্লাহই জানেন, কিন্তু অধিকাংশই রুকু-সিজদা করেন না, রোযা রাখেন না, যাকাতের ধার দিয়েও যান না। সংসার-জীবনেও অলস এবং কর্মবিমুখ। ক্ষেতে আলু রোপন না করে কেবল মাত্র দোওয়ার বরকতে হাজার মন আলু ফলান যায় না। প্রথমে চাই সোনার মাটি প্রস্তুত করা, এক আল্লাহতে ঈমান সুদৃঢ় হবার পর চাই বীজ বপন অর্থাৎ নামায-রোজা-যাকাত ইত্যাদি আন্তরিকভাবে পালন করা, তারপর চাই পরিচর্যা—নিড়ানো সার দেওয়া অর্থাৎ সংসার জীবনে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা এবং কোন বিষয়ে সীমালংঘন না করা। এ ধরনের জীবনবৃক্ষে, রহমত আল্লাহর, ফুল আপনিই ফুটবে। আমি ডাল ভরা ফুল চাইব আর বৃক্ষর মূল মাটি থেকে ছিন্ন করে রাখব—আমরণকাল অপেক্ষা করলেও আমার হাতে, কেবল দোওয়ার বরকতে, একটি পাপড়িও ছিঁড়ে পড়বে না।

ঈমান এবং আমলের সঙ্গে দোওয়া অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত, ফলের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে সৌরভ, যেখানে ফুল নেই সেখানে সৌরভও থাকতে পারে না। সেখানে ঈমান এবং আমল নেই সেখানে দোওয়া অর্থহীন। আমাদের সকলের উচিত ঈমান-মুখী হওয়া, আমলমুখী হওয়া। ঈমান শক্তির উৎস, আমল সেই শক্তিকে কল্যাণমুখী করে।

অথচ আমাদের সমাজে অনেক পীর সাহেব, অনেক মাওলানা সাহেব দোওয়া প্রার্থীদের ঈমান-মুখী হতে, আমলমুখী হতে কমই উপদেশ দিয়ে থাকেন। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এ'রা বরং মানুষকে অধিকতর দোওয়া নির্ভরশীল করে তোলেন। তাতে শিষ্য সংখ্যা বাড়ে, বাড়ে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিজের বুজরুকিও। এ'রা তখন রসূলুল্লাহ্‌র কথা বেমালুম ভুলে যান। এ'রা তো কেউই হযরত মুহম্মদ স-এর থেকে বড় নন। কেবল দোওয়ায় যদি

কাজ হত তা হলে রসূলুল্লাহ স কেবল মসজিদ নববীতে বসে দোওয়াই করতেন, যুদ্ধজয়ের জন্য তাঁকে সেনাপতির বেশে বদর-খন্দক-হুনায়নের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে হত না।

অসংখ্য মানুষের মধ্যে বিশেষ ভাবে ব্যতিক্রম দেখলাম একজনকে, তাকে আমি পূর্বে বড় একটা সুনজরে দেখতাম না। সে দুটি ফুলের মালা এবং প্রচুর মেওয়া নিয়ে হাজির। আমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরে সে একবার তার কপালে ঠেকায়, একবার চুমা খায়— এমনি করে বার বার আর কেঁদে কেঁদে বলতে থাকে ঃ আমি কিছু চাই না—আল্লাহ পাকের দরবারে আমার ঈমানের জন্য দোওয়া করবেন।

অতিসাধারণ এই মানুষটির ব্যবহারে সেদিন আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিলাম।

সব আয়োজন শেষ হয়ে এসেছিল, বিদায় মুহূর্ত আসন্ন। সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব তাঁর লেখা একটি অত্যন্ত উপকারী পকেট বই দিয়েছিলেন, 'হজ ও জিয়ারতনামা', বইটি যে কতখানি কাজের এবং গুরুত্বপূর্ণ তা কাবা শরীফে উপস্থিত হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম। এই বইতে নানান নির্দেশ এবং উপদেশ ছিল, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে দু রাকাত নামায পড়া প্রয়োজন এবং সেজন্যই মহল্লার মসজিদে গেলাম। সৌভাগ্যক্রমে গিয়েই আসরের জামাত পেলাম। কিন্তু আসর আর মগরিবের মধ্যে আর কোন নামায পড়া চলে না সুতরাং দু রাকাত নামায পড়া হল না তবে আল্লাহ্‌র কাছে প্রাণ ভরে দোওয়া চাইলাম। মুনাযাত শেষ করে উঠে দেখি অনেকেই আমার জন্য অপেক্ষা করছেন, তাঁরা সকলেই একে একে আমার সঙ্গে মিলিতও হলেন, সকলেই আন্তরিক ভাবে হজযাত্রা শুভ হোক বলে দোওয়া করলেন। আমার চোখ পানিতে ভরে এল। এত মানুষের এত শুভেচ্ছা, আল্লাহ গো—

বাড়িতে এসে দেখি আমার স্ত্রীও নামায পড়ে প্রস্তুত। বলতে দ্বিধা নেই আমার স্ত্রী সর্ব বিষয়ে আমার থেকে অনেক বেশি সংযমী ও অগ্রগামী। এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে বাড়িতে কে থাকবেন তারও

ব্যবস্থা তিনি করে রেখেছেন, অতি নিকট আত্মীয়া মঞ্জু এবং তার স্বামী আজ কদিন ধরেই বাড়িতে আছে। সংসারের যে সব রাশিকৃত প্রয়োজন ছিল সে সব তিনি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করে রেখেছেন। সুতরাং এখন আমরা দায়মুক্ত এবং এখনই শুরু হবে মহাঅভিসার—

এই অভিসারের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নিয়ম-নির্দেশ অনুষ্ঠান-উপাসনার মূল লক্ষ্য ঃ মানুষকে পরিপূর্ণরূপে আল্লাহমুখী করা, তাকে সমুদয় অহংবোধ থেকে মুক্ত করে বিনত করা, মহিমাময় আল্লাহতে আত্মসমর্পিত করা।

বিকেল পাঁচটা তের মিনিট। এই দোওয়া পড়ে বিসমিল্লাহ্ বলে আমরা আল্লাহ্‌র পথে পা বাড়ালাম ঃ

বিস্‌মিল্লাহে তাওয়াক্‌কালতু আলাল্লাহে, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহে। আল্লাহ্‌র নামে যাত্রা শুরু করলাম, আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, আল্লাহ্ শক্তি না দিলে পাপ থেকে বাঁচার এবং তাঁর উপাসনা করার কারও কোন শক্তি নেই।

অনেক ভিড়, অনেক অশ্রু সজল চোখ অতিক্রম করে আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

গাড়িটা সকলে ফুল দিয়ে সাজিয়ে বরযাত্রীর গাড়ি করে তুলতে চেয়েছিল, আমি তাদের ধমক দিয়েছিলাম এবং সকলকে বিশেষ করে নিষেধ করেছিলাম কেউ যেন স্টেশনে না আসেন, বাড়িতে যে যার নিজের নিজের কাজ করুন।

এক সময় গাড়ি ছাড়ল হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে। আমাদের মহাসফর শুরু হল, আমরা আল্লাহ্‌র কাছে বিনীত হলাম। পড়লাম ঃ আল্লাহুম্মা হাওবেন আলায়না...হে আল্লাহ্ যে সফরে যাচ্ছি তার সকল অনিষ্ট হতে আমি আপনার আশ্রয় চাই। এই সফরের সময় আপনি আমার সন্তানসন্ততি এবং বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করুন আমি আপনার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী এবং আপনাতেই আত্মসমর্পনকারী।

যাত্রা পথে কলকাতার সেই বিখ্যাত জ্যাম মাঝে মাঝেই পথ রোধ করে দাঁড়াল, পনের মিনিটের পথ শেষ হল পৌনে এক ঘন্টায়।

যখন স্টেশনে পৌঁছলাম তখন মগরিব জয়ীফ হয়ে গেছে। তবু নামায পড়লাম। মুনাযাত শেষ করে উঠে একেবারে অবাক হয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে মালা হাতে, ফুলের তোড়া সহ বহু লোক এসে গেছেন এবং এখনও আসছেন অবিরাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকে লোকারণ্য। আমরা এটা একেবারেই আশা করিনি। তা ছাড়া এই বাড়াবাড়ি ব্যাপারটা আমার কোন দিনই ভাল লাগেনা, সকলকে নিষেধও করেছিলাম, দেখলাম অনেকেই সে নিষেধ মানেন নি ; তাঁদের হৃদয়াবেগের স্রোতে আমাদের নিষেধ খড়কুটোর মত কোথায় ভেসে গিয়েছে।

প্লাটফর্মে গাড়ি এল, রিজার্ভ কামরায় আমাদের সামান্য মাল-পত্র তুলে দিলেন সকলে। তারপর সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। মেয়েরা আমার স্ত্রীকে নিয়ে পড়লেন, আমাকে ঘিরে পুরুষ দল কেউ মালা গলায় পরিয়ে দিচ্ছেন, কেউ কদমবুসি করছেন, কেউ হাতে হাত মেলাচ্ছেন, কেউ ভিড় ঠেলে কাছে আসতে না পেরে অতি বিনীত এবং সশ্রদ্ধ ভাবে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, অতিউৎসাহী যুবকের দল কামরার বাইরেটা ফুল দিয়ে সাজাবার কাজে তখন ভীষণ ব্যস্ত। দেখতে দেখতে মালায় তোড়ায় এবং ফুলে কামরার ভিতরটা ভরে উঠল। মুহুর্মুহু নারায়ে তকবীর আল্লাহ হো আকবর ধ্বনিতে সমগ্র স্টেশন মুখরিত হয়ে উঠল। আমরা দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী অভিভূত হয়ে গেলাম। আমাদের মত অকিঞ্চনের জন্য এত মানুষের এত ভালবাসা এত শ্রদ্ধা যে জমা ছিল তা ভাবতেই পারিনি। বার বার চোখ দুটি ভিজে আসছে। সিজার এবং মনির কাছে এল অবশেষে। বুকে ধরে শেষ বারের মত বললাম ঃ ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শোবে—ফজরের নামায যেন কাজা না হয়।

সাতটা একান্ন। সবুজ আলো জ্বলে উঠল, ট্রেন বোম্বের পথে চলা শুরু করেছে, পিছনে তখন নারায়ে তকবীর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে. কিছুক্ষণ অনেকের আন্দোলিত বাহুগুলি দেখতে পাচ্ছিলাম, এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সকলকে পিছনে ফেলে আমরা চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি—দূরে বহু দূরে।

একদিন সকলকে ফেলে, সকলের অশ্রুসজল চোখের উপর দিয়ে এভাবেই আমি চলে যাব, আমরা চলে যাব। সেদিন আমরা কেউই আর ফিরে আসব না।

ইতিমধ্যে দেড় ঘণ্টার পথ চলে এসেছি। শহরের ব্যস্ত জটলা, ধূলিমলিন আলোর বিষণ্ণতা অনেক আগেই দৃষ্টির আড়াল হয়েছে, এমন কি শহরতলীর আধা শাহরিক অর্ধ ব্যস্ততা ও নগ্নতাও বহু পূর্বেই অতিক্রান্ত। এখানে, দু পাশেই গ্রাম বাংলার উদার আব-হাওয়া আর অকৃপণ রূপরাশির অনন্ত বিস্তার।

এখন প্রায় রাত ন-টা, আজ দ্বাদশী। একটু আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে, নির্মল আকাশে ছিটে ফোঁটা মেঘ। এবারে বিলম্বে বর্ষা নামায় এখনো রোয়ার কাজ চলছে মাঠে, কোথাও কোথাও ধানগাছ বেশ বড় হয়ে উঠেছে, বর্ষণ-সিক্ত নিবিড় গাছ-গাছালির পত্রপল্লব ঝিকমিক করছে চাঁদের আলোয়, জ্যোছনার বেহেশতী লেবাস পরে প্রকৃতি যেন অপরূপা হয়ে উঠেছে। এসব দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ যেন নিজের মনের অতলে তলিয়ে গেলাম। চোখের সামনে ভেসে উঠল মক্কা নগরী, ভেসে উঠল সাফা-মারওয়া, ভেসে উঠল রসূলুল্লাহ্র জন্ম-ভূমি, ভেসে উঠল জিবরাইল ফেরেশতা, ভেসে উঠল আল্লাহর ঘর কাবা। কয়েকটা বছর মক্কা-মদিনায়, মরুর প্রতি বালুকণায় আল্লাহ্ যেন তাঁর অনন্ত রহমত উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। অসীমের বার্তা বয়ে নিয়ে জিবরাইল আ এই নেমে আসছেন, এই উঠে যাচ্ছেন। সসীম-অসীমে যেন এক মহামিলনের আসর বসে গিয়েছিল। ধন্য সেই যুগ, মহাসৌভাগ্যবান সেই যুগের আশ্চর্য সব মানুষেরা! আমরা চলেছি সেই দেশে, সেই মহিমান্বিত দেশে—আল্লাহর মেহবান হয়ে। কাবাকে কেন্দ্র করে সব কিছু আলোড়িত হয়েছে বার বার। চোখে আমার কাবার পবিত্র ছবি সুস্পষ্ট, আমরা চলেছি সেই কাবার পথে—

বোম্বে মেল তখন দুরন্ত গতিতে ছুটে চলেছে দু পাশের গাছপালায় ঝড়ের আন্দোলন জাগিয়ে, মনে হচ্ছে সে আর কোথাও থামবে না। কাবার কথা ভাবতে ভাবতে আমি বাইরের দিকে

যেই তাকিয়েছি, হঠাৎ চমকে উঠে দেখি গাছপালা ঘরবাড়ি ক্ষেতখামার সকলেই আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে। আর হঠাৎই আমার মনে হল: কচি ধানের ক্ষেত চলেছে কাবার পথে জ্যোছনা-ঝিকমিক কলার বাগান চলেছে কাবার পথে, উল্লসিত কাঁশফুলের বন চলেছে কাবার পথে, নারিকেল গাছের সারি লম্বা লম্বা পা ফেলে দৌড়ুচ্ছে কাবার পথে, সবুজ শ্যামল প্রান্তর ছুটেছে কাবার পথে, মিটি মিটি আলো সহ গৃহাঙ্গন চলেছে কাবার পথে, কাজ ভুলে গৃহবধূরা আত্মহারা হয়ে ছুটেছে কাবার পথে, সারা গ্রাম সারা মাঠ চলেছে কাবার পথে, জ্যোছনায় পথ আলো করে দ্বাদশীর চাঁদ চলেছে কাবার পথে, নীল আসমান আর ভাসমান মেঘ ছুটেছে কাবার পথে, তারকারাজি আর নীহারিকাপুঞ্জ অবিরাম গতিতে ছুটেছে কাবার পথে, নিখিল বিশ্ব দুর্নিবার বেগে চলেছে কাবার পথে—

আকাশে বাতাসে আজ আল্লাহর আহ্বান। আল্লাহর মেহমান হয়ে, কিছুদিনের জন্য নিজেকে ভুলে, চল—সকলেই চল আজ কাবার পথে।

প্রকৃতপক্ষে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, আমরা সকলেই প্রতিদিন প্রতি পলে, অনিবার্যভাবে সেই কাবার দিকেই এগুচ্ছি। সেই পরম সত্যের দিকেই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন।

৩.

বাইরে তখনো অন্ধকার, কিছুই স্পষ্ট করে চেনা যায় না, সেই অন্ধকার গায়ে জড়িয়ে প্রকৃতি যেন স্তব্ধ। ট্রেনের এই কম্পার্টমেণ্টও নিস্তব্ধ, ঘুমে কাতর সকলেই, এত ভোরে সম্ভবতঃ ওঠার অভ্যাস নেই কারও। কেবল আমরা দু'জন ফজরের নামায পড়ে, আরো আলোর প্রত্যাশায় এবং সবার আগে বাইরের রূপরাশির সবটা লুট করে নেব বলে জানালার ধারে বসে রইলাম চুপচাপ। অন্ধকারে চোখটাকে যতই অভ্যস্ত করতে চাই, ততই দৃষ্টিরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, দেখা যায় না কিছুই। বাইরে এভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল ঃ এই অন্ধকার যদি আর দূর না হয় ? যদি আর কোনদিন আলো না ফোটে ? মনে পড়ল কোরআন শরীফে ঠিক এ ধরণের একটি আয়াত পড়েছি ঃ '

''তোমরা ভেবে দেখেছ কি আল্লাহ যদি রাত্রির অন্ধকারকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত স্থায়ী করেন—আল্লাহ ছাড়া এমন কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের দিবালোক দান করতে পারে ?'' ২৮ ঃ ৭১

নিশ্চয়ই শক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারও হিম্মত নেই অন্ধকারে আলো ফোটায়। আমাদের সৌভাগ্য যে অন্ততঃ আজকের দিনটা সেই ভয়ংকর গজবের দিন নয়। কেননা ঐ তো দিগন্ত বলয়ে আলোর আভাস, অন্ধকার পাতলা হচ্ছে ক্রমে, ডালপালা আর পত্রপল্লবের আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারও মিলিয়ে গেল এক সময়। ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে এল সব কিছুই, এখন পৃথক করে চেনা যায় গাছপালা লতাফুল ঝরাপাতা এবং কিশলয়। এদিকে পূব আকাশ আলোয় উতলা, সূর্য ওঠার এখনো অনেক বাকি কিন্তু সারা দিগন্ত জুড়ে যেন রং-এর মহোৎসব শুরু হয়েছে। আল্লাহ যেন নিখিল বিশ্বে তাঁর রহমতের নূর ছড়িয়ে দিচ্ছেন, নবপল্লবে বনউপবনে বিছিয়ে যাচ্ছে তার রেশ, তিনি যেন সকল মানুষকে উদ্দেশ্য করে কখনো আকাশ থেকে ডাক দিচ্ছেন—এই তো আমি এখানে, কখনো ঝিকিমিকি পল্লব থেকে আহবান জানাচ্ছেন—এই তো আমি এখানে,

কখনো তৃণশীর্ষের শিশির বিন্দু থেকে তাঁর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে—এই তো আমি এখানে। ঘাস লতাপাতা ফুল মাটি নদী মেঘ আকাশ বাতাস নিখিল ভুবন থেকে যেন অবিরাম তাঁর আহ্বানধ্বনি ভেসে আসছে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা—এই তো আমি, তোমাদের পায়ের সামনেই সরল পথ, সেরাতল মুস্তাকিম, চলে এস—

বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে চলে এসেছি তবুও প্রকৃতি ও পরিবেশে খুব বেশি পরিবর্তন চোখে পড়ল না। সকাল আটটায় পৌঁছলাম বিলাসপুর। দল বেঁধে বিলাসপুরী যুবতীরা মাঠের কাজে চলেছে, ভীষণ আঁট-সাঁট দেহ, সাঁওতালি নিটোলতাও টোল খায়। কেউ কেউ ইতিমধ্যে মাঠের কাজে নেমে পড়েছে, রোয়ার মরশুম চলছে। এদিকেও রাতে বৃষ্টি হয়েছিল প্রচুর—তার চিহ্ন সর্বত্র। বর্ষণ-সিক্ত সজীবতা গাছের ডালে পাতায় মাটিতে ক্ষেতে ফসলে—সম্ভবত মানুষের দেহে এবং মনেও। কালাম পাকের বহু জায়গায় আছে ঃ 'বৃষ্টি দ্বারা আমি মৃত মৃত্তিকাকে পুনর্জীবিত করি।' ৫০ ঃ ১১। আজ ট্রেনে বসে যতদূর দৃষ্টি যায় আমি দেখতে পাচ্ছি, কেবল মৃত্তিকাই পুনর্জীবন পায়নি, নতুন জীবন পেয়েছে মানুষও, চরাচরের সর্বত্র তার স্পন্দন। নতুন আশা মানুষের বুকে, কিষাণের মুখে নতুন হাসি। মেঘহীন আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এতদিন তারা যেন মরেছিল, আজ তাদের উল্লসিত মুখগুলি দেখে গৃহবধূরা একে অন্যের আড়ালে সযত্নে চোখে কাজল পরছে।

বড় একটা নদীর উপর দিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করল এক সময়। চারদিক থেকে ঝোরা পানি হু হু শব্দে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, বর্ষণপুষ্ট নদী কানায় কানায় ভরা, তার দেহের সর্বত্র ঘূর্ণি জেগেছে, পাক খেতে খেতে সমগ্র নদীটাই যেন সুদূরে ছুটে চলেছে, যেন অনন্ত অসীমের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হবে বলেই তার এই অবিরাম ছুটে চলা, পরম প্রভুর কাছে আত্মসমর্পিত হবে বলেই তার বুকে এত আবেগ। সে মানুষের মত অকৃতজ্ঞ নয়।

মানসিক এই অবস্থায় ট্রেনে বসেই বেলা দশটা চুয়ান্ন মিনিটে তওয়াফ কবিতাটি লিখেছিলাম, সময় লেগেছিল পাঁচ মিনিটেরও

কম। অবশ্য মক্কায় বসে কবিতাটির কিছু সংশোধন করেছিলাম, আরো কিছু সংশোধিত হয়েছিল কলকাতায় ফিরে আসার পর। বলা বাহুল্য কবিতাটি আত্মসমপর্ণের কবিতা, পরম সত্যে আত্মলীন হবার কবিতা ঃ

তওয়াফ

কেন্দ্রে কাবাকে রেখে
করেছি তওয়াফ
পৃথিবীর মত
সূর্যের চারপাশে
ব্যাকুল পিপাসায়।

যেমন ছায়াপথ
ছুটেছে মহাশূন্যে
অলৌকিক অন্য এক
জ্যোতির্লোকের টানে।

তারকাপুঞ্জ মাঝে
নিরন্তর চলেছে তওয়াফ
এক সৌরলোক ধায়
অন্য সৌরলোকে।

কর্মের সহস্র বাঁধনে
তওয়াফ চলেছে দেখি
সংসার মাঝে
অবিরাম।

তারপর একদিন
তওয়াফের হয় শেষ
সাগর প্রান্ত চুমি
চঞ্চল জলধারা
হয়ে যায় শান্ত নীরব।

সংসার কাবা ছেড়ে
একদিন আমি
চলে যাব
চিরন্তন চলার পথে
একান্ত অনিবার

এ লাব্বায়েকের দেশ ছেড়ে
আর এক লাব্বায়েকের দেশে
অনন্ত জ্যোতির্ময়

সে নূরের তাজাল্লিতে
সেজদায় লুটিয়ে শির
আকণ্ঠ উল্লাসে যেন
বলে উঠি :

লাব্বায়েক লাব্বায়েক
প্রভু গো
তোমার খিদমতে অধম
গোলাম নতশির ॥

কাল রাতে আমাদের কম্পার্টমেন্টটা ভাল করে দেখাই হয়নি, আজ পর্যাপ্ত দিনের আলোয় কিছুটা চোখ বুলিয়ে নেবার অবকাশ পেলাম। দেখলাম : বেশ কয়েকজন হজযাত্রী আছেন, সকলেই পশ্চিমবাংলার, কয়েকজনের সঙ্গে সামান্য কিছু আলাপও হল!

আমার কিন্তু বেশি কথা বলতে একেবারেই ভাল লাগছিল না। আমি যেন নিজের মধ্যে ক্রমেই গুটিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার স্ত্রী দু-একজন মহিলার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন কিন্তু লক্ষ্য করলাম তিনিও নীরবতাই পছন্দ করছেন।

ট্রেন ছুটে চলার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর দিকে দৃষ্টি রাখছিলাম ঠিকই কিন্তু আমার মন পড়েছিল বোম্বাইতে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে নেমেই খুঁজে বার করতে হবে হজ কমিটি নির্বাচিত মুসাফিরখানার ১৩৬নং কুলি জনাব আবদুল খালেককে, কেননা আমাদের জন্য তিনিই নির্বাচিত হয়েছেন। তারপরের বড় কাজ হোটেল ঠিক করা, অবশ্য কথামত যদি আবদুল খালেক সাহেব ঠিক করে রাখেন তা হলে একটা ভাবনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। হজ কমিটি থেকে পাশ-পোর্ট এবং এয়ার টিকিট সংগ্রহ করা তার পরের কাজ। ট্রেনের হট্টগোলে কান

দেবার মত কোন অবকাশই ছিল না। আমি তখন ভাবছিলাম অন্য কথা, আমার চোখে তখন ভাসছিল অন্য জগতের ছবি।

বিকেল পাঁচটা চল্লিশ মিনিটে 'সায়ী' কবিতাটি শেষ করলাম। কবিতাটি পরে আমার ''ফেরা'' কাব্যগ্রন্থের সম্পদ হয়েছে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় চরিত্রের সঙ্গে আমার আর একবার সাক্ষাৎকার ঘটে গেল, নামায পড়ব বলে নামতে গিয়ে দেখি আমার স্যাণ্ডেল জোড়া গায়েব হয়ে গেছে। এখন ট্রেনযাত্রা যে কতখানি ভীষণ হয়ে উঠেছে তা ভাবতে খুব কষ্ট হয়। ব্যবসা করতে গিয়ে দোকানে নিরাপদ নই, পথে ঘাটে নিরাপদ নই, ট্রামবাসে নিরাপদ নই, প্লেনে-ট্রেনে নিরাপদ নই, এমন কি বাড়িতেও নিরাপদ নই। আমাদের জাতীয় চরিত্র শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে ?

দিন হয়ে এল শেষ। ক্লান্ত রাখাল শিথিল পদবিক্ষেপে এখন বাড়ির পথে। এক ঝাঁক কলেজের ছেলেমেয়ে উঠেছিল ওয়ার্ধা থেকে, কাকলি ছড়াতে ছড়াতে নেমে গেল ফুলগাঁ-তে, তারাও বাড়ির পথে। মাথায় লাল ফেজ পরে নীলাকাশ পৃথিবীর সবুজ জায়নামাযে দাঁড়িয়েছে মগরিবের নামাযের জন্য, ট্রেনের মধ্যে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম।

এখন সময় ছটা বাহান্ন, কলকাতায় মগরিব হয় ছ-টা পাঁচে, সুতরাং কলকাতার সঙ্গে ফুলগাঁ-র সময়ের ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ মিনিট।

নামায পড়ে বসতে না বসতেই রাতের খাবার দিয়ে গেল এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে, ঊর্ধাকাশে তখন লাল আভা রয়েছে ! অনেকেই অর্থহীন হাসি হাসলেন, কড়া মন্তব্য করলেন কেউ কেউ কিন্তু তাতে আমাদের ভারতীয় ট্রেনের শব্দের কোনই পরিবর্তন হল না।

এশার নামায পড়ে জানালার কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম। অতিকায় পাহাড়ের উপর দিয়ে চাঁদের ভেসে ওঠা, টুপ করে গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়া, আবার হঠাৎই উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে জ্যোৎস্নায় ভেঙে পড়া—কতদিনের সেই পুরানো খেলা দেখতে দেখতে

এক সময় তন্দ্রার স্পর্শ অনুভব করলাম, কম্পার্টমেণ্টের ভিতরটা ইতিমধ্যেই নীরব হয়ে এসেছে, সকালের প্রত্যাশায় আমিও আল্লাহ্‌র শরণ নিলাম।

কল্যাণ স্টেশনে নামালেন এক ভদ্র মহিলা, সঙ্গে নামল তাঁর বিরাট লটবহর। হৈ-হুল্লোড়ে যখন ঘুম ভাঙল, ভোর হয়ে এসেছে। নামায পড়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। আমরা বম্বের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। শহরতলির সূচনা হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই ঘরবাড়িতে শহুরে ভাব ফুটতে ফুটতে হঠাৎ শহরতলির ভাব কেটে বোম্বের ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এক সময় দাদার স্টেশন পার হলাম, তার অল্প কিছু পরেই এসে গেল সেই বহু প্রতীক্ষিত ভি. টি। কলকাতার যেমন শিয়ালদহ, বোম্বের তেমনি ভি. টি অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস। বেডিং পত্র আগেই বাঁধাছাঁদা করে রেখেছিলাম এখন শুধু ১৩৬নং তকমা আঁটা আবদুল খালেক সাহেবকে খুঁজে বার করা। তাতেও কোন অসুবিধা হল না, লাল কুর্তা গায়ে স্টেশনের যে কুলি এসেছিল তাকে ১৩৬নং এর কথা জিজ্ঞেস করতে সেই ধরে আনল খালেক সাহেবকে। বেঁটে খাট দোহারা চেহারা, রঙ মাঝামাঝি, পরণে পা-জামা গায়ে ফুল সার্ট। কথাবার্তা অমায়িক, ব্যবহারও তাই এবং অমায়িক ভাবেই তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন। দু'মিনিটেই অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গেল, ভাষার পর্দা সরে গেল, তিনি আমাদের আপন হয়ে গেলেন।

যিনি আপন হন তিনি এভাবেই হয়ে যান, অন্যথায় সারা জীবন পাশাপাশি বাস করেও মানুষ চেনা যায় না, দূরত্ব থেকেই যায়।

১৩৬নং-এর জনাব আবদুল খালেককে পাওয়া সত্যই একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিশ্বাসে পরিচর্যায় কর্মতৎপরতায় ইনি আমাদের বোম্বের প্রবাস জীবনকে মধুময় করে তুলেছিলেন, এমন কি হজ যাত্রার উদযোগ-আয়োজনের যে দুরূহ অংশটুকু বাকি ছিল তা ইনি আমাদের হয়ে সম্পন্ন করে দিয়েছিলেন।

দেখলাম স্টেশনের কুলিরাও আবদুল খালেক সাহেবের খুব অনুগত, তিনিও আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকলেন, কুলিরাই মাল

নামিয়ে একেবারে স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে গেল। দাম চুকিয়ে দিলাম। খালেক সাহেব আমাদের নিয়ে নির্দিষ্ট হোটেলে এলেন। এ সময় বোম্বের সাধারণ কোন হোটেল খালি থাকে না, কলকাতা থেকে হোটেল বুক করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন সৈয়দ আশরাফ হোসেন সাহেব, দেখলাম ১৩৬নং তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি করেন নি। আমাদের বাক্স বেডিং এবং অন্যান্য সব কিছু রুমে তুলে দিয়েও বেশি কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করলেন তারপর বিকেলে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন। আমরা সত্যই খুশি হলাম।

এই মহাতীর্থ যাত্রায় এখনো পর্যন্ত করুণাময় আল্লাহ্ আমাদের সম্পূর্ণ নিরাপদেই রেখেছেন, অত্যন্ত আনন্দের মধ্য দিয়ে বোম্বে পর্যন্ত তিনি আমাদের পৌঁছে দিলেন —সেই রহমানুর রহীমের রহমতের কথা ভাবতে ভাবতে উল্লাসে উচ্ছ্বাসে আবেগে বুকের ভিতরটা দারুণভাবে আন্দোলিত হয়ে উঠল। অশ্রু রোধ করে সাধ্য কার। আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম, সব কিছুর আগে শুকরের নামায পড়লাম দু'রাকাত ঃ আল্লাহ গো ! আমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করবেন, পরিপূর্ণরূপে হজ করার তৌফিক দেবেন, যাত্রাপথ নিরাপদ রাখবেন, মধুময় করবেন এই অভিসার, আপনার সাহায্য ছাড়া কোন কিছুই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

আমার জীবন সঙ্গিণীর হাত দুটিও উত্তোলিত হয়ে আছে আল্লাহর দরবারে, তাঁর চোখেও অশ্রুর প্লাবন।

যে হোটেলে আমরা এসে উঠেছি সেটি কোন দিক দিয়েই উঁচু মানের নয়, বরং সাধারণ মানের থেকে কিছুটা নীচুই বলা চলা। ছোট ছোট রুম, বড় একটা পরিচ্ছন্ন নয়, আলো-হাওয়া নেই বললেই চলে এমন কি পানির সরবরাহও পর্যাপ্ত নয়। নানান প্রয়োজনে আমরা বহুবার কলকাতার বাইরে এসেছি, সে সময় যদি এ ধরণের একটি হোটেলে উঠতাম তা হলে আমার স্ত্রী কেবল রাগই করতেন না, সম্ভবতঃ অন্য হোটেলে যেতে বাধ্য করতেন। কিন্তু আজ তিনি একটি কথাও বললেন না, হাসি মুখে সব কিছু মেনে নিলেন।

বুঝলাম, আল্লাহর পথে যাত্রা করলে মানুষ অধিকতর কষ্ট সহিষ্ণু হয়।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম, বিকেলে বেরুলাম মার্কেটিংএ, অল্প কিছু বাজার করার ছিল, সেগুলি সংগ্রহ করলাম। বাজার বলতে এমন কিছু নয়—জমজমের পানি আনার জন্যে দুটি দশ লিটারের প্লাস্টিক জার, দশ মিটার নাইলনের সরু দড়ি. কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ, দুটি তসবি. এক প্যাকেট ব্লেড, একটি তালা, ঘর-কন্নার আরো কিছু টুকিটাকি—চা ছাঁকনি, হাঁড়ি মাজা ব্রাস. ছোট ডেকচি ইত্যাদি। এ ছাড়াও চাল ডাল আলু সরষের তেল ঘি ইত্যাদিও কিনলাম প্রায় পনের কেজির মত, আরো কিনলাম দু'জনের কাফন ও এহরামের কাপড়। সব মিলিয়ে প্রায় ত্রিশ কে. জির ওপর হয়ে গেল। পরে বাস্তব অভিজ্ঞতায় বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম ঃ এভাবে কেনাকাটা করে ঠিক করিনি। খাদ্যদ্রব্য এবং বাড়তি কাপড়াদি কিনে মক্কা শরীফে বয়ে আনা একেবারেই অর্থহীন। যে সব শুভার্থীরা এ সব কেনাকাটা করার উপদেশ দেন. আমার মতে তাঁরা ভাল করেন না, বিশেষ করে প্লেনের যাত্রীদের জন্য এগুলি একেবারেই পরিত্যাগ করা উচিত। প্রথমতঃ এগুলি বয়ে নিয়ে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, বিশেষ করে স্মরণ রাখা দরকার যে সৌদি আরবে কোথাও কুলি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের মত মানুষের জীবন এবং সম্মান কোনটিই সেখানে সস্তা নয়, সুতরাং যা কিছু করতে হয় নিজেকেই। বেডিং ও ব্যাগ বয়ে ওঠা-নামা করা এক প্রাণান্তকর ব্যাপার, তার উপর এ সব জিনিষপত্র থাকলে তো আর কথাই নেই। পথে কখনো কখনো আমার এমন মনে হয়েছে এসব জিনিষপত্র ফেলে চলে যাই—কিন্তু তখন ফেলাও যায় না, ছাড়াও যায় না। তাছাড়া বিমানযাত্রীদের কাছে বিমানকর্তৃপক্ষ শোভনীয় কিছু আশা করেন, ওঠানামা চলাফেরা সব কিছুতেই। একই ব্যক্তি কাদা ভেঙে পথ এগুতে পারেন, গরুর গাড়িতে যেতে পারেন, ট্রেনে চড়তে পারেন, বিমানেও উঠতে পারেন—এই চার পরিবেশে নিশ্চয়ই তাঁর বেশবাস চলাফেরার মান এক নয়। বিমানযাত্রী অনেক হাজি

সাহেব এই ব্যাপারটা একেবারেই ভুলে যান, এটা তাঁদের বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন। মোটঘাট নিয়ে অনেক হাজি সাহেবকে এমন বেকায়দায় উঠতে দেখেছি যে তাতে লজ্জায় মাথা নুয়ে এসেছে, কোন হাজি সাহেবের তাতে সম্মান বাড়েনি বরং অমুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে কিছুটা হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন।

এ ছাড়া অন্য দিক দিয়েও বিষয়টা চিন্তা করা যেতে পারে। প্রশ্ন করা যেতে পারে ঃ এই দ্রব্যগুলি কিনে আমরা মক্কাশরীফে বয়ে নিয়ে যাব কেন? দু'দিক দিয়ে এর উত্তর দেওয়া যায়। ক. জিনিষগুলি মক্কায় পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলেও দাম বেশি অথবা নিকৃষ্ট মানের। খ. মক্কায় সৌদি রিয়েল ভাঙিয়ে জিনিষ কিনতে হয়, টাকা বা রিয়েল হাজিদের কাছে থাকে না, শেষ হয়ে গেলে বিদেশে টাকা পাত্তয়ার কোন উপায় নাই।

এ দুটির কোনটিও যুক্তিতে টেঁকে না। মক্কায় জিনিষ পাওয়া যায় না—এ ধারণা একেবারে ভুল। এটা ঠিক, সৌদি আরবে বিশেষ কিছুই উৎপন্ন হয় না, সব কিছুই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। আর নিখিল বিশ্বের প্রতিটি দেশ সৌদি আরবের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্যে লালায়িত, কেবল লালায়িত নয়—একেবারে নতজানু, এমন কি জাপান ইংল্যান্ড ফ্রান্স আমেরিকাও। দিনকাল ও পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে বিশ্বের বাজার এমন দাঁড়িয়েছে যে এরা সৌদি সরকারের কাছ থেকে বাণিজ্যের নির্দেশ পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে, বর্তে যায়। আর সৌদিরা সারা বিশ্ব থেকে যে দেশের যে জিনিষটি সব চেয়ে ভাল, সে দেশ থেকে সেই দ্রব্যটিই আমদানি করেন, কোন নিকৃষ্টমানের জিনিষ তাঁরা আনেন না। সুতরাং পৃথিবীর সেরা জিনিষগুলি মক্কা শরীফে পাওয়া যায়। যে বালাম চাল আমরা চোখে দেখিনি, মিসফালা বাজারে তা অঢেল! ডাল, আলু পিয়াজ রসুন লঙ্কা হলুদ জিরে মরিচ গরম মশলা—কি চাই। এক হাজি সাহেব আমাকে বলেছিলেন, একটিন ঘি নিয়ে যাবেন, ভাল ঘি সেখানে পাওয়া যায় না, রান্না কিছু যদি না করতে পারেন আলুভাতে আর ঘি, তোফা খাওয়া হয়ে যাবে। তাঁর কথামত

আমি ঘি কিনেছিলাম, আর এটা আমার পক্ষে বাড়তি বোঝা হয়েছিল, কিন্তু ঘি পাওয়া যায় না এমন মন্তব্য তিনি কেন করেছিলেন তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। মক্কা শরীফের বাজারে ঘিয়ের অভাব নেই এবং অসট্রেলিয়ান মাখন যা পাওয়া যায় তাও সর্বোৎকৃষ্ট। এবং সব থেকে বড় কথা এ সবকিছুই একেবারে ভেজাল শূন্য। সুতরাং জিনিষপত্রের মান সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। দামের দিক দিয়েও তুলনামূলকভাবে বেশ সস্তা. পরে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করব। আর এক হাজি সাহেব আমাকে বলেছিলেন সরষের তেল অবশ্য নিয়ে যাবেন কেননা মক্কায় সব তেল পাওয়া গেলেও সরষের তেল পাওয়া যায় না এবং জৈতুন তেলের রান্নায় কেমন একটা গন্ধ হয়, যাঁরা অভ্যস্ত নন তাঁরা সে তরিতরকারি খেতে পারেন না। মক্কা শরীফে গিয়ে দেখলাম সত্যই সরষের তেল পাওয়া যায় না, কিন্তু জৈতুন ছাড়াও অন্য তেল পাওয়া যায়, এক কেজি-র দাম মাত্র সাড়ে চার টাকা (ভারতীয় মুদ্রায়) এবং যাতে কোন গন্ধ নেই ও যা খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু।

এবার বাকি থাকে সৌদি রিয়েল খরচ করে জিনিষপত্র কেনার প্রশ্ন অর্থাৎ যে টাকা পাওয়া যায় তাতে অনটন পড়বে কি না। এটা অবশ্য একটা গুরুতর প্রশ্ন এবং এ নিয়ে আমি বিশেষ চিন্তা-ভাবনা করেছি। ভারতীয় মুদ্রায় এবার সকল হাজি সাহেবকেই জমা দিতে হয়েছে ন হাজার দু'শো টাকা, জেদ্দা বিমান বন্দরে এর বিনিময়ে মুয়াল্লিমের খরচ ও অন্যান্য ব্যয় বাদ দিয়ে নগদে হাতে পাওয়া গেছে তিন হাজার এক শো রিয়েল। আমার অভিজ্ঞতা বলছেঃ সব কিছু কিনে সাধারণভাবে থাকা খওয়া করলে একজন হাজির জন্য আড়াই হাজার রিয়েলই যথেষ্ট. বাকি যা থাকে তাতে নামায পাটি তসবি কিছু খুর্মা এবং ফেরার খরচ বাদ দিয়েও উদ্বৃত্ত হবার কথা। একজন হাজি যদি কেবল হজের নিয়তে মক্কা-শরীফে যান এবং এ টাকা খরচ করেন, সব খরচ সুন্দরভাবে চালিয়ে কিছু টাকা তাঁর উদ্বৃত্ত হবেই—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি কেউ হজের সঙ্গে ব্যবসা ও মুনাফা করার ধান্দা নিয়ে যান, তাঁর কাছে এ টাকা

কিছুই নয় বরং তিনি আরো বিশ হাজার রিয়েল হাতে পেলে খুশি হন, তা হলে তাঁর ব্যবসাটা ভালভাবে জমে ওঠে। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে এ ধরণের হাজির সংখ্যা আজকাল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।

সুতরাং যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক—এ সব লটবহর কিনে বোঝা বাড়ানোর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না, বিনিময়ে বাড়ে কেবল পথের অবিশ্বাস্য রকমের পরিশ্রম কষ্ট ক্লান্তি আর দুশ্চিন্তা, ঘরে বসে যার পরিমাপ করা কোন রকমেই সম্ভব নয়। এ ছাড়া আরো কারণ আছে, সেগুলি যথাস্থানে বিবৃত হবে।

প্রেমের পথে আল্লাহর অভিসারে যত হালকা হয়ে বার হওয়া যায়, ততই মঙ্গল। কেবল ভারি হোক গভীর প্রেমে আপ্লুত হৃদয়খানি আর অনুরাগের অশ্রুতে সিক্ত সজল চক্ষু দুটি।

স্বদেশ থেকে জিনিষপত্র কিনে মক্কা শরীফে নিয়ে না আসার আর একটি বিশেষ কারণের প্রতি আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং বিষয়টি আমি যত্নসহকারে সকলকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি। সুরা তওবার আঠাশ সংখ্যক আয়াতে আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ এই ঃ "হে বিশ্বাসিগণ ! অংশীবাদীরা তো অপবিত্র, সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।" ৯ ঃ ২৮

মক্কা বিজয়ের পর, নবম হিজরীর শেষ ভাগে সম্পূর্ণ ইসলামী প্রথায় হজব্রত সম্পন্ন করার জন্য, রসুলুল্লাহ স মাত্র তিন শো জন মুসলমানকে মক্কা শরীফে পাঠিয়ে দেন। এই দলের নেতা নির্বাচিত হন হযরত আবুবকর রা। মদিনা শরীফ থেকে এই কাফেলা মক্কাভিমুখে যাত্রা করার কয়েকদিন পর উল্লিখিত আয়তটি অবতীর্ণ হয়। হযরত মুহম্মদ স সঙ্গে সঙ্গে সর্বজন সমক্ষে এই আয়াতটি ঘোষণার জন্য এক অতিদ্রুতগামী উটের পিঠে হযরত আলি রা-কে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। হজ সমাপ্ত হলে সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে হযরত আলি রা ঘোষণা করেনঃ "এখন থেকে কোন পৌত্তলিক

আর কাবা শরীফে হজ করতে পারবে না, মসজিদুল হারাম তাদের কাছে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হল।''

এই আদেশ শিরোধার্য করে পৌত্তলিকেরা কাবা শরীফের দুয়ার থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করল। অংশীবাদীদের বিদায়ের পর মুসলমানদের মনে নানান প্রশ্ন দেখা দিল। পৌত্তলিকদের মধ্যে অনেকেই ছিল বিত্তবান, হজের মৌসুমে তারা বহু জিনিষ পত্র ক্রয় করত, ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা মোটা অংশের লেনদেন হত তাদের সঙ্গে। মুসলমানদের মনে হল, এই নির্দেশের পর পৌত্তলিকেরা না এলে বাণিজ্যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হবে, পরবর্তীকালে যা মুসলমানদের জীবিকার অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। আলেমুল গায়েব আল্লাহ মুসলিম-মানসিকতায় এই সংশয়াচ্ছন্ন ভাব লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজেল করলেনঃ ''যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর তবে জেনে রাখ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ করুণায় তিনি তোমাদের অভাব মুক্ত করতে পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।'' ৯ঃ২৮

আল্লাহ এখানে পরিষ্কার বলছেন যে মুসলমানেরা যা আশংকা করছে তা সত্য নয়, কয়েকজন পৌত্তলিক না এলে কিছুই ক্ষতি হবে না, তাদের বদলে আসবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মুসলমান, বর্তমানে যা ব্যবসা-বাণিজ্য হয় পরে তার বহুগুন লেনদেন হবে। আর এক দিক দিয়েও আয়াতটির ব্যাখ্যা করা যায় এবং অনেকের মতেও এ ব্যাখ্যাটি অধিকতর সমীচীন। যে পৌত্তলিকেরা আজ ফিরে যাচ্ছে, ওরা আর পৌত্তলিক থাকবে না, এক আল্লাহতে ঈমান এনে পরিপূর্ণ মুসলমান হয়েই আবার ওরা মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। সুতরাং যে দিক দিয়েই বিচার করা যাক, মুসলমানদের আশংকার কোন কারণ নেই।

আমার মনে হয় এই আয়াতের মর্মার্থ অনুধাবন করে হজ গমনেচ্ছু প্রত্যেক ব্যক্তির জিনিষপত্র ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ত ঠিক করা উচিত। বিশেষ রূপে স্মরণ রাখতে হবে নিয়তের উপর আপনার পুণ্যার্জন নির্ভরশীল। সব হাজি সাহেবের মনে মনে এই ধরণের

নিয়ত করা উচিত ঃ আমার প্রয়োজনীয় যে দ্রব্যই আমি ক্রয় করব তা মক্কা বা মদিনা থেকেই ক্রয় করব। মক্কায় আছে বায়তুল্লাহ—আল্লাহর ঘর, এখানেই ইসলামের শুরু ও সূচনা, এই পবিত্র ভূমিতেই আল্লাহর রসূল জন্মগ্রহণ করেন। মদিনাবাসীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বদেশ বিতাড়িত রসূলুল্লাহকে বুকে ধরেছেন, ইসলামের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। আমার এই অতি সামান্য কেনাকাটায় যদি মক্কা মদিনার ভাইদের এতটুকুও উপকার হয় তাই হোক। আল্লাহ আমি ইসলামের কোনই খিদমত করতে পারিনি, আপনি আমার এই সৎ মাকসাদটুকু গ্রহণ করুন।

এই নিয়তে, হাজি সাহেবের সামান্য ব্যক্তিগত কেনাকাটায় মক্কা-মদিনাবাসীদের কতটুকু উপকার হবে জানি না কিন্তু হাজি সাহেব যে সওয়াব হাসিল করবেন তার কোন হিসাব নেই।

বিকেলে আবদুল খালেক সাহেবের সঙ্গে দেখা, তিনি নিয়ে গেলেন আবু-সিদ্দিক মুসাফিরখানায়। নামে মুসাফির খানা কিন্তু রাজসিক ব্যাপার। এটি একজন মুসলমানের দান, পাঁচতলা বিশাল বিল্ডিং, এক শোর মত বড় বড় রুম, রীতি মত চওড়া বারান্দা কম্পাউন্ডের মধ্যেই বিরাট মসজিদ—সব কিছুই হাজিদের জন্য উৎসর্গীকৃত। এখানেই সেন্ট্রাল হজ কমিটির অফিস। এখান থেকেই পাওয়া যাবে আমাদের পাসপোর্ট এবং এয়ার টিকিট ভারতের সব প্রদেশের সকল হাজি এখানে এসে ওঠেন, এখান থেকেই মূল যাত্রা শুরু হয় জেদ্দার পথে।

মুসাফিরখানার উপর নীচে একবার ঘুরে এসে সব দেখে শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। সে দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া যায় না। লক্ষ্য হাজির মিছিল, দশ জনের এক একটি কামরায় আশ্রয় নিয়েছেন চল্লিশজন, কামরা ছাপিয়ে বারান্দায় মানুষ উপছে পড়ছে, উপরে মানুষ নীচে মানুষ, সামনে মানুষ পিছনে মানুষ, পাশে মানুষ সিঁড়িতে মানুষ, গেটে মানুষ, খোলা কম্পাউন্ডে মানুষের ঠেলাঠেলি,

বাক্স বেডিং রান্নার সরঞ্জাম ড্রাম জার বালতি সে এক এলাহি ব্যাপার। কোথাও ঠাঁই না পেয়ে বারান্দাতেই আশ্রয় নিয়েছেন কয়েক শো হাজি, পাটের বস্তার মত আবালবৃদ্ধাবণিতা নিজেরাই নিজেদের সাজিয়ে নিয়েছেন হাসি মুখে। কারো মুখে বিষন্নতা নেই, ঝগড়া নেই, কথাকাটাকাটি নেই—কোথাও বাদানুবাদের সূচনা হলেই দশজন সঙ্গে সঙ্গেই সেটা মিটিয়ে দিচ্ছেন, তারপর আবার হাসি, আবার সকলে ভাই ভাই। বিহারী নয়, বাঙালি নয়, গুজরাটি নয়, মারাঠি নয়, তামিল নয়, কাশ্মিরী নয়—সকলেই মুসলমান, কুল্ল মুসলিম এখোয়াতোন, সকল মুসলমান ভাই ভাই ! একের সেবায় আর একজন এগিয়ে আসছেন, একজনের প্রয়োজন মেটাতে হাত বাড়াচ্ছে দশজন। থাকার জায়গা নেই, বসার জায়গা নেই—অথচ কেউ অসন্তুষ্ট নন ! এখানেই শেষ নয়, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে এক একটি ট্রেন এসে থামছে আর হাজার হাজার হজযাত্রীর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে মুসাফিরখানায়। একটা তিলের জায়গা হলে দশজন হাজি সাহেব সেখানে আসন পাতেন এই অবস্থা ! যাঁরা হজের উদ্দেশ্যে পথে বেরিয়েছেন এ'দের সকলেই মোটামুটি স্বচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত অথচ বাড়িতে যাঁরা সংগতি সম্পন্ন এখানে তাঁরা ভিখারীর সঙ্গে এক শয্যায় রাত কাটাচ্ছেন। হয়ত ভিখারীদের কিছু কিছু নিজস্ব আস্তানা আছে আজ এ'দের তাও নেই। এখন বর্ষার মরশুম, পানি নামলে যে এ'রা কোথায় দাঁড়াবেন তা আমার চিন্তায় আসে না।

সকলেই আজ আল্লাহর আহ্বানে ঘরছাড়া—লক্ষ্য কাবা, মাকসাদ হজ। আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঘর ছাড়া না হলে মানুষ বোধহয় এমন কষ্ট কিছুতেই সহ্য করত না। হজযাত্রা আমাদের কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলে, ঈমান সুদৃঢ় করে, আল্লাহ-নির্ভরতা বাড়ায়।

হজ মানেই আত্মসমর্পন।

৪.

বোম্বাই শহর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমার কোন ধারণাই ছিল না, এখানে যে এত মুসলমান বাস করেন তাও আমার জানা ছিল না। শুক্রবারে জুম্মা মসজিদে নামায পড়তে এসে এ-সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেলাম। ভারতবর্ষের সর্বত্রই দেখেছি, মুসলমানেরা শহর ছাড়া, শহরে যদি কারো জমি-জায়গা থাকে সেগুলি বিক্রি করে, চলে গেছে গ্রামের দিকে। কেবল বোম্বাইতে দেখলাম এক শো জনে প্রায় পঁয়তাল্লিশ জন মুসলমান এবং কমবেশি সকলেই ব্যবসায়ী, সঙ্গতিসম্পন্ন।

কলকাতার না-খোদা মসজিদ নিয়ে আমার মনে গর্ব ছিল, বোম্বাইয়ের জুম্মা মসজিদ দেখে তা দূর হল। শ্রীনগর বা দিল্লীর জুম্মা মসজিদও এমন কারুকার্যমণ্ডিত নয়। শাফি মজহাবের মসজিদ, যেমন বিশাল তেমনি নয়নাভিরাম। এক সঙ্গে হাজার পনের নামাযী সহজেই কাতারে দাঁড়াতে পারেন। ভিতরে প্রবেশ করে তৃপ্তিতে মন ভরে গেল। ইমাম সাহেব বৃদ্ধ কিন্তু সুদর্শন, প্রথম মিলনেই শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। মনে হল ভারতীয় নন, পুণ্যভূমি আরবের কোন দেশে জন্ম, মাতৃভাষা আরবী। আজানুলম্বিত সফেদ পোষাক, দীর্ঘ সফেদ দাঁড়ি, হাতের শাদা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মিম্বরে। আমার মনে হল আমি যেন রসুলুল্লাহর যুগের কোন এক সাহাবী বা অলি-আউলিয়াকে দেখছি। খুৎবা লিখে এনেছিলেন নিজ হাতে, সেটাই পাঠ করলেন। নামায শেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন হজ যাত্রীদের উদ্দেশ্যে, খুবই ভাল লাগল। নামায পড়ে তৃপ্তি পেলাম।

বিকেল পাঁচটায় জনাব সৈয়দ আশরাফ হোসেন এলেন হোটেলে দেখা করতে। আজ সকালের ট্রেনে তিনি কলকাতা থেকে বোম্বাইতে এসে পৌঁচেছেন। সঙ্গে আবদুল খালেক সাহেব। বিমান-টিকিট এবং পাসপোর্ট এখনো হাতে পাইনি, সে সম্পর্কে তাগাদা দিতেই খালেক সাহেব বললেন, কোন চিন্তা করবেন না, যথাসময়ে এনে দেব।

কিন্তু আমার কোন কিছুই ভাল লাগছিল না, যতক্ষণ না এগুলি হাতে পাচ্ছি একটা অতৃপ্তি এবং মানসিক অশান্তি আমাকে অস্থির করে তুলছিল। শেষ পর্যন্ত এই অমূল্যে সম্পদগুলি পাঁচ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যাবেলা হাতে পেলাম। খালেক সাহেব তাঁর কথামত যথাসময়ে এগুলি পেঁাছে দিয়ে গেলেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানালাম।

ছ তারিখ সকাল দশটায় প্লেন। সুতরাং সব কিছু এখনই গোছগাছ করে নিতে হয়। কালক্ষেপ না করে সে দিকেই মন দিলাম।

মাত্র চার-পাঁচ দিন হল হোটেলে এসেছি, এর মধ্যেই হোটেলটা যেন আপনার হয়ে গেছে, একেবারে সবকিছু বার করে সংসার পেতে বসেছিলাম। সুদূরের আহ্বান এসেছে, আবার সেগুলি গুটিয়ে নিয়ে আমরা এগিয়ে যাব সামনের পথে।

মানুষকে এভাবেই এগুতে হয়, জীবনের জটিল পথ ভেঙে ভেঙে এভাবেই এগিয়ে চলেছে জগৎ সংসার, মানব-সভ্যতা।

আশরাফ সাহেব সারা সন্ধ্যেটা কাছে বসে নানান বিষয়ে বার বার সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। তাঁর নিকট থেকেই আমরা হাতে-কলমে পাঠ গ্রহণ করে এহরাম বাঁধা শিখে নিলাম। বেশ কিছু রাত হলে তিনি চলে গেলেন।

নূরবানু এবং কামাল এল তারপর। নূরবানু আমার নিকট আত্মীয়া এবং সদ্য বিবাহিতা। চার তারিখে তারা বোম্বাই এসেছে 'হনিমুন' করতে। কোন কিছুতেই হাত দিতে হল না, এরা দু'জনে মিলে সব কিছু বাঁধা ছাঁদা করে দিল। আসার সময় কয়েক প্যাকেট খাবার এনেছিল আমাদের জন্য, সেগুলিও বেডিংপত্রের সঙ্গে বেঁধে দিলে। যাবার সময় আমার স্ত্রীর গলা জড়িয়ে কান্নাকাটি করল নূরবানু। সকালে এয়ার পোর্টে যেতে চাইছিল, আমি বিশেষভাবে নিষেধ করলাম। দুটি নতুন হৃদয় সবে একত্রিত হয়েছে, এই আনন্দের দিনে আমাদের বিদায় জানাতে এসে তারা বিষাদে ভারি হয়ে উঠুক—এ আমি চাইনি। এখন তারা গান গাওয়া পাখি, তাদের জীবনের দিগন্তে সবে সুবেহ সাদেকের আলো পড়েছে। বললাম, তোমরা আনন্দ-ভ্রমণ নির্বিঘ্নে শেষ করে কলকাতায় ফিরে যেও যথা

সময়। তবে আল্লাহ্ করুন, এমন একদিন আসুক যেদিন তোমরা হজে যাবে এবং আমরা তোমাদের বিদায় জানাতে আসব বিমান বন্দরে।

শেষে এলেন খালেক সাহেব, রাত তখন এগারটা। বললেন, সবকিছু রেডি রাখবেন, রওনা হতে হবে চারটার সময়, আমি ঐ সময় এসে ডাকব আপনাদের। খুব ভোরে মুসাফিরখানা থেকে বাস ছাড়বে।

সব চলে যেতে ঘর অন্ধকার করে দিয়ে দু জনে প্রাণ ভরে নামায পড়লাম, শেষে পরম প্রভুর কাছে সকাতর প্রার্থনা ঃ আল্লাহ্ গো— আমাদের এই যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করুন, নিরাপদ করুন, আপনার গৃহ দর্শন করার সৌভাগ্য দিন, হজকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দিন। সুখে-দুখে ব্যথা-বেদনায় আনন্দ-উল্লাসে জীবন-মৃত্যুতে সকল সময় সর্ব অবস্থায় আমরা আপনাতেই আত্মসমর্পিত !

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না। একটা দারুণ অস্থিরতা। মনে হচ্ছে যেন এখুনই উড়ে কাবায় চলে যাই। কিসের ঘুম, কেন এই কালক্ষেপ—আর সহ্য হয় না। মনে হয় আজকের রাতটা অনর্থক, কোন প্রয়োজন ছিল না সন্ধ্যার নেমে আসার, এখুনই তো সকাল দশটা হতে পারত !

আমার স্ত্রী বললেন, আমি একটু চোখ বন্ধ করছি—ঠিক সময় ডেকে দেবেন। উত্তর দিলাম ঃ আচ্ছা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম দু'জনেরই এক অবস্থা, কেউ ঘুমাতে পারছি না, বিছানায় পড়ে ছটফট করছি কেবল। অথচ আজ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘুম হওয়াটা অত্যন্ত জরুরী। কেননা কালকের দিনটা একটা বিশেষ সৌভাগ্যের দিন এবং বিশেষ পরিশ্রমেরও। ভোরে এই মালপত্র নিয়ে বাসে ওঠা, বিমান বন্দরে ওগুলি নামান এবং নানাবিধ চেকিং সমাপ্ত করে বিমানে ওঠা, জেদ্দায় নেমে এই লটবহর সামলান, সেখানেও চেকিংএর জন্য ওঠান-নামান এবং বাসে তোলা, মক্কা শরীফে পৌঁছে ওগুলি মুয়াল্লেমের ঘর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া, তারপর ওমরাহ্-এর জন্য বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ, সাফামারওয়া সাতবার সায়ী করা (দৌড়ান), নামায, মস্তকমুণ্ডন এবং তারপর এহরাম খোলা।

যতক্ষণ না এই কাজগুলি সম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ কেউ এহরাম খুলতে পারবে না। সুতরাং নানারকম ব্যস্ততা ও কর্তব্য-কর্মে দিনটি বিশেষরূপে শ্রমসাধ্য।

বললাম ঃ একটু না ঘুমালে কালকের কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যাবে না। স্ত্রী উত্তর দিলেন ঃ ঘুম আসছে না যে।

এই ভাবে কতক্ষণ কাটল জানি না। বোম্বাই শহর এখন সম্পূর্ণ স্তব্ধ। বাইরে কোন সাড়া নেই। শুয়ে শুয়ে কলকাতার কথা ভাবলাম, সিজার-সানি এতক্ষণ কি করছে সে দৃশ্য দেখার চেষ্টা করলাম, তারপর বোধহয় একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। ঘোর কাটতেই ঘড়ি দেখলাম প্রায় দুটো। তারপর থেকে প্রতি পনের বিশ মিনিট পর পর আচমকা তন্দ্রা ছুটে যায়, জেগে উঠি, ঘড়ি দেখি, আবার ঘুমের রেশ জড়িয়ে ধরে, আবার জেগে উঠি—যেন কত দেবী হয়ে গেল, আবার ঘড়ি দেখি। ঘুমে তন্দ্রায় জাগরণে উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় সে এক আশ্চর্য রাত। শেষ পর্যন্ত সাড়ে তিনটার কাছাকাছি উঠেই পড়লাম, স্ত্রীও উঠলেন। তাহাজ্জদ পড়ে শেষ বারের মত সবকিছু ঠিকঠাক করে নিলাম।

মহাযাত্রা একেবারেই নিকটবর্তী, আমাদের প্রস্তুতিও প্রায় সম্পূর্ণ। এখুনি এহরাম বাঁধতে হবে এবং এহরাম বাঁধার আগে গোসল করা সুন্নত। সন্ধ্যায় দারোয়ানকে বলে রেখেছিলাম, সে পানির ব্যবস্থা করে দিল, আমরা গোসল করে পাক-সাফ হয়ে এলাম।

ইতিমধ্যে ফজরের সময় হয়ে এসেছিল। ফজরের পর দু রাকাত শোকরের নামায, নামাযের পর পরম প্রভুর কাছে কাতর মিনতি। তারপর পরিধানের সমস্ত কাপড় ত্যাগ করে এহরামের সফেদ লেবাস পরে নিলাম। একখন্ড কাপড় তহবনের মত করে পরে আর একখন্ডকে চাদরের মত গায় দিলাম, দুই কাঁধ ঢাকা থাকবে কিন্তু মাথা থাকবে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, টুপি পরা পর্যন্ত নিষেধ।

মাত্র এই দু খন্ড শাদা কাপড়ই এহরামের পোষাক। কিন্তু দু খন্ড কাপড় পরার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য রকম ভাবান্তর উপস্থিত হল। আমি যেন ক্রমেই অন্য মানুষ হয়ে উঠছি। পার্থিব লোভ

লালসা দূরে ফেলে আমি সফেদ দিলে আল্লাহর দিকে ধাবিত হচ্ছি, এহরামের সফেদ লেবাস হয়ত তারই প্রতীক। আল্লাহর ভালবাসা পাওয়ার জন্যে সমগ্র দেহমন উন্মুখ, যাত্রীরা ব্যাকুল, মহাযাত্রা শুরু করার জন্যে সকলই প্রস্তুত, এহরাম পরার সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

এহরাম শব্দের অর্থ হারাম বা নিষিদ্ধ করা। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব কাজ শরিয়ত সম্মত বা হালাল, এহরাম বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই তার অনেকগুলিই নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এসব নিষিদ্ধ কাজের বিস্তারিত বিবরণ যে কোন হজের বইতেই পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সকল দিক থেকেই হজের মাসে প্রেমিকের দল কাবা শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কা শরীফের চারদিকে চারটি নির্দিষ্ট স্থান বা সীমারেখা আছে, সাধারণতঃ ঐ সীমারেখা অতিক্রম করার পূর্বে এহরাম বেঁধে নিতে হয়। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি পূর্বদেশীয় যেসব যাত্রী হজে যান তাঁদের জন্য এহরাম পরিধানের নির্দিষ্ট সীমারেখা হল এল্‌মলম্‌ পর্বত, এটি লোহিত সাগরের পূব দিকে অবস্থিত। যাঁরা জাহাজ যোগে হজে যান, কয়েকদিন যাত্রার পর এল্‌মল্‌ম পর্বত নিকটবর্তী হলেই জাহাজের বাঁশী বেজে ওঠে এবং তখন যাত্রীরা এহরাম পরিধান করেন, কিন্তু যাঁরা বিমানযাত্রী তাঁদের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই পর্বত অতিক্রম করতে হয়, সুতরাং বিমানযাত্রীদের জন্য এহরাম পরেই বার হয়ে আসা উচিত।

আমরাও তাই করলাম। এহরাম পরার পর দু'রাকাত এহরামের নামায এবং নামায শেষে নিয়ত। নিয়তের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল 'তালবিয়া' পাঠ, এই তালবিয়া সমগ্র হজের নানাবিধ দোয়া দরুদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। সামান্য কয়েকটি অতি সংক্ষিপ্ত আরবী বাক্য, কিন্তু মনে হয়—সমগ্র হজের প্রাণটি ঐ বাক্য কটির মধ্যে ধরা আছে। আত্মসমর্পণের এমন আকুলতা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না, আত্মনিবেদনের এমন বিনীত

প্রকাশ আর কোথাও চোখে পড়েনি। তালবিয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জন্ম মৃত্যুসহ সমগ্র দেহমনআত্মা যেন মহান আল্লাহর সমীপে সমর্পিত হয়ে যায়, বিলীন হয়ে যায়। তালবিয়া যেন সমগ্র হজের এস্‌মে আজম।

এবং এই তালবিয়ার ওপর এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে হজের নিয়তে বাড়ি থেকে বেরুবার পর হতেই খেতে শুতে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সাক্ষাতে বিদায়ে সকল সময়, প্রতি স্থান পরিবর্তনের মুহূর্তে সকল হজযাত্রীর উপর তালবিয়া পড়ার জরুরী নির্দেশ রয়েছে। সম্পূর্ণ তালবিয়াটি সকলের সঙ্গে আমিও এখানে একবার পড়ে নিতে চাই ঃ

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইক লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওন্নেয়মাতা লাকা অল মুলক, লা শারীকা লাক্।

আল্লাহ আমি আপনার গোলাম, আপনার আহ্বানে হাজির, আমি হাজির, আপনার কোন অংশী নেই, আমি আপনার দাস আপনার আহ্বানে উপস্থিত হয়েছি, সকল প্রশংসা আপনার, সকল নেয়ামত (উত্তম জিনিষ) আপনার, আপনি সকল কিছুর প্রভু এবং আপনার কোন অংশী নেই।

আপনার আহ্বানে গোলাম হাজির, পাপ-পুণ্য সকল কিছু নিয়ে অবনত শিরে আমি হাজির, যা আদেশ করার করুন, যা শাস্তি দেবার দিন, কিন্তু অশ্রু-সজল চোখে অনুতপ্ত হৃদয়ে পাপী গোলাম আজ আপনার পুণ্য দরবারে হাজির। হাজির এবং বিনীত, ব্যথিত এবং লজ্জিত, ক্ষমাপ্রার্থী এবং আত্মসমর্পিত।

গোলাম আজ পরম প্রভুর জিয়ারতে হাজির! এর চেয়ে বড় কথা, বড় আকাঙ্খা আর কি হতে পারে!

খালেক সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বিসমিল্লাহ বলে হোটেল ত্যাগ করলাম সাড়ে পাঁচটায় (কলকাতার সময় ভোর সাড়ে চারটা)। মুসাফিরখানার সামনেই এয়ার পোর্টের বাস প্রস্তুত ছিল, যাত্রীরা ঠিক হয়ে বসলে চলতে শুরু করল ঠিক ছ'টার সময়। হজ কমিটি

থেকে বাসে একজন মৌলবী সাহেবকে দিয়েছিলেন, যিনি সারাপথ আমাদের তালবিয়ার তালিম দিতে দিতে নিয়ে গেলেন। উচ্চৈস্বরে এই প্রাথমিক পাঠগ্রহণ, পরবর্তীকালে আমাদের সকলের বিশেষ উপকারে এসেছিল।

এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে সময় লাগল প্রায় এক ঘণ্টা, দীর্ঘ পথ। একে একে মালপত্র নামিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলাম অতিকষ্টে। প্রথম দফায় একটা চেকিং হয়ে গেল এবং প্রথম চেকিং-এ নতুন কেনা 'ওমরাও' স্টোভটি কর্তৃপক্ষ আটক করলেন। বিমানের জন্য স্টোভ ডেন্‌জারাস। বললাম ঃ এর মধ্যে আমরা এখনো তেল ভরিনি, কোন রকম দাহ্য পদার্থ নেই যা বিমানের ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু কে শোনে কার কথা। সুতরাং স্টোভ ছেড়ে দিয়েই ভিতরে যেতে হল। একে একে কাস্টম চেকিং পুলিশ চেকিং শেষ হল। আমরা একেবারে ভিতরে যাবার অনুমতি পেলাম। অন্দরে যাবার আগে দু'শো করে দুজনে মোট চার শো টাকার বিনিময়ে সৌদি আরবের মুদ্রা রিয়াল পেলাম। বিমান থেকে নেমেই টুকিটাকি খরচ মেটানর জন্য ভারত সরকার এই টাকাটি দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

ভিতরে গিয়ে দেখলাম এখনো আর একটি চেকিং বাকি। একটি গেটের পাশে এক ভদ্রলোক একটি ছোট্ট ইলেক্ট্রনিক্ যন্ত্র নিয়ে বসে আছেন, তিনি কথা বলতে বলতে সেই যন্ত্রটি আমার সারাদেহে বিশেষ করে কোমরের দিকটাতে বেশি করে বুলিয়ে গেলেন। বুঝলাম ইনি ডুবুরি, শরীরে ডুব দিয়ে সোনাদানা হীরে জহরতের অন্বেষণ করছেন।

গরীবের দেহ কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো করলেও ওসব দুর্লভ সামগ্রী পাওয়া যায় না, গেলও না। তিনি আমাকে হাসতে হাসতে যেতে বললেন। আমি ভিতরে চলে গেলাম।

বিমান ক্ষেত্রে অবতরণের আগে দেখলাম সেণ্ট্রাল হজ কমিটির লোক দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাদের দু'জনের দিকে দু'প্যাকেট খাবার এগিয়ে দিয়ে বললেন, জেদ্দায় নেমে বিকেলে খাবেন—নেমেই তো আর খাবার পাবেন না।

হজ কমিটির এই আতিথেয়তাটুকু বড় ভাল লাগল।

কাজ করে যাচ্ছি আর গুন গুন করে পড়ছি লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, প্রভু গো—আপনার দরবারে গোলাম হাজির। বিমান বন্দরে নামছি তালবিয়া পড়ছি, বাসে উঠছি তালবিয়া পড়ছি, নামছি একই বাক্য উচ্চারণ করছি, শেষে তালবিয়া পড়তে পড়তে সিঁড়ি বেয়ে বিমানে উঠে গেলাম। এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং সেভেন ফোর সেভেন—বিশাল বিমান, নয়নাভিরাম। ভিতরে বিমানের গায়ে সর্বত্র ভারতীয় ওরিয়েন্টাল আর্ট, নীচেটা দামী কার্পেট দিয়ে মোড়া, সেই অনুপাতে অভিজাত সীট এবং আনুসঙ্গিক আসবাবপত্র। যাত্রীদের অনেকেরই ইতিপূর্বে বিমান-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই, ভিতরে এসে তাঁরা যেন গোলক ধাঁধায় পড়লেন, সব কিছু দেখেই হতভম্ব, কি করবেন কোথায় যাবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। বিমান সেবিকারা যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের সীট খুঁজে বসিয়ে দিলেন। পাইলট এয়ার হোস্টেস ইত্যাদি ছাড়াও কেবল হজ যাত্রীর সংখ্যা তিন শো সত্তর, সব মিলিয়ে যাত্রীর সংখ্যা চার শতাধিক। এঁদের সকলের খাদ্য পানীয় বিমানের নিজের ওজন এবং অন্যান্য লটবহর নিয়ে সামগ্রিক ওজন প্রায় এক শো টন, এই পর্বত প্রমাণ ওজন নিয়ে বিমান চলতে শুরু করল ঠিক সকাল দশটা পনের মিনিটে।

আমাব পাশে বসেছিলেন মুর্শিদাবাদের দু'জন হাজি সাহেব। তাঁরা বেল্ট বাঁধতে জানেন না, আমি দেখিয়ে দিলাম। মহাখুশি হলেন, বললেনঃ দেশের এরকম একজন লোক কাছে থাকায় কত সুবিধে হল।

রান ওয়ের উপর দিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বিমান তার নিজস্ব গতি নেবার জন্যে ঘুরে স্থির হয়ে দাঁড়াল। প্রায় মিনিট খানেক। তারপরেই গর্জে উঠে সংগ্রহ করে নিল সেই দুরন্ত গতিবেগ, যে গতিতে এক শো টনের পর্বতটি মুহূর্তেই তুলোর মত হালকা হয়ে শূন্যে উঠে গেল।

রান ওয়েতে দৌড়ান, গতি নিয়ে বাতাসে ভাসা ইত্যাদি ঘটনার

ঘোর কাটার পর যখন বিমান আকাশে স্থির হয়ে চলতে শুরু করেছে, দেখলাম কেউ তালবিয়া পড়ছেন না, পড়লেও মনে মনে পড়ছেন। ব্যাপারটি আমার ভাল লাগল না। এতগুলি আল্লাহর রাহের যাত্রী ম্রিয়মান হয়ে থাকবেন—এ হয় না। বিসমিল্লাহ বলে আমি উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ শুরু করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সোনার ফল ফলল, বুঝলাম সকলেই মনে মনে এমন একটি কিছু চাইছিলেন্ সারা বিমান আমার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাল ঃ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক... প্রভু গো বান্দা হাজির, আনতশিরে আপনার পাক দরবারে সকলে হাজির।

ইতিমধ্যে একজন মৌলবী সাহেব বিমান-ঘোষণার মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন, আমার কণ্ঠ তিনি তুলে নিলেন নিজের কণ্ঠেঃ তিনি এক একটি বাক্য পাঠ করেন, আমরা সকলে তার প্রতিধ্বনি করি, সমস্ত বিমান মুখরিত হয়, আকাশ-বাতাসে প্রতিধ্বনি ফেরে। এমনি ভাবে সেই বিশাল বিমানটি হজ-যাত্রীদের লাব্বায়েকের প্রতিধ্বনি বাতাসে ছড়িয়ে দিতে দিতে আমাদের নিয়ে আরব সাগরের উপর দিয়ে উড়ে চলল আর এক লাব্বায়েকের দেশে।

৫.

'পৃথিবীতে যদি কোথাও বেহেশত থাকে তা এইখানে তা এইখানে, তা এইখানে'—খাসমহলের চত্বরে কান পাতলে শিল্পী শাজাহানের দর্পী উচ্চারণ আজো শ্রুত হয়। শেষ বার যখন আগ্রায় গিয়েছিলাম তখন ভালভাবে খাসমহল পরিক্রমা ও পর্যবেক্ষণ করেছি কিন্তু কোথাও বেহেশতী দ্যোতনা অনুভূত হয়নি কিন্তু এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে সুবিশাল তিনতলা 'সেভেন-ফোর-সেভেন' বোয়িংখানা বেহেশ্তের কিনারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলেছে। আকাশের দূরতম প্রান্তে তাপ-নিয়ন্ত্রিত এক নিরাপদ আসনে বসে প্রতি মুহূর্তে জ্যোতির্লোকের এক অপার্থিব সৌন্দর্যের মহাবিস্ময় অনুভব করতে করতে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন ক্রমান্বয়ে বেহেশ্তের গভীরে প্রবেশ করছি। এক অনাবিষ্কৃত সৌন্দর্য যেন আমার জন্যে সম্মুখের চারপাশে বিছিয়ে আছে, এক অনাঘ্রাত সুবাস যেন আমার জন্যে বাতাসে ছড়িয়ে আছে, ইন্দ্রিয়াতীত এক সুমহান অলৌকিক সংগীত যেন সব কিছু ছাপিয়ে এখনই আমার জন্যে বেজে উঠবে—প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে এখন এক অনাস্বাদিত উত্তেজনায় ভরপুর হয়ে উঠছে। নিম্নে অসীম নীল আরব সাগর, তার উপর শাদা কালো স্তূপীকৃত গাঢ় পাতলা ফ্যাকাসে নানান মেঘের ঢেউ তোলা আস্তরণ. সেই মেঘের দেশের অনেক উপর দিয়ে অনন্ত শূন্যতা ভেদ করে আমাদের বোয়িং নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উড়ে চলেছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি কেবল মেঘ আর মেঘ। সীমাহীন মেঘমালার রাজ্য। কোথায় মেঘেরা সমতল প্রান্তরের মত দিকচক্রবাল আচ্ছন্ন করে সমান হয়ে বিছিয়ে আছে, কোথাও উঁচু-নীচু ভাব নেই—উপরটা একেবারে মসৃণ, দূরে দিগন্তরেখায় কিছু উচ্চতার ইশারা—যেন কালো মেঘের গভীর বন, একটি মেঘের হরিণ শিকারীর তাড়া খেয়ে প্রাণপণে ছুটেছে সেই গভীর জঙ্গলের দিকে, তার শিং তার মুখ ঘন মেঘের ছোপ ধরা তার কালো চোখ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কোথাও মেঘ

পার্বত্য এলাকার মত ভীষণ ভাবে উঁচু-নীচু হয়ে আছে, তার মাঝে কোথাও একটা বিশাল পর্বত খাড়া হয়ে উঠেছে, সেই পর্বতের গায় উঁচু-নীচু শৃঙ্গ, মাঝে মাঝে শ্রেণীবদ্ধ শাল গাছ, সেই ঘন আর ফ্যাকাশে মেঘের কোল ঘেঁষে দুধশাদা মেঘের ঝর্ণা নেমে এসেছে, দূরে এক মেঘ-মা আকাশের নীল বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে হাসি মুখে তার শিশু পুত্রকে ঘুমপাড়াই করছে, কোথাও মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মন কাপাশ তুলো ধুনে বিছিয়ে দিয়েছে আর সেই স্তূপীকৃত তুলোর উপর ঘনকৃষ্ণ কেশদাম ছড়িয়ে শিথিল দেহ এলিয়ে যেন বিশ্রাম নিচ্ছেন এক বেহেশতী হুর, তার রূপ নিখিল আকাশ ছাপিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বিশ্বভুবনে, আকাশ-পৃথিবী তাই আলোয় ঝলমল। মেঘে যে এমন বিস্ময়কর সৌন্দর্য থাকে তা পৃথিবী থেকে বোঝা যায় না। বেলা শেষের গোধূলি আলোয় শ্যামল প্রান্তরে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের মধ্যে অনেক বিস্ময় আবিষ্কার করেছি, বিস্মিতও হয়েছি অনেক সময় কিন্তু জ্যোতির্লোক থেকে দেখা মেঘের এই সৌন্দর্য-সম্ভার সম্পূর্ণরূপে আমার অগোচরে ছিল। এ এমনই এক সৌন্দর্য যা কোনদিন দেখার সৌভাগ্য হয়নি এবং দেখে এমনই এক উল্লাসে আপ্লুত হচ্ছি যা আমার চেতনায় কোনদিন অনুভব করিনি। দুর্বার গতিতে বোয়িং এগিয়ে চলেছে, আর এই চলার পথে চারপাশে দুচোখ ভরে আমি একি দেখলাম ! এ কি দেখলাম !! মনে হচ্ছে রেজওয়ান যেন দূর ফেরদৌসের উৎসব-দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সেই দ্বার পথে অনন্ত সৌন্দর্যরাশি নির্গত হয়ে অবিরাম নিখিল আকাশকে পরিব্যপ্ত করে ফেলছে।

কিছুক্ষণ আগেও আরব সাগরকে ঠিক মত দেখা যাচ্ছিল না, সম্ভবতঃ মেঘের জন্যেই কিন্তু এখন একেবারে পরিষ্কার। পানিতে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ছায়া পড়েছে, মনে হচ্ছে খোপ খোপ জলঝাঁঝি, শাদা ঢেউগুলি অতিসূক্ষ্ম এক একটি সরল রেখার মত মনে হচ্ছে, রেখাগুলি গড়াতে গড়াতে কিছুদূর গিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, নিখিল

সমুদ্র যেন এই ফেনিল রেখার চাঞ্চল্যে মেঘের আলো ছায়ার লুকোচুরির খেলায় উতরোল হয়ে উঠেছে। আমি শিশুর মত মুগ্ধবিস্ময়ে এই সব দেখতে এমনই তন্ময় হয়ে গেছি যে পাশে বসা মুর্শিদাবাদের সেই হাজি সাহেবের এক অস্বস্তিকর স্পর্শেই ট্রে-ভর্তি লজেন্স আর টফি ভরা সুবেশা এক এয়ার হোস্টেসকে সামনে দেখতে পেলাম। আরো দেখলাম দু হাতে ট্রে সামনে ধরে সেই লাবণ্যময়ী বিমান-সেবিকা মৃদু মৃদু হাসছেন। অর্থাৎ ভাবখানা যেন এই রকম ঃ বিমানে ত কখনো ওঠনি সুতরাং এসব দেখবে কি করে। অথবা এমনও হতে পারে, আমার হাতে ডায়রি ছিল, যা দেখছিলাম তা সঙ্গে সঙ্গে নোট করে নিচ্ছিলাম আর গুনগুন করে পড়ছিলাম তালবিয়া, এতগুলি হাজির মধ্যে হঠাৎ এক বাতিকগ্রস্ত হাজিকে আবিষ্কার করে এই বিমান সেবিকা হয়তো মনে মনে মহাকৌতুক অনুভব করছিলেন। যা হোক, তাঁর মুখে যে কেন মৃদু আর আরব সাগরে আভাসিত ফেনিল রেখার মত অনুচ্চ হাসি ফুটে উঠেছিল তা আমি জানি না কিন্তু টফি বা লজেন্স কিছুই না নিয়ে সেই হাসি ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, ধন্যবাদ। বলাবাহুল্য এসব কোন কিছুই আমার ভাল লাগছিল না, এই সময়টুকুতে, হয়ত কত সব দুর্লভ সৌন্দর্য আমাকে ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের মত দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। তা ছাড়া আমার হৃদয়-মন পড়ে আছে কাবা শরীফের দিকে, প্রতিমুহূর্ত আমি সেই পবিত্রতম গৃহের আশা করছি। মাত্র চার ঘণ্টার পথ, বোয়িং সরাসরি গেলে মক্কার উপর দিয়ে হয়ত জেদ্দায় পেঁাছাবে তা হলে কাবা শরীফ নজরে পড়তে পারে। অজানা পথ কোন পলকে সেই পবিত্রতম মুহূর্তটি এসে পড়বে কে জানে সুতরাং টফি বা এই জাতীয় কোন কিছুই আমার ভাল লাগছিল না অথচ দেখতে পেলাম অনেকেই টফি নিতে ভীষণ ব্যস্ত, কেউ কেউ একাধিক নিচ্ছেন, কেউ কেউ আবার মুঠো মুঠো। একটু পরে বিমান সেবিকারা ফলের ঠাণ্ডা রস পরিবেশন করতে এলে তখনো অনেকের মধ্যে ব্যগ্রভাব লক্ষ্য করলাম। হয়ত তাঁরা যথার্থই পিপাসিত ছিলেন। যাই হোক তাঁদের এই

'হাঘরে' ব্যগ্রতা আমার রুচিকে দারুণ ভাবে আহত করল। ফলের রস পরিবেশিত হলে একটু নিরিবিলি ভাব নেমে এল বিমানের মধ্যে। বাইরে তেমনি অফুরন্ত সৌন্দর্য উড়ে চলেছে, একটি দৃশ্য শেষ হতে না হতে আর একটি অনুপম দৃশ্য নেমে আসে, একের পর এক সেই অলৌকিক বেহেশতী আঞ্জাম উন্মুক্ত হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে, মাটির মানুষের জন্য মহীয়ান আল্লাহ্ এত সব শিল্পশোভা আসমানে থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন অথচ এ সব উপেক্ষা করে, বিমানে দেখলাম, অনেকেই ঘুমে ঢুলছেন। জানি না এমন অবস্থায় মানুষের চোখে ঘুম আসে কি করে!

আমি আবার, উইণ্ডো গ্লাসের ভিতর দিয়ে রূপসাগরে ডুব দিলাম। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...মাইকে সমানে চলছে তালবিয়া পাঠ। তবে এখন অনেকেরই কণ্ঠ ঈষৎ ম্লান, স্বরে সে কৈশোর-দীপ্তি নেই—তবুও পাঠ চলছে। হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল যিনি তালবিয়া পড়াচ্ছেন তিনি একটি শব্দ ভুল বলছেন, আর একজন হাজি সাহেব এসে তা সংশোধন করে দিলেন। সকলের মধ্যে আবার কিছুটা চাঞ্চল্য ফিরে এল। শুদ্ধ ভাবে আবার সকলে পাঠ শুরু করলেন। এই ঘটনা থেকে বোঝা গেল শতকরা পঁচানব্বুই জন হাজি সাহেব হজের প্রস্তুতি না নিয়েই বাড়ি থেকে বার হয়ে এসেছেন। এই ভাবে হজ যাত্রা ঠিক নয়, কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। অন্ততঃ তালবিয়া ইত্যাদি কিছু অতি প্রয়োজনীয় দোওয়া-দরুদ ও নিয়ম-কানুনের প্রাথমিক পাঠ বাড়িতেই গ্রহণ করা উচিত। আমিও তালবিয়া পড়ছি গুনগুন করে কিন্তু দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সঞ্চারমান সুবিন্যস্ত মেঘমালার বুকে, যেদিকে তাকাও কোথাও কোন ত্রুটি নেই, কোথাও কোন বিচ্যুতি নেই—এক সুশৃঙ্খল নিয়মের কাছে সব কিছুই নত শির। কোরআন শরীফে পড়েছিলামঃ

..."যিনি স্তরে স্তরে বিন্যস্ত সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন, দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না; আবার তাকিয়ে দেখ কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি না? অতঃপর তুমি বার বার

তাকাও —তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ এবং ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে।" ৬৭ ঃ ৩-৪

অবশ্যই ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে তবুও আল্লাহর সৃষ্টিতে কেউ কোন ত্রুটি আবিষ্কার করতে পারবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে দৃষ্টি ক্লান্ত হচ্ছে না বরং যত তাকাচ্ছি ততই রূপ সৌন্দর্যে জড়িয়ে যাচ্ছে, মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ছে।

কোরআন শরীফে আরো পড়েছি ঃ "আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা"...৬৭ ঃ ৫, মেঘমালার দ্বারাও। আরো যে সব শোভা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেসব আমার মত পাপীর চোখে পড়ার কথা নয়, তা দেখার এবং উপলব্ধির জন্যে যে সুগভীর আকূতি ও অনুভূতির প্রয়োজন তা আমার নেই। পৃথিবী থেকে সামান্য উপরে যদি আকাশের এই বিপুল রূপের মুখোমুখি হই তাহলে সপ্তাকাশ ব্যাপী অনন্ত জ্যোতির্লোকে না জানি কী অসীম রহস্য ও অপার সৌন্দর্যরাশি ছড়িয়ে আছে!

আবহাওয়া মন্ডল ভেদ করে দুরন্ত গতিতে আমাদের বোয়িং এগিয়ে চলেছে। উইন্ডো গ্লাস দিয়ে বোয়িং-এর এক দিকের কম্পমান বিশাল ডানা দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার বোরাকের কথা মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল মিরাজের কথা। সাতাশে রজব গভীর নিশীথ। আরব মরু স্তব্ধ। রসূলুল্লাহ ঘুমিয়ে ছিলেন কাবা শরীফের চত্বরে। বোরাক নিয়ে এলেন জিবরাইল আ, কাবার পবিত্র অঙ্গন থেকে শুরু হল সেই আশ্চর্য নভোভ্রমণ। মুহূর্তে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা, সেখান থেকে দূর নভোলোকে এক আশ্চর্য অভিসার। প্রথম আকাশ, দ্বিতীয় আকাশ এবং ক্রমান্বয়ে সপ্তাকাশ অতিক্রম করে অবশেষে বিশ্বনবী পেঁাছলেন 'সেদরাতুল মনতাহা'য়—এক অপূর্ব জ্যোতির্জগতে, জিবরাইল আ-এর গতি এখানে এসে রুদ্ধ হয়ে গেল কিন্তু রসূলুল্লাহ নিখিল বিশ্বের অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করতে করতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হলেন, শেষ পর্যন্ত অরূপলোক অতিক্রম করে তিনি এসে উপস্থিত হলেন 'বায়তুল মামুরে'। একটা অপূর্ব নূরের তাজাল্লিতে এই

স্থান চিররহস্যময় চিরমনোরম। এই নূরের জগতে এসেই তিনি আপন প্রভুর সমীপবর্তী হলেন। তাঁর জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হল, তিনি সৃষ্টি লীলা এবং অরূপলোকের অনেক অজ্ঞাত রহস্য যা এতদিন তাঁর অজানা ছিল সম্যকরূপে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর দৃষ্টি সার্থক হল, হৃদয়-মন ভরে গেল। তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

কি দেখেছিলেন রসূলুল্লাহ ? নভোলোকের কোন রূপ, কোন রহস্য, কোন সৌন্দর্য ? জানি না। কিন্তু আমার মনে হল ঃ আমিও যেন সেই পবিত্র পদচিহ্ন ধরে ধরে সেদরাতুল মন্‌তাহায় পৌঁছে গেছি, আমি যেন সেই অপরূপ রহস্যের কিছু আভাস পেয়ে অসীম আনন্দে আপ্লুত হয়েছি, আমার হৃদয়মন ভরে গেছে, আমি ধন্য হয়েছি !

ক্ষণিক হলেও কিছুক্ষণের জন্য আমি বোধহয় সম্বিতহারা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি বিমান-সেবিকা এক গোছা খাবার প্লেট হাতে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অর্থাৎ ডিনার এসে গেছে। সারা বিমান জুড়ে সে কি ব্যস্ততা। এতক্ষণে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম অনেকেই খাওয়া শুরু করে দিয়েছেন। আমার সঙ্গের হাজি সাহেব চেয়ার-সংলগ্ন খাবার ছোট্ট টেবিলটি ঠিক করে নিতে পারছিলেন না, আমি সাহায্য করাতে ভীষণ খুশি হলেন। বার বার নানা ভাবে তাঁদের সে খুশি হওয়ার ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। আমার সঙ্গের এই হাজি সাহেব দুজন সত্যই উদার মনের মানুষ, তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাব ভাষা থেকেই ক্রমাগত তা প্রকাশ পাচ্ছিল। হৃদয়ের এই ঔদার্য অনেকেরই থাকে না।

ভাবতে অবাক লাগে—একটি বিমানে এতও থাকে ? চার শো লোকের ঢালাও খাবার ব্যবস্থা। এবং তাও আবার যে সে খাবার নয়, বিরিয়ানি ডিম গোশত সালাদ তিন রকম পনির মাখন রুটি পুডিং মিষ্টি তিন রকম দই প্যাকেট ভর্তি চিনি লবণ ইত্যাদি ইত্যাদি এমন কি দুটি করে খেলালও একটি সুন্দর প্যাকেটে দেওয়া আছে এবং সব শেষে এক প্রস্ত চা বা কফি। যে কোন একটি শাদী বাড়ির কথা চিন্তা করুন, চার শো লোক একত্রিত হলে কতদিন আগে থেকে

তার আয়োজন চলতে থাকে, সেই দিনটিতে কি দারুন ব্যস্ততা, খাদ্য পরিবেশনের সময়টির কথা চিন্তা করুন—শত সতর্কতা চিন্তা ভাবনার পরও ঠিক সময়টিতে কোন না কোন বিষয়ে ভুল হবেই এবং কিছু গোলযোগ দেখা দেবেই। অথচ পৃথিবী থেকে অনেক উপরে আমাদের এই বোয়িং-এর মধ্যে চার শো লোক এক সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে নির্বিঘ্নে পরিপাটি খাওয়া সম্পন্ন করলেন। প্লেট ওঠান হয়ে গেল, এতটুকু শব্দ পর্যন্ত হল না, প্লেন যেমন চলছিল তেমনি চলতে থাকল আরব সাগরের উপর দিয়ে।

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, প্রভুগো—হাজির, গোলাম হাজির। গুন গুন চলছে তালবিয়া পাঠ। হঠাৎ দেখি আরব সাগরের উপর দিয়ে একটি পানির জাহাজ ভেসে চলেছে। সাগরের বুকে এই প্রথম একটি জাহাজ দেখলাম। হতে পারে ওটি মোগল লাইনের একটি জাহাজ, অসংখ্য হাজিদের নিয়ে পাড়ি জমিয়েছে জেদ্দার পথে। দিগন্তহীন তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে, মধ্যাহ্ন বিকেল হচ্ছে, বিকেল সন্ধ্যার অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে, সাগরের নীল পানির উপর রঙিন বর্ণালি ছড়িয়ে অস্ত যাচ্ছে দিনের সূর্য, বিপুল অন্ধকারে সমগ্র সাগর অবলুপ্ত, ততক্ষণে মাথার উপর খুলে গেছে আর এক দ্বার—বেহেশতের দরজা, প্রদীপমালায় সুসজ্জিত হয়েছে নীল আসমান, নক্ষত্রের দীপ্তি, তারকাপুঞ্জের অনাবিল ঝিলিমিলি—এ সব বেহেশতী দ্যোতনা শেষ হতে না হতে নূরের তাজাল্লিতে বুক ভাসিয়ে দিয়ে নীল আসমানে ভেসে উঠেছে অনন্ত রূপের চাঁদ, সারা রাত কেটে যাচ্ছে এমনি অরূপের লীলা প্রত্যক্ষ করতে করতে, ভোরে দিগন্ত আলো করে পানির ভিতর দিয়ে ভেসে উঠেছে অলৌকিক সূর্য, তখন আবার সব আলোয় আলোময়। এমনি প্রতিমুহূর্তে আল্লাহর কুদরত প্রত্যক্ষ করতে করতে মঞ্জিলে মাকসাদের পথে ভেসে চলেছেন পানির জাহাজের হাজি সাহেবগণ, তাঁরা কত সৌভাগ্যবান ! বোয়িং-এ মাত্র চার ঘণ্টা আর ওঁদের সময় লাগবে দশ থেকে বার দিন, কোন কোন ক্ষেত্রে ঝড়ঝন্‌ঝার মুখে পড়লে আরো বেশি দিন। কাবা শরীফে বসে এক হাজি সাহেবের

মুখে শুনেছিলাম, তাঁরা সাগরের বুকে পাহাড় দেখেছেন, ঝাঁক ঝাঁক উড়ন্ত মাছ দেখেছেন। যাত্রাপথে যে দশ-বার দিন সময় পাওয়া যায়, প্রতিমুহূর্ত নানান ওয়াজ-নাছিহতের মাধ্যমে হজের নানান বিষয়ের শিক্ষালাভই হল পানির জাহাজের যাত্রীদের একটি বড় সঞ্চয়। বিমান যাত্রীদের এমনতর জ্ঞানলাভের বড় একটা সুযোগ থাকে না।

তবুও দেখলাম, একজন মৌলানা সাহেব, বিমান-ঘোষিকার মাইকে মুখ রেখে হজের কিছু জরুরি বিষয় বলতে শুরু করেছেন। ইনি সম্ভবতঃ এর আগেও হজ সমাধা করেছেন, অন্ততঃ তাঁর কথাবার্তায় তাই মনে হল। বিমানের সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁর কথা শুনলেন।

এই সময় আমি দেখতে পেলাম সেই আশ্চর্য দৃশ্যটি, যে দৃশ্য হয়ত জীবনে আর কোন দিনই দেখতে পাব না। আমাদের বোয়িং-এর গতি যে প্রচন্ড ছিল সে কথা আমি বার বার উল্লেখ করেছি। ঘণ্টায় নশো কিলোমিটার বেগে উড়ে যাওয়া সহজ কথা নয় অর্থাৎ প্রতি মিনিটে পনের কিলোমিটার। চোখের পলক পড়তে না পড়তে আপনি বারাসাত থেকে শ্যামবাজারে পেঁাছে গেলেন। বিমান থেকে, আমার ধারণা, আমি এক শো কিলোমিটারের দূরের জিনিষ দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ বহুদূরে কালোমত একটা ক্ষীণ অতি লম্বা রেখা দেখতে পেলাম যেন, রেখাটি বৃত্তাকার এবং স্পষ্ট হতে হতে মুহূর্তে শেষ হয়ে গেল অর্থাৎ চোখের পলকে আমরা সেই অতিকায় এবং অনির্বচনীয় দিগন্তরেখাটি অতিক্রম করে গেলাম। বিস্ময় কাটতে না কাটতে দেখতে পেলাম আমাদের পর্বতপ্রমাণ 'সেভেন-ফোর-সেভেন' বোয়িংটি সমান গতিতে এখন বালুর সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে। অর্থাৎ নীল পানির রাজ্য শেষ করে আমরা এতক্ষণে আরবের নিজস্ব সম্পদ ধূসর মরুভূমির মধ্যে প্রবেশ করলাম। হঠাৎই এই পরিবর্তন, এর ঘোর কাটতে বহুক্ষণ সময় লাগল।

কতদিন হয়ে গেল অথচ চোখ বন্ধ করলেই জল-স্থলের মিলন-

ভূমিতে সেই অতিকায় দিগন্তরেখাটি আমি আজো স্পষ্ট দেখতে পাই।

দেখলাম সাগর-মরুর অসাধারণ মিলন-রেখা নিয়ে কারো কোন মাথা ব্যথা নেই, কি হারালাম এ নিয়ে যেন আমি একাই মনে মনে হয়রান হচ্ছি, বিমানের মধ্যে তখন ঠান্ডা পানি খাওয়ার ধুম পড়ে গেছে। সেদিন বেশ গরম ছিল, তায় ভর দুপুর, আবার এসে পড়েছি তপ্ত মরুর উপরে, একটু আগে পোলাও-গোশত সহ মধ্যাহ্ন ভোজ সম্পন্ন হয়েছে—সব মিলে পানির বিপুল চাহিদা। বিমান-সেবিকারা পানি পরিবেশন করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছেন, হঠাৎ দেখি যিনি প্রথম মাইকে তালবিয়া পড়ছিলেন তিনি এগিয়ে এলেন, দেখলাম অশুদ্ধ তালবিয়া পাঠের জন্যে তাঁর কোন সংকোচ নেই—তিনি এগিয়ে এসে বিমান-সেবিকার হাত থেকে গ্লাস ভর্তি পানির ট্রেটি নিয়ে পিপাসার্ত হাজি সাহেবদের পানি পান করাতে শুরু করলেন। তাঁর এই সেবার মনোভাব আমার খুবই ভাল লাগল। এই মহৎ দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো বেশ কিছু তরুণ হাজি সাহেব পানি বিতরণের কাজে এগিয়ে এলেন, কাজ লাঘব হয়ে যাওয়ায় বিমান-সেবিকারাও মহা খুশি, তারা কেবল ঠান্ডা পানি বার করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গ্লাস ভর্তি করে দিতে থাকলেন।

পানি পান করে কিছুটা তৃপ্ত হলে সেই হাজি সাহেব হঠাৎ মাইক্রোফোনের সামনে গিয়ে ঘোষণা করলেনঃ আমরা আর অল্পক্ষণের মধ্যেই সেই পবিত্র শহরে গিয়ে হাজির হব, আপনারা মনে মনে প্রস্তুত হন, তালবিয়া পড়ুন জোরে জোরে, প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করুন আল্লাহকে...

প্লেনের মধ্যে আবার ব্যস্ততা, আবার চাঞ্চল্য। তবে কি এসে গেলাম ! সকলেরই জিজ্ঞাসা। ঘড়ি দেখলাম, সকলেই দেখলেন। এখনো দেড় ঘন্টা বাকি। সুতরাং সকলের মধ্যে হঠাৎ জাগা উত্তেজনায় আবার শৈথিল্য দেখা দিল। শিথিল হয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন অনেকেই।

সোলেমানপুরের দখিন মাঠে যেতে অজদালির পুকুরের বালুর

পাড় ছাড়া কোনদিন মরুভূমি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। প্রতিমুহূর্তে আশ্চর্য সব দৃশ্য অতিক্রম করে, বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের বোয়িং। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি নিচে। কত বিচিত্র রূপ মরুভূমির। ঠিক সমুদ্রের ঢেউ-এর মত বালুর ঢেউ গড়িয়ে চলেছে এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্তে, এর মধ্যে আবার ঘন ঘন পাহাড়। যেন একটানা মরুর নর্তনশীল ছন্দ ভঙ্গ করে দীপ্ত ভংগীতে মাথা উঁচু করে সগর্বে ঘোষণা করছে ঃ এই ত আমি মরুর সম্রাট, যতদূর চোখ যায় এরাজ্য আমার পদানত। নানান রঙের বালুর মাঝে নানা বর্ণের পাহাড়। বালুর রঙ যে এত বিচিত্র হতে পারে তাও আমার জানা ছিল না। কয়েক মাইল জুড়ে ধূসর রঙের বালুর ঘন কালো রঙের পাহাড়, ঠিক তার পাশেই মেটে রঙের বালুর ঢেউ, মাঝে মাঝে ঈষৎ লালচে বালুও চোখে পড়ল। কিন্তু অবাক হলাম হলুদ বালু দেখে, কত মাইল যে তার বিস্তার বলা মুস্কিল, যেন শেষ হতে চায় না। হলুদ বালু যেখানে শেষ ঠিক তার কিনারা থেকে শুরু হয়েছে আর এক আশ্চর্য রঙের বালু— বিমান থেকে ঠিক গোলাপী রঙের মনে হচ্ছে, গাঢ় নয়—গোলাপের পাপড়ির আগায় যে হালকা স্বপ্নালু রঙ থাকে এ সেই আশ্চর্য রঙ। জনহীন নিস্তব্ধ মরুর মাঝে মহামহিম আল্লাহ এই দৃষ্টিনন্দন রঙের খেলা ছড়িয়ে রেখেছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সত্যই তাঁর কুদরত বোঝা ভার। এই আশ্চর্য জীবন্ত গোলাপী রঙের বালুর পাশেই আবার শুরু হয়েছে তামাটে মরা বালুর স্তূপ। দুটি ধারা পরস্পর মিশে যায়নি—তাদের মধ্যে পরিষ্কার একটি সীমারেখা রয়েছে দেখতে পেলাম। বহুবছর আগে, সম্ভবতঃ উনিশ শ চৌষট্টি সালে, স্টীমার যোগে ঢাকায় যাবার পথে, দুই নদীর মিলন স্থলে এই অদ্ভূত সীমারেখা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তখন ছিল পুরো বর্ষায় মরশুম। পদ্মা বর্ষণপুষ্ট পানিতে ফুলে ফেঁপে উন্মত্ত হয়েছিল, মেঘনাও তাই। আমাদের স্টীমার চলছিল দুটি নদীর মিলিত রেখার উপর দিয়ে। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম স্টীমারের একদিকে পদ্মার ঘূর্ণিজাগা ছুটে চলা ঘোলা পানি, আর

একদিকে মেঘনার অপেক্ষাকৃত শান্ত স্ফটিক-স্বচ্ছ কালো পানি—দুটি নদীর ধারা একটি রেখায় মিলিত হচ্ছে কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে মিশে যাচ্ছে না। এই আশ্চর্য ক্রিয়াকান্ড আর কুদরতের কথা আরো অনেক পরে পড়লাম সুরা রহমানের মধ্যে ঃ ''তিনি (আল্লাহ) দুটি সমুদ্র প্রবাহিত করেন যারা পরস্পর মিলিত হয় কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ?'' ৫৫ ঃ ১৯-২১। বালুর সমুদ্রেও এই সীমারেখা অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সুতরাং মহান প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যে করে সে বিশ্বাসহীন, সে বেঈমান—প্রকারান্তরে সে নিজেকেই অস্বীকার করে।

আগুনজ্বালা তপ্ত মরুর লক্ লক্ জিহ্বা দেখতে দেখতে আমি ভাবছিলাম রসুলুল্লাহর কথা। কুরেশদের অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরম ধৈর্যশীল নবী মুহম্মদ স চোখের পানি মুছতে মুছতে এমনি দুঃসহ মরুপথ ভেঙে ভেঙে ক্লান্ত পদে চলেছেন মক্কা থেকে মদিনার দিকে, চারদিকেই দুষমন, তীর-বর্শা-বল্লম নিয়ে ওঁৎ পেতে আছে তারা, অথচ এক আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করে রসুলুল্লাহ স চিরনির্ভয়, পর্বতের মত অটল, আকাশের মত সীমাহীন। আমরাও প্রত্যেকে যদি তেমনি ভাবে আল্লাহর উপর নির্ভর করতে পারতাম !

ভূগোল বইতে পড়েছি মরুদ্যানের কথা, কোদিন চোখে দেখিনি, আজ দেখলাম। দেখলাম ঃ আদিগন্ত পোড়া বালুর রাজ্যে হঠাৎ যেন একটি অংশ গাছ-গাছালিতে ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে, বিমান থেকে একটি ছোট্ট মরুদ্যানকে একেবারে চারকোণা সবুজ রুমাল মনে হল, কোন অনন্ত রসিকজন যেন খেলার ছলে হাত থেকে রুমালটা এই মরুভূমির মাঝখানে ফেলে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই ওখানে পানির প্রবাহ আছে, পানি থেকে গাছগাছালি, মনুষ্য বসতি, পানিই মরুর জীবন। কিছু ঘর বাড়িও দেখতে পেলাম।

ঘন ঘন না হলেও, ওড়ার পথে অনেকগুলি মরুদ্যান চোখে পড়ল। কোন কোনটি বেশ বড়, আধা শহরও বলা যায়। দেশলাইয়ের বাক্সের

মত অনেক দালান বাড়িও লক্ষ্য করলাম। মরুর মধ্যে মাঝে মাঝেই মোটা কালো রেখার মত আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম, মনুষ্যবসতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হল না। দেখলাম মরুর রুক্ষ বক্ষ দীর্ণ করে এক দিগন্ত থেকে আর এক প্রান্তে উধাও হয়ে গেছে। অনেক চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলাম এগুলিই হল পেট্রল পরিবহনের পাইপ লাইন। এর ভিতর দিয়েই 'তরল সোনা' প্রবাহিত হয়। বহুক্ষণ এমনতর বিশ্বাসে অটল ছিলাম কিন্তু বিমান একটু নিচে নামতেই দেখতে পেলাম সেই কালো রেখাগুলির উপর গাড়িঘোড়ার ছুটোছুটি। শুনেছিলাম গঠমান সৌদি আরবে অনেক রাস্তাঘাট তৈরি হচ্ছে, মরুভূমির উপর দিয়ে যত্রতত্র যে এমন হাইওয়ে প্রস্তুত হয়েছে তা ভাবতেই পারিনি।

বিমান চলছিল নিথর হয়ে। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন ঘরের মধ্যে কোন একটা চেয়ারে বসে আছি। আমার সামনেই দুজন বিমান সেবিকা ও একজন সেবক বসে তাঁদের সুখ-দুঃখের গল্প-গাছা করছিলেন। রাতদিন বিমানে আসা-যাওয়া করে করে—বাইরের দৃশ্য দেখার প্রতি তাঁদের এতটুকু আগ্রহ আছে বলেই মনে হল না। হঠাৎ দেখলাম আমাদের বিমানের অনেক নিচে দিয়ে পর পর দুটি বিমান উড়ে গেল। অবশ্যই আকারে অনেক ছোট, ঠিক যেন খেলনা বিমান। তার সামান্য পরেই আমাদের 'সেভেন-ফোর-সেভেন'টি একটি বিশাল শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেল। জনবহুল দীর্ঘ শহর, কে একজন বললেন দুবাই। কিন্তু এডেনও হতে পারে। বিমান-সেবিকাকে জিজ্ঞেস করে নিলেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যেত কিন্তু কারো সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছিল না। প্রতি মুহূর্তেই আমার চোখের সামনে কাবা শরীফের পবিত্র ছবি ভাসছিল, আমি ক্রমেই রসুলুল্লাহর দেশের নিকটবর্তী হচ্ছিলাম, যে কোন মুহূর্তে আমরা জেদ্দায় পৌঁছে যেতে পারি। কখন সেই বাঞ্ছিত মুহূর্তটি আসবে তারই প্রত্যাশায় দেহমন আকুল হয়ে উঠছিল।

লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।...

নীরবে নিভৃতে আত্মা গুনগুন করেই চলেছে। শহর অতিক্রম

করে আমাদের বিমানটি যে কখন লোহিত সাগরের উপর এসে পড়েছে তা খেয়ালই করিনি। ধূলির রাজ্য শেষে আবার পানির সাম্রাজ্য, আবার কূলহারা—আকূল পাথার। মাটির মানুষ, মাটির বাঁধন ছেড়ে হাওয়ায় উড়লে বা সাগরে ভাসলেই বুকটা যেন হালকা হয়ে যায়। কখন মাটিতে ফিরব সে আশায় উন্মুখ হয়ে উঠি। মাটির বাঁধনই বোধহয় সবচেয়ে বড় বাঁধন, মাটির আশ্রয় তার সবচেয়ে বড় আশ্রয়। মাটির মানুষ তাই মাটিতেই ফিরতে চায়।

সাগরের উপর দিয়ে আবার উড়ে চলা। থৈ থৈ পানির নীল রাজ্য। কিন্তু এই উড়ে চলাতে আর কোনই আগ্রহ ছিল না। প্রতিমুহূর্তে সেই পবিত্র শহরের মাটি স্পর্শ করার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠছিল। হাওয়ার শব্দে যেমন বাঞ্ছিতজনের আগমন প্রত্যাশায় ব্যাকুল-প্রিয়া উন্মুখ হয়ে ওঠে, তেমনি লোহিতের তীরে কোন শহরের চিহ্ন নজরে পড়লেই আমার হৃদয় আবেগে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠছিল। জেদ্দায় না নেমে আমাদের বিমানটি কাবার দুয়ার প্রান্তে অবতীর্ণ হতে পারে না ? বিমানে বসে বুক বার বার কেঁপে ওঠে, বিনীত হৃদয়ের চারপাশে ভীরু প্রশ্নরা বিনম্র পদে আনাগোনা করে ঃ এই পাপ চোখে পৃথিবীর সেই পবিত্রতম গৃহটি দেখতে পাব কি ? এই অপবিত্র দুই হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারব কি তার পবিত্র দেওয়াল ? তার পবিত্র দরওয়াজা ? এই ক্ষতবিক্ষত লোলুপ ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করতে পারব কি হাজরে আসোয়াদ—কৃষ্ণ প্রস্তর —যার বুকে লেগে আছে হযরত ইবরাহিমের স্পর্শ, রসুলুল্লাহর আলিঙ্গন ? এখনো যেন বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় ঃ আমাদের মত পাপীদের সেখানে কোন প্রবেশাধিকার নেই। আমরা গেলেই বুঝি সেই পবিত্র ধূলি নাপাক হয়ে যাবে। মন ক্রন্দনাকুল হয়, চোখ ভিজে ওঠে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলি ঃ প্রভু গো সবই আপনার হাতে।

রুমালে চোখ মুছে ঠিক হতে না হতেই বিমান ঘোষিকার স্নিগ্ধকণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে ঃ আমরা জেদ্দায় এসে গেছি। আর মাত্র

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বিমান 'স্পর্শ করবে। আপনারা সিট-বেল্ট বেঁধে নিন। ধন্যবাদ।

যাত্রীদের মধ্যে ভীষণ ব্যস্ততা জেগে ওঠে। সঙ্গতকারণেই এই ব্যস্ততা। এই মাটি স্পর্শ করার জন্যে কত দিন ধরে কত জনের কত প্রস্তুতি, কত প্রতীক্ষা ?

আমি নম্র হাতে ধীরে ধীরে সীট-বেল্ট বেঁধে নিলাম, আরো বিনম্র কণ্ঠে পড়লাম ঃ লাব্বায়েক আল্লাহু হুম্মা লাব্বায়েক......

প্রভু ! আপনার পাক দরবারে বান্দা হাজির, নত শিরে অনুতাপে বিহ্বল গোলাম হাজির।...

৬.

পাঁচ মিনিট অর্থাৎ তখনো প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটারের দীর্ঘ পাড়ি সামনে। দিগন্তহীন লোহিত সাগরের নীল পানিতে দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন তখনো। বুঝতে পারছি আমাদের বোয়িংটা নিচে নামছে ক্রমাগত, সাগর পানি ঢেউ এমন কি উছলে ওঠা ফেনাও যেন দেখতে পাচ্ছি। একটা বিশালকায় জলযানে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। নীল পানি কেটে কেটে ব্যস্ত যাত্রীদের নিয়ে সে চলেছে তার মাকসাদ মঞ্জিলের দিকে। আবিসিনিয়ার পথে কি ? আমি যেন একদল উদ্বেগাকুল কাফেলাকে দেখতে পাচ্ছি জাহাজের ডেকে, আল্লাহকে স্মরণ করে তারা ক্রমেই দৃঢ়চিত্ত আর নিঃশঙ্ক হচ্ছে, আর একদল ক্রোধোন্মত্ত জন্তুদের দেখতে পাচ্ছি জেদ্দার উপকূলে। বন্দর ছেড়ে যাওয়া জাহাজের দিকে তাকিয়ে তারা আক্রোশে উত্তেজনায় উন্মাতাল হয়ে উঠেছে। মক্কা থেকে তারা ছুটে এসেছে জেদ্দায়, জাহাজের যাত্রীদের হাতের মুঠোয় পেলে এখুনি টুকরো টুকরো করে ভাসিয়ে দেবে লোহিতের নোনা পানিতে। কিন্তু হায় ! যারা আল্লাহর আশ্রয়ে থাকে—তাদের কোন ক্ষতি করা যায় না।

আমার আঁখি-পল্লবে অতীতের স্বপ্নছায়া ঘন আবেগে দুলে সজীব হয়ে উঠল। চোদ্দশো বছর আগের মক্কাকে আমি যেন একেবারে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

নবুয়তের পঞ্চম বছর। মক্কার ঘরে ঘরে শিশু ইসলাম বিকাশোন্মুখ। প্রতিদিনই ইসলামে দীক্ষা নিচ্ছেন দু-একজন করে। ইসলামের শীতল ছায়ায় এসে বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে তাঁদের কিন্তু দৈহিক যন্ত্রণা আর অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। কুরেশ নেতারা রক্তলোলুপ হিংস্র পশুতে পরিণত। তারা তরুণ ইসলামের রক্তপান করতে চায়। অত্যাচারে নিষ্পেশিত আর হত্যা করতে চায় মুসলমানদের। রসূলুল্লাহর কানে সব কথা যায়। তিনি কাতর অশ্রুবিসর্জন করেন আর সবর করতে বলেন,

একান্তভাবে নির্ভর করতে বলেন আল্লাহর ওপর। নির্যাতন বেড়েই চলে।

হযরত বেলাল রা কে ত আবুবকর রা মুক্ত করেছিলেন আগেই। জোবেরকে খেজুর পাতার চেটাই সহ আচ্ছা করে বাঁধল কুরেশ পশুরা। তারপর মাটিতে ফেলে ক্রমাগত নাকে ধোঁয়া দেওয়া হয়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অচৈতন্য হলেও ধোঁয়া দেওয়া চলতে থাকে, একদিন নয়—দিনের পর দিন। কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করা তো দূরের কথা আগুন আর ধোঁয়ায় যেমন ইট পোড় খায়, জোবেরের ঈমান তেমনি সুদৃঢ় হয়। অচৈতন্য হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত উল্লাসে আর ঘন আবেগে জোবের উচ্চারণ করেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।

শত অত্যাচারে যখন খাব্বার রা ইসলাম ত্যাগ করলেন না তখন কুরেশরা এক লোম হর্ষক নির্যাতন শুরু করল তাঁর ওপর। জ্বলন্ত অঙ্গার পুরু করে বিছিয়ে সেই প্রচন্ড উত্তাপের উপর চিৎ করে শুইয়ে দুদিক থেকে চেপে ধরে রাখল পশুর দল। পিঠের চামড়া এবং মাংস পুড়ে পুড়ে দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে এল। তবুও জ্বলতে জ্বলতে খাব্বার রা কাতর আর উল্লাসব্যাকুল কণ্ঠে বলতে থাকলেন, আল্লাহ গ আপনি আমায় সহ্য দিন, প্রভু গ এ গোলাম আপনার জন্যে...। চেতনা হারিয়ে যাবার পরও যতক্ষণ অঙ্গার জ্বলছিল ততক্ষণ পশুর দল খাব্বার রা এর অচেতন দেহটাকে চেপে ধরে থাকল। শেষে অঙ্গার নিভে গেলে তারাও চলে গেল। খাব্বার রা পরে জীবন লাভ করেন, দীর্ঘদিন পর ক্ষতও সেরে যায় কিন্তু সারা পিঠে ধবলকুষ্ঠের মত দাগ ফুটে উঠেছিল।

আম্মার, তাঁর পিতা ইয়াসির আর মা সুমাঈয়া এক পরিবারের তিন জনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই তিনজন নওমুসলিমের ওপর যে নির্মমতম অত্যাচার করা হয়েছিল ইতিহাসে বুঝি তাঁর দ্বিতীয় নজির নেই। স্ত্রী সুমাঈয়ার সামনে তাঁর স্বামী ইয়াসিরের দুই পা দু দিক থেকে দড়িতে বেঁধে দুটি উটকে প্রবলভাবে দুই বিপরীত দিকে চালনা করা হল। সঙ্গে সঙ্গে

ইয়াসিরের দেহ দু ভাগে চিরে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। সুমাঈয়াকে গাঢ়তর আবেগে তখনো কলেমা তৈয়ব পড়তে দেখে কুরেশরা তাঁর পুত্র আম্মারকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করতে শুরু করল। এই আম্মার সেই মহাসৌভাগ্যবান ছজন মুসলমানদের (আবুবকর, বেলাল, খাব্বার, সোহায়ব, সুমাঈয়া, আম্মার) একজন যাঁরা ইসলামের প্রথম যুগে প্রকাশ্যে মুসলমান হবার কথা নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। প্রহারের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে আম্মার অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। একদিকে স্বামীর লাশ অন্যদিকে অচেতন পুত্রের দেহ—মাঝে মহীয়সী সুমাঈয়া। পশুর দল তাঁকে ধর্ম ত্যাগ করতে বলায় তিনি এক অদৃশ্য শক্তিকে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্বেলিত কণ্ঠে কলেমা তৈয়ব পড়তে শুরু করলেন। অন্তর্জগৎ আলোকিত হলে বোধহয় তাকে আর মলিন করা যায় না। কিছুতেই নিরস্ত করা যাচ্ছে না দেখে, ইসলামের চিরশত্রু আবুজেহেল মহাক্রোধে তীক্ষ্ন বর্শা নিয়ে এগিয়ে এল, তারপর সেই বর্শা দিয়ে সুমাঈয়ার স্ত্রীর-অঙ্গ নির্মমভাবে বিদ্ধ করে ঈমানে গরীয়ান এই মহাপুণ্যবতী মহিলাকে পশুর মত হত্যা করল। এভাবে সুমাঈয়া ইসলামের প্রথম নারী শহীদ হবার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করেন।

মক্কার আকাশ-বাতাস করুণ ক্রন্দন ধ্বনিতে ব্যথাতুর। রসুলুল্লাহ সব কথা শুনে অস্থির হয়ে ওঠেন। সাহাবাদের নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য গোপন সভায় মিলিত হন। স্থির হয়ঃ সহানুভূতিশীল এবং ন্যায়বিচারক নাজ্জাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় কিছু মুসলমানকে কুরেশদের অত্যাচার থেকে মুক্তির জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। পরিকল্পনা দ্রুত কার্যে রূপায়িত করার নির্দেশ দেন রসুলুল্লাহ। সেই মত, নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে, বার জন পুরুষ আর চার জন মহিলা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ নির্ভর করে, জন্মভূমির মায়া বিসর্জন দিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। যথাসময়ে শয়তান কুরেশদল ব্যাপারটি অবগত হয়। শিকার হাতছাড়া হচ্ছে দেখে, পথিমধ্যে ধরার জন্য, তারাও মক্কা থেকে অতিদ্রুত জেদ্দাভিমুখে যাত্রা শুরু করল। জেদ্দায় পৌঁছে দেখল, বেশ কিছু আগে

আবিসিনিয়াগামী জাহাজ উদ্বেগাকুল যাত্রীদের নিয়ে বন্দর ত্যাগ করে গেছে। বিফল ক্রোধে বিষমুখ কুরেশদল শ্বাপদের মত আপন গহ্বরে প্রত্যাবর্তন করল।

এই সেই জেদ্দা, এই সেই লোহিতসাগর।

আল্লাহর অশেষ করুণা আর রসুলুল্লাহর শুভেচ্ছা সম্বল করে লোহিত সাগরের নীল পানি কেটে কেটে বিশাল জাহাজ ভেসে গেল দূর আবিসিনিয়ার পথে। প্রথম দলের নির্বিঘ্নে গন্তব্যে পৌঁছানোর সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় দল হিজরতের জন্যে প্রস্তুত হল। বাগ্মী জাফরের (আবু তালিবের পুত্র এবং হযরত আলির ভ্রাতা) নেতৃত্বে এই দলে তিরাশি জন মুসলমান মহানুভব নাজ্জাশীর রাজত্বে পৌঁছে গেলেন যথাসময়। আরো কিছু পরে তৃতীয় দলে একশ জন হিযরতকারী এসে গেলেন আবিসিনিয়ায়। এইভাবে মুসলমানেরা ক্রমেই নির্বিবাদে আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে প্রচুর উপঢৌকনসহ কুরেশরা তাদের কিছু লোককে আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দিল। তারা অঢেল এবং দামী উপহার দিয়ে সভাসদ এবং নাজ্জাশীকে বিশেষ ভাবে পরিতুষ্ট করে বলল ঃ আমাদের কিছু উচ্ছৃংখল লোক দেশ এবং ধর্ম ত্যাগ করে হুজুরের রাজত্বে পালিয়ে এসেছে। এরা এমন এক ধর্ম গ্রহণ করেছে যা আমাদের ধর্ম নয় আর আপনাদের খৃস্টান ধর্মও নয়। এই অসৎ আর বেয়াদবগুলিকে যদি হুজুর আমাদের সঙ্গে ফেরৎ পাঠাবার নির্দেশ দেন তা হলে আমরা বড়ই অনুগৃহীত হই। এদের শায়েস্তা করা দরকার।

কুরেশ প্রতিনিধিদের সব কথা শুনে নাজ্জাশী বললেন, কিন্তু যারা আমার আশ্রয়ে তাদেরও ত কিছু বলার থাকতে পারে। তাদের কথা না শুনে আমি কিছুতেই রায় দেব না।

পরদিন মুসলমানদের রাজ দরবারে হাজির করা হল। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ধর্ম কি ?

মুসলমানদের পক্ষ থেকে শঙ্কাশূন্য নির্ভীক কণ্ঠে জাফর উত্তর দিলেন, ইসলাম। নাজ্জাশী বললেন, এ ধর্মের মূল রীতি নীতিগুলি আমাকে ব্যাখ্যা করে বল। বিনীত, সুললিত এবং আবেগপূর্ণ

কণ্ঠে জাফর বললেনঃ আল্লাহ এক, তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ—এই হল ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র। এতদিন আমরা নানা পাপকর্মে লিপ্ত ছিলাম। আমরা আল্লাহকে ভুলে পুতুল পূজো করতাম এবং বিশ্বাস করতাম যে, এই দেবদেবীগুলিই আমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু হযরত মুহম্মদ স এসে আমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা সমূলে উৎপাটিত করেছেন, এখন আমরা উপলব্ধি করেছি ঠাকুর দেবতা মিথ্যা, সত্য একমাত্র পূর্ণ জ্যোতির্ময় আল্লাহ। পূর্বে সামান্য ব্যাপারে আমরা পরস্পর মারামারি ও ঝগড়া বিবাদ করতাম, এখন করি না। আগে আমাদের মধ্যে সম্ভাব ছিল না, ইসলাম আমাদের মধ্যে গভীর মিলন সৃষ্টি করেছে। পূর্বে প্রতিবেশীদের আমরা ঘৃণা করতাম, সকল সময় তাদের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত থাকতাম—হযরত মুহম্মদ স এসে বললেনঃ প্রতিবেশীরা তোমাদের ভাই, তাদের সঙ্গে মিলে মিশে থাক। আগে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতাম না, নবীজী এসে বললেন, ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না—সকলের সঙ্গে সম্ভাব বজায় রাখ, আগে আমাদের সন্তানদের হত্যা করতাম, এখন করি না, পূর্বে মদ্যপান করতাম, ব্যভিচার করতাম, খুন-জখম করতাম —আমাদের রসুলের শিক্ষা ও উপদেশে এখন এগুলি সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছি, আর্ত পীড়িত ব্যথিত শোকাতুরকে পূর্বে আমরা অগ্রাহ্য ও অবমাননা করতাম—শান্তির ধর্মে দীক্ষিত হবার পর থেকে তাদের সেবা করি, সান্ত্বনা দিই, ব্যথাতুরকে বুকে জড়িয়ে ধরি, তাদের অশ্রু মুছাই। সেবা আমাদের ধর্মের এক বড় নির্দেশ। আগে পিতামাতার সঙ্গে দুর্বলদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতাম এখন করি না, আগে চুরি করতাম সুদ খেতাম ওজনে কম দিতাম এখন ওসব করি না, সকল রকম কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস ত্যাগ করেছি, জীবনে কোন দিন শান্তি পাইনি—সকল অনাচার ত্যাগ করে আজ আমরা পরম শান্তি অনুভব করছি, আল্লাহর বাণী ও রসুলকে পেয়ে আমরা অন্ধকার থেকে আলোকে এসেছি, দুর্গন্ধ থেকে সৌরভে ফিরেছি, মিথ্যা ছেড়ে সত্যকে আলিঙ্গন করেছি। এই পবিত্র ধর্ম গ্রহণ করেছি

বলে প্রতিবেশী কুরেশগণ আমাদের উপর অমানবিক অত্যাচার শুরু করেছে, কয়েকজনকে হত্যাও করেছে—সেই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আমরা হুজুরের আশ্রয়ে এসেছি। পুনরায় আমাদের উপর পাশবিক অত্যাচার শুরু করার মানসেই কুরেশ দল আমাদের ফিরিয়ে নিতে এসেছে—সুতরাং হে মহানুভব মহান সম্রাট! আমরা সকলে আপনার সহানুভূতি ও ন্যায়বিচার প্রার্থনা করি।

সত্যালোকে উদ্ভাসিত জাফরের এই তেজোদীপ্ত বক্তৃতা শ্রবণ করে সভাসদসহ সকলেই বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর মৃদুকণ্ঠে নাজ্জাশী বললেন, মুহম্মদ স যে বাণী প্রাপ্ত হয়েছেন তার থেকে কিছু অংশ আমাকে শোনাও।

জাফর মধুর কণ্ঠে কালাম পাক থেকে মরিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ের কিছু অংশ পাঠ করে শোনালেন। বাতাসে তখনো কোরআন শরীফের সুমধুর ছন্দ দোল খেয়ে ফিরছিল। আপ্লুত নাজ্জাশী আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, যীশুখৃস্ট যেখান হতে বাণীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন—নিঃসন্দেহে এ বাণী সেস্থান হতেই।

কুরেশ দুর্বৃত্তদের অন্যায় প্রার্থনা না-মঞ্জুর হয়ে গেল। কিন্তু তারা নিরুৎসাহ হল না। রাত্রে সকলে মিলিত হয়ে নতুন আক্রমণসূত্র রচনা করল এবং সেইমত পরদিন রাজদরবারে গিয়ে দাম্ভিক কণ্ঠে বলল, হুজুর আমরা কোন কুমতলব নিয়ে আসিনি। বরং এই লোকগুলিই শয়তান। এরা আমাদের ধর্ম তো মানেই না এবং আপনাদের ধর্মকেও অস্বীকার করে। এরা যীশুকে 'খোদার বেটা' বলে স্বীকার করে না। সত্য না হয় এদের জিজ্ঞেস করুন।

আবার মুসলমানদের ডাক পড়ল রাজদরবারে। আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে দৃঢ়তাব্যাঞ্জক কণ্ঠে জাফর বললেন, আমরা কোন ধর্মের নিন্দাবাদ করি না, কেবল রসুলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি। কোরআন শরীফের উল্লেখ অনুযায়ী যীশু একজন প্রেরিত পুরুষ মাত্র, যেমন হযরত মুহম্মদ স একজন প্রেরিত পুরুষ। তিনি কখনই আল্লাহর পুত্র নন। তবে হযরত মুহম্মদ স-এর উপর যেমন আল্লাহর মহান

নির্দেশ অবতীর্ণ হচ্ছে—যীশখৃস্টের উপরও তেমন নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল।

সব শুনে মুসলমানদের দিকে ফিরে নাজ্জাশী মস্তক আন্দোলিত করলেন, তারপর কুরেশদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের সব নালিশ আমি নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করলাম, তোমরা এখান থেকে চলে যেতে পার।

ভগ্নোদ্যমে ব্যথাতুর চিত্তে কুরেশরা নত মস্তকে এবং ধীরে ধীরে সভাস্থল ও আবিসিনিয়া ত্যাগ করল। তাদের সকল কুপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে গেল। মুসলমানগণ পরমভক্তিভরে অশ্রুসজল চোখে আল্লাহর পবিত্র দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। আবার চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল ঃ আল্লাহ যাঁদের সহায় তাঁদের কেউ কোন দিন অপমানিত ও ক্ষতিসাধন করতে সমর্থ হয় না ঃ "আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করলে কেউ তোমাদের উপর জয়ী থাকবে না।" ৩ ঃ ১৬০

এভাবে এশিয়া ভূখন্ড থেকে পবিত্র ইসলামের জ্যোতি আফ্রিকা মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

এই সেই জেদ্দা, এই সেই লোহিত সাগর! কত দুর্যোগ কত শংকা কত বিজয় কত ইতিহাস রচিত হয়েছে এই সমুদ্রের নীল পানিতে। এই বন্দরের পবিত্র মৃত্তিকায়!!

আমাদের সেভেন-ফোর-সেভেন বোয়িং বিমানটি সেই বন্দরের অতি কাছে এসে পড়েছে। লোহিত সাগরের ওপর থেকে যেন একটা বিরাট লাফে বোয়িংটা অকস্মাৎ শহরের আকাশে উঠে এল। আর পানির রাজ্য নয়, মাটির চিহ্ন দেখে মনটা পুলকে আকুল, এত উপর থেকেও যেন মাটির স্পর্শ পাচ্ছি। মাটির সঙ্গে মাটির মানুষের যে কি নিবিড় সংযোগ!

নিচে অসংখ্য ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, যানবাহনের অফুরন্ত চলাচল। ছবির মত আঁকা বিশ্বের আধুনিকতম শহর। হঠাৎ বোয়িংটা বাঁক নিয়ে বৈরাগির মত ঘরবাড়ি ত্যাগ করে ফাঁকা মাঠের পথ ধরল এবং চোখের পলক পড়তে না পড়তে বিশ্বের বৃহত্তম ও আধুনিকতম

৭.

সেভেন-ফোর-সেভেন বোয়িংটি এখন জেদ্দার মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, যেন রণক্লান্ত দুর্ধর্ষ সৈনিক এক, যুদ্ধজয়ের বিপুল গৌরবে উজ্জ্বল এবং অসম্ভব শ্রমে ক্লান্তিতে এখন স্বগৃহে নিশ্চুপ। তার সফল উড্ডীনের কথা স্বীকার করতেই হবে, পথে অসুবিধা হয়নি কারো, অভিজ্ঞ বৈমানিকদের ধন্যবাদ, শুকরিয়া বিমান সেবকসেবিকাদের। তাঁদের সৌজন্যতা ভদ্রতা আর আতিথেয়তার কথা দীর্ঘদিন মনে রাখব।

বোয়িং বিশ্রামরত কিন্তু তার ভিতরটা এই মুহূর্তে দারুণভাবে কর্মচঞ্চল। তীর্থযাত্রীগণ তাঁদের জিনিষপত্র কাঁধে ও হাতে ঝুলিয়ে প্রস্তুত এবং সকলে একই সঙ্গে বিমান থেকে বেরিয়ে যেতে চান। সকলেই চঞ্চল ব্যগ্র কিন্তু জটলা বা কোলাহল নেই একেবারে ; সকলেই সজাগ যেন কারো কোন অসুবিধা না হয়। তালবিয়া পড়ছেন মনে মনে আর ধীর পায়ে একটু একটু করে এগুচ্ছেন লাল টকটকে Exit এর দিকে।

আমার স্ত্রীর সিট একটু দূরে পড়েছিল। দেখলাম তিনিও একটি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে এবং আরো ছোট ছোট দুটি ব্যাগ দু হাতে ঝুলিয়ে সঙ্গী মেয়েদের নিয়ে স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হচ্ছেন। সেই পরম পবিত্র বাঞ্ছিত মাঞ্জিলে মাকসাদের দিকে প্রতিমুহূর্তে আল্লাহ আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এটা মনে হতেই কৃতজ্ঞতায় আমার সমগ্র দেহমন যেন আপ্লুত আর নম্রনত হয়ে গেল। আমি তালবিয়া পড়তে পড়তে ধীরে অতি ধীরে বিনীত ভাবে উঠে দাঁড়ালাম। এক সময় মনে হল যেন আমি ঠিক মত মাথা তুলে খাড়া হয়ে দাঁড়াতেই পারছিনা। ভয়ে সম্ভ্রমে ভক্তি শ্রদ্ধায় ভিতরটা কি রকম হয়ে যাচ্ছে। এই সেই পবিত্র দেশ, এই সেই পবিত্র মাটি— এখুনিই আমি সেই মাটি স্পর্শ করব ! যেন বিশ্বাস হয় না।

অনেক রানওয়ে, অনেক বিমান। জেদ্দা এখন ভীষণভাবে কর্মচঞ্চল। বিশ্বের এই আধুনিকতম এবং সর্ববৃহত্তম বিমানবন্দরে এক সঙ্গে যে কত বিমান উঠতে আর নামতে পারে তা আমার জানা

নেই। উইণ্ডো গ্লাস দিয়ে পলকে দেখলাম অসংখ্য বিমান প্রায় একই সঙ্গে উঠছে নামছে এবং দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়ান বিমানের গায়ে মধ্যাহ্ন সূর্য আগুন ধরিয়ে দিয়েছে মনে হল, অগ্নিশিখার মত লকলকে ভাঁপ উঠছে বাঁক খেয়ে, রানওয়ের উপর দিয়েও, মরুর মাটি ভেদ করেও। সর্বত্রই আগুন জ্বলছে দাউ দাউ। আমাদেরও হয়ত ঐ আগুনের ভিতর দিয়েই এগুতে হবে! দেখলাম বিমান থেকে যাঁরা বেরিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা নিচে নামছেন না, তা হলে যাচ্ছেন কোথায়? অবশেষে আমার সময় এলে, আমি নির্গমনের মুখে এসে দাঁড়ালাম। অপরূপা এক বিমানসেবিকা দুহাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, নমস্তে! আমি স্মিত হাস্যে মাথা নেড়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে বেরিয়ে এলাম, পিছনে আমার স্ত্রী। দেখলাম, এক শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুউচ্চ সুড়ঙ্গপথ বিমানের নির্গমন দরজার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আমরা সেই আলোকোজ্জ্বল মনোরম শীতল পথ বেয়ে চলতে চলতে এক অতি সুসজ্জিত বিশাল বিশ্রামাগারে পৌঁছে গেলাম। বাইরের অগ্নিক্ষরা মরু তার রৌদ্রতপ্ত রাগী সঙ্গীসাথীদের নিয়ে আমাদের স্পর্শ করতেই পারল না। জেদ্দাকে কেন যে আধুনিকতম বিমান-বন্দর বলা হয় তার কিছুটা আঁচ পেলাম।

আসলে তিনটি বিশালতর বিমানবন্দব নিয়ে জেদ্দা বিশ্বের বৃহত্তম বিমানবন্দরের গৌরব পেয়েছে, পাশাপাশি তিনটি দিগন্তহীন অতিকায় বিমানবন্দর নিয়ে জেদ্দা বিমান পোত—সৌদি, যুনাবি আর মাতার। সৌদি টার্মিনাল থেকে সৌদি আরবের আভ্যন্তরীণ বিমান সংযোগগুলি রক্ষিত হয়। ট্রেন নেই, রেড সী ছাড়া জলযান চলাচলের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই আভ্যন্তরীণ সংযোগ রক্ষায় বিমানের ভূমিকা সৌদি আরবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতিবিত্তবান সৌদিদের কাছে বিমানে যাতায়াতটা প্রায় আমাদের ট্রামবাস ধরে নড়াচড়া করার মতই হয়ে উঠেছে। তাছাড়া অনেক সৌদির নিজস্ব প্লেন আছে। তাই সৌদি টার্মিনাল সব সময় বিমানগর্জনে ভীষণভাবে আক্রান্ত।

যুনাবি অর্থাৎ ইন্টারন্যাশন্যাল টার্মিনাল। এটিও এক অতিকায়

বিমানবন্দর। বিশ্বের সকল দেশের সকল বিমান এখানে ওঠানামা করে। মাতার অর্থাৎ হজ টার্মিনাল। এই বিমান বন্দরটি কেবলমাত্র হজ আর ওমরাহ্ পালনকারীদের জন্য নির্মিত। বিশ্বের সকল দেশের হাজিবাহী বিমান এখানেই অবতরণ করে। হজের মৌশুম শেষ হয়ে গেলে যাঁরা ওমরাহ পালনের জন্য আসেন তাঁদেরও এ টার্মিনালেই অবতরণ করতে হয়।

বিমানবন্দরগুলির গঠন ভারি অদ্ভুত। আকাশ থেকে দেখে আমার মনে হয়েছিল যেন মরুভূমির মধ্যে বেশ কিছু তাঁবু খাটান রয়েছে। আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারগণ বহু পরিশ্রম করে বিপুল অর্থের বিনিময়ে মরুর মাঝে এই অভিনব বিমানপোতটি গড়ে দিয়েছেন। পরপর অতিবিশাল আর সুউচ্চ অনেকগুলি তাঁবু, তার তলায় প্রয়োজন মত অফিস, ব্যাংক, পাশপোর্ট আর ভিসা অফিস, বিশ্রামাগার, নামাযের স্থান হোটেল রেস্টুরেণ্ট সহ এক আধুনিকতম শহর। সৌদি যুনাবি আর মাতার তিনটিতেই একই বিলাসবহুল ব্যবস্থা। প্রতিমুহূর্তে হাজার হাজার লোকের ওঠা-নামা গমনাগমন অথচ ময়লা, আবর্জনা নোংরা নেই কোথাও। দলে দলে দাল্লারা (ঝাড়ুদার) আধুনিক বৈদ্যুতিক সাফাই মেসিন নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সাফাই হয়ে যাচ্ছে সব, যেন এইমাত্র ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেল কেউ।

বিশ্রামাগারের মধ্যে জিনিসপত্র রেখে আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে আল্লাহকে স্মরণ করলাম। আমি বার বার গভীরভাবে উপলব্ধি করছি আল্লাহর সাহায্য ও রহমত ছাড়া কোন কিছুই হতে পারে না। আমি যেন প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর রহমতের অফুরন্তধারায় সিক্ত হচ্ছি, পরিপূর্ণ হচ্ছি। চার ঘণ্টা আগে ছিলাম বোম্বে —সেটা ভারত, এখন জেদ্দায়—এটা রসুলুল্লাহ স-এর দেশ। ভাবতেও মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শিহরণ জাগে, পুলকে দোল খাই।

বসে বসে চেতনার মধ্যে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম হঠাৎ স্ত্রী বললেন, দেখুন দেখুন।

তাকিয়ে দেখি এক হাজি সাহেব লোটায় পানি নিয়ে বিশ্রাগারের

প্রায় মাঝখানে অজু করতে বসে গেছেন। বাথ রুমে ভীষণ ভীড়, দীর্ঘ লাইন। হাজি সাহেব আর ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন নি। তাই প্রায় অশোভন ভাবে অজু করতে বসেছেন পরিচ্ছন্ন এক বিশ্রামাগারের পরিচ্ছন্নতর এলাকায়। আমি ভেবে অবাক হয়ে গেলাম ওখানে অজু করতে বসায় তার বিবেক কি একটু ধাক্কা খেল না !

কিন্তু আমার তখন অনেক বিস্ময়ের বাকি ছিল। দেখলাম, হাজি সাহেবের দেখাদেখি অনেকেই অজু করতে বসে গেছেন বিভিন্ন এলাকায় এবং প্রতিটি এলাকাই নিষিদ্ধ। ঐ যে অগ্রগামি হাজি সাহেব একবার মুখটা উসকে দিলেন মৃদু আঘাতে আর সেই ছিদ্রপথেই হুহু করে বেরিয়ে এল আমাদের কুরুচির দুর্গন্ধ গলিত পদার্থসমূহ। এরমধ্যে কে আবার একজন সবজান্তার মত ঘোষণা করেদিলেন, কোন খাদ্যদ্রব্য ভিতরে নিয়ে যেতে দেবে না—সুতরাং যার সঙ্গে যা খাবার আছে এখানেই খেয়ে নিতে হবে।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সে এক দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হল। যাঁর সঙ্গে যা ছিল নির্দ্বিধায় তিনি তা খাওয়া শুরু করলেন। প্লেনে পরিপূর্ণ খাওয়ার পর এই অল্প সময়ের ব্যবধানে বম্বের হজ কমিটির দেওয়া খাবারগুলি কারো পক্ষেই সম্পূর্ণ খাওয়া সম্ভব হল না। সুতরাং কেউ রুটির টুকরো নিচে ফেললেন, কেউ পারটার অংশ, কেউ মুরগীর গোশত, কেউ বা কলার খোসা, প্যাকেটগুলি তো যত্রতত্র ছড়াছড়ি হয়ে রইলই, তার উপর চার দিকে অজুর পানি। সব মিলিয়ে বীভৎস অবস্থা। ডাস্টবিন সামনেই রয়েছে অথচ খুব কম হাজিই তার সদ্ব্যবহার করলেন। এক অতি সুসজ্জিত আধুনিক বিশ্রামাগার মুহূর্তে ভারতীয় হাজিদের দ্বারা ভীষণভাবে মলিন নোংরা কদর্য আর কুৎসিত হয়ে গেল। অত্যন্ত বেদনার ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করলাম আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার মত বোধ আমরা কেউই অর্জন করতে পারিনি। অথচ এটা রসুলুল্লুহর দেশ আর রসুলুল্লাহ স আমাদের বিস্ময়করভাবে সৌন্দর্যসচেতন করে দিয়েছিলেন।

এখানে অনেক পরিচিত লোকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে

গেল। দেখলাম আকড়া চন্দননগর প্রভৃতি এলাকা থেকে কয়েকজন পরিচিত জন হজ করতে এসেছেন। চব্বিশ পরগণার আরো কয়েকজন হাজি সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল।

সেই বিশ্রামাগারেই অন্যান্য হাজি সাহেবদের সঙ্গে আমি ও আমার স্ত্রী জোহরের নামায সম্পন্ন করলাম। আরবের মাটিতে এই আমাদের প্রথম নামায।

এবারে ভিতরে যাবার পালা। কাস্টম-এ যাবার পথে প্রথমেই পুলিশ চেকিং। দেখলাম, একজন পুলিশ অফিসার বসে আছেন। তিনি পাশপোর্ট নিয়ে ফটোর সঙ্গে ব্যক্তিকে মিলিয়ে নিচ্ছেন তারপর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় একটি করে সই ও স্ট্যাম্প দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন। অতিদ্রুত কাজ মিটে যাচ্ছে এখানে। পুলিশ চেকিং-এর পর মুয়াল্লেম ঘোষণা। উঠতি বয়সের দুটি ছেলে বসে আছে বেশ কিছু উঁচুতে, আর সরকারি তরফের দুজন কর্মচারি বসে আছেন দু দিকে। উঠতি বয়সের ছেলে দুটির আচরণ বেশ কিছুটা অশালীন বলে মনে হল, তাদের কোনই কাজ নেই কেবল বসে বসে মেয়েদের দেখছে, টিপপুনি কাটছে আর অর্থপূর্ণ হাসি বিনিময় করছে নিজেদের মধ্যে। এদের বালখিল্যপনা আর কেউ লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানি না কিন্তু আমি ভীষণ ব্যথা পেলাম। অন্ততঃ সৌদি আরবে এই আচরণ আমি আশা করিনি। সবে শুরু, সামনের তিনটি মাসে যে আরো কত কদর্য অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হব ভেবে শঙ্কিত হলাম কিছুটা। কিন্তু আশ্চর্য, আর কোথাও কোনদিন কোন কিছুই ঘটে নি, এমনকি এ ধরনের আচরণের বিন্দুমাত্র কোথাও চোখে পড়েনি। বরং দুর্লভ পবিত্রতা লক্ষ্য করেছি সর্বত্র, যা আমার বোধ ধারণা আর চৈতন্যকে উজ্জ্বল করেছে।

আমরা আমাদের মুয়াল্লেমের নাম বলতে সরকার নিযুক্ত কর্মচারি যথারীতি তা লিপিবদ্ধ করে নিলেন। এখানেও কোন ঝামেলা নেই, মিনিটখানেকের মধ্যেই সব কিছু মিটে গেল।

এভাবে হাজিদের মুয়াল্লেমের হাদিস নেবার একমাত্র কারণঃ সৌদি সরকার প্রত্যেক মুয়াল্লেমের কাছে অন্ততঃ কিছু সংখ্যক

(এই সংখ্যা সম্ভবতঃ কমপক্ষে আঠার শো) হাজিকে রাখতে চান এবং আরফাতের ময়দানে হজের দিন এই রেকর্ড অনুসারেই সৌদি সরকারের তরফ হতে প্রত্যেক হাজি সাহেবকে এক ওয়াক্ত খাবার খরচ মুয়াল্লেমদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এরপর সামনে এগিয়ে গেলাম। এবারেই কাস্টম চেকিং। প্লেন থেকে আমাদের ব্যাগগুলিকে এখানেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছে দেখলাম। প্রতিটি জিনিস বুঝে পেলাম। বিরাট এলাকা জুড়ে কাস্টম চেকিং হচ্ছে। পাঁচ-ছ জন যুবক অফিসার মিলে কাজ করছেন সেখানে। দেখলাম, অনেকের চাল-ডাল এবং আরো সব নানান জিনিসপত্রের প্যাকেট টান মেরে মেরে ফেলে দিচ্ছেন তাঁরা। অর্থাৎ এগুলি বাজেয়াফ্‌ত হয়ে গেল। দেখতে দেখতে বাজেয়াফ্‌ত জিনিসের পাহাড় জমে উঠল। চাল-ডাল সহ অন্যান্য জিনিসপত্র যাঁরা বম্বে থেকে বয়ে এনেছিলেন তাঁদের অবস্থা ক্রমেই করুণ হয়ে উঠল। আমরাও অনেকের নিষেধ না শুনে কিছু কিছু বাড়তি বোঝা আর ঝামেলা সঙ্গে এনেছি, সুতরাং আমরাও শঙ্কিত হয়ে উঠছিলাম মনে মনে। কিন্তু কেন জানি না, আমাকে দেখে কাস্টম অফিসার হয়ত কিছুটা দয়াপরবশ হলেন। সব কিছুই দেখলেন কিন্তু একটি মাত্র চানাচুরের প্যাকেট ছাড়া তিনি আর কিছুই আটক করলেন না। এই প্যাকেটটি বাণী-কামাল জোর করে আমাদের সঙ্গে দিয়েছিল।

আমি আবার বলছি, কোন বিমান হজযাত্রী চাল ডাল ময়দা ঘি চিনি তেল প্রভৃতি যেন আদৌ সঙ্গে না আনেন। আনলে অহেতুকভাবে বিব্রত হবেন এবং শেষ পর্যন্ত জিনিসগুলি হয়ত খোয়া যাবে।

ময়দা চাল ডাল ইত্যাকার খাদ্য সামগ্রি আটক করার হেতু জিজ্ঞেস করাতে একজন বললেন ঃ কেবল বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান প্রভৃতি থেকে আগত হজ যাত্রীদের খাদ্য দ্রব্য আটক করা হয় বেশি করে, কেননা এসব দেশের হাজিরাই খাদ্যের সঙ্গে লুকিয়ে আনেন চরস গাঁজা আফিম এবং আরো নানান মাদক দ্রব্য। অন্যকোন দেশের হাজিদের মধ্যে এই অন্যায় নীতিহীন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না।

হায়রে, বিদেশে আমরা আমাদের নাম সুনামকে কত উজ্জ্বলভাবেই না প্রতিষ্ঠিত করছি !

কাস্টম চেকিং সমাপ্ত হলে আমরা আমাদের খোলামেলা জিনিসগুলিকে আবার বেঁধে ছেঁদে কিছুটা সংহত করে নিলাম। তারপর ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এয়ারপোর্টের কুলিরা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের কিছু জিনিস একটিতে তুলে দিলাম। এ বিষয়ে আমার স্ত্রী যথেষ্ট সাহায্য করলেন। কাস্টম হাউসে তাঁকে বড় বড় ব্যাগ উঠাতে নামাতে খুলতে এবং বন্ধ করতে দেখলাম, গাড়িতেও তিনি এভাবেই আমাকে সাহায্য করলেন। বাড়িতে যিনি অলস না হয়েও কিছুটা আরামপ্রিয়, এখানে তিনি স্মার্ট আর দারুণ কর্মঠ। তাঁর এই পরিবর্তন আর ক্রিয়াকান্ড দেখে আমি হতবাক। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে, তার পিছনে প্রায় ছুটতে ছুটতে বললেন, পরের গাড়িতে আপনি ওগুলি নিয়ে আসুন —আমি টার্মিনাসে এসব নামিয়ে নিচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে মেয়েরা যদি কেবল বাড়তি বোঝার মত নিষ্প্রাণ হয়ে সঙ্গে আসেন তা হলে সুষ্ঠুভাবে হজের সব কিছু পালন করা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বৃদ্ধাদের কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যাঁরা শক্ত সামর্থ, হজের উদ্দেশ্যে বার হবার পূর্বে তাঁদের মানসিক দিক দিয়ে ভীষণভাবে সতর্ক আর প্রস্তুত হবার জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।

টার্মিনালে এসে দেখি মুয়াল্লেমদের বাস দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসপত্র একত্র করে গেলাম ব্যাঙ্কে। পাশেই এগার নম্বর কাউন্টার, সেখানে গিয়ে মাত্র একটা টিপের বিনিময়ে পেলাম তিন হাজার একশো রিয়াল। স্বদেশে ব্যাঙ্কে আমরা যে টাকা জমা দিয়েছিলাম—সৌদি সরকারের খরচ, মুয়াল্লেমের খরচ মায় অন্যান্য সবকিছু সরকারী খরচ কাটার পর হাতে পেলাম তিন হাজার এক শো রিয়াল। এ দিয়েই আমাদের সকল খরচ মেটাতে হবে। আমার স্ত্রীও টিপসই দিয়ে তাঁর রিয়াল নিয়ে এলেন। এসব ঝামেলা মেটাতে আসরের ওয়াক্ত হয়ে এসেছিল। অজু করে একে একে নামায পড়ে নিলাম। একজন নামায পড়ছিলাম আর জিনিসপত্রের পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম

অন্যজন। সবে ভারত থেকে এসেছি, স্বদেশের আবহাওয়া আর পরিবেশ পঙ্কিলতা থেকে মন তখনো মুক্ত হয় নি। পরে বুঝেছিলাম, কোটি টাকার জিনিষ পড়ে থাকলেও সেটি নেবার মত লোক নেই সৌদিতে, একমাত্র ভয় বহিরাগত আমাদের মত হাজিদের, দেশে যেমন এখানেও তেমনি—মওকামত কিছু একটা পেলেই হয়। মক্কায় এলেই সকলের মন পবিত্র হয়ে যায় না, মনকে পবিত্র করতে হয়।

নামায সমাপ্ত করে এক সময় বিসমিল্লাহ বলে জিনিসপত্রগুলি বাসের মাথায় তুলে দিলাম তারপর পবিত্র নগরী মক্কার পথে রওনা হবার জন্যে আসন গ্রহণ করলাম। এ সময় আমার জীবন সঙ্গিনীকে অসম্ভব সুন্দর মনে হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম আল্লাহর ঘরের নৈকট্যলাভের ব্যাকুলতা এবং তজ্জনিত এক অপার্থিব প্রশান্তি তাঁর চোখে মুখে আশ্চর্য দীপ্তি দান করেছে।

প্রায় পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে বাস মক্কার পথে যাত্রা শুরু করল। দু-একটি বাঁক ঘুরেই জেদ্দাকে পিছনে ফেলে আমরা মক্কার রাজপথে উঠে এলাম। রাজপথ কাকে বলে তা এই প্রথম বোধহয় ঠিকমত উপলব্ধি করলাম। যেমন প্রশস্ত তেমনি মসৃণ। বালির দেশ অথচ কোথাও কোন ধুলো নেই। ময়লা আর জঞ্জাল থেকে মুক্ত হয়ে পথ আশ্চর্যরকম পরিষ্কার। সিঁদুর পড়লে তোলা যায়—পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে এমন প্রবাদ চালু আছে বাংলায়, আমি বলি ঃ থালা বা বাসুনের দরকার নেই—ডাল ভাত মেখে খাওয়া যায় রাস্তায়। যানবাহনের সংখ্যাও কম কিছু নয়, অন্ততঃ হজের মরশুমে তো নয়ই —প্রায় সৌদির এখন গাড়ি রয়েছে, কারো কারো দুটি, কারো বা তিনটি —তবু কোথাও কোন যানজট নেই, থেমে যাওয়া নেই, যে যার মত চলেছে আপন গতিতে, আপনার পথে। গতিও অবাক হয়ে দেখার মত, অতি সাধারণ গাড়িগুলি চলেছে এক শো কিলোমিটার বেগে, অন্যগুলি একশো বিশ থেকে দেড়শোর মধ্যে। আরোহী বা ড্রাইভারকে ঠিকমত লক্ষ্য করা যায় না অনেক সময়, তীরের ফলার মত শোঁ করে চকিতে কানে একটা বাতাসের ঝাপটা মেরে বেরিয়ে মিলিয়ে যায় কোথায়। সব গাড়িই বিদেশী এবং বিদেশের সেরা

গাড়ি। দামী জাপানী গাড়ির তো কথাই নেই, বিলাসবহুল রোলস রয়েস বা লিমোজিনেরও অভাব নেই। যত্রতত্র চোখে পড়বে। সারা ভারতে নতুন মডেলের লিমোজিন সর্বসাকুল্যে মাত্র কুড়িটি আছে কিনা সন্দেহ, সেক্ষেত্রে এক মক্কাতেই এ ধরনের গাড়ি আছে কয়েক হাজার। সৌদিদের অর্থ আর বিত্তের কথা ভাবা যায় না, কল্পনায় আসে না। শুকনো বৃক্ষহীন খটমটে মরুর দেশ, তার তলায় ঢল ঢল করছে তরল সোনা। গড়িয়ে বয়ে চলেছে অঢেল। আল্লাহর কি অপার মহিমা !

গাড়িগুলির ভিতরটা দামী কার্পেটে মোড়া, সিটগুলি মূল্যবান আর পুরু 'ফার' দিয়ে ঢাকা। অনেক গাড়িতেই দেখলাম খাঁটি আরব স্টিয়ারিং ধরে আছেন আর তাঁর পাশে বসে আছেন কালো বোরখা ঢাকা দুর্লভ গাড়ির মতই বহুমূল্যবান বেগম। মূল্যবান কথাটা বহু অর্থে সত্য। প্রথমতঃ আরবী মেয়েদের রং ও সৌন্দর্যের বোধহয় কোন দ্বিতীয় নেই। আরবী ঘোড়ার মতই তাঁরা তুলনাহীন, দ্বিতীয়তঃ সৌদি আরবে বিপুল অর্থের বিনিময়ে বৌ ঘরে আনতে হয় ! সুতরাং সব দিক দিয়েই তাঁরা মূল্যবান। যাক—এসব কথা পরে সম্ভব হলে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

সূর্য নরম হয়ে এসেছিল। নানান আশ্চর্য রঙের খেলায় সে মত্ত হয়ে উঠছিল ক্রমে ক্রমে। সারাদিন ঘরে দুঃসহ আবদ্ধতায় কাটিয়ে এই স্বপ্নময় বৈকালিক মুহূর্তে সৌদিরা দলে দলে সআবরু বেগমদের নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন বোধহয়। অধিকাংশ গাড়িতে দুজন দুজনকেই দেখতে পাচ্ছি।

বাস ছুটে চলেছে মক্কার পথে, ঝড়ের বেগে। মাঝে মাঝেই পাহাড়, ছোটবড় মাঝারি, নানান আকারের। বালির সমুদ্রে এত ঘন ঘন পাথুরে পাহাড় কি করে জন্মাল এও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। চারিদিকেই প্রবল পরাক্রমে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়েরা। তাদের বুক কেটে কেটে এই মসৃণ রাজপথগুলিকে বার করে নিয়ে যেতে যে কি বিপুল অর্থ আর শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে তা না দেখলে অনুমান করা চলে না।

পথের দু পাশে দেখলাম অগণিত নতুন ঘরবাড়ি হচ্ছে। তাদের সংখ্যা এত বেশি যে মাঝে মাঝে মনে হয় সারা সৌদি এখন গঠনমুখী, সমগ্র দেশ জুড়ে কর্মমুখী নবীন উদ্যম যেন কোলাহল শুরু করে দিয়েছে। যত্রতত্র নতুন ইমারত তৈরি হচ্ছে। ছোট আছে, বড় আছে, ম্যানসান আছে--তবে ম্যানসানের সংখ্যা নগণ্য। দেখলাম সৌদিরা ম্যানসানের মানসিকতা ত্যাগ করে ছোট ছোট সুন্দর নিজস্ব অভিজাত বাড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরাম করে থাকতে ভালবাসে। ম্যানসানের দেশলাইয়ের বাক্সে বন্দী হতে তারা একেবারেই নাখোশ, হয়ত স্থান এবং অর্থের কোন অনটন নেই বলে।

কলকাতায় বসে শুনতাম ড্রাইভার আর রাজমিস্ত্রীর বড় অনটন সৌদি আরবে। জেদ্দা থেকে মক্কায় যাবার পথে দুই দিকের কর্মকান্ড থেকে তার মর্মার্থ কিছুটা উপলব্ধি করলাম। এত গাড়ি ! এত বাড়ি ! চলতে চলতে দেখতে দেখতে আমারই মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

এক সময় আমরা হুদাইবিয়ায় এসে পেঁছিলাম। হুদাইবিয়ার আর এক নাম শোমায়ছিয়ার।

জেদ্দা থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় এক শো কুড়ি কিলোমিটার, মক্কা থেকে হুদাইবিয়া প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে। সুতরাং জায়গাটা মক্কা জেদ্দার ঠিক মাঝামাঝি না হলেও প্রায় মাঝামাঝি এমন কথা বলা যেতে পারে।

এই সেই হুদাইবিয়া ! যেখানে দুষমন কুরেশদের সঙ্গে রসুলুল্লাহ স-এর বহুখ্যাত ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। মক্কার পথে চলতে চলতে বাসে বসে আমি যেন উনিশ বছরের নওজোয়ান ইসলামের প্রদীপ্ত তেজকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

হিজরীর ষষ্ঠ বর্ষ। ইসলামের বয়স তখন মাত্র উনিশ। দীর্ঘদিন মক্কা ছেড়ে মদিনায় রয়েছেন হযরত মুহম্মদ স, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন হিযরতকারী অসংখ্য মুসলমান। স্বদেশের মাটিতে যাবার জন্যে, আত্মীয়-স্বজনকে দেখার জন্যে সকলেই উদগ্রীব। আল্লাহর

জন্য, রসূলের জন্য, ইসলামের জন্য সব কিছুই তাঁরা ত্যাগ করেছেন —তবুও স্বজনদের জন্যে মাঝে মাঝে তাঁদের মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণটা এসে যায়, বিশেষ করে আল্লাহর ঘর কাবা দর্শনের জন্য তাঁদের মধ্যে আকুলতা তীব্র হয়ে ওঠে। রসূলুল্লাহর মন তো কাবাতে পড়েই ছিল। সকলের সকাতর অনুরোধে এবং নিজের অন্তর্লোকের তাগিদে অবশেষে জিলকদ মাসে তিনি ঘোষণা করলেন যে এবার হজ করতে যেতে হবে, যারা যেতে চায় যেন প্রস্তুত হয়। এ ঘোষণায় অদ্ভুত সাড়া পড়ে গেল। অল্প সময়ের মধ্যে চৌদ্দ শ মুসলমান হজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এলেন। নির্দিষ্ট দিনে গোসল সমাপ্ত করে হজের বেশ পরিধান করে রসূলুল্লাহ স ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তারপর তাঁর প্রিয় উটে সওয়ার হয়ে সেই তীর্থ যাত্রী কাফেলাকে সঙ্গে নিয়ে পবিত্র কাবার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন. তাঁর উদ্দেশ্য হজ—সুতরাং সঙ্গে নিলেন কুরবানীর জন্য সত্তরটি উট. সর্বপ্রকার যুদ্ধাস্ত্র বর্জন করে কেবল পথিমধ্যে বিপদের মুকাবিলা ও আত্মরক্ষার জন্য নিলেন সামান্য অস্ত্র। হজযাত্রী কাফেলা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। সংসারের সকল রকম বাসনা কামনা হতে আজ তাঁরা মুক্ত—শৌর্যবীর্যের অভিমান নেই, বীরত্বের দম্ভ নেই. ভোগ বিলাসিতার উচ্ছৃংখলতা নেই. নেতৃত্বের অহংকার নেই—আজ তাঁরা সকলে এক. কাবার জিয়ারতে রসূলের অনুগামী. চোখে কাবার ছবি, বুকে দীপ্ততেজ ঈমান, হৃদয়ে অনন্ত আল্লাহ প্রেম। এই সর্বত্যাগী কাফেলা পরম নির্ভরতায় একমাত্র আল্লাহতে আত্মসমর্পিত হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে পবিত্র মক্কার পথে এগিয়ে চলল।

যথাসময় সংবাদ পৌঁছে গেল মক্কায়। সমরানলে যেন ঘৃতাহুতি হল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কুরেশদের প্রচন্ড হিংসা। তারা কিছুতেই হযরত মুহম্মদ স আর তাঁর দলবলকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না, হজ করা ত দূরে অস্তু। বদরে তারা পরাজিত, ওহোদের যুদ্ধেও খুব সুবিধে করতে পারেনি, সম্প্রতি খন্দকের যুদ্ধে ত তারা বিধ্বস্ত আর লাঞ্ছিত হয়ে এসেছে। যার জন্যে এত লাঞ্ছনা ভোগ—সেই চিরদিনের শত্রু আসছে মক্কায়, তাকে পাওয়া

গেছে হাতের মুঠোয়। সুতরাং পথিমধ্যে তাঁকে সমূলে ধ্বংস ও হত্যা করার দৃঢ় সংকল্পে সঙ্গে সঙ্গে দুশো জবরদস্ত সশস্ত্র অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেই মুহূর্তেই মক্কা ছেড়ে মদিনার পথে বেরিয়ে গেল বীর খালেদ বিন অলিদ আর ইকরামা বিন আবু জেহেল। ওসফান নামক স্থানে পেঁাছে রসুলুল্লাহ স এ সংবাদ অবগত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিবাদ ও সংঘর্ষের পথ পরিহার করে শত্রুর দৃষ্টি এড়িয়ে ভিন্ন পথ ধরলেন এবং যথাসময় নির্বিঘ্নে হুদাইবিয়ায় পেঁাছে গেলেন। দর্পী অশ্বারোহী সৈন্যেরা বহু দূর অগ্রসর হয়েও রসুলুল্লাহর দেখা না পেয়ে ভাবল, মুহম্মদ স হয়ত অন্যপথ দিয়ে মক্কায় গিয়ে এতক্ষণ মক্কা দখল করে ফেলেছে। সুতরাং তারা আর অগ্রসর না হয়ে অতিদ্রুত মক্কার দিকে ফিরে গেল।

ইতিমধ্যে কুরেশরা আরো একটা কাজ করল। তারা কেবল নিজেরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হল না বরং নিকট দূরের বহু গোত্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে দিল। তারা বললে, বাবা হোবলের দুষমণকে মারার এই সহজতম সুযোগ, শত্রু নিজে এসে ধরা দিয়েছে, কিছুতেই এই মহোত্তম মুহূর্তকে বিফলে যেতে দেওয়া যায় না।

প্ররোচনায় কাজ হল। অসংখ্য গোত্র ক্ষেপে গেল, মুসলমানদের রক্তে মরুর মাটি লাল করার জন্যে অসংখ্য লোক জমায়েত হল মক্কায়।

খোজা সম্প্রদায় পৌত্তলিক কিন্তু তারা মুসলমানদের প্রতি আগাগোড়াই কিছুটা সহানুভূতি সম্পন্ন। এই গোত্রের বোদায়েল তাঁর কিছু সঙ্গীসাথী নিয়ে হুদাইবিয়ায় রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, কুরেশরা যুদ্ধের জন্যে সর্ব রকমে প্রস্তুত হচ্ছে, তারা যুদ্ধ করবেই।

রসুলুল্লাহ স বোদায়েলকে বললেন, বরং তুমি গিয়ে কুরেশদের বুঝিয়ে বল যে আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, এসেছি হজ করতে। তা ছাড়া এই পবিত্র মাসে ত যুদ্ধ নিষিদ্ধ। আমরাও যুদ্ধ চাই না, হিংসা চাই না, শান্তি চাই, প্রীতি চাই। অন্ততঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কুরেশরা আমাদের সঙ্গে সন্ধি করুক, এই সময়ের মধ্যে

আচরণ ও প্রচারের মাধ্যমে যদি আমাদের ধর্ম জয়লাভ করে তবে তারা ইচ্ছা করলে এই ধর্মে দীক্ষা নেবে অন্যথায় তাদের মর্জিমত স্বাধীন ভাবে তাদের ধর্মমত নিয়ে বসবাস করবে, কোন রকম জোরজুলুম করা হবে না।

বোদায়েল কুরেশদের নিকট ফিরে গিয়ে রসুলুল্লাহর অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন এবং বললেন, হযরত মুহম্মদ স সত্যই হজ করতে এসেছেন, যুদ্ধ করতে নয়। তিনি অবিমিশ্রিত শান্তি চান। কিন্তু বোদায়েলের কোন কথায় কুরেশ প্রধানগণ কর্ণপাত করল না, প্রকারান্তরে বোদায়েলের কথাকে প্রলাপোক্তির মত তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভরে উড়িয়ে দিল। সেখানে ওরওয়া ইবনে মসউদ নামে জনৈক পণ্ডিতমনা তায়েফবাসী উপস্থিত ছিল সে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করল, তোমরা অনুমতি দিলে আমি স্বয়ং মুহম্মদের স কাছে যেতে পারি এবং তাকে আচ্ছা করে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে তার সত্যকার অভিপ্রায় কি জেনে আসতে পারি।

ওরওয়া চলে গেল হুদাইবিয়ায়। রসুলুল্লাহ স-এর নিকট উপস্থিত হয়ে সে অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল। সে বলল, দেখ মুহম্মদ স তুমি তোমার প্রিয় আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছ, তাদের হত্যা করে তোমার কি লাভ ? আর যদি তুমি পরাজিত হও তা হলে তোমার সঙ্গের এই ছোটলোকগুলি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে ত্যাগ করে পালিয়ে যাবে। ওরওয়ার কথাবার্তা ত এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ ছিলই, উপরন্তু আরবের সাধারণ প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সে বার বার রসুলুল্লাহ স-এর পবিত্র দাড়ি স্পর্শ করছিল। তার এই ধরণের কথাবার্তা ও ব্যবহারে সকলের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল, সাহাবাগণ ত ফেটে পড়ার মত অবস্থা। রসুলুল্লা স সম্মুখে না থাকলে তাঁরা ওরওয়াকে এখুনি টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবেন এমন ভাব। অন্যদের কথা বাদ দিলেও চিরশান্ত হযরত আবুবকর রা পর্যন্ত এমনই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন যে তিনি ওরওয়াকে শেষবারের মত সাবধান করে দিলেন। বললেন, সংযত হয়ে কথাবার্তা না বললে এবং শালীন আচরণ না করলে অসুভ

ফলাফলের জন্য সে যেন প্রস্তুত থাকে। সে যেন মনে রাখে, সে আল্লাহর রসূলের সামনে বসে কথা বলছে।

ধৈর্যের প্রশান্ত মূর্তি রসূলুল্লাহর মধ্যে কেবল কোন ক্ষোভ নেই, নেই কোন উত্তেজনা। এক অপার্থিব শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সদা প্রশান্তময়। তিনি সকলকে শান্ত করে এই অশুভ পরিস্থিতিতে পূর্ণচ্ছেদ টেনে প্রসঙ্গান্তরে গমন করলেন। ওরওয়া সেই পবিত্র মজলিশে আরো কিছুক্ষণ বসে থাকলেন চুপচাপ। সাহাবাবৃন্দ পরিবৃত হয়ে বসে আছেন রসূলুল্লাহ, একজন নেতার প্রতি তাঁর ভক্তবৃন্দের যে কী গভীর শ্রদ্ধা ও অবিচল নিষ্ঠা থাকতে পারে তা যেন নতুন করে প্রত্যক্ষ করল ওরওয়া। যাঁর একটি মাত্র ইংগিতেই হাজার হাজার ভক্ত অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত, যাঁর প্রতি সামান্য অবজ্ঞা সূচক কথাবার্তা ভক্তবৃন্দের কাছে অসহ্য—ভক্তির সেই গভীরতা আর অপরিসীম আনুগত্য লক্ষ্য করে ওরওয়া একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে ফিরে এসে কুরেশদের বলল যে সত্যই মুহম্মদ স যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছেন হজ করতে। আর শতকণ্ঠে ব্যক্ত করল নবীজীর প্রতি সাহাবাদের সুগভীর আনুগত্যের কথা। বলল, আমি বহু সম্রাটের সভায় উপস্থিত হয়েছি, কায়সারের প্রাসাদে ও নাজ্জাসীর দরবারেও হাজির থেকেছি কিন্তু হুদাইবিয়ার মুক্ত প্রান্তরে মুহম্মদের প্রতি তাঁর শিষ্যদের যে অপরিসীম অনুরাগ, সুগভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম আনুগত্য দেখে এসেছি পৃথিবীতে তার কোথাও কোন তুলনা নেই। তাছাড়া মুহম্মদ স যে প্রস্তাব দিয়েছে তা খুবই সঙ্গত, যুদ্ধ করা কোন অবস্থায় উচিত হবে না। আর মুহম্মদ স সত্যই হজ করতে এসেছেন, যুদ্ধের সরঞ্জাম তাঁর কাছে নেই।

এরপর এল বেদওয়া গোত্রের দলপতি। রসূলুল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং কুরবানীর উট দেখে সে উপলব্ধি করল যে মুহম্মদ স সত্যই হজ করতে এসেছেন, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাঁর মধ্যে নেই। এরপর একে একে আরো বহু আরব গোত্রের দলপতিরা এল হযরত মুহম্মদের স কাছে। রসূলুল্লাহর মধুর ব্যবহার, বিনীত

কথাবার্তা আর অমায়িক আচরণে সকলে কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হল। যারা ইতিপূর্বে কোনদিন রসূলুল্লাহকে দেখেনি, কেবল কুরেশদের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছিল তারা এখন সরাসরি মিশতে পেরে নবীর অপরিসীম চরিত্র মাধুরীর কিছুটা উপলব্ধি করতে পারল, তাদের মন থেকে ঘৃণা বিদ্বেষ হিংসার ভাব দূর হতে লাগল। তারা ভাবতে শুরু করল, এমন মানুষের সঙ্গেও কেউ শত্রুতা করে !

যে সব গোত্রপ্রধানেরা কুরেশদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল তারা নিজেরা বলাবলি শুরু করল, আল্লাহর ঘর কাবায় কারও হজ বন্ধ করা উচিত নয়, কুরবানী করতে না দেওয়াও অন্যায়। এমন সময় এক ঘটনা ঘটল। খেরাশ নামক রসূলুল্লাহর এক দূত সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে মক্কায় কুরেশদের নিকট এল এবং কুরেশরা যাতে অবিশ্বাস না করে তার জন্যে হযরত স্বয়ং তাঁর উটে খেরাশকে সওয়ার করে পাঠিয়েছিলেন কিন্তু কুরেশরা রসূল স-এর উটটিকে হত্যা করে খেরাশকে বন্দী করে রাখল। কেবল বন্দী নয় খেরাশকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র শুরু হতেই মিত্র ভাবাপন্ন গোত্রগুলি এই অন্যায় আচরণে কুরেশদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কুরেশরা খেরাশকে মুক্তি দিল।

এই সময় কুরেশ সৈন্যদের একটি অগ্রবর্তীদল. মুসলমানদের হত্যা করতে এসে মুসলমানদের হাতেই বন্দী হয়। এই শত্রু বন্দীদের হত্যা করায় কোন দোষ বা অপরাধ ছিল না। কিন্তু রসূলুল্লাহ স প্রথম থেকেই শান্তি কামনা করে আসছিলেন, তিনি সংঘর্ষের পথ পরিত্যাগ করলেন, সমুদয় বন্দীদের বিনা সর্তে মুক্তি দিলেন।

শত্রুদের সীমাহীন কুটিল বিষাক্ত আচরণের মধ্যেও রসূলুল্লাহর এই ত্যাগ, এই ক্ষমা বিভিন্ন গোত্রাধিপতিদের মনে নতুন আলো জেলে দিল।

দিন যায়। হজের মৌসুম আগতপ্রায়। রসূলুল্লাহ স আর স্থির থাকতে পারেন না। সন্ধির ব্যাপারে ক্রমেই বিলম্ব হচ্ছে দেখে

নবীজী আপন প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ শিষ্য হযরত উসমান রা-কে মক্কায় কুরেশদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত উসমান রা তাঁর সাধ্যমত সব কিছু কুরেশদের বুঝিয়ে বললেন কিন্তু শয়তানের দল সেসব কথায় কর্ণপাত করার পরিবর্তে তাঁকে আটক করে রাখল। এদিকে সম্ভাব্য সময় উত্তীর্ণ হবার পরও হযরত উসমান রা প্রত্যাবর্তন করছেন না দেখে সকলেই ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন, এমন সময় সংবাদ এল যে কুরেশরা উসমান রা-কে হত্যা করেছে। কুরেশদের পূর্বাপর সকল আচরণের সঙ্গে এই সংবাদ অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিল, সুতরাং এ কথা সকলেই বিশ্বাস করলেন। প্রিয় সাহাবার মৃত্যুসংবাদে রসূলুল্লাহ স ভীষণভাবে বিচলিত ও ব্যথিত হলেন। অন্যান্য মুসলমানেরাও এটিকে ধিক্কার এবং প্রচন্ড অপমান হিসেবে চিহ্নিত করলেন। এ ত উসমান রা হত্যা নয়, এটি প্রকারান্তরে সত্য হত্যা এবং মুসলমানদের পরাজয়ের সামিল। সুতরাং সকলে ভীষণভাবে উত্তেজিত এবং নিদারুণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু হয়ে উঠলেন। একটি বাবলা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ স ঘোষণা করলেনঃ আল্লাহর জন্য সত্যের জন্য আমরা জীবন দেব। মিথ্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। জীবনপণ আমরা কিসাস অর্থাৎ অন্যায়ভাবে উসমান-হত্যার বদলা নেব। সেই চৌদ্দ শো নিরস্ত্র মুসলমান সেই বৃক্ষ তলায় একে একে রসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে জীবনপণ করে নির্ভীকভাবে আসন্ন যুদ্ধের শপথ নিলেন। ইসলামের জন্য, আমরা জীবন দেব—পিছু হটব না।

অটল বিশ্বাসের কি অপার মহিমা! মুহূর্তে দীপ্ত ঈমানের অপূর্ব ঝলক সমগ্র মরুপ্রান্তরকে এক অপার্থিব ঐশ্বর্যে ভরিয়ে দিল। প্রকৃত পক্ষে এই ত হজ। কুরবানীর জন্যে আনা উটগুলি বাঁধা রইল। পঞ্চ রিপুকে মুসলমানেরা আল্লাহর রাহে কুরবানী দিলেন প্রথমে, তারপর অবশিষ্ট রইল তাঁদের প্রাণ, নিজেদের কাছে যা সর্বাপেক্ষ প্রিয়, আল্লাহর রাহে তা উৎসর্গ করার জন্যে সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। অসংখ্য শত্রুর

মাঝে আত্মবলিদানের জন্য এই যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্তুতি এই তো সত্যকার হজের প্রস্তুতি, আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি। প্রত্যেক হজযাত্রী হাজিই তালবিয়া পড়েন, লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, প্রভু আমি হাজির, আপনার সমীপে গোলাম হাজির, অর্থাৎ আমার জীবন মরণ আপনার জন্যে, আমি আপনাতেই সমর্পিত—একথা ত হাজি সাহেবগণ মুখে বলেন কিন্তু কজন হাজি জীবন উৎসর্গ করার জন্যে এভাবে নিঃশঙ্কচিত্তে আল্লাহর দরবারে হাজির হন ? প্রভুর আহ্বান যখন এসেছিল বিনীত ইবরাহিম আ আপন পুত্রকে আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননি। আজ হুদাইবিয়ার প্রান্তরে বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে দেড় হাজার হজতীর্থযাত্রী, অসীম সাহসী মুসলমান নিজের জীবন উৎসর্গ করে বিনম্র অথচ নির্ভীক কণ্ঠে উচ্চারণ করলেনঃ লাব্বায়েক, প্রভু হে আমরা হাজির, কর্তব্যের আহ্বান যখন এসেছে আমাদের জীবন আপনাকে সমর্পিত করে আমরা ধন্য হব, কৃতার্থ হব—আমরা আপনারই।

যথাসময়ে ঈমানের অটল এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথা কুরেশদের কানে গেল। মুসলমানদের কথা ও কাজে যে কোন ফারাক নেই একথা কুরেশরা ভালভাবেই জানত। স্বাভাবিক কারণেই তারা ভীত হয়ে পড়ল। তা ছাড়া খেরাশকে বন্দী এবং হযরত উসমান রা-কে আটক করায় মিত্র ভাবাপন্ন গোত্র দলপতিগণ তাদের উপর সত্যসত্যই ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা কিছুতেই এই অন্যায়কে সমর্থন করতে পারল না। এমন কি, তারা এমন কথাও বলল যে, কুরেশদের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা চলে যাবে। কুরেশরা প্রমাদ গণল !

বৃক্ষতলে প্রতিজ্ঞা নেওয়া শেষ হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞা 'বাইআতে রেজওয়ান' নামে কোরআন শরীফে স্বয়ং আল্লাহ সুরা 'ফাৎহ'তে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসে এই শপথ খ্যাত হয়েছে 'বয়ে আতে শজারা' বা 'বৃক্ষতলের শপথ' নামে। শপথের পর মুসলমানেরা ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে আসন্ন যুদ্ধের জন্য সর্বস্বপণ করে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় ফিরে এলেন হযরত উসমান রা।

মুসলমান শিবিরে স্বস্তি ফিরে এল।

হযরত উসমান রা বললেন যে, কুরেশরা প্রস্তাব দিয়েছিল ইচ্ছে করলে আমি নিজে কাবা শরীফ তওয়াফ করতে পারি কিন্তু রসূলুল্লাহ স-কে তারা কিছুতেই সেখানে প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের এ প্রস্তাব আমি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছি। আর এই প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলেই তারা আমায় আটক করেছিল।

একদিকে মুসলমানদের শপথ, তেজ ও বাহুবল অন্যদিকে সহানুভূতি সম্পন্ন গোত্রদের বিরূপতা—সব মিলিয়ে কুরেশরা প্রায় ভগ্ন মনোরথ। তারা শেষ পর্যন্ত সন্ধিকার্য সম্পন্ন করার জন্যে সোহায়েল নামক এক তর্কপরায়ণ ধূর্ত ও কূট ব্যক্তিকে হযরতের সন্নিকটে প্রেরণ করল।

অনেক তর্কবিতর্ক আর শলাপরামর্শের পর সন্ধির যে শর্তগুলি ঠিক হল তা মুসলমানদের জন্য আদৌ কোন গৌরবের ছিল না, আপাতঃ দৃষ্টিতে তা হীনতাজনক এবং এমনও মনে হতে পারে মুসলমানেরা পরাজিত আর নতজানু হয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষার্থে এই আরোপিত হীন শর্তগুলি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সন্ধির প্রথম শর্তই হল, এবারে কেউ মক্কায় গিয়ে হজ করতে পারবে না—এখান থেকেই সকলকে ফিরে যেতে হবে। কেননা মক্কায় গিয়ে হজ করলে সকলেই বলবে কুরেশদের উপেক্ষা ও জোর করে মুহম্মদ স হজ সম্পন্ন করে গেছেন, তাতে সকল কুরেশের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

সন্ধির অন্যান্য শর্তগুলিও ঠিক একই প্রকারে মুসলমানদের নিদারুণ মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। কোন মুসলমানই এগুলি ঠিক মত মেনে নিতে পারছিলেন না। এই নিয়ে সকলের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হল, গুঞ্জন কিছুটা বিক্ষোভের রূপ নিল, এই শর্তগুলি মেনে নেওয়া তো আত্মহত্যার নামান্তর। কিন্তু সকলকে চকিত করে রসূলুল্লাহ স ঘোষণা করলেন, আজ শান্তির জন্য আত্মীয়তার দাবীতে কুরেশরা আমার কাছে যা চাইবে তা মেনে নেব।

প্রকৃতপক্ষে রসূলুল্লাহ স মনেপ্রাণে হিংসা সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পথ পরিহার করে চলছিলেন।

হযরত আলি রা-র উপর সন্ধি পত্রটির রচনার ভার অর্পিত হল। আলি লিখতে শুরু করলেন, বিসমিল্লাহ হেররহ্মা নেররাহিম—পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে। সোয়াহেল আপত্তি তুলে বলল, তোমাদের আল্লাহকে জানি কিন্তু করুণাময়টি আবার কি পদার্থ। ওসব চলবে না। শুধু লিখে দাও, আল্লাহর নামে। আলি তাই লিখলেন। পরের বাক্যে লিখলেন, আল্লাহর রসুল মুহম্মদ স-এর পক্ষ হতে কুরেশদের সঙ্গে সন্ধিপত্র...বাক্য শেষ হতে না হতেই সোহায়েল চিৎকার করে উঠল, মুহম্মদকে আল্লাহর রসুল বলা চলবে না, এ আমরা স্বীকার করি না। আর এ যদি আমরা মেনেই নেব তা হলে এত বাদ বিসম্বাদ কিসের। ঐ বাক্যটি কেটে লেখ আবদুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ। সব শুনে রসুলুল্লাহ স স্মিত হাসলেন। বললেন, আমি আল্লাহর রসুল এও যেমন সত্য, আমি আবদুল্লাহর পুত্র এও তেমনি সত্য। সুতরাং মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ কেটে মুহম্মদ বিন আবদুল্লাহ লিখে দাও। বিনীত কণ্ঠে আলি বললেন, হুজুর আমি নিজ হাতে ঐ শব্দটি কিছুতেই কাটতে পারব না। তখন রসুলুল্লাহ স বললেন, আচ্ছা আমাকে শব্দটি দেখিয়ে দাও—কেটে দিচ্ছি। রসুলুল্লাহ স নিজ হাতে শব্দটি কেটে দিলেন।

এখানে একটি কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঃ কোরআন শরীফে বহু স্থলে রসুলুল্লাহকে নিরক্ষর বলা হয়েছে, অর্থাৎ তিনি লিখতে ও পড়তে জানতেন না। তিনি যে পড়তে জানতেন না উপরের এই ঘটনাটি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। রসুলুল্লাহর লিখিত পত্র বলে যেসব পত্র এখন পাওয়া যায় সেগুলিও অন্য কেউ লিখেছেন, নিচে শীল মোহরটুকু রসুলুল্লার।

তারপর সন্ধির শর্তগুলি লেখা হল পরপর ঃ

১. মুসলমানগণ এবার হজ না করে হুদাইবিয়া থেকে মদিনায় ফিরে যাবেন।

২. আগামী বছর হজ করতে আসবেন কিন্তু তিন দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করবেন না।

৩. একজন পথিকের আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু অস্ত্রের প্রয়োজন, মুসলমানেরা তাই সঙ্গে আনবেন কিন্তু তা থলির মধ্যে আবদ্ধ করে আনতে হবে।

৪. মক্কায় যেসব মুসলমান আছে তিনি তাদের মদিনায় নিয়ে যেতে পারবেন না বরং তাঁর সঙ্গীরা যদি কেউ মক্কায় থেকে যেতে চান তিনি বারণ করতে পারবেন না।

৫. মদিনার কোন লোক কুরেশদের মধ্যে ফিরে এলে কুরেশরা তাকে মুহম্মদের কাছে ফিরিয়ে দেবে না কিন্তু মক্কায় কোন মুসলমান বা অমুসলমান (পুরুষ) মুসলমানদের নিকট গেলে তারা তাকে কুরেশদের নিকট ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।

৬. এরপর আর কোন পক্ষ শত্রুতাচরণ করবে না।

৭. দশ বছরের মত পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদি বন্ধ থাকবে। আরবের বিভিন্ন গোত্র নিজেদের ইচ্ছামত যে কোন পক্ষের সঙ্গে স্বাধীনভাবে মিত্রতা স্থাপন করতে পারবে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে সন্ধির প্রতিটি শর্তই মুসলমানদের জন্য অপমানজনক। এই হতাশাব্যঞ্জক শর্তগুলি নিয়ে যখন প্রতিটি মুসলমান অভিমান ও উত্তেজনায় স্ফীত ঠিক সেই মুহূর্তে সোহায়েলের পুত্র আবু জন্দল শৃংখল বেষ্টিত হয়ে রসুলুল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হল। সে মুসলমান হওয়ায় কুরেশরা তাকে বন্দী করে তার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে। সর্বাঙ্গে ক্ষত চিহ্ন। আজ সে সুযোগ বুঝে কুরেশদের প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে হুদাইবিয়ায় চলে এসেছে মুক্তির আশায়। অনেকে মনে করেন, সন্ধির সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হয় কিনা তা পরখ করার জন্যই ধূর্ত কুরেশরা আবু জন্দলকে পালিয়ে আসার সুযোগ করে দিয়েছিল। যা হোক, আবু জন্দলের করুণ অবস্থা দেখে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য পড়ে গেল। স্বয়ং রসুলুল্লাহ স সোহায়েলকে বার বার আবু জন্দলের দাবী ত্যাগ করার এবং তাঁদের সঙ্গে তাকে মদিনায় যেতে দেবার অনুরোধ জানালেন, কিন্তু পাষাণ সোহায়েল নির্বিকার, সে কিছুতেই কোন দাবী গ্রাহ্য করল

না বরং চিৎকার করে রসূলুল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিল, চুক্তি অনুযায়ী এখনই আবু জন্দলকে মক্কায় ফিরিয়ে দাও। অগত্যা, নিরুপায় হয়ে রসূলুল্লাহ স তাই করলেন। আবু জন্দলকে বললেন, যে চুক্তি এখনই সম্পাদিত হয়েছে তা ভাঙতে পারি না। চুক্তি পালন এবং অঙ্গীকার রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের পবিত্র কর্তব্য। তুমি মক্কায় ফিরে গিয়ে ধৈর্য ধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য একটি উপায় স্থির করবেন।

আবু জন্দল বার বার তার ক্ষত চিহ্নগুলি দেখাল। মক্কায় গেলে তার উপর যে কি পরিমাণ পাশবিক নির্যাতন শুরু হবে তা সকলেই অনুমান করতে পারলেন। এমনও হতে পারে সেই অত্যাচারে তার মৃত্যু ঘটে যাবে। ফিরে যেতে যেতে আবু জন্দলের করুণ আর্তনাদ হুদাইবিয়ার আকাশ বাতাসকে ব্যথাতুর করে তুলল, মুসলমানেরা নীরবে দাঁড়িয়ে বিশ্বের এই করুণতম দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন, তাঁদের সকলের চোখ সজল হয়ে এল। সকলেই বিচলিত, উত্তেজিত কিছুটা বিক্ষুব্ধও। হীন শর্তগুলির জন্যে সকলে এমনই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন যে এই নির্মম ব্যাপারটিতে কারো কারো ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। হযরত উমর রা জীবনে যা কোনদিন করেন নি তাই করলেন, তিনি উত্তেজিত স্বরে রসূলুল্লাহর সঙ্গে তর্কবিতর্ক শুরু করে দিলেন এবং এই চুক্তির বিরুদ্ধে প্রকারান্তে প্রতিবাদ জানালেন। রসূলুল্লাহ স সকলকে শান্ত করে বললেন, হয়ত এই চুক্তিতে আল্লাহ আমাদের সাফল্য দেবেন। তারপর তিনি হুদাইবিয়াতেই সকলকে কুরবানী ও হজের অন্যান্য ক্রিয়া সম্পাদন করতে বললেন কিন্তু একমাত্র হযরত আবুবকর ছাড়া অন্যান্য সকলে মনে মনে এমনই একটা অশোভন মানসিকতার শিকার হয়েছিলেন যে সেই মুহূর্তে কেউ তাঁর সেই পবিত্র আদেশের উপর গুরুত্ব দিলেন না। তখন রসূলুল্লাহ স নিজে উঠে তাঁর উট কুরবানী করলেন এবং পরে মস্তক মুণ্ডন সমাপ্ত করতেই অন্যান্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন।

কুরেশদের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহ স চরম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সাহাবীদের অনুযোগ ও প্রতিবাদের বিরুদ্ধেও তিনি

যে অপরিসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্তই খুঁজে পাওয়া যায় না। মহানবীর সারাটা জীবনই যেন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার এক অখণ্ড পরীক্ষাগার। আল্লাহ বার বার তাঁর প্রিয় দোস্তকে বিপদে আঘাতে নিষ্ঠুর পীড়নে নির্মমভাবে পরীক্ষা করেছেন।

সন্ধি সম্পন্ন হবার তৃতীয় দিনে রসূলুল্লাহ স সঙ্গীদের নিয়ে মদিনার পথে অগ্রসর হলেন। পথিমধ্যে আল্লাহর বাণী নিয়ে এলেন জিবরাইল আ, অবতীর্ণ হল এই আয়াত ঃ "ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাতহান্ মুবীন" অর্থাৎ (হে মুহম্মদ) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে সরাসরি মহাবিজয় বা স্পষ্ট বিজয় প্রদান করলাম। "নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"— আল্-কোরআনের এ বাণী আবার সত্য প্রমানিত হল। এই পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হবার পর মনক্ষুণ্ণ ও অবসন্ন মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের এক মহা উৎসব শুরু হয়ে গেল, হতাশব্যঞ্জক মুখমণ্ডলে ফুটল পুষ্পের হাসি। সকলেই আপন আপন অশিষ্ট আচরণের জন্য রসূলুল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। হযরত উমর রা তাঁর অশালীন আচরণের জন্য সারা জীবন কেঁদেছেন, অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছেন, ক্ষমা চাওয়ার পরও কাফফারা স্বরূপ বহু ক্রীতদাসের মুক্তি দিয়েছেন, দান করেছেন, নামায পড়েছেন।

সামান্য উত্তেজনার বশে, চলার পথে, আমরাও এমন ভাবে কত না কঠিন পাপে লিপ্ত হয়ে যাই, নিমগ্ন হই!

মদিনায় পৌঁছানোর অল্পদিন পর ওৎবা নামক এক ব্যক্তি মক্কা থেকে পালিয়ে এসে রসূলুল্লাহ স-এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, কিন্তু হযরত তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন, আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করতে পারি না—সন্ধির শর্তানুযায়ী আমি তোমাকে কিছুতেই আশ্রয় দেব না। ইতিমধ্যে মক্কা থেকে দুজন লোক এসে হাজির হল ওৎবাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তাদের সঙ্গে ফিরে যেতেই হল ওৎবাকে। কিন্তু মাঝপথে ওৎবা কৌশলে তাদের তরবারি হস্তগত করে একজনকে হত্যা করল আর অন্যজন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। ওৎবা

আবার ফিরে এল রসূলুল্লাহর কাছে, ফিরে এসে আশ্রয় চাইল। কিন্তু রসূলুল্লাহ স তার এ কাজকে কিছুতেই সমর্থন করলেন না। ওৎবা বুঝল যে মক্কা থেকে আবার লোক আসবে তাকে ধরে নিয়ে যেতে এবং এবার আর কোন কৌশল খাটবে না। সে রাতের অন্ধকারে মক্কা থেকে পালিয়ে মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী ঈস নামক অপেক্ষাকৃত এক নিরাপদ স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করল। ওৎবার কথা চারদিকে প্রচার হয়ে যেতেই মক্কায় যত উৎপীড়িত আর নির্যাতীত মুসলমান ছিল সকলে দলে দলে 'মাকামে ঈস' এ এসে ওৎবার সঙ্গে একত্রিত হল। কিন্তু সমবেত হলেই চলে না জীবিকার একটা নির্দিষ্ট উপায় থাকা চাই। তারা সমবেত ভাবে এক উপায় বার করল। যেসব কুরেশ মালমাত্তা নিয়ে বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কা থেকে সিরিয়ায় যেত, ঐ সব অত্যাচারিত মুসলমানেরা তাদের লুটপাট শুরু করল, শেষে অবস্থা এমন ঘোরাল হয়ে দাঁড়াল যে কুরেশদের পক্ষে বাণিজ্যগমন অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন তারা নিজেরাই মদিনায় গিয়ে রসূলুল্লাহকে ধরে সন্ধিপত্রের পঞ্চম ধারাটি বাতিল করিয়ে আনল। এখন আর কোন কুরেশের পক্ষে মদিনায় এসে রসূলুল্লাহর সান্নিধ্যলাভ গ্রহণে এতটুকুও বাধা রইল না।

এই চুক্তির লাভগুলি দেখে নেওয়া যেতে পারে।

১. এই সন্ধিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমেই কুরেশরা রসূলুল্লাহর শক্তি সামর্থ্যকে সর্ব প্রথম স্বীকার করে নিল। তারা বুঝল, এই অজেয় শক্তিকে আর কোন মতেই অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না।

২. কুরেশদের মিত্রশক্তিগুলি উপলব্ধি করল—হযরত মুহম্মদকে জিদের বশে হজ করতে না দিয়ে কুরেশরা মহা অন্যায় করেছে।

৩. মিত্র গোত্রগুলির অধিকাংশের অনুরোধ ও পরামর্শ কুরেশরা অহেতুকভাবে উপেক্ষা করেছে, এতে ঐ গোত্রগুলি মনের দিক দিয়ে রসূলুল্লাহ স-এর অনেক কাছাকাছি এসে গেল।

৪. সকলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করল হযরত মুহম্মদ স সম্পর্কে কুরেশরা যে নিন্দাবাদ প্রচার করে তা একেবারেই মিথ্যা,

প্রকৃতপক্ষে এই মহৎ মানুষটি মনেপ্রাণে শান্তিতে বিশ্বাসী। যুদ্ধবিগ্রহ চাইলে কেউ এমন শর্তগুলি নির্দ্বিধায় মেনে নিতে পারেন না।

৫. হযরতের মধুর ব্যবহার ও উন্নত চরিত্র সকলকে মুগ্ধ করল।

৬. চুক্তি বলে মুসলমানগণ নানা কর্মোপলক্ষে হেজাজ প্রদেশে মক্কা এবং অন্যান্য লোকালয়ে যাতায়াত শুরু করলেন। তাঁরা আন্তরিকতার সঙ্গে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশলেন, তাদের রোগে পথ্য দিলেন, শোকে সান্ত্বনা দিলেন, নিরন্নকে আহার দিলেন, আর্তকে সেবা করলেন, বস্ত্রহীনকে কাপড় দিলেন, মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাখ্যা প্রচার করলেন। বললেন, মিথ্যা কথা বলো না, ব্যাভিচার করো না, সুদ খেয়ো না, খুন-জখম করো না, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা কর, গুরুজনদের ভক্তি কর, পুতুল কখনো দেবতা হতে পারে না, এক আল্লাহর আরাধনা কর। মুসলমানেরা নিজেরাও সৎ আর তাঁরা প্রচার করলেন এই সব মহৎ উপদেশ। পাপে বিপর্যস্থ হানাহানিতে জর্জরিত মানুষেরা এই প্রথম যেন শান্তির স্পর্শ পেল, ব্যাপকভাবে সত্যকার আলোকের মুখোমুখি হল তারা। প্রদীপ জ্বলে উঠলেই অন্ধকার দূর হয়। সত্যধর্মে দীক্ষার জন্যে মানুষের মনে এক প্রবল ব্যাকুলতা দেখা দিল। প্রভাতসূর্যের নবীন আলোকে অকস্মাৎ সব যেন আলোকিত হয়ে গেল।

তাই, সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের দু বছরের মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যায় অশ্চর্যরকম ভাবে বেড়ে, একেবারে দ্বিগুণ হয়ে গেল। এই ভাবে, মহান আল্লাহ আপাতহীনতাজনক শর্তগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর রসুলকে 'ফতহুম মুবীন'—মহাবিজয় দান করলেন।

শোমায়ছিয়ার বৃক্ষতলে ইসলাম যেন নবজীবন লাভ করল। সেই ঐতিহাসিক পবিত্র বৃক্ষটি এখন আর নেই, এখন সেখানে এক সুন্দর মসজিদ গড়ে উঠেছে। পথের পাশেই এই মসজিদ। এ মসজিদে দু রাকাত নামায পড়া জরুরী। কিন্তু অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। আমাদের পক্ষেও সম্ভব হল না, যদিও আমার স্ত্রী স্থানটি পরিদর্শন এবং নামায পড়ার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন।

কেননা যে ড্রাইভার আমাদের বাসটি চালাচ্ছিলেন শোমায়ছিয়ার নিয়ে তাঁর কোন ধারণা ও মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হল না। যেমন ঝড়ের গতিতে বাস চলছিল তেমনি ঝড়ের গতিতে বাস চলতেই থাকল, হুদায়বিয়ায় এল এবং মুহূর্তে তা অতিক্রম করে চলেও গেল। ড্রাইভার তো দূরের কথা, বাস ভর্তি কোন হাজি সাহেবকেও আমি এই বহু বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানটি নিয়ে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করতে দেখলাম না। কেউ নিশ্চুপ, কেউ গল্পগুজবে মাতোয়ারা, কেউ বা তন্দ্রাচ্ছন্ন।

আমরা পবিত্র হুদাইবিয়া অতিক্রম করে চলে গেলাম. পিছনে পড়ে থাকল অতীত দিনের এক বেদনাবিধুর স্মৃতি, আর এক বিপুল ইতিহাস !

বাস অতিদ্রুত এগিয়ে চলল কাবার পথে।

৮

সেই সুন্দর রাজপথ, সেই অতি আধুনিক অভিজাত গাড়ির সারি, আর সেই অবিরাম পাহাড়ের মিছিল অতিক্রম করে আমাদের যাত্রীবোঝাই যানটি দ্রুত এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের পর পাহাড়— মাঝে মাঝে মনে হয় আর বোধ হয় সমতল ভূমি দেখা যাবে না। সূর্য এখন চূড়োর ওপাশে অনেকটা নেমে গেছে, অনেকখানি এলাকা জুড়ে আকাশটা অদ্ভুত লাল হয়ে আছে, যেন দিগন্ত প্রসারিত সোলেমানপুরের মাঠের ওপাশের অতিকায় বটগাছের ঘন আড়ালে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মগরিবের আর বেশি দেরী নেই।

মাঝে মাঝেই আমি এক একটি দামী গাড়ির অদ্ভুত স্তূপ লক্ষ্য করছিলাম। রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক এক জায়গায় দেখলাম প্রায় তিন-চার শো করে বিলাসবহুল ঝকমকানো গাড়ি দাঁড় করান রয়েছে। প্রথমে এই রকম একটি স্তূপ দেখে আমার মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই এ গাড়িগুলি সদ্য বিদেশ থেকে আমদানী করে এখানে জমা করা হয়েছে, তারপর প্রয়োজন মত গন্তব্যে চলে যাবে। কিন্তু চার-পাঁচ কিলোমিটার ব্যবধানে এ রকম এক একটি স্তূপ চোখে পড়াতে কেমন যেন সন্দেহ হল। একটি স্তূপে দেখলাম কিছু ভাঙাচোরা গাড়িও রয়েছে। কিন্তু বার আনা গাড়ি দেখে নতুনই মনে হবে, চারটি চাকায় হাওয়া ভরা—সুতরাং টায়ার টিউব ঠিক অছে, রিং রূপোর মত ঝকঝক করছে, রঙে যথেষ্ট ঔজ্জ্বল্য রয়েছে, ভিতরে সিট তেমনি কার্পেট আর ফারে মোড়া— অথচ এ গাড়িগুলো অকেজো, শেখেদের বাহনের অনুপযুক্ত। আসলে সারা সৌদি আরবে মটর রিপেয়ারের কোন কারখানা বা গ্যারেজ নেই, ফলে কোন পার্টস খারাপ হলে বা গাড়িতে জটিল কিছু বিভ্রান্তি দেখা দিলে অনর্থক তার পিছনে কোন বাড়তি উদ্বেগ-চিন্তা-মাথা খরচ না করে অতি বিত্তবান ধনকুবের মাথা-গরম শেখেরা সেই গাড়িটিকে শহর থেকে দূরে ওয়েস্ট ল্যান্ডের এই রকম যে কোন একটা স্তূপে ফেলে দিয়ে যায়। অর্থাৎ চলন্ত গাড়িটা আজ থেকে চিরদিনের মত অচল হয়ে গেল। আমাদের দেশে এ রকম একটি

বাতিল গাড়ি অন্ততঃ আরো একটি পুরুষকে বছর ত্রিশ-চল্লিশ ধরে রাজকীয়ভাবে সংবর্ধনা জানিয়ে যাবে। যন্ত্রাংশে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াও এ রকমভাবে গাড়ি বাতিল করার আরো একটি নেপথ্য কারণ হল নিত্যনতুন মডেলের প্রতি শেখেদের দুর্নিবার আকর্ষণ। গাড়ি হয় তো সামান্য একটু বিগড়েছে, কিন্তু নতুন মডেল দেখে তার থেকে বেশি বিগড়েছে শেখেদের মাথা। সামান্য আহত হওয়া গাড়িটি তাই চিরকালের জন্য প্রাণ হারাল।

আমেরিকায় এবং ইংল্যান্ডে শুনেছি এ রকম ওয়েষ্ট ল্যান্ড আছে কিন্তু সেখানে একেবারে রদ্দি জিনিস ছাড়া আর কিছুই পড়ে থাকে না, পার্টসগুলি খুলে নিয়ে গালাইতে দিয়ে নতুন মডেলের যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়। সৌদি আরবে এ রকম কোন কারখানা না থাকায় কোটি কোটি রিয়ালের সম্পদ এমনিতর মাটিতে পড়েই বিনষ্ট হয়। আজকের ডাইরি থেকে কয়েকটি লাইন আমি তুলে দিচ্ছ: ''জেদ্দা থেকে মক্কার পথে কোথাও কোন চাষাবাদ দেখলাম না, কোন ফ্যাক্ট্রিও না, অথচ ঘরবাড়ি সব তৈরি হচ্ছে ব্যাপক হারে, কি ভাবে চলছে তার খোঁজ নেব মক্কায় গিয়ে।''

আকাশ শীর্ষেও আর রঙের কোন চিহ্ন নেই। দিগন্ত জোড়া পাহাড় কালো হয়ে উঠেছে। দিন কখন শেষ হয়ে গেছে খিয়ালই হয়নি। মাগরিবের ওয়াক্ত যায় যায়, বাসের মধ্যে সকলেই নামাযের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, বেশ একটু সোরগোলও পড়ে গেল। যে উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহয় ছুটে চলা, সেই নামাযই যদি কাজা হয়ে গেল! সমস্যা দাঁড়াল ড্রাইভারকে বাসটা থামাতে বলা, বাস থামলে যে কোন জায়গায় নামায পড়ে নেওয়া যায় কিন্তু ড্রাইভার আরবী ছাড়া অন্য ভাষার বিন্দুবিসর্গ বোঝেন না। সৌদি আরবের মাটিতে পা দিয়ে এই ভাষার ব্যবধানটাই মানুষের ভাবের আদানপ্রদানের বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একজন গিয়ে নিজস্ব ভাষায় চালককে বাস থামাবার কথা বললেন, কিন্তু চালক কি বুঝলেন তিনিই জানেন, থামানোর বদলে তিনি বাসের গতি অসম্ভব রকম বাড়িয়ে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত বাসের মধ্যে সকলে চুপ হয়ে গেলেন। তারপর

অধিকতর উচ্চকণ্ঠে সোরগোল শুরু করলেন আবার। অর্থাৎ নামাযের জন্য যেমন করেই হোক গাড়ি দাঁড় করাতে হবে। একজন চালকের পাশে গিয়ে নামাযের নিয়েত বাঁধার মত দুই হাত কানে ঠেকিয়ে তাকে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন সকলেই নামায পড়তে চায়, গাড়ি থামান।. চালক ব্যাপারটা বুঝলেন। এবং আমরাও উপলব্ধি করলাম ইশারাই মানুষের আদিম ভাষা, এ ভাষা সারা পৃথিবীতে সরব। সকল যাত্রীর নামায পড়ার আকুলতা যা এতক্ষণ ভাষা দিয়ে বোঝান যাচ্ছিল না, ইশারায় তা বোঝান গেল। এবং বুঝে নিয়ে চালক আঙুল বাড়িয়ে সামনের দিকে ইঙ্গিত করলেন, কিন্তু ওদিকে তাকিয়ে আমরা কিছুই উপলব্ধি করতে পারলাম না কেবল বিজলী বাতির আলোয় রাস্তা চিকচিক করছে দেখলাম। এমনি উদ্বেগ আর অস্বস্তির মধ্যে কয়েক মিনিট কাটানোর পর, সন্ধ্যা যখন রাতের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, একটি প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল জায়গায় এসে বাসটি থামল। সেখানে আরো অনেকগুলি বাস দাঁড়িয়েছিল, হাজি সাহেবগণ নেমে মাগরিবের নামায পড়ছেন। পানির ভাল ব্যবস্থা, প্রস্রাবাগারও আছে, আমরাও বাস থেকে দ্রুত নেমে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। মুহূর্তে সমস্ত মানসিক অস্বস্তি আর দ্বন্দ্ব দূর হয়ে গেল। আল্লাহর সমীপে দাঁড়াতে পেরে নিজেকে পরম কৃতার্থ মনে হল। নামায না পড়তে পারলে অনেক হাজি সাহেবের মনঃকষ্ট হয়ত প্রচন্ড মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দেখা দিত। আল্লাহ মেহেরবান, সেই মনঃকষ্ট থেকে তিনি আমাদের সকলকে মুক্তি দিলেন।

এখানে দেখলাম, মুয়াল্লিমের-লোকজন একটা বিরাট টেবিল জুড়ে, আমাদের পাশপোর্টগুলি নিয়ে গভীর গবেষণায় ব্যাপৃত। পাশপোর্ট দেখে নিশ্চয়ই এখানে কোন তথ্যের লেনদেন হচ্ছে, কিন্তু কি হচ্ছে তা আমরা কিছুই বুঝলাম না। তার প্রয়োজনও ছিল না। এখানে বিশাল একটি বিল্ডিং গড়ে তোলার ভিত স্থাপিত হয়েছে, পরবর্তীকালে জেদ্দা থেকে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশের পূর্বে হয়ত সকল বিদেশীর এখানে বিশেষ চেকিংএর ব্যবস্থা হবে। বুঝলাম আমরা মক্কানগরীর খুব কাছাকাছি এসে গেছি।

আমাদের বাসে এক হাজি সাহেব হাঁফানির টানে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু রোগের ক্রমাগত আক্রমণের প্রচণ্ডতায় বয়সের তুলনায় তিনি অনেক বেশি জীর্ণ রুগ্ন আর বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। আজ তিনি একেবারেই সোজা হয়ে বসতে পারছিলেন না, পিছনে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে মুখ করে হাঁপরের মত বুক-পাঁজরার হাড়গুলি ফুলিয়ে ফুলিয়ে দম টানছিলেন। গায়ে কোন বস্ত্র নেই. কিছুটা অজ্ঞান অবস্থা। তাঁর জন্যে বাসের সকল যাত্রীই বেদনাবোধ করছিলেন। সীটটা আমাদের কাছাকাছি হওয়ায় তাঁর বুকের ঘড় ঘড় শব্দ আর কাতরোক্তিগুলি সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের সমবেদনা জানানো ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তাঁর জন্যে কিছুটা ঠাণ্ডা পানি নিয়ে বাসে উঠে এলাম। কিছু পরে এলেন ড্রাইভার, উপর্যুপরি কয়েকবার হর্ণ দিতেই, যেসব তীর্থযাত্রী শিথিল হয়ে বাইরে ঘুরছিলেন, পড়িমরি করে ছুটে এসে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। ড্রাইভার একবার পিছন ফিরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ভিতরটা ভালভাবে দেখে নিলেন কোন সিট খালি আছে কিনা. তারপর সম্পূর্ণ যাত্রী ওঠা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে স্টার্ট দিলেন। মাঝে আর কোথাও কোন বিরতি নেই, একেবারে সেই পবিত্র গন্তব্যে গিয়ে স্থির হবে।

আবার বাস ছুটে চলেছে। চারদিকে আলোর মেলা। যানবাহনের ঘনত্ব বাড়ছে ক্রমে, বাড়ছে লোকজনের গমনাগমন. দুটি বাড়ির মধ্যকার ব্যবধান কমে আসছে দ্রুত—বুঝতেই পারছি আমরা শহরতলী অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে শহরের ঘনত্বের মধ্যে প্রবেশ করছি। মাঝে মাঝেই মসজিদ চোখে পড়ছে। জেদ্দা থেকে মক্কার পথে অনেকগুলি মসজিদ দেখলাম। বিরল প্রান্তরে সামান্য কয়েকঘর লোকের বসতি, অথচ দেখছি তাঁরা একটি মসজিদ তৈরি করে নিয়েছেন ঠিকই। আশ্চর্য সুন্দর সব মসজিদ, বাইরের রংগুলিতে এমনি একটা শোভন কোমলতা রয়েছে যা পবিত্রতার মধুর দ্যোতনায় অন্তরপ্লাবী শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। বোঝাই যায় জীবনের সংগে নামায এবং এবাদাৎকে এঁরা কিভাবে গ্রহণ করেছেন। এ দুয়ের মধ্যে কোন ফারাক নেই।

এ সব থেকেই একটি জাতির মানসিক গঠন ও পবিত্রতা উপলব্ধি করা যায় বিশেষ রূপে। আমাদের দেশের পত্র পত্রিকায় সৌদিবাসিদের উদ্দামতা ও উচ্ছৃংখলতার চিত্র অত্যন্ত উলঙ্গ করে তুলে ধরা হয় এবং এই সব পত্রপত্রিকা উপাদান সংগ্রহ করেন সৌদি থেকে যে সব আরব বোম্বাই শহরের বিভিন্ন হোটেলে আস্তানা গাড়েন তাঁদের নিকট থেকে। সৌদি আরবে কোন উচ্ছৃংখলা বা পাপ নেই এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিছু কিছু পাপ সর্বত্রই আছে কিন্তু মনে রাখা দরকার বোম্বাই হোটেলের সৌদিরা হলেন সৌদি আরবের আঁস্তাকুড়, সব থেকে জঘন্য চরিত্রের লোকগুলিই এখানে এসে আড্ডা জমায়, এরা আমদানি-রপ্তানীর কালো দুনিয়ার কালো মানুষ। এদের দিয়ে সৌদি আরবের বিচার চলে না।

সন্ধ্যা আটটার কাছাকাছি সময়ে আমরা পবিত্র মক্কা নগরীতে পেঁৗছে গেলাম। আল হামদোলিল্লাহ—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। যে রাজপথ দিয়ে আমাদের বাস চলেছে সেটি মক্কার খুবই অভিজাত এলাকা মনে হল, অবশ্য এইমাত্র বিশ্বের এই প্রাচীনতম শহরে প্রবেশ করলাম, এ মহানগর সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই। দু ধারে অসংখ্য বিরাট বিরাট বিলাসবহুল আধুনিক দোকান, তাদের আলোক সজ্জা দেখার মত। পণ্য সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে অত্যন্ত নিপুণভাবে। বিভিন্ন শ্রেণীর খরিদ্দার কেনাকাটা করছেন, বোরখা-ঢাকা বেগমদেরও দেখলাম ঘুরে ফিরে জিনিসপত্র পছন্দ করছেন। সুতরাং মক্কায় মেয়েরা বাইরে বেরোয় না এই রকম ভ্রান্ত ধারণা প্রথম ধাক্কাতেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। অবশ্যই কারো মধ্যে কোন উগ্রতা বা উচ্ছৃংখলতা নেই, সকলেই আবরুর মধ্যে সম্ভ্রান্ত আর অভিজাত, সুবাস বুকে নিয়ে কলিরা যেমন বাতাসে হিন্দোল জাগায় তেমনি মোহময়, স্বপ্নময়। এই পরিবেশে তাঁদের খুব ভাল লাগল। নিয়ন লাইটে দোকানের নাম ঝলমল করছে, কোথাও ইংরেজিতে, অধিকাংশই আরবীতে। আরবীর সাথে বর্তমানে ইংরেজিও কিছু কিছু চালু হচ্ছে দেখলাম। রাস্তা ঘাটের নাম-পরিচিতিতে আরবীর সঙ্গে সর্বত্রই ইংরেজির ব্যবহার চোখে পড়ল। হয়ত এটা

বিদেশীদের জন্য করতে হয়েছে। সৌদিরা এখনো ইংরেজি অনভিজ্ঞ।

যেতে যেতে বাস এক জায়গায় থামল, পাশেই এক মুয়াল্লিমের আস্তানা, সেখান থেকে দু জন লোক ছুটে এসে সেই মুয়াল্লিমের নাম ঘোষণা করলেন। আমাদের বাস থেকে কয়েকজন যাত্রী তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। অর্থাৎ এঁরা এই মুয়াল্লিমের জিম্মাদারীতে পবিত্র হজব্রত সম্পন্ন করবেন। এঁদের পাশপোর্টও মুয়াল্লিমের কাছে জমা হয়ে গেল। বাস একটু করে এগিয়ে যায় এবং এক একজন মুয়াল্লিমের আস্তানায় থেমে সেই মুয়াল্লিমের তালিকাভুক্ত যাত্রিদের নামিয়ে দেয়। এমনি করে বাস ক্রমান্বয়ে পবিত্রতম গৃহ বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে এগিয়ে চলল।

কোথায় কোন মুয়াল্লিমের ঘর তা জানা নেই, হঠাৎ আমাদের পালা কখন আসবে তা নিয়েও কিছুটা উদ্বেগ ছিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছিলাম আল্লাহর ঘর দর্শনের জন্য, যে বাঞ্ছিত ধনের প্রত্যাশায় সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, এত যন্ত্রণা ক্লেশ স্বীকার করে এখানে পাগলের মত ছুটে আসা কখন দেখব সেই পরম প্রিয়কে, সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রাণসম্পদকে ! ভিতরে ভিতরে প্রতি মুহূর্তে দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠছিলাম। সংগে সংগে বাড়ছিল উদ্বেগ, আকুলতা আর অনন্ত পিপাসা। অপরিসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলাম। হঠাৎ বাঁক ঘুরে এক মুয়াল্লিমের আস্তানায় দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম বেশ দূরে অনেক ঘরবাড়ির শীর্ষদেশ ছাড়িয়ে অনন্ত আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দুটি আলোকোজ্জ্বল মিনার, ঈষৎ নীলাভ অত্যুজ্জ্বল এক অপার্থিব আলোয় শোভিত দুটি মিনার। চোখে পড়ার সংগে সংগেই মন আপনা থেকেই বলে উঠল, এ ত সেই ! এ ত সেই !! এই ত সেই বহু বাঞ্ছিত আলোকিত গৃহের রূপের ঝিলিক। সংগে সংগেই বুকের ভিতরটা তোলপাড় হয়ে গেল। মুহূর্তে মহাপ্রলয় ! দেহ কোষের গভীরতম প্রদেশ সিক্ত করে এক অনাবিল আনন্দ, যা কখনই বর্ণনায় ধরা যাবে না, সিক্ত হতে হতে ভেসে উঠল। দেহ ভিজল, মন সিক্ত

হল, চোখে তখন অশ্রুর প্লাবন। সেই অসংখ্য জনতার মাঝে, সেই বাসে বসেই দেখলাম হাত দুটি কখন উঠে গেছে আল্লাহর দরবারে, শুকরিয়া ঘোষণা করছি গভীর আবেগে, আল্লাহ আপনিই আমাদের ডেকেছেন, আপনার মেহমান হয়ে আমরা এসেছি এখানে, ঐ ত পাওয়া যায় পবিত্রতম গৃহের ইশারা, আপনি তওফিক দিলে বায়তুল্লাহ শরীফের পবিত্র দর্শনের সৌভাগ্যও আমরা অর্জন করব। দেখলাম সেই অপরূপ মিনারের দিকে তাকিয়ে পাশে বসে আমার স্ত্রীও সমানে কাঁদছেন।

বাস এগিয়ে চলল। আরো দু-একজন মুয়াল্লিমের আস্তানায় আরো কিছু যাত্রীদের নামিয়ে এক সময় বাসটা একেবারে ঠিক হরম শরীফের সংলগ্ন রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এখানে থেকে মাত্র ত্রিশ-চল্লিশ হাত দূরে হরম শরীফের দেওয়াল, সাতটি আলোকোজ্জ্বল মিনার সহ পুরো হরম সুস্পষ্ট। যাত্রীরা সকলেই বাস থেকে ঝুঁকে পড়ে সেদিকে অসম্ভব আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন আর বিশ্বাস করুন সেই মুহূর্তে আমি প্রাণপণ শক্তিতে মুখটা জোর করে ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি বাসে বসে ছিন্ন ভিন্ন, অস্পষ্ট আর আংশিকভাবে প্রথম দর্শনে হরম শরীফ সহ বায়তুল্লাহকে দেখতে চাই নি। কেন জানি না, এ ভাবে তাড়াহুড়া আর অতি ব্যস্ততার মধ্যে এই পবিত্র গৃহ দেখতে আমার বিবেক একেবারেই সায় দেয়নি। বার বার মনে হয়েছে, দ্রুত পর্যবেক্ষণে যদি সম্পূর্ণ রূপটা ধরা না পড়ে, যদি কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়! তার চেয়ে অখণ্ড অবসর নিয়ে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে আমি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে কাবা শরীফ প্রথম দিদার করতে চাই। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে কোন বেয়াদবি হল কিনা জানি না, হলে আল্লাহ মাফ করুন, আমি কিন্তু কোন অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য যে এমনটি করিনি তা আর কেউ না জানুক, আমার প্রভুর অজ্ঞাত নেই।

হরম শরীফকে দু বার চক্কর দিয়ে, বাসের প্রায় সমূহ যাত্রীকে নানান স্থানে নামিয়ে অবশেষে রাত সাড়ে ন-টার সময় আমাদের মুয়াল্লিম জনাব আবদুর রাজ্জাক মেহবুব সিদ্দিকীর ডেরায় থামল

বাসটি। রাজ্জাক সাহেবের আস্তানা কাবা শরীফের বাবুল উমরার ঠিক পাশেই, একবারে বিশ্ববিখ্যাত অতি অভিজাত মক্কা হোটেলের গায়। এমন কি আমরা মুয়াল্লিমের প্রশস্ত ফাঁকা চত্বরে বসে মক্কা হোটেলের কিচেন রুম পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। মুয়াল্লিমের লোকজন অত্যন্ত সমাদরের সংগে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন, অযু করার ব্যবস্থা করলেন, খাওয়ার ঠান্ডা পানি দিলেন, যে যার মত বিশ্রাম নিলেন কিছুটা। ইতিমধ্যে একজন এসে ঘোষণা করলেন, বেশি টাকা পয়সা সংগে নিয়ে ঘোরা ফেরা করবেন না, পকেটমারের ভয় আছে (বিভিন্ন দেশ থেকে কিছু লোক কেবল পকেটমারের ধান্দায় হজের মৌসুমে মক্কায় এসে ভিড় করে) পথে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে—এ সব বিপদ এড়াতে আপনারা সামান্য কিছু সংগে রেখে বাকি টাকা মুয়াল্লিমের কাছে জমা দিন, যার যেমন প্রয়োজন পড়বে টাকা নিয়ে নেবেন কোন অসুবিধা হবে না। তবে কেউ যদি টাকা জমা দিতে না চান সে তাঁর ইচ্ছা, জমা দেওয়াটা কোন আবশ্যিক ব্যাপার নয়। আমরা আমাদের টাকা মুয়াল্লিমের জিম্মায় ছেড়ে দিলাম, প্রায় সকলেই জমা দিলেন, দু-একজন যাঁরা দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে সংগে সংগে জমা দেন নি—নিশ্চয়ই তাঁরা পরে জমা দিয়েছিলেন। এখানে টাকা জমা দেওয়া যে বিশেষ নিরাপদ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এখনও অনেক কাজ বাকি। এখুনিই কাবাশরীফ তওয়াফ করতে হবে, সাফা-মারওয়া সায়ী করতে হবে, নামায পড়া, মস্তক মুণ্ডন—এভাবে উমরার কাজ সেরে তবে এহরাম খোলা যাবে। একটু বিশ্রাম নিয়ে আমি এবং আমার স্ত্রী মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে মুয়াল্লিমের লোকদের কাবা শরীফ জিয়ারত করানোর কথা বললাম। তারা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলেন। আমরা চত্বরে বসে বার বার বাবুল ওমরার আলোকোজ্জ্বল মিনারের দিকে তাকাচ্ছি আর সেই অনাস্বাদিত ব্যাকুলতা আর উদ্বেগে অস্থির হচ্ছি। হঠাৎ মুয়াল্লিমের লোকগুলি ফিরে এসে বললেন, আগে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে নিন—তারপর জিয়ারত। মুখ থেকে কথা বেরুতে যা দেরি, দেখলাম সবাই খাবার জন্যে বসে

পড়লেন। আমার তখন খাবার কোন রকম অভিরুচিই ছিল না তবুও সকলের সঙ্গে বসতে হল। মক্কায় এক রকম রুটি পাওয়া যায় যা অনেকটা তন্দুরী রুটির মত দেখতে, কিন্তু তাদের আয়তন বিশাল আর মোটা অথচ অবিশ্বাস্য রকম নরম। একটা রুটিতে দু জনের অনায়াসে চলে যায়, সেই রুটি আর প্রচুর পরিমাণে মুরগীর গোশ্‌ত। মক্কা নগরীতে বসে এই হল আমাদের প্রথম আহার।

আহার পর্ব শেষ করেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছিলাম না, মুয়াল্লিমের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানালাম, একজন ভাল আর অভিজ্ঞ লোক দিন—যিনি আমাদের কাফেলাকে সুন্দর ভাবে জিয়ারত আর উমরার কাজ সম্পূর্ণ করাবেন। বুঝতেই পারছেন এই প্রথম আল্লাহর ঘরের সম্মুখে যাচ্ছি, কত কি জিজ্ঞেস করব, কত কি জানতে চাইব—তিনি যেন উত্যক্ত না হয়ে ওঠেন।

বৃদ্ধ মুয়াল্লিম আমার মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। বললেন, তাই হবে। আপনারা প্রস্তুত হোন।

ফাঁকা চত্বরে নেমে এসে নীলাভ আলোয় উজ্জ্বল সেই মিনারের দিকে তাকিয়ে আমি আমার মনটাকে সংযত আর সংহত করতে চাইলাম। আমার স্ত্রীকেও দেখলাম এক অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘড়িতে তখন কাঁটায় কাঁটায় রাত বারটা।

৯.

বায়তুল্লাহ (বায়ত আল্লাহ, আল্লাহর ঘর, কাবা শরীফ) শরীফ জিয়ারতের জন্যে আমাদের কাফেলায় লোক সংখ্যা দাঁড়াল পনের-ষোল জন, এর মধ্যে মহিলা ছিলেন সম্ভবতঃ পাঁচ জন। বছর আটাশ-ত্রিশ বয়সী এক যুবককে মুয়াল্লিম পাঠালেন আমাদের কাফেলার সংগে। ভদ্রলোক ভারতীয় এবং উর্দুভাষী। সুতরাং কথাবার্তায় আর ভাবের লেনদেনে আমাদের কোন অসুবিধা হল না। মুয়াল্লিমগণ মক্কাবাসী, তাঁদের ভাষা আরবী কিন্তু তাঁরা যে দেশের হাজিদের জিম্মাদারি গ্রহণ করেন সাধারণতঃ সেই দেশের কোন না কোন লোককে বেশ ভাল মাইনে দিয়ে রাখেন। কোন মুয়াল্লিম যদি মিশর এবং নাইজেরিয়ার হাজিদের তত্ত্বাবধানের ভার নেন তা হলে তিনি মিশরী আর নাইজেরিয়ানকেই হজযাত্রীদের খিদমতের জন্য নিযুক্ত করে থাকেন। এতে মুয়াল্লিম এবং হজযাত্রী সকলেরই বিশেষ সুবিধা হয়। হাজি সাহেবগণ নিজের ভাষায় কথা বলতে পেরে অবশ্যই মুক্তির আনন্দ পান। আমাদের মুয়াল্লিম আবদুর রাজ্জাক মহবুব সিদ্দিকী সাধারণতঃ ভারতীয় হাজিদের নিয়েই ব্যস্ত থাকেন ফলে তাঁর কাছে তিন-চার জন ভারতীয় কর্মচারীকে দেখলাম। এঁরা সকলেই উর্দুভাষী। আমরা বেশ কিছু বাঙালি হজযাত্রী ছিলাম কিন্তু এখানে কোন বাঙালি কর্মচারী দেখলাম না। ভারত বহুভাষী দেশ, সব ভাষার কর্মচারী রাখাও সম্ভব নয়, তাই যে উর্দুভাষা সর্বভারতীয় মুসলমানী ভাষা রূপে স্বীকৃত সেই ভাষাভাষী কয়েকজন কর্মচারীকে নিযুক্ত করেছেন রাজ্জাক সাহেব। এতে অবশ্য অসুবিধা হবার কথা নয়, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছুটা অসুবিধা আর মানসিক পীড়ন অনুভব করলাম। আমাদের সংগের যুবকটির অবয়বে যে ধর্মীয় এবং নম্র ভাব থাকলে আমার অন্তর অজানতে আপ্লুত হতে পারত তা তাঁর মধ্যে ছিল না। প্রথমতঃ তাঁর দাড়ি ক্ষুর দিয়ে একেবারে পরিচ্ছন্ন করে কামান, দ্বিতীয়ঃ মাথায় টুপি ছিল না, তৃতীয়তঃ একটা হাফ শার্ট আর লুঙ্গি

পরেই তিনি আমাদের মহান জিয়ারতে নিয়ে চললেন, সর্বোপরি এই মহাতীর্থে যাবার জন্যে যে নম্রনত বিনীত ভাবের প্রয়োজন তা তাঁর চলাফেরায় কথাবার্তার কোথাও খুঁজে পেলাম না। এমন একটা পরম শুভ লগ্নে তাঁর সংগে যেতে মনটা হঠাৎ ভীষণ ভাবে ক্ষুণ্ণ আর মলিন হয়ে গেল। আল্লাহ্ কেন যে এ রকম একটা মন আমাকে দিলেন ! অথচ সংগের হজযাত্রীগণ, দেখলাম তাঁর সংগে দিব্যি কথা বলতে বলতে নিঃসংকোচে আর নির্দ্বিধায় হেঁটে চলেছে। মিলাদে আর মসজিদে ধূপ জ্বালিয়ে কেন যে পরিবেশটাকে সুরভিত আর পবিত্রতার অনুকূল করা হয় তা যেন আজ এই মুহূর্তে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আমরা একটু পিছিয়ে পড়েছিলাম। মন থেকে চিন্তা-ভাবনার এই সব দোলায়িত ভাব, দ্বন্দ্ব আর মালিন্য জোর করে দূরে সরিয়ে গভীর আবেগে অনুচ্চ কণ্ঠে তালবিয়া পড়তে শুরু করলাম ঃ লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক—প্রভু গো এই ত আমি হাজির ! মনে মনে বললাম, আল্লাহ আমি ত চলেছি আপনার গৃহের জিয়ারতে, আপনার দিদারের কাঙাল হয়ে আপনারই গহাঙ্গনে। যে সংগে নিয়ে চলেছে সে ত উপলক্ষ মাত্র আপনি আমার হৃদয়কে এই পবিত্রতম জিয়ারতের উপযুক্ত করে দিন, প্রশস্ত করে দিন, নিয়ামতে পরিপূর্ণ করুন।

আমাদের ছোট্ট কাফেলা বাবুস সালামের দিকে এগিয়ে চলল।

মাঝখানে কাবা শরীফ, তার চারপাশে খালি জায়গা—এই জায়গাটা ছাদহীন এবং শ্বেত পাথরে বাঁধান কাবা শরীফের বিশাল চত্বর, এই চত্বরের চারপাশে সুবিশাল এলাকা জুড়ে মসজিদ—যার আর এক নাম হরম শরীফ, এই মসজিদের বা হরম শরীফে প্রবেশের জন্য অসংখ্য ছোট দরজা সহ চারটি বড় দরজা বা প্রধান প্রবেশ-পথ আছে—এদের নাম হল বাবুল ওমরা, বাবুস সালাম, বাবুস সৌদ—বর্তমানে প্রাক্তন সৌদি বাদশাহ্‌র নাম অনুযায়ী বাবে আবদুল আজীজ এবং সাফা পাহাড়ের দিকে বাবুস সাফা। প্রথম তিনটি দরজায় দুটি করে ছটি এবং বাবুস সাফায় একটি—হরম শরীফে সর্বমোট সাতটি মিনার। কাবা শরীফ যাঁরা প্রথম জিয়ারত করবেন

তাঁদের জন্য বাবুস সালাম দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করাই উত্তম। যুবক গাইড আমাদের সকলকে হরম শরীফের পাশের উঁচু রাস্তা দিয়ে সে দিকেই নিয়ে চললেন। মাত্র মিনিট তিনেক চলার পর রাস্তা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আমরা একেবারে বাবুস সালামের সামনে এসে দাঁড়ালাম। সুবিশাল গেট, ঘাড় উঁচু করে উপরের দিকে তাকাতে হয়। গাইডের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা আমাদের চপ্পলগুলি খুলে একটু দূরে অপেক্ষাকৃত নিরালা জায়গায় রেখে এলাম। আমাদের কারো পায়ে চটি বা জুতো ছিল না। এহরাম বাঁধার পর উমরা বা হজের নিয়েত করা হলে পায়ের উপরের অংশটা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হয়, চটি বা জুতো পরলে কিছুটা ঢাকা পড়ে —সে জন্যে আমরা সকলে রবারের চপ্পল পরে ছিলাম এবং হজ না হওয়া পর্যন্ত সকল হাজিই তাই পরেন। মক্কার পথে পথে রবারের এই চপ্পল ঢেলে বিক্রি হয়।

চপ্পল রেখে ফিরে আসতে আসতে অনুভব করলাম আমার ভিতরের সমগ্র সত্তা জুড়ে কেমন যেন এক অদ্ভুত কম্পন শুরু হয়েছে, আমি কাঁপছি। ঠিক ভীতি নয় অথচ ভয়ের ভাবটা রয়েছে, এক অনাস্বাদিত বিপুল আশায় হৃদয় ভরে উঠতে চায় অথচ কেমন যেন একটা ভয় আর সংকোচ তাকে গ্রাস করতে চাইছে, আমি যেন ধীরে ধীরে কেমন হয়ে যাচ্ছি। প্লেন থেকে জেদ্দার পবিত্র মৃত্তিকা স্পর্শের সময় এই রকম একটা ভাবে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, এখনকার অবস্থাটা তার থেকে বহুগুণে তীব্র। মনে পড়ল মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ স অগণিত সাহাবাদের সংগে নিয়ে এই বাবুস সালাম দিয়েই বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করেছিলেন, এই বাবুস সালামে তাঁর পদচিহ্ন পড়েছে, হয়ত সেই কদম মুবারকের ধূলি এখনো বিছিয়ে রয়েছে এর চারপাশে। আমার কি দুঃসাহস সেই পবিত্র পদধূলির উপর আমার এই পাপ-মলিন অপবিত্র আর নোংরা পা ফেলে ফেলে আমি বাবুস সালামের দিকে এগুচ্ছি! ভয়ে সম্ভ্রমে সংকোচে আমার ভিতরের কম্পন এত বেড়ে গেল যে ঠিক মত পা রাখতে পারছিলাম না। আকাশে বাতাসে আমি যেন শুনতে

পাচ্ছিলাম এক অশ্রুত বেহেশতি স্বরের অবিরাম ঘোষণা ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান ! সে কণ্ঠ কখনো হযরত আবুবকরের, কখনো হযরত উমরের, কখনো বা সুকণ্ঠ বেলালের। পাহাড়-পর্বত সাফা-মারওয়া জমীন-আসমান সর্বত্র যেন সেই অশ্রুত স্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আলোড়িত হয়ে ফিরছে। উষ্ণ অধীর উল্লাসে সব কিছুই উতরোল। রেজওয়ান বোধহয় বেহেশতের সব দ্বার খুলে দিয়েছেন। ফেরেশতারা দলে দলে এগিয়ে আসছেন। আমার চার পাশে হযরত উসমান-আলি-হামজা-আব্বাস সকলের সরব উপস্থিতি অনুভব করছি। মক্কাবিজয়ের সেই উজ্জ্বল দিনে রসুলুল্লাহ স ছিলেন সকলের আগে, এ'রা ছিলেন তাঁর পিছনে। আর এই ঐতিহাসিক বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্যেই এই দরজার নাম হয়েছিল বাবুস সালাম—শান্তির দরজা, আর বিরোধ নয়—এখন থেকে অনাবিল শান্তি। মক্কা-বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ স এই দরজা দিয়ে কাবা শরীফে প্রবেশ করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ এই পবিত্র প্রবেশ পথ দিয়ে হাজি সাহেবদেরও প্রথম প্রবেশের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চোদ্দ শ বছর পর, আমার মত এক পাপী এবং জাহেল—তার অতি কলংকিত আত্মা নিয়ে, কাবা শরীফে প্রবেশের জন্যে সেই পবিত্র দরজায় এসে দাঁড়াল। আমি কাঁপছিলাম, ক্রমাগত কাঁপছিলাম. এক সময় আমার মনে হল আমি সভয়ে সংকুচিত হয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছি। আমার বার বার মনে হচ্ছিল আমার মত জঘন্য পাপীর এই পবিত্র গৃহে প্রবেশের কোন অধিকার নেই। বাবুস সালামের চৌকাঠের নিকটবর্তী হয়ে আমি কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না, যেন মাটির সংগে মিশে যাচ্ছিলাম বার বার। দেরী হচ্ছে দেখে আমার স্ত্রী মৃদু ভাবে আমার হাত স্পর্শ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরও কথা বলার মত অবস্থা ছিল না। এই পবিত্র পরিবেশে অনুভূতি, বোধ আর চেতনা বিছিয়ে দিতে পারলে, আমার বিশ্বাস, এখানে এসে কেউ কথা বলতে পারেন না। মুখের কথা অশ্রুতে গড়িয়ে যায়। আমার সংগীরা দেখলাম কথা বলতে বলতে বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে

অনেকখানি। আমার সমগ্র চেতনা আর অনুভূতি দিয়ে বিসমিল্লাহ বলে চৌকাঠের ভিতরে, মসজিদুল হরমের মধ্যে, প্রথম ডান পা রাখলাম তারপর অন্য পা তুলে ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভিতরে গিয়ে হাঁটব কি—পা তুলতেই পারছিলাম না। বার বার মনে হচ্ছিল আমি এমন জায়গায় পা ফেলছি যেখানে আমার নবীজীর পদচিহ্ন পড়েছে। পা-টা যেন দুমড়ে ভেঙে যেতে চাইছিল। আমি কি করে এই পথটুকু হেঁটে যাব ! মনে মনে আল্লাহর কাছে শক্তিভিক্ষা চাইলাম ঃ প্রভু—সাত সমুদ্র তের নদী পার করে যদি এই জঘন্যতম পাপীকে এতদূর এনেছেন, তৌফিক দিন আপনার গৃহ জিয়ারত করার, শক্তি দিন ইসলামের সেই প্রাণকেন্দ্রের নিকটবর্তী হবার। জানি আমি মহাপাতক, পাপে আমার সর্ব শরীর-দেহ-মন-আত্মা কলংকিত কিন্তু আমি ত পরিপূর্ণ রূপে আপনাতেই সমর্পিত।

মনে হল আমার উচ্চতা ঠিক অর্ধেক কমে গেছে। ভয়ে ভক্তিতে বিনয়ে সম্ভ্রমে নম্রনত হয়ে ধীরে অতিধীরে এগুচ্ছিলাম আর ক্রমে ক্রমে সেই মহাতীর্থের নিকটবর্তী হচ্ছিলাম। আমার স্ত্রীর অবস্থাও তাই, বুঝতে পারছিলাম তাঁর গতিও শ্লথ হয়ে এসেছে। আজ সকালের কথা মনে পড়ল। কত ব্যস্ততার সঙ্গেই না আমরা বোম্বে থেকে বেরিয়েছিলাম. ঠিক উৎসমুখ থেকে উৎসারিত হয়ে নিম্নাভিমুখী নদীর অতিচঞ্চল গতির মত। সাগর-সঙ্গমে এসে যেমন নদীর স্রোত পরম নিশ্চিন্তে শিথিল হয়ে পড়ে তেমনি মহাতীর্থ সঙ্গমে আমাদের গতি একেবারে শ্লথ হয়ে এল। শ্লথ কিন্তু এক আশ্চর্য আশার ঝলক ফুটে উঠছিল সে গতিতে। আর মাত্র কয়েক পা অগ্রসর হলেই জীবনের সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত ধনকে পেয়ে যাব দৃষ্টি সীমার মধ্যে। হরম শরীফের বিশাল এলাকা পার হতে হতে অসংখ্য থামের আড়াল থেকে হঠাৎ কালো গেলাফে ঢাকা কাবা শরীফের কিছু অংশ চোখে পড়ল, আর চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মধ্যে এক অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হল, যে ভয় আর শংকা এতক্ষণ আমার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা যেন হঠাৎই দূর হল, আমি আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলাম। আর

এক মুহূর্ত বিলম্ব সইছিল না, ছুটে গিয়ে সেই অলৌকিক গৃহকে পরিপূর্ণ রূপে দেখার জন্যে মন সবেগে আন্দোলিত আর অধীর হয়ে উঠল। তবুও ধীর স্থির ভাবে শান্ত পায়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ড হেঁটে আমরা হরম শরীফের শেষ প্রান্তে এমন এক উঁচু জায়গায় দাঁড়ালাম যেখান থেকে কাবা শরীফ সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ রূপে চোখে পড়ে। সর্বপ্রথম কাবা শরীফ প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর কাছে যা প্রার্থনা করা যায় তা মঞ্জুর হয়, এই পরম পবিত্র মুহূর্তটি জীবনে সকলের একবারই আসে এবং এই বরকতময় মুহূর্তটি দোয়া কবুলের চরম মুহূর্ত। কাবা শরীফ দেখেও একটি দোওয়া পড়তে হয়, দোওয়াটি বেশ বড়, বদলে ছোট ছোট দোওয়াও পড়া চলে। আমরা কয়েকটি রপ্ত করে এসেছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য আমার কিছুই বলা হল না। কাবা শরীফ চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় আমি একবার বলেছিলাম, আল হামদো লিল্লাহ —সমুদয় প্রশংসা মহাপ্রভু আল্লাহর, তারপর সব ওলট-পালট হয়ে গেল, সব ভুলে গেলাম। চোখ মেলে বোধহয় একটি কি দুটি পলক মাত্র দেখেছিলাম তারপর সব একাকার হয়ে গেল। গভীর নিশীথে আমরা কাবা-প্রাঙ্গণে এসেছিলাম, তখন ভিড় অনেকটা কমে এসেছিল, তবে তওয়াফ চলছিল সমানে, এহরামের শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে সকলে গোল হয়ে কাবা শরীফ প্রদক্ষিণ করছিলেন। আর সেই অপূর্ব দৃশ্যটিকে আমার পৃথিবীর কোন দৃশ্য বলে মনেই হল না। প্রথম পলকেই আমার মনে হল, অনন্ত অসীম থেকে কালো গেলাফে ঢাকা কাবা শরীফকে অসংখ্য ফেরেশতা মিলে এই মাত্র পৃথিবীতে নামিয়ে নিয়ে এলেন, এখনো ঠিক মত স্থাপন করা হয়নি, হরম শরীফের চারপাশের উপর থেকে প্রতিফলিত অত্যুজ্জ্বল আলোক-মালাকে আমার মনে হল বেহেশত থেকে অবিরাম ছুটে আসা অপার্থিব নূরের রোশনাই, এক দল আলোর ফেরেশতা যেন নীল আসমানের চারপাশ থেকে এই বেহেশতি আলো ফেলছেন কাবা শরীফের উপর। চারপাশে আনন্দের চাপা নীরব উল্লাস, ফেরেশতারা খুশিতে উতরোল; অনন্ত আকাশ থেকে আল্লাহর রহমত ঝরে পড়ছে

অফুরন্ত। কোটি কোটি ফেরেশতা যেন বিশাল কাবাকে মাটিতে বসানোর কাজে ব্যস্ত। আর মানুষ নয়—যেন সপ্ত আসমানের উপর বায়তুল মামুরকে ঘিরে শুভ্র বসন ফেরেশতারা অবিরাম তওয়াফ করেছেন। আমার আর কিছু মনে নেই। এত সব মনে হওয়া একটি পলকে ঘটে গেল। পরমুহূর্তে আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম। আমি আমার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললাম, পাগল হয়ে গেলাম! বোধহয় আমি পাগলই। আর এও মনে হল এখানে এসে সকলে পাগল হয়ে যায়। হু হু করে অবিরল অশ্রু গড়াচ্ছে, মোছার আগেই আবার সব দৃশ্য অস্পষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর দরবারে দুটি পাপ-পংকিল মলিন কম্পিত হাত পেতে বললাম, লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক ! প্রভু গো, আমি হাজির, আপনার পবিত্র দরবারে আমি হাজির ! আমার জীবনে কোন পুণ্য নেই, কোন ভাল কাজ আমি করি নি—সারা জীবনের সব পাপ, সব কলংক নিয়ে এই অপবিত্র দুশ্চরিত্র নাফরমান আজ আপনার পুণ্য মজলিসে হাজির। এই দীন এই ভিখিরী এই কলংকিত কাঙাল আজ আপনার দরবারে হাজির ! আপনি কাটতে হয় কাটুন, মারতে হয় মারুন, আগুনে পোড়াতে হয় পোড়ান, দোজখে দিতে চান দিন—আমার কোন আপত্তি নেই, প্রভু গো, যেখানেই রাখুন এ গোলাম শুধু আপনার দিদার চায়। আর কিছু নয়—শুধু আপনার দিদার, আপনার দিদার, আপনার দিদার। শুধু এই একটিই ভিক্ষা, কাঙালের এই একটিই আরজি—দু চোখ ভরে শুধু আপনাকে দেখা, আপনার দিদার, আপনার দিদার। প্রভু আমার ! আমি আপনার কাছে যাব না, আপনার নিকটে যাব না, অনেক দূর থেকে কেবল দু চোখ মেলে দেখব, শুধু দেখব, শুধু দেখব। আমার সব পাপ নিয়ে তখন যেন চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বলতে পারি, লাব্বায়েক—প্রভু, আমি এসেছি, প্রভু গো আপনার খিদমতে গোলাম হাজির।

আর কিছু বলতে পারি নি, কিছু চাইতে পারি নি। কত কি মনে করে গিয়েছিলাম, সব ভুলে গেলাম, বুকের কান্নায়, চোখের পানিতে সব একাকার হয়ে গেল, ভেসে গেল।

আমি এক আদিম মানুষের মত, ডুকরে ডুকরে কাঁদতে শুরু করলাম। আমার চোখের সামনে তখন বিশ্ব-সংসার-আকাশ-কাবা সব কিছু অবলুপ্ত, এক অনন্ত জ্যোতির যেন আমি স্পর্শ পেলাম। বিদ্যুতের স্পর্শ থেকেও এই স্পর্শ দ্রুত। অনুভূতি গাঢ় হতে হতে হঠাৎ যেন চকিতে অন্তর্জগতের কোন অতল তলে তলিয়ে যায় আর তখনই এই পরশমণির ছোঁওয়া লাগে এবং সংগে সংগেই, একেবারে মুহূর্তেরও অনেক কম সময়ে, কোন অনন্ত অসীমের সঙ্গে এই মাটির দেহের যোগাযোগ ঘটে যায়, দেহমন উথাল-পাথাল হয়ে ওঠে, অশ্রুতে বুক ভেসে যায়।

একেবারে উন্মাদ অবস্থা ! সকলের অবস্থাই তাই ! অবশ্য সে সময় আমি অন্যের অবস্থা দেখিনি। নিজেও যে কি করেছিলাম তাও ঠিক মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে ঃ অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে যে মনে এত প্রশান্তি, এত পবিত্রতা আর এমন বিপুল আনন্দ অনুভব করা যায় তা যেন এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। মনে হল আমি এক অন্য আল-আমান হয়ে উঠছি। জীবনে অশ্রু না এলে মানুষ বোধহয় প্রকৃত আর পবিত্র আনন্দ থেকেই বঞ্চিত হয়। আমার এমনও মনে হল ঃ বেহেশতে গিয়ে যদি অশ্রু রুদ্ধ হয়ে যায়, যদি অশ্রুতে সিক্ত হয়ে আল্লাহকে ডেকে বুক ভরাতে না পারি তা হলে প্রকৃত আনন্দ থেকেই আমি বঞ্চিত হব, অমন বেহেশতের প্রয়োজন নেই। গভীর আন্তরিকতায়, অনুভূতির গাঢ়তায় আর গভীর বেদনা দিয়ে যদি আল্লাহকে অনুভব করতে না পারলাম ! অশ্রুতে ডেকে যে তৃপ্তি, আর কোন কিছুতে সে তৃপ্তি পাওয়া যেতে পারে না। অশ্রু মানুষকে মহান করে।

ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিলাম। তখনো বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আল্লাহ আমার নসিব এত বড় করেছেন যে আমি কাবা শরীফ জিয়ারত করছি, আমার সম্মুখে রয়েছে বায়তুল্লাহ, এই দীন কাঙাল আমি—আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। সব কিছু যেন এক অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে ঘটে যাচ্ছে। আমি তখন সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গেছি, একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য তন্ময় অবস্থা।

হঠাৎ আমার স্ত্রী ঘন হয়ে কাছে সরে এলেন তারপর গায় হাত দিয়ে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, চল্‌ন—ও'রা অনেক আগে চলে গেছেন ! বলেই তিনি সর্দি ম্‌ছলেন।

আমার তন্ময়তা ভেঙে গেল। স্বপ্নের অলৌকিক জগৎ থেকে হঠাৎ আমি বাস্তবে হরম শরীফের পাথরে আছড়ে পড়লাম। জীবনে এতবড় পাওয়ার আনন্দ এমন আকস্মিক ভাবে আর কখনো ভেঙে যায়নি। সংগে সংগে আমার মনে হল, এই উন্মাদ দলের সংগে আমাদের আসা ঠিক হয় নি। মনে পড়ল সেবার দলবন্ধ হয়ে দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়ে বার বার মনে দার্‌ণ আঘাত পেয়েছি। আমি ও আমার স্ত্রী যখন নীলগিরি পাহাড় চ্‌ড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতিক সৌন্দর্যে বিভোর তখন দলের অন্য সকলে বাসে উঠে হর্ণ টিপতে শ্‌র্‌ করেছে, লেকের মাঝখানে নৌকো নিয়ে যখন আমরা বিকেলের উজ্জ্বল আকাশে চোখ রেখে ক্ষণিক তন্ময় হয়েছি তখন পাড়ে দাঁড়িয়ে দলের অন্যান্য সকলে চিৎকার শ্‌র্‌ করেছে অর্থাৎ লেক-ফেক দেখা তাদের অনেক আগেই হয়ে গেছে এবং যদি আমরা এখ্‌নি তীরে না উঠি তা হলে তারা বাস নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। এ যে কত বড় মানসিক যন্ত্রণা, ভ্‌ক্তভোগী ছাড়া অন্য কেউ ব্‌ঝতে পারে না। সত্যই, এই মহাতীর্থে এই উন্মাদ কাফেলার সংগে আসা কিছ্‌তেই সংগত হয় নি। পরক্ষণেই মনে হল, ও'রা তো উন্মাদ নন—উন্মাদ আমি নিজে। বরং আমাদের মত অর্ধপাগলদের সংগে আসা ও'দের উচিত হয় নি।

হরম শরীফে ভিড় না থাকলেও তওয়াফে ভিড় ছিল, পথ হারাবার ভয়, ঠিকমত ম্‌য়াল্লিমের ঘরে পেণছ্‌তে পারব কি না তার ভয়, সর্বোপরি উমরার অবশিষ্ট করণীয়গ্‌লি কি ভাবে করতে হবে তা আমাদের অজ্ঞাত স্‌তরাং আহত ও অতৃপ্ত মনটাকে সংযত করে চোখ ম্‌ছতে ম্‌ছতে গাইড এবং সংগীদের খ‌্‌জতে কাবা শরীফের চত্বরে নেমে এলাম। তওয়াফের সীমারেখায় কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই সংগীদের সন্ধান পেলাম, তাঁদের তখন বায়তুল্লাহ শরীফ দ্‌ বার প্রদক্ষিণ করা হয়ে গেছে। দেখলাম গাইড য্‌বক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর আমাদের কাফেলাকে তওয়াফ করাচ্ছেন অন্য একটি

লোক। এখানে তওয়াফ এবং সায়ী (সাফামারওয়া পর্বতের মধ্যে ছুটাছুটি) করানর জন্য খাদেম পাওয়া যায়, কয়েক রিয়েলের বিনিময়ে এ'রা এ কাজগুলি নিয়ম রীতি মাফিক সম্পূর্ণ করিয়ে দেন। দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক আমাদের কাফেলাকে তওয়াফ করাচ্ছিলেন। কাবা শরীফকে সাতবার প্রদক্ষিণ করলে একটি তওয়াফ সম্পূর্ণ হয় এবং প্রতিবার প্রদক্ষিণের সময় এক একটি পৃথক দোওয়া পড়তে হয়। যিনি তওয়াফ করাচ্ছিলেন তিনি উচ্চস্বরে দোওয়া বলে যাচ্ছিলেন আর সংগে সংগে আমরাও তা উচ্চারণ করছিলাম—এমনি ভাবে আমরা দু জনে আমাদের কাফেলার সংগে তৃতীয় প্রদক্ষিণ থেকে তওয়াফ শুরু করলাম। ভদ্রলোকের খাস আরবী জবানের উচ্চারণ ছিল খুবই শ্রুতি মধুর। মাথায় টুপি ছিল আর বিরাট আলখাল্লায় গলা থেকে পায়ের পাতার উপর পর্যন্ত ঢাকা। তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উদ্রেক হয়। কাফেলার সাতবার প্রদক্ষিণ হতেই তাঁদের তওয়াফ শেষ হল। গাইড যুবককে ধন্যবাদ, তাঁকে যখন বললাম যে আমাদের দু জনের মাত্র পাঁচ-প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয়েছে, তিনি কাফেলাকে দাঁড় করিয়ে রেখে আমাদের আরো দু বার প্রদক্ষিণ করিয়ে তওয়াফ সম্পূর্ণ করালেন। তওয়াফ সম্পূর্ণ হতে আমরা মাকামে ইবরাহিমের পাশে দু রাকাত নামায পড়লাম। প্রতি তওয়াফ শেষে দু রাকাত নামায পড়া জরুরি। নামাযের পর মুনাজাত। মাকামে ইবরাহিমের পাশে বসে কাবা শরীফের দিকে ফিরে আল্লাহর দরবারে দু হাত তুলে সবে আকুল হয়েছি, সেই মুবারক বরকতময় জায়গায় সবে অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করেছে—পিছনে থেকে কদর্য চীৎকার ভেসে এল, চলিয়ে। অর্থাৎ একবার দলছুট হয়েছ আর হওয়া চলবে না। আর যদি না আস তা হলে বসে মুনাজাত কর—আমরা চললাম। কি যন্ত্রণা বুকে নিয়ে উঠে পড়লাম সে একমাত্র আল্লাহ জানেন। অতিবেদনার মধ্যেও শুধু সান্ত্বনা এইটুকু যে আজ ব্যাপারটি পুরো জানা হয়ে যাচ্ছে, আগামী কাল এসে আমরা নিজেরা নিজেদের মত করে এই কাজগুলি পরিপূর্ণ রূপে করতে পারব।

আমাদের ওঠার আগেই দেখলাম কাফেলা সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এগিয়ে গেছে। আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম।

পূর্বে সাফা-মারওয়া পাহাড় দুটি হরম শরীফের বাইরে ছিল, বর্তমানে পাহাড় দুটিকে হরমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এক পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে অন্য পাহাড়ের শীর্ষদেশ পর্যন্ত দু তলা বিশাল বিল্ডিং করে দিয়েছেন সৌদি সরকার। নিচে দিয়ে যেমন হাজার হাজার মানুষ সায়ী করতে পারেন তেমনি দু তলা দিয়েও সম সংখ্যক পুণ্যযাত্রী অনায়াসে সায়ীর কাজ সম্পন্ন করেন। সাফা পাহাড় থেকেই সায়ী শুরু করতে হয়, সেই একই খাদেম, যিনি তওয়াফ করিয়েছিলেন, সায়ী করতে সাহায্য করলেন। দুই পাহাড়ের দূরত্ব প্রায় পৌনে এক কিলোমিটার, এই পথ সাত বার অতিক্রম করতে হয় অর্থাৎ সাড়ে তিন বার যাতায়াত করতে হয়। আমার আগে ধারণা ছিল যে সায়ীতে এই পথ সাতবার যাতায়াত অর্থাৎ চোদ্দবার অতিক্রম করতে হয় কিন্তু এ ধারণা ভুল। সাড়ে তিনবার যাতায়াত করলেই সাতবার যাওয়া হয়। প্রতি বার যাওয়ার সময় বিভিন্ন দোওয়া-দরুদ পড়তে হয় এবং পানির জন্য মা হাজেরার ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটির কথা অত্যন্ত আন্তরিক ভাবে স্মরণ করতে হয়। কিন্তু এখানেও আন্তরিকতার অভাব বিশেষভাবে আমাকে পীড়া দিল। দেখলাম অনেকেই কেবল ঘোড়দৌড়ের মত ছুটছেন, যেন কোন রকমে সাত বার ছোটার কাজটা সেরে দিতে পারলেই বেঁচে যান। প্রথম দু-বার আমরা কাফেলার সঙ্গে যেতে পেরেছিলাম, তারপর আমি এবং আমার স্ত্রী পৃথক হয়ে গেলাম। মন সায় দিল না। মনে হল, এ ভাবে দৌড়ান অর্থহীন। কাফেলাকে বলে দিলাম, সায়ী শেষ হলে তারা যেন আমাদের জন্য অনুগ্রহ করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলে সাত বার শেষ হয় মারওয়া পাহাড়ে, আমরা অত্যন্ত বিনীত হয়ে চলা শুরু করলাম। চোখের সামনে ফুটে উঠল পিপাসাকাতর শিশু ইসমাইলের মুখে এক বিন্দু পানি দেবার জন্য পানির অন্বেষণে সাফা-মারওয়ার দুর্গম ও ভয়ংকর বিপদ-সংকুল পথে ব্যাকুল হয়ে

মা হাজেরার রক্তাক্ত পায়ে ছোটাছুটির দৃশ্য। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমার সম্মুখ দিয়ে মা হাজেরা ছুটছেন, পাথরে আছাড় খেয়ে এই পড়ে গেলেন, বুক ছিঁড়ে গেল, কপাল ফেটে গেল, রক্তে ভেসে গেল মুখ, শেষ শক্তি সঞ্চয় করে আবার উঠে দাঁড়ালেন, আবার ছুটতে শুরু করলেন—যেন এবার দু-পা এগিয়ে গেলেই পেয়ে যাবেন টলটলে শীতল পানি, আল্লাহ গো—এসব কথা মনে হতেই আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না, পাগলের মত হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠলাম, চোখ ফেটে হৃদয় ফেটে অবিরল অশ্রুর ধারা গড়াতে শুরু করল। সকলেরই এমন হয়। অতি পাষাণও এসব কথা স্মরণ করে না কেঁদে থাকতে পারেনা !

আমাদের সায়ী চলল অত্যন্ত ধীর ও শান্ত গতিতে। এবং এক সময় শেষ হল। সায়ী শেষের পর মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে মুনাজাত তারপর মস্তক মুন্ডন। কিন্তু ভিতরে মুন্ডনের কোন ব্যবস্থা নেই, এখানে মহিলাদের অলক গুচ্ছের অগ্রভাগ থেকে সামান্য অংশ মহিলারা নিজেরাই কেটে নেন আর পুরুষদের ঘাড়ের চুলের কয়েক গাছি মাত্র কেটে নিলেই চলে। আমরাও তাই করলাম। সায়ী শেষ হল।

তওয়াফ এবং সায়ী সম্পর্কে পরে ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা রইল।

গাইড এগিয়ে এলেন। বললেন, এবার চলুন হরম শরীফে দু রাকাত নামায পড়বেন। মুনাজাতের পর উমরার কাজ শেষ। আমরা সকলে দলবন্ধ হয়ে হরম শরীফের দিকে অগ্রসর হলাম।

সাফা-মারওয়াকে বর্তমানে হরম শরীফের সংগে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। সামান্য একটু হেঁটে এসেই আমরা মসজিদুল হরম-এ প্রবেশ করলাম। মসজিদের ভিতরে পা দেবার সংগে সংগেই মনটা কেমন যেন এক অপার্থিব পবিত্রতায় ভরে ওঠে। মসজিদের সর্বত্র বহুমূল্যবান কার্পেট পাতা, এত কারুকার্যশোভন অনিন্দ্যসুন্দর পুরু কার্পেট সাধাণতঃ চোখে পড়ে না। এর উপরেই নামায পড়া হয়। মাথার উপরে হাজার হাজার পাখা সব সময়ই

ঘুরছে। আমরা একটি ভাল জায়গা দেখে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে নামাযে বসে গেলাম। বেশ কিছু সময় নিয়ে গভীর আবেগে ও আন্তরিকতায় আমরা দু রাকাত নামায পড়লাম। মুনাজাতে আমার স্ত্রী সমানে কাঁদছিলেন, আমি কিছু বললাম না, কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে আমি অভিভূত হয়ে বসেছিলাম। কিন্তু এখানেও সেই মর্মপীড়ক 'চলিয়ে' থেকে রেহাই পেলাম না। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমাদের জন্য আর এতটুকু ক্লেশ বা বিলম্ব সহ্য করতে তাঁরা রাজি নন। অগত্যা আল্লাহকে অসংখ্য শুকরিয়া জানিয়ে উঠে পড়লাম। যেতে মন চাইছিল না, ক্ষতি কি ছিল যদি আজকের রাতের অবশিষ্টটুকু এই পবিত্রতম মঞ্জিল মকসাদে বসেই কাটিয়ে দিতাম।

আজকের ডাইরিতে আমি বায়তুল্লাহ শরীফ দর্শন করে যা লিখেছিলাম এখানে তার কিছু হুবহু তুলে দিলাম ঃ

..."বেশ কিছুটা প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল সেই পরম বাঞ্ছিত ধন, পৃথিবীর পবিত্রতম গৃহ হারাম শরীফ —খানা-এ কাবা, কালো গেলাফে ঢাকা, সোনালি অক্ষরে আয়াত লেখা, চারদিকে আলোয় আলোময়, শাদা পাথরের চত্বরের উপরে কাবা—যেন বেহেশত থেকে ডানা মেলে এইমাত্র মাটিতে নেমে এসেছে, অনন্ত আকাশ থেকে এক অফুরন্ত অবিরাম জ্যোতির্ধারা এসে পড়ছে, নূরের তাজাল্লিতে ভেসে যাচ্ছে সব—কাবা-মাকামে ইবরাহিম-দেহ-মন-আত্মা। এই সেই বাঞ্ছিত ধন—যার জন্য পাগলের মত বিশ্ব মুসলিম দশদিগন্ত থেকে ধেয়ে আসছে, আমি দিওয়ানা হয়ে এসেছি—এই সেই পরম ধন। দেখব কি দু চোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নামল। আল্লাহর কাছে কি চাইব, একেবারে বোবা হয়ে গেছি, চাওয়ার শক্তি নেই, শুধু কান্না, শুধু অশ্রু—চোখ মুছে পলকে কাবা দেখি পরমুহূর্তে সব একাকার। ...দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত পেতেই রইলাম। আমি ভিখারী, পরমদাতা কি দিলেন জানি না কিন্তু আমার মন ভরে গেল।"...

মুয়াল্লিমের আস্তানায় যখন এসে পৌঁছলাম তখন রাত পৌনে দুটো। পথঘাট জনবিরল হয়ে এসেছে, যাত্রীরাও অনেকে ঘুমিয়ে

পড়েছেন দেখলাম। ফিরে এসে আমি প্রথমে নাপিতের কাছে মস্তক মুণ্ডনের জন্য বসে গেলাম। প্রতি মুয়াল্লিমের কাছে সাধারণতঃ একজন করে নাপিত থাকেন, এঁরা মুণ্ডনের কাজ সম্পূর্ণ করেন। মস্তক মুণ্ডন সম্পূর্ণ হওয়ার পর স্বাভাবিক কারণেই গোসল করার দরকার হয়ে পড়ে। কিন্তু গোসল করতে গিয়েই দারুণ এক গোলযোগের মধ্যে পড়ে গেলাম। পানি পড়ার শব্দ হতেই দারোয়ান ছুটে এল, শুধু ছুটে আসা নয়, দরজায় এমন ভাবে ঘা দিতে শুরু করল মনে হল সে এখুনি দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবে তারপর সম্ভবতঃ আমাকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এতটা বাড়াবাড়ি করল না কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে যা চিৎকার শুরু করল তাতে রীতিমত লোক জমা হয়ে যাবার কথা। আমি যতক্ষণ গোসল করলাম সে ততক্ষণই সমানে চেঁচিয়ে গেল যার মর্মার্থ মোটামুটি এই রকম ঃ এটা হিন্দ্ (ভারত) নয়, এটা মক্কা—এখানে পেট্রলের থেকে পানির দাম বেশি। .

সত্যই আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এটা নদীমাতৃক পশ্চিম বাংলা নয়। গোসল সংক্ষেপ করে, কোন রকমে কয়েক মগ পানি মাথায় ঢেলে বেরিয়ে এলাম।

উমরা সম্পূর্ণ হয়েছে সুতরাং এখন এহরামের কাপড় খুলে সাধারণ লেবাস পরে নিলাম। কাপড়-চোপড় পরে সবে বসেছি, এক ভদ্রলোক এসে সালাম করে দাঁড়ালেন। বললেন, একটা ভাল ঘর আছে, যদি একবার দেখে নিতেন—

আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার সংগে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়েছেন। তখনই শুনলাম এই বৃদ্ধা এসেছেন দিল্লি থেকে এবং একেবারে একা, আমাদের প্লেনে এসেছেন আর এসে উঠেছেন আমাদেরই মুয়াল্লিমের কাছে। আমার স্ত্রীর সংগে কথা বলে তাঁর এমনই ভাল লেগেছে যে তিনি আমাদের সংগেই থাকতে চাইলেন, আমাদের ছেড়ে তিনি অন্য কোথাও যাবেন না, এমন কি আমরা না নিয়ে গেলেও তিনি আমাদের সংগে যাবেন। আমাদের দেখে বা কথা বলে তাঁর কতটা ভাল লেগেছে জানিনা, তবে তাঁর মত একজন

বৃদ্ধার জন্যে একটি পরিবারে নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। আর এক গুজরাটি দম্পতি তাঁরাও আমাদের সংগে একই ঘরে থাকতে চাইলেন। এতে সব দিক দিয়ে ভাল হল। মক্কায় একটি সুসজ্জিত ঘরের ভাড়া অত্যন্ত বেশি। যদি দেশ থেকে নিজেরা একটি দল নিয়ে আসা যায় সে ত সর্বোত্তম কিন্তু অনেক সময় সেটি সম্ভব হয় না, চেনা-জানা লোক পাওয়া যায় না কিন্তু প্লেনে বা পানির জাহাজে বা মুয়াল্লিমের বাড়িতে একটু আলাপ করলেই এধরনের লোকের অভাব হয় না, দেখে শুনে একটা দল গড়ে নিতে পারলে ভাল ঘর ভাড়া নিতে সুবিধা হয়। এ ছাড়া পরিচিত দলের মধ্যে থাকার নানান সুবিধাও আছে। যা হোক আপাততঃ আমাদের পাঁচ জনের একটি দল কয়েক মিনিটের মধ্যে গড়ে উঠল। মালপত্র এবং মেয়েদের বসিয়ে রেখে গুজরাটি ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে রাত আড়াইটায় আমি ঘর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। ঘর দেখে পছন্দ হল। শুধু ঘর নয়, ঘরের সঙ্গে ভদ্রলোক দিতে চাইলেন, দুটি খাট, স্পঞ্জের দুটি গদি, প্রয়োজনীয় বালিশ, তাঁর ফ্রিজ, বাসনপত্র, তেলমশালা, গ্যাস, গ্যাস ওভেন, হাঁড়ি-বটি-চাকু-বাটি প্রায় সম্পূর্ণ একটি পরিবারের সাজ-সরঞ্জাম এবং এয়ার কুলার। ঘর অনেকেই পান কিন্তু এই রকম সাজান একটি সংসার কেউ পান কি ? আমি ত আজ পর্যন্ত শুনি নি। আল্লাহর প্রতি সীমাহীন কৃতজ্ঞতায় আবার চোখ ভিজে এল। আমি কিছুই বলতে পারছিলাম না। এই অনন্ত রহমতের কাছে আমি শুধু নীরবে মাথা পেতে রইলাম। এত পেয়েও আমরা নাফরমান হই, অকৃতজ্ঞ হই, বেঈমান হয়ে যাই ! ভাবতেই পারি না।

ভাড়া ঠিক হল আট হাজার রিয়াল, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় চব্বিশ হাজার টাকা, দু-মাসের জন্য। হজের ক্রিয়া কর্ম শেষ হয়ে গেলেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

রাত সাড়ে তিনটার সময় মুয়াল্লিমের বাড়ি থেকে বেডিংপত্র নিয়ে মিসফালা সুক-এ আমাদের তিন তলার নতুন আস্তানায় চলে এলাম। বিছানাপত্র তৈরি করাই ছিল, আমাদের বেডিং থেকে কোন কিছু বার করার প্রয়োজন হল না। সকলেই এত ক্লান্ত হয়ে ছিলাম

যে আর কেউই বসে থাকতে পারছিলাম না। সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। এমনি করে জীবনের একটি স্মরণীয় আর পরম পবিত্রতম কর্মবহুল দিনের সমাপ্তি ঘটল।

১০.

মিসফালা সুক-এর মসজিদ থেকে মাইকে আযান ভেসে এল সুবেহ্ সাদেকের আলো-আঁধারিতে। একেবারে পাশেই মসজিদ। সুতরাং ঘুম ভেঙে গেল। ঘণ্টাখানিকের কিছু বেশি সময় বোধহয় ঘুমিয়েছিলাম। চোখ জ্বলে যাচ্ছিল, মাথাটাও ভারি হয়েছিল সমানে, ক্লান্তির ছাপ ছিল দেহমনের সর্বত্র। ঘুম ভেঙে যাবার পর আবার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু জামাত শুরু হবার একামত যেই কানে ভেসে এল—একেবারে চাবুক খেয়ে সোজা উঠে বসলাম। যত কষ্টই হোক—নামায কাজা করলে চলে না। স্ত্রীও উঠলেন। তুলে দিলাম অন্যান্য সকলকে। মসজিদে যাওয়া হল না, ঘরেই ফজর পড়ে নিলাম। নামায শেষ হবার সংগে সংগে, বলা যেতে পারে, সেই পাটিতে আবার ঢলে পড়লাম। সত্যই বসে থাকা আমাদের পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। ঘণ্টা পাঁচেক টানা বিছানায় অঘোর হয়ে থাকার পর ঘুম ভাঙল বেলা দশটায়। শরীরটা অনেক ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। মাথাটা হাল্কা হয়েছে। মনটা প্রফুল্ল।

কাল রাতে, গভীর রাতে যে অলৌকিক গৃহ জিয়ারত করেছিলাম এখন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। কাবা শরীফ গভীর ভাবে টানছিল আমাদের কিন্তু আমরা ঠিক করলাম গোসল এবং বাজার পর্ব সেরে জোহরের ওয়াক্তে চলে যাব সেই পবিত্রতম গৃহে। সুতরাং করণীয় কাজগুলি তাড়াতাড়ি সেরে ফেলার জন্যে দ্রুত উঠে পড়লাম।

বাজারের ব্যাপারটা আমাকে খুব বেশি শঙ্কাতুর করে তুলেছিল। প্রথমতঃ বাজারে কি কি পাওয়া যায় জানিনা, দ্বিতীয়তঃ কোথায় কোনটি পাওয়া যায় সেটিও অজানা, তৃতীয়তঃ কি বলে চাইব সেটি

আর এক সমস্যা এবং সম্ভবতঃ প্রধান সমস্যা। চা চাইলে যদি মুসুর ডাল দিয়ে বিদায় করে তা হলে ত বড় বেদনার কারণ হবে। বাজারের ব্যাগ হাতে নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় এলেন ইয়াকুব আদম—এ ব্যাপারে তিনি আমাকে সাহায্য করলেন। এ গুজরাটি যুবক ইয়াকুব, বর্তমানে মক্কায় চাকরি করেন, যে রুমটি আমরা ভাড়া নিয়েছি এটি তাঁর। কাল রাতে আমাদের এখানে পেঁাছে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন, এলেন আজ ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে। সংগে করে বাজারে নিয়ে গিয়ে একটা চক্কর দিয়ে সবটা দেখিয়ে দিলেন প্রথমে। এতে আমার খুবই সুবিধে হল। ইয়াকুব কয়েক বছর আছেন মক্কায়, আরবীটা ভাল ভাবেই রপ্ত করেছেন সুতরাং তিনি দোকানদারদের সংগে আরবীতেই কথা বলছিলেন। কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলাম দোকানদারদের মধ্যে কেমন যেন একটা বাঙালি-বাঙালি ভাব। যত মাছের মধ্যে ইলিশ থাক ঠিক বোঝা যায়। প্রথমটা আমার কেমন যেন খটকা লাগছিল, কিন্তু একটি দোকানের সামনে দাঁড়াতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। হজের মরশুম, সব দোকানেই প্রচন্ড ভিড়, দোকানের ভিতর তিন-চার জন যুবক হিমসিম খাচ্ছে, হঠাৎ একজন জিজ্ঞেস করল, কাল যে ছোট এলাচগুলো কিনে আনলাম —কোথায় রাখলি ? একেবারে পরিষ্কার বাংলা। সেই ভিড়ের মধ্যে মুহূর্তেই আলাপ জমে গেল। জানলাম, সে ঢাকার লোক। আমি খাস কলকাতা থেকে এসেছি শুনে ভীষণ খুশি। সৌদি আরবে, একেবারে খোদ মক্কা শরীফে বসে, ঢাকার লোকের কলকাতার প্রতি আগ্রহ দেখে আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, সামনের বাড়ির তিন তলায় আছি, পরে এসে আলাপ করব।

ডাইনে-বাঁয়ে কাঁধ-ঝুকিয়ে সে তার অনাবিল খুশি প্রকাশ করল। অতিব্যস্ততার মধ্যেও তার অন্য তিনজন সঙ্গী মুহূর্তের জন্য কাজ থামিয়ে সুন্দর বিদায় হাসি হাসল আমার দিকে তাকিয়ে। অর্থাৎ ঃ আসবেন আবার—

মিসফালা এলাকাটা বেশ বড় কিন্তু তুলনায় বাজারটি ছোট। এলাকাটি বর্তমানে কিছুটা বাঙালি এলাকায় পরিণত হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে যেসব তীর্থযাত্রী হজে আসেন তাঁরা সাধারণতঃ এই এলাকাতেই সমবেত হন। বাজারে এলে দু-চারজন বাঙালির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবেই। তা ছাড়া এ-বাজারের দোকানদারদের মধ্যে দেখলাম শতকরা কুড়ি-বাইশজন বাঙালি। বিদেশ এবং বিশেষ করে মক্কার মত আন্তর্জাতিক শহরে এটা কম কথা নয়। এঁরা সকলেই বাংলাদেশী। সৌদি সরকার বাংলাদেশের প্রতি যে সবিশেষ সদয়, নানান ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে তা উপলব্ধি করা যায়।

বাজারে আর যে সব দোকানদার রয়েছেন তাঁদের কেউ আবিসিনিয়ান, কেউ আফ্রিকান, কেউ ইন্দোনেশিয়ান, চীন-মালায়েশিয়া-জাপানের লোকও দেখা যাবে তবে সব থেকে বেশি নজরে পড়বে পাকিস্তানী। মক্কার সর্বত্র পাকিস্তানী দোকানদার ছড়িয়ে রয়েছেন। এই দেশের সঙ্গেও যে সৌদি আরবের এক বিশেষ সখ্যতা এবং বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রয়েছে এই সংখ্যাধিক্য তার প্রমাণ। তবে দোকানদারগণ যিনি যে দেশেরই হোন, সকলকেই সৌদি আরবের নাগরিকত্ব অর্জন করতে হয়েছে, সৌদি নাগরিক না হলে কেউ এ-দেশে দোকান করার অনুমতি পান না। বর্তমানে এই নাগরিকত্ব অর্জনে নানা রকম কঠোর বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে, ফলে সৌদি আরবের নাগরিক হওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। বছর দশেক আগেও এ ব্যাপারে বিশেষ কোন কড়াকড়ি ছিল না।

একটি কথা এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ খাঁটি আরবের যে দীর্ঘকায় রূপোজ্জ্বল গৌরবর্ণ স্বর্ণকান্তি আমাদের মানস-চোখে ঝলমল করে সেই ধরনের একটি মানুষকেও আমি এই বাজারে দোকান করে বসতে দেখিনি। শুধু এই বাজারে নয়—আমার এই প্রায় দুমাস মক্কায় অবস্থানের সময় এই পবিত্র শহরে যে-সব এলাকায় আমি ঘুরেছি, কোথাও কোন দোকানে এঁদের দর্শন পাইনি, একমাত্র বাবুল উমরার সংলগ্ন দুটি দোকানে এই ধরনের দুজন আরবকে দেখেছি, একজনের একটি সোনার দোকান, সোনার স্তূপের মাঝে বসে থাকতেন চুপচাপ, কর্মচারীরা কাজ করতেন আর একজনের ছিল একটি

আতরের দোকান, কাবা শরীফের পাশেই এই দোকানটিকে আলো করে বসে থাকতেন, জীবনে এমন রূপবান পুরুষ আমি আর দেখিনি। একটি মানুষের দেহে যে এত রূপ আর যৌবন থাকতে পারে তা আমি এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম। আজানুলম্বিত সফেদ আরবী পোষাকে মাথায় কালো আবা পরা পরিপূর্ণ যুবক—যেমন দীর্ঘ চেহারা, তেমনি সৌন্দর্যউতল গড়ন, তেমনি পৌরুষ, তেমনি রং। আল্লাহর সৃষ্টি যে কত নিখুঁত আর কত সুন্দর হতে পারে এ যেন তার উজ্জ্বল প্রমাণ। মাঝে মাঝে তাকে দেখার জন্যে দোকানের পাশ দিয়ে যেতাম দেখতাম আতরের দুর্লভ গন্ধকে ম্লান করে দিয়ে দোকানে বসে আছেন, মাঝে মাঝে মনে হত দোকানের সব আলো নিভিয়ে দিলেও দোকান আলোকিত হয়ে থাকবে।

এই সব খাঁটি আরবদের দোকান করে বসে না থাকার একটি প্রধান কারণঃ এই সব শেখেদের প্রায় সকলের তরল সোনার অর্থাৎ পেট্রলের কূপ আছে, কারো একটি কারো একাধিক, কারো বা দশটি-বারটি পর্যন্ত আর এক-একটি কূপ থেকে দৈনিক উত্তোলিত পেট্রলের মূল্য প্রায় পঁচিশ লক্ষ রিয়াল যা ভারতীয় মুদ্রায় দাঁড়ায় সত্তর লক্ষ টাকায়। যাঁদের তৈল কূপ নেই তাঁরা এই পেট্রল সংক্রান্ত অন্যান্য অর্থকরী ব্যবসায় অর্থাৎ প্যাকিং পরিবহন পরিশোধন প্রভৃতি বানিজ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে আছেন যে দোকানে বসে কাপড় বা ঘড়ি বা গহনা বিক্রিটাকে তাঁদের কাছে অতি তুচ্ছাতি তুচ্ছ ব্যবসা বলে মনে হয়। সৌদি আরবের সর্বত্র বর্তমানে গঠনমুখী যে বিপুল কর্মযজ্ঞ চলছে তাতে স্বদেশের শেখদের পাওয়া যাচ্ছে না বলেই সৌদি সরকার হাজার হাজার কোটি রিয়েলের কাজ বিদেশী কন্ট্রাক্টরদের হাতেই তুলে দিচ্ছেন।

মিসফালা সুক-এ অনেকগুলি গোশতের দোকান, এগুলির মালিকদের দেখতাম অত্যন্ত কর্মব্যস্ত অবস্থায় এবং এঁরা সকলেই ভীষণ কালো, তাতে মনে হয়েছে গোশতের দোকানগুলি নাইজেরিয়ান-আফ্রিকানদের এক চেটিয়া। কেবল দুটি মুরগীর দোকান ছিল দুই বাংলাদেশীর। এঁদের সংগে পরে বেশ সখ্যতা

গড়ে উঠেছিল।

বাজারের ভিতর গিয়ে এইমাত্র তুলে আনা তাজা পালং শাখ আর টাটকা ধনে পাতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম ধনেপাতার সংগে পাদিনা আর কারি পাতাও রয়েছে। রয়েছে কুমড়ো টম্যাটো বীন লাউ শশা বেগুন ঢেঁড়স কাঁচা লংকা পাতি লেবু—ঠিক যেন পশ্চিম বাংলার কোন এক হাট। ফলের মধ্যে খেজুর নানান রকম আঙুর লেবু মোসাম্বি কলা আপেল ন্যাসপাতি ডালিম বেদানা —সব ফলই টাটকা এবং সম্ভবতঃ পৃথিবীর মধ্যে সেরা। শব্জির মধ্যে পটল আর ফলের মধ্যে আম-কাঁঠাল এই দুই জিনিসের অভাব বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করলাম। অবশ্য তখন আম-কাঁঠাল বা পটলের সিজন নয় কিন্তু অন্য কোন সময় এই জিনিসগুলি মক্কায় আমদানী হয় কিনা তা আর কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় নি। সব তরকারি টাটকা নয় বিশেষ করে বাঁধা কপি ফুলকপি আলু লাউ প্রভৃতি যে হিম ঘর থেকে সরাসরি বাজারে এসেছে তা বেশ বোঝা যায়।

আমি উপলব্ধি করতে পারছি বাজারদর জানার জন্যে অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক। ১৯৮২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মিসফালা বাজারে জিনিষপত্রের যে মূল্যমান ছিল আমি অবিকল এখানে তুলে দিচ্ছি। মূল্য দিলাম সৌদি রিয়ালে, ঐ সময়ে ব্যাংকে মুদ্রা-বিনিময়ের হার ছিল এক রিয়াল সমান দু টাকা পঁচাশি পয়সা (ভারতীয় মুদ্রায়) ঃ আলু ১ কিলো ৩ রিয়াল কিন্তু বাক্সবন্দী ১১ কিলো আলুর দাম ২৫ রিয়াল, বাক্সবন্দী আলুও ভাল, কোন রকম জাল জুয়াচুরি বা ভেজালের কারবার নেই, পিয়াজের কিলো ৩ রিয়াল কিন্তু নাইলনের জালে ৮ বা ১০ কিলো ওজনের পিয়াজ পাওয়া যায়, তাতে দাম পড়ে কিলো প্রতি সওয়া দু রিয়াল, লাউ কুমড়ো প্রতি কিলো ৩ রিয়াল অবশ্য ৩।৪ কিলো আস্ত লাউ নিলে দাম অনুপাতে কমে যায়, টম্যাটো কিলো ৩ রিয়াল কিন্তু ছোট বড় টম্যাটোয় ভরা ৪ কিলোর একটা বাক্সের দাম মাত্র ৭ রিয়াল অর্থাৎ কিলো দেড় রিয়ালের কিছু বেশি, দুর্মূল্য হয়ে আছে ঢেঁড়স—এক কিলো পঁয়ত্রিশ রিয়াল অর্থাৎ কিলো এক

শো টাকা, এই দ্রব্যটির মূল্য কেন যে এত বেশি তা আমার চিন্তায় আসে না, রসূলুল্লাহ স ঢেঁড়স বেশি পছন্দ করতেন বলে ত শুনি নি, তিনি পছন্দ করতেন লাউ অথচ বাজারে লাউ-এর দামে একটা সমতা আছে, ঢেঁড়সের আমদানীও কম নয় অথচ এই শবজিটি ছোঁয়া যায় না। পালং, বেগুন, শশা তিন-চার রিয়ালের মধ্যে। ধনে পাতা, পদিনা আর কারি পাতার আটি দেড় রিয়াল, কাঁচা লংকার ভাগা এক রিয়াল, আবার এক রিয়ালে পাওয়া যাবে চারটি ভাল সাইজের পাতিলেবু। ফলের বাজারে গেলে আপনি রীতিমত প্রলুব্ধ হবেন। এমন পরিপুষ্ট নিটোল আঙুর সম্ভবতঃ আপনি জীবনে দেখেননি অথচ অতি মিষ্টি আঙুরের কিলো মাত্র আট রিয়াল. শুনলাম শাক শব্জি সহ বিভিন্ন ফলের বিশেষ করে অতি উত্তম আঙুরের ঢালাও চাষ হয় তায়েফে, মক্কা থেকে খুব দূরে নয়। বড় সাইজের অতি মিষ্টি পাকা কলার কিলো তিন রিয়াল. অথচ যে খেজুরের জন্য মরুভূমি বিখ্যাত সেই আরবী খেজুরের ভালটা সংগ্রহ করতে গেলে এক কিলোর জন্য আপনাকে দশ রিয়াল খরচ করতেই হবে, আট রিয়ালে পাওয়া যাবে একটু নিম্নমানের, মোসাম্বি এক কিলো চার রিয়াল। এ ছাড়া আঙুর কলা মোসাম্বি কমলা আনারস প্রভৃতি ফলের রস ছোট ছোট এয়ার-টাইট টিনের প্যাকেটে এবং বরফ-ঠাণ্ডায় পাওয়া যায়। এগুলি খুবই সুস্বাদু এবং সস্তা—মাত্র এক রিয়াল। আর এ জন্যেই এগুলি অত্যধিক জনপ্রিয়। হজযাত্রীদের কাছে ডিম খুব প্রিয় খাদ্য, একটু ভেজে বা সিদ্ধ করে নিলেই অতি অল্প সময়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য হয়ে যায়, দু রিয়ালে পাবেন পাঁচটি। গোশতের দোকানে যাওয়া কঠিন। খাসি ভেড়া দুম্বা উট মোষ গরু সব রকম গোশতই পাওয়া যায় এবং সবগুলি খুবই উৎকৃষ্ট মানের কিন্তু বিনিময় মূল্যটাও কম উৎকৃষ্ট নয়, কুড়ি রিয়াল কিলো। কমবেশি সব রকম গোশতের দামই এক, কিমা করালে দাম বেড়ে যায় অস্বাভাবিক —এক কিলো পঁচিশ রিয়াল। তুলনায় মুরগীর গোশত খুবই সস্তা, এত সস্তা যে এসবের সংগে তার কোন তুলনাই চলে না। এক একটি ছোট আকারের মুরগীতে প্রায় দেড় কিলো গোশত পাওয়া যাবে, দাম মাত্র পাঁচ থেকে ছ রিয়াল,

বড়গুলির দাম দশ রিয়াল —আড়াই থেকে তিন কিলো গোশত বাঁধা। আর এই গোশতগুলি এত নরম যে আগুনে বসাতে যা দেরী, পনের থেকে বিশ মিনিটে একেবারে গলে ক্ষীর, স্বাদেও কোন ঘাটতি নেই। ছাড়াবারও কোন ঝামেলা থাকে না কেননা মুরগী-অয়ালাই জবাই করে গরম পানিতে ডুবিয়ে ছাড়াই মেসিনে ফেলে দেয়—দশ সেকেণ্ডেরও কম সময়ে একেবারে পরিষ্কার হয়ে বেরিয়ে আসে, ছোট-বড় কোন পালকের কোন চিহ্ন থাকে না, বাড়িতে এসে সামান্য একটু দেখে খুঁটে নিলেই চলে। সস্তা খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখলাম মুরগীর থেকে সস্তা আর কোন খাবার মক্কা শরীফে নেই।

চট্টগ্রামের এক ভদ্রলোক মাছ নিয়ে বসতেন। মিসফালা বাজারে ঐ একটি মাত্র মাছের দোকান, সব সময় ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি অনেক সময় মাছগুলির আকৃতি-প্রকৃতি দেখতাম। কাৎলা রুইয়ের আকৃতি নয় অথচ মাছের আকার—সবগুলোই সামুদ্রিক। লোহিত সাগরে ধরা হয় এ মাছ, জেদ্দা হয়ে চলে আসে মক্কার বিভিন্ন বাজারে। অবসর সময়ে এই মানুষটির সংগেও বহু গল্প করেছি কিন্তু কোনদিন মাছ কেনার সৌভাগ্য হয় নি। আমার স্ত্রী মাছ বাছতে পারেন না, এই একটি কাজ ছোট বেলা থেকে কেন যে তিনি অবহেলায় এড়িয়ে এসেছেন আমি জানি না, এই বয়সে সে ত্রুটি সংশোধনের আর কোন উপায় নেই। এ নিয়ে আমিও আর কোন জোর করি নি। শুনেছি সামুদ্রিক এই মাছগুলি খেতে বেশ সুস্বাদু।

মিহি, অতি মিহি চাল ছাড়াও মাঝামাঝি ধরনের এক রকম আমেরিকার চাল পাওয়া যায়, এ সব দুই থেকে চার রিয়ালের মধ্যে। ডাল, ময়দা, চিনি এ সবের মূল্যও বেশ কম। উৎকৃষ্ট ময়দার প্যাকেট নিলে এক থেকে দেড় রিয়াল কিলোতে পাবেন। ঘি মাখন পনির মিল্ক পাউডার এসব বিদেশের, অধিকাংশই অষ্ট্রেলিয়া বা সুইডেনের, খুবই উৎকৃষ্ট মানের দাম একেবারেই বেশি নয়। মোটা প্লাস্টিকের ছোট ছোট গোল এবং চৌকো বাক্সে বা প্যাকেটে পাওয়া যায় এক রকম জমান টক দই। হাফ কিলো চার রিয়াল, ছোট দু রিয়াল এবং এটি মক্কাবাসীদের খুবই প্রিয়। বাজারে এমন একটি

শবজি বা ফল চোখে পড়ল না যেটা কেবল মাত্র মরুতেই উৎপন্ন হয় এবং যেটি সৌদিদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত, বরং সব কিছুই আমাদের একেবারে বাঙালিদের মত। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখলাম জৈতুন ফল আর জৈতুন তেল—এ দুটোই মরুতে খুব জনপ্রিয়। মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনে জৈতুনের উল্লেখ আছে। রুটি বা ভাল যে কোন খাদ্যের সংগে এঁরা টক বা আচার জাতীয় জিনিষ একটু বেশি পছন্দ করেন। পনির এবং জয়তুনের আচার বহুল প্রচলিত খাদ্যোপকরণ। ফুলকপি এবং কাঁচা লংকার আচার প্রায় দোকানেই পাওয়া যায়। অত্যন্ত গরমের দেশ বলেই হয়ত টক জাতীয় খাদ্যের প্রতি সৌদিদের এই স্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। টকের প্রতি আরববাসীদের এই আগ্রহ দেখে আমি বিভিন্ন হাদীস থেকে জানার চেষ্টা করেছি আমার রসুল টক ভালবাসতেন কিনা। কিন্তু কোথাও সঠিক উত্তর পাইনি। হয়ত বাসতেন হয়ত বাসতেন না। কিন্তু বিভিন্ন হাদিস থেকে এটা সঠিক প্রতিপন্ন হয়েছে যে তিনি বিশেষভাবে ভালবাসতেন মধু এবং মিষ্টি। এই বিশেষ জিনিষটিও তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় থাকত না, তিনি ত আজীবন এক বেলা আধপেটা খেয়েছেন আর অন্য বেলা প্রায় অভুক্ত থেকেছেন। একমাত্র আমার মত পশুই দু বেলা পেটপুরে আহার করে আর আল্লাহকে ভুলে এবাদাত থেকে দূরে সরে পশুর মতই অঘোরে নিদ্রা যায়।

বাজারে ঘুরছিলাম, নতুন পরিবেশটিকে দু চোখ মেলে দেখার আগ্রহ ছিল, জিনিষপত্রের দামও জেনে নিচ্ছিলাম কিন্তু সকল কাজ সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে প্রতি মুহূর্তেই সেই আলৌকিক গৃহের প্রতিচ্ছবি আমার হৃদয় কাবায় ভেসে উঠছিল। বাজারে দাঁড়িয়ে আমি অনুভব করলাম ভিতর ভিতর আমি বেশ অস্থির হয়ে উঠছি। কেবল বাজার করা আর খাবার জন্যে ত আমি এত পথ ছুটে আসি নি।

ইয়াকুব আদমের হাত ধরে তাকে এক রকম জোর করে টেনে নিয়েই আমি বাজার থেকে বেরিয়ে এলাম।

বাজারের একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমি গভীর ভাবে আকৃষ্ট

হয়েছি এবং সেটি উল্লেখ না করলে অন্যায় করব। ওজন এবং মাপ সম্পর্কে এখানকার প্রতিটি দোকানদার বিশেষ ভাবে সচেতন। আপনি যে কোন জিনিষ এক কিলো যদি বাড়িতে পুনরায় ওজন করেন দেখবেন কম ত হচ্ছেই না বরং একশো থেকে দেড় শো কোন কোন ক্ষেত্রে দু শো গ্রাম পর্যন্ত বেশি হয়েছে। এক ফলঅলার কাছে আঙুর কিনতে গিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়লাম। দামী জিনিষ, হাফ কিলো আঙুর দিতে বলায় তিনি পাল্লা এত ঝুঁকিয়ে দিলেন যে আমার মনে হল কম করেও দু শো গ্রাম বেশি হয়ে গেছে এবং যার দাম প্রায় দু রিয়াল অর্থাৎ প্রায় ছ টাকা। এ ভাবে আঙুর নেওয়া আমার কাছে অন্যায় মনে হল। শুধু আঙুর নয় চাল ডাল আলু পেঁয়াজ যা নেবেন—সর্বত্র ওজন একই রকম। ওজন এবং মাপ সম্পর্কে কোরআন শরীফে আল্লাহ সকল মানুষকে কঠোর ভাবে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। আমি এ সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত এখানে উদ্ধৃত করছি ঃ

ক. সুতরাং তোমরা মাপ ও ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকেদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না,...তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের পক্ষে এইটিই কল্যাণকর।

খ. মাপ দেবার সময় পূর্ণ মাপ দেবে এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করবে—এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্ট। ১৭ ঃ ৩৫

গ. মাপ পূর্ণমাত্রায় দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের মত হয়োনা এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। লোকেদের তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাবে না। ২৬ ঃ ১৮১-৮৩

ঘ. ন্যায্য ওজনের মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে কম দিও না। ৫৫ ঃ ৯

ঙ. যারা ওজনে কম দেয় তাদের জন্য বড় আক্ষেপ! যারা লোকের কাছ থেকে মেপে নেবার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন তাদের জন্য মাপে তখন কম করে দেয়—ওরা কি ভাবে না যে ওরা পুনরুত্থিত হবে মহাদিনে, যেদিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে বিশ্বজগতের প্রতিপালকের সম্মুখে ? এ প্রকার আচরণ অনুচিত। ৮৩ ঃ ১-৭

আল্ কোরআনে ত বটেই—হাদীস শরীফেও মাপ এবং ওজন সম্পর্কে কড়া নির্দেশ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে সৌদি জনগণ কোরআন-হাদীস মোতাবেক তাঁদের ব্যবহারিক জীবনাচরণ গড়ে তুলেছেন। সামান্য দু মিটার কাপড় কেনার সময়ও দেখেছি সঠিক মাপ দিয়েও অন্ততঃ আধ হাত পৌনে এক হাত কাপড় বেশি ছেড়ে দিয়ে কাটছেন। আমাদের দেশে এক সের জিনিষ নিলে আট শো পাবেন, ওজনে ত কম দেবেই আবার বাঁটখারাতেও কারচুপি। তিন মিটার কাপড় কিনতে গেলে দোকানী কাপড় এমন ভাবে টান করে ধরবে যে সঠিক মাপে পৌনে তিন মিটার দাঁড়াবে। গোয়ালার দুধ মাপাও আমাদের এখানে বড় বিচিত্র। প্রথমতঃ পোয়াতে কারচুপি, তারপর প্রায় অর্ধেক পানি মেশানোর কথা আর নাই বা উল্লেখ করলাম। অর্থাৎ লোক ঠকান এখন আমাদের জাতীয় চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক কষ্টে বিদেশের কোন অর্ডার সংগ্রহ করে যখন সেখানে আমরা মাল পাঠাই, এই মনোবৃত্তির জন্যই সেখান থেকে মাল ফেরৎ আসে, অর্ডার ক্যানসেল হয়, পৃথিবীর সামনে সমগ্র ভারতের মাথা হেঁট হয়ে যায়।

বাজার ঘুরে, সব দেখে শুনে, আমার মনে এমন ধারণা হয়েছে যে এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত থেকে আমাদের মত নীতিহীন অমানুষের দল হজের ছল-ছুতোয় সৌদি আরবের পবিত্র মাটিতে এসে এদেশের আইন-শৃঙ্খলাকে একটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যেমন ঃ আগে মক্কায় জিনিষ পত্র এক দামে বিক্রি হত, এখন আমাদের মত চরিত্রের লোকদের আমদানীতে রীতিমত দামাদামী চলে এবং দাম কমেও। হজের মৌসুমে জিনিসপত্রের দাম হঠাৎ দু-তিনগুন বেড়ে যায়, আগে এমনটি হত না, সরকারপক্ষ কিছুতেই এটা রোধ করতে পারছেন না, কেননা দোকানদারেরা ত এ দেশীয়, তাদের চরিত্র আর কত শোধরাবে। উপরে আমি যে বাজার দর দিয়েছি তা কখনই সৌদি আরবের স্থায়ী দর নয়, হজের মরশুম শেষ হয়ে গেলে সব জিনিষের দাম নিশ্চতভাবে অর্ধেক কমে যাবে, কোন কোন ক্ষেত্রে তারও কম। আরও একটা উদাহরণ পেশ করি। বাজারে যে কোন পচা বা দাগী জিনিষ ফেলে দেওয়া হয়, সৌদি

সরকারের নিয়মানুযায়ী তা দিতেই হয় কিন্তু কিছু বাংলাদেশীকে দেখেছি সেই দাগধরা কলা আপেল আঙুর ইত্যাদি নিয়ে রাস্তার একটা অন্ধকার জায়গায় বসে আমাদের মত চরিত্রবান হাজিদের কাছে তা অল্প দামে বিক্রি করছেন। রাস্তার কোন স্থানে কোন হকারকে বসতে দেওয়া হয় না কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা কিছু উপার্জনের ধান্দায় যেখান-সেখান বসে যায়, পুলিশের হাতে মার খায়, ধরা পড়ে, মালপত্র নষ্ট হয়, তবুও আবার বসে, লজ্জা নেই। সম্ভবতঃ আমাদের জাতীয় চরিত্র থেকে লজ্জা জিনিষটা উঠে গেছে। আর রসুলুল্লাহ বলেন ঃ যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই।

আমাদের দেশের লোক এবং হাজিরা এখন সৌদি আরবের মস্ত বড় সমস্যা।

মিসফালা বাজারের গায় একটি রাস্তা, রাস্তাটি সোজা কাবা শরীফে চলে গেছে। অবশ্য মক্কার সব রাস্তাই শেষ হয়েছে এই মহাপুণ্যভূমিতে, মাটির উপর দিয়ে পৃথিবীর সব নদনদী যেমন মহাসাগরের বুকে এসে হারিয়ে যায়। এই রাস্তার উপরেই আমাদের দু দিনের নতুন আস্তানা। দু দিনের ? না ক্ষণিকের ? পার্থিব জীবনই ত দুদণ্ডের সুতরাং এই আস্তানা একেবারেই ক্ষণিকের। রসুলুল্লাহর জন্মভূমিতে এসে বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে। হযরত ইবনে মসউদ রা একদিন এসে দেখলেন যে রসুলুল্লাহ একটি অতি সাধারণ খেজুরের চেটাইয়ের উপর নিদ্রা যাচ্ছেন এবং তাতে তাঁর উজ্জ্বল পিঠে অনেকগুলি দাগ পড়েছে। ইবনে মসউদ রা ভীষণ ব্যথা পেলেন। অত্যন্ত আপ্লুতকণ্ঠে তিনি বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ, আপনি যদি অনুমতি করেন তা হলে আপনার জন্যে একটি (নরম) শয্যা তৈরি করি। শুনে তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে আমার কি প্রয়োজন ? একজন অশ্বারোহী যেমন ক্ষণিকের জন্য গাছতলায় দাঁড়ায় এবং পরক্ষণেই তা ত্যাগ করে, আমার সংগে পৃথিবীর সম্পর্ক তো সেই রকম।'

কত ক্ষণস্থায়ী আমাদের এই পার্থিব জীবন, অথচ এ জীবন নিয়েই আমাদের কত দম্ভ, কত অহংকার !

বাজার থেকে বেরিয়েই আমাদের এই নতুন গৃহটির দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালাম, পাঁচ তলা বিশাল বাড়ি। আদমজীকে শুধালাম, বাড়িটি কার ? আদমজী বললেন, বাড়িটি এক সৌদির। তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বাড়িটা এক বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছেন এক পাকিস্তানী, ভাড়া দিতে হয়েছে পঁচাত্তর হাজার রিয়াল।

ইয়াকুব আদমের কাছ থেকে আরো জানলাম সেই পাকিস্তানী ভদ্রলোক সপরিবারে এই বাড়িতেই থাকেন। অবশিষ্ট ঘরগুলি তিনি এক বছরের জন্য অন্যদের ভাড়া দিয়েছেন। সাত হাজার রিয়ালের বিনিময়ে আদমজী এক বছরের জন্য যে প্রশস্ত রুমটি ভাড়া নিয়েছিলেন আমরা সেই রুমটি আট হাজার রিয়াল দিয়ে ভাড়া নিলাম এই কদিনের জন্য। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াল ঃ আমরা হলাম সাবটেনেন্টের সাবটেনেন্ট আর আদমজীর একবছর থাকাও ফ্রি হয়ে গেল, উপরন্তু এক হাজার রিয়াল লাভ হল। যাক, এ নিয়ে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই, বিনিময়ে তিনি যে সেবা আমাদের দিয়েছেন তার কোন তুলনা হয় না। আমরা তাঁর কাছে ঋণী, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ সর্ববিষয়ে তাঁর মঙ্গল করুন !

পাঁচতলা বিল্ডিং, রুমের সংখ্যা ছত্রিশ। নিচের রুমগুলি দোকান, সেগুলির ভাড়া অত্যধিক, বার্ষিক কুড়ি থেকে ত্রিশ হাজার রিয়াল। অর্থাৎ এরকম একটা ঘর থেকে মক্কা শরীফে ভাড়া বাবদ আয় হয় তিন লক্ষ রিয়াল, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ন লক্ষ টাকা। ভাবা যায় না।

অবশ্য সস্তার ঘরও আছে। যেমন এক হাজীসাহেবের সংগে আলাপ হল, শুনলাম মিসফালা অঞ্চলেই একটি রুম মাত্র দেড় হাজার রিয়ালে ভাড়া নিয়ে মিলেমিশে আছেন দশজন। এ সব ঘরে আনুপাতিক হারে, বসবাসের নানাবিধ সুবিধা অনেক কম থাকে। আবার এমনও দেখা গেছে, বেশি ভাড়া পাওয়ার লোভে অনেক বাড়িওয়ালা উন্নতমানের রুমগুলি নিয়ে বেশি রকম দামাদামী করেন এবং শেষ পর্যন্ত মক্কাশরীফে পৃথিবীর সকল প্রান্ত থেকে

হজযাত্রীদের আগমন শেষ হয়ে গেলে যখন আর কোন চাহিদা থাকে না তখন রুমগুলি নাম মাত্র রিয়ালের বিনিময়ে ভাড়া দিতে বাধ্য হন, কখনো কখনো ঘর খালি পড়ে থাকে। আমাদের সময় অর্থাৎ ১৯৮২ সালের হজ মৌসুমে অনেক উন্নতমানের হোটেলে রুম খালি পড়েছিল।

হজযাত্রী যাঁরা আসেন তাঁরা সাধারণতঃ কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে তার চার পাশে অবস্থান করেন আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতে পড়ার বাসনায় বেশি দূরে কোথাও যান না। কেননা আল্লাহ কাবা শরীফের ইজ্জত এবং ফজিলত এত বেশি দিয়েছেন যে এখানে নামায পড়লে এক লক্ষগুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। পৃথিবীর আর কোন মসজিদের যে এই ইজ্জত থাকতে পারে না সে ত জানা কথাই। সহী হাদীস থেকেও একথা প্রমাণিত হয় ঃ "রসুলুল্লাহ বলেন, বাসগৃহে নামায পড়লে এক নামাযের সওয়াব পাওয়া যায় কিন্তু মহল্লার মসজিদে পড়লে পঁচিশ নামাযের, জামে মসজিদে পড়লে পাঁচ শ নামাযের, মসজিদে আকসায় (বায়তুল মুকাদ্দাস ঃ জেরুজালেমে) পড়লে এক হাজার নামাযের, আমার মসজিদে (মসজিদ নববী বা নবীর মসজিদ ঃ মদিনা) পড়লে পঞ্চাশ হাজার নামাযের এবং মসজিদুল হারামে (কাবা শরীফ) পড়লে এক লক্ষ নামাযের সওয়াব পাওয়া যায়।"—ইবনে মাজা। তাই সাধারণতঃ পায়ে হেঁটে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের মধ্যে যাতে কাবা শরীফে পেঁাছান যায় এমন দূরত্বই হাজিসাহেবগণ পছন্দ করেন। এর থেকে বেশি দূরে গেলে সত্যই নামাযে যোগ দেবার ভীষণ অসুবিধা হয়। অবশ্য বাস-জার্নির দশ মিনিটের দূরত্বে ঘর নিলে এত কম ভাড়ায় এত প্রশস্ত আর বহু সুবিধাযুক্ত ঘর পাওয়া যাবে যা চিন্তা করাই চলে না। কিন্তু সাবধান ভাড়া কম খুঁজতে গিয়ে যেন আসল কাজে ফাঁকি না হয়ে যায়।

আরবী বছরের প্রথম মাস মুহররম আর শেষ মাস জিলহজ। সৌদি আরবের নিয়মানুযায়ী জিলহজ মাস শেষ হবার সংগে সংগেই সর্বশ্রেণীর ভাড়াটিয়াকে ঘরের দখল ছেড়ে দিতে হয়। অর্থাৎ

ভাড়াটিয়ার সংগে বাড়িঅয়ালার মাত্র এক বছরের কন্ট্রাক্ট থাকে। মুহররম মাসে যখন নতুন করে কন্ট্রাক্ট শুরু হয় তখন কিছু না কিছু ভাড়া বেড়ে যায়। যাঁর সামর্থ থাকে তিনি বেশি ভাড়া স্বীকার করে নতুন চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন অন্যথায় বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যান। আমরা যে বাড়িতে উঠেছি, জিলহজের শেষে এই বাড়ির ভাড়া পাঁচ হাজার রিয়াল বেশির বিনিময়ে নতুন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল আর ইয়াকুব আদম অতিরিক্ত এক হাজার রিয়াল দিয়ে তাঁর রুমটি দখল পেয়েছিলেন। এই বাড়ির নিচে গৃহসজ্জার যে বিশাল সুসজ্জিত দোকানটি ছিল, একদিন রাতে কাবা শরীফ থেকে ফেরার পথে দেখি সেটির ভাঙচুর শুরু হয়ে গেছে, দু দিন পর তার জায়গায় দৃশ্যবহুল একটি অতি আধুনিক দোকান গড়ে উঠল। এ সবই ঘটে গেল আমাদের সামনে এবং মাত্র তিন-চার দিনের মধ্যে। সাধারণ ভাড়াটিয়াদের একটি ফ্লাট ছেড়ে নতুন ফ্লাটে যেতে হয়ত খুব বেশি অসুবিধা হয় না, কিন্তু একটি সাজান-গোছান সুসজ্জিত অতি আধুনিক দোকান হঠাৎই স্থানান্তরিত করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু সৌদি আরবে সকলকেই তা করতে হয় এবং প্রতি মুহররমের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই। আমাদের দেশে বর্তমানে যা আইন তাতে বলা যায় ভাড়াটিয়ারাই বাড়ির মালিক, সৌদি আরবে বাড়ির মালিকেরাই যথার্থ বাড়ির মালিক।

যৎসামান্য বাজার নিয়ে যখন তিন তলায় উঠে এলাম, দেখলাম আমার স্ত্রী কোমরে কাপড় জড়িয়ে ভীষণ ভাবে কামরাটিকে ভদ্রস্থ করার কাজে ব্যস্ত। হাশ্‌মি ইশরাত অর্থাৎ দিল্লির বৃদ্ধা মহিলা তাঁর চালডাল বার করে দিয়েছেন সুতরাং ইতিমধ্যে খিচুড়িও প্রস্তুত। আমি যেতেই ব্যাগ থেকে কয়েকটা আলু বার করে বাছতে বসে গেলেন গুজরাটি মহিলা। দশ মিনিটের মধ্যে আলু ভাজিও তৈরি অর্থাৎ খেতে বসলেই হয়। গোসল করতে যাব হঠাৎ ইয়াকুব বললেন দাঁড়ান একটু রিদ্ স্প্রে করে দিই বাথরুমে, ভীষণ মশা।

জংলা পচা জায়গায় মশা হয় জানি কিন্তু মরুর দেশে মশা ! কেমন যেন খটকা লাগল। এখানে গাছপালা বিরল, বৃষ্টি ত নেই বললেই

চলে অথচ মশা ! আমি ইয়াকুবের সংগে বাথরুমে চলে এলাম। দেখলাম সত্যই মশা উড়ছে ভন ভন করে। ইয়াকুব তখন রিদ্ ছড়াতে শুরু করেছে। রেড এর আরবী উচ্চারণ রিদ্—এক রকম কড়া কীটনাশক ওষুধ। কীটনাশক কিন্তু সুগন্ধি, আমাদের এখানে দামী সেন্টের মুখ টিপলেই যেমন স্প্রে হয়ে গায়ে ছড়িয়ে পড়ে—রিদেও ঠিক সেই ব্যবস্থা, ফোয়ারার মত জোরাল স্প্রে। দু-তিন মিনিট পর ইয়াকুব বললেন, যান—গোসল করুন এবার। সত্যই মক্কায় মশার উপদ্রব আছে বেশ, প্রায় প্রতি রাতেই আমাদের স্প্রে করে নিদ্রা যেতে হয়েছে কিন্তু মিনার মরুতে যে পাঁচ দিন আমরা অবস্থান করেছিলাম, মশকের কোন দংশনই সহ্য করতে হয়নি। মদিনাতেও মশা খুবই কম, অন্ততঃ আমরা যে ঘরে ছিলাম সেখানে এ কীটের উপস্থিতি বিশেষ লক্ষ্য করিনি।

সকলের গোসল শেষ হলে আমরা একত্রে অতি অল্প সময়ে খিচুড়ি আর আলু ভাজা দিয়ে মধ্যাহ্নের আহার পর্ব পরম পরিতৃপ্তির সংগে সমাপ্ত করলাম। আল হামদো লিল্লাহ !

মসজিদুল হারাম-এ যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি—স্ত্রী বললেন, দেখছেন ত ঘরে বেশ কিছু কাজ বাকি। আপনি জোহর পড়ে আসুন, আমরা আসরের ওয়াক্তে এক সংগে যাব আর এশা পড়ে ফিরব।

আমি আর দ্বিরুক্তি না করে বিসমিল্লাহ বলে বেরিয়ে পড়লাম। মধ্যাহ্নের মরুর সূর্য বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে। উত্তাপে ঝলসে যাচ্ছে সব। বিগত দিনের ক্লান্তিতে বেশ পরিশ্রান্ত ছিলাম, তার উপর এই অস্বাভাবিক উত্তাপ—আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি আর দেখছি জনস্রোত কেমন ব্যাকুল হয়ে উদ্দাম গতিতে চলেছে কাবার দিকে, হঠাৎ এক ভদ্রলোক উর্দুতে আবেগ ভরা কণ্ঠে বললেন, কেন দাঁড়িয়ে আছেন ? বাসের জন্য যতক্ষণ অপেক্ষা করবেন ততক্ষণে পৌঁছে যাবেন। এইত সামান্য পথ, অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, হেঁটে আসুন।

উত্তাপ-জনিত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অন্ধকার যেন হঠাৎ আলোর

ঝলকানিতে ভেসে গেল। লোকটিকে মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। পরম প্রভুকে জানালাম শুকরিয়া। এই প্রথম মিসফালা থেকে কাবা শরীফে যাচ্ছি সুতরাং রাস্তা চিনে ঠিক মত যেতে পারব কিনা এই ধরনের একটি দ্বন্দ্ব যখন বাড়ি থেকে বেরুই মনের মধ্যে দুলছিল, এখন তা নিতান্তই অমূলক মনে হল। এই জনস্রোত ত সেই মহাসাগরের দিকেই ধাবমান, এই মুহূর্তে মক্কা-শরীফের সকল দিক থেকে সহস্র ধারায় জনসমুদ্র অবিরাম সেই মহাসাগরের দিকেই এগিয়ে চলেছে। সুতরাং আমি আর কোন দ্বিধা না করে সেই চলমান জনস্রোতে মিশে গেলাম, হারিয়ে গেলাম।

১১.

সাত সেপ্টেম্বর উনিশশো বিরাশি বিশ জিলকদ চোদ্দশ দুই হিজরী মঙ্গলবার মধ্যাহ্নের কিছু পূর্বে উজ্জ্বল দিনের আলোয় আমি মসজিদুল হারাম-এ প্রবেশ করলাম। কাল গভীর নিশীথে যে অলৌকিক গৃহকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম, আজ মধ্যাহ্নের পর্যাপ্ত আলোয় তা দ্বিতীয়বার প্রত্যক্ষ করলাম। আমার সম্মুখে কালো গেলাফে ঢাকা সমুন্নত সেই গম্ভীর গৃহ, যা অর্ধেক স্বপ্নের অর্ধেক বাস্তবের, অর্ধেক লোকালয়ের অর্ধেক বেহেশতের, যার অর্ধেক বোঝা যায় অর্ধেক যেন স্বপ্নের ঘোরে হারিয়ে যায়। চেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি বেশ কিছু কিন্তু সমস্তটা কিছুতেই ধরতে পারি না। চিরমহিমামণ্ডিত সেই বিশাল গৃহ মধ্যাহ্নের আলোয় সুস্পষ্ট রূপ ধরে দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে কয়েক লক্ষ মানুষ কাতারে বসে জোহরের নামাযের জন্য অপেক্ষারত। কয়েক মিনিট পরেই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শোনা যাবে আযান, তারপর কাবাকে কেন্দ্র করে শুরু হবে নামায, রুকু সিজদা সব কিছুই আবর্তিত হবে এই মহান গৃহকে কেন্দ্র করে। কেবল এখানে সমাবেত হওয়া এই সামান্য কয়েক লক্ষ মানুষের নয়—নিখিল বিশ্বের কোটি কোটি বিনীত মস্তক এই গৃহকে লক্ষ্য করেই এই মুহূর্তে লুটিয়ে থাকবে সিজদায়। মসজিদের ভিড়ে একটু জায়গা করে নিয়ে আমি অপলকে তাকিয়েছিলাম এই বরকতময় আশিসপ্রাপ্ত গৃহের দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে প্রশ্ন জাগল ঃ পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যে গৃহের প্রতি এমন আবেগপ্লুত আর শ্রদ্ধানত—কবে সৃষ্টি হয়েছিল সেই গৃহের, কি তার ইতিহাস ? কেনই বা এ গৃহ এমন আশিসপ্রাপ্ত ?

এই পবিত্র গৃহের ইতিহাস অবশ্যই আমাদের জানা দরকার। মহাগ্রন্থ কোরআন শরীফে আল ইমরানের ৯৬ সংখ্যক আয়াতটি থেকে আমরা কাবা শরীফের ইতিহাসের সঠিক সূত্র এবং দুর্লভ উপকরণ পেয়ে যাই।

এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটির কয়েকটি অনুবাদ আমরা পরস্পর তুলে দিচ্ছি ঃ

"নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্য নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।" তফসীরে মা' আরেফুল কোরআন, ২য় খন্ড, পৃ ১১৫, মুফতী মুহাম্মদ শফী রা।

"নিশ্চয় সমস্তের পূর্বে যে গৃহ মানবকুলের জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে, তাহা ঐ ঘর, যাহা মক্কায় অবস্থিত ; যাহার অবস্থা এই যে, উহা বরকত বিশিষ্ট এবং সমস্ত বিশ্বাসীর জন্য পথ প্রদর্শক।" তফসীরে আশরাফী, চতুর্থ পারা পৃ ৪, মাওলানা আশরাফ আলি থানবী রা।

"নিশ্চয় (জানিও), সমগ্র মানব সমাজের জন্য সর্বপ্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে এবাদাতখানা, বাক্কাতেই অবস্থিত আছে তাহা—বহু কল্যাণ পূর্ণ হইয়া আছে তাহা এবং তাহা হইতেছে সারা জাহানের জন্য পথপ্রদর্শক।" কোরআন শরীফ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ।

"মানুষের জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাই এই মক্কার বুকে, বরকত সম্পন্ন এবং বিশ্বাসীর পথের দিশারী সন্দেহ নাই।" মাওলানা মুহম্মদ তাহের।

"নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়), উহা আশিস-প্রাপ্ত এবং বিশ্বজগতের দিশারী।" হরফ প্রকাশনী প্রকাশিত কোরআন শরীফ, পৃ ৫২।

কাবা শরীফ সম্পর্কিত আল্-কোরআনের এই অতিখ্যাত আয়াতটির পাঁচটি অনুবাদ আমরা উদ্ধৃত করেছি। অনুবাদগুলির প্রতি নিবিষ্টচিত্ত হলে দুটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি প্রথমেই আমরা বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হই ঃ

ক. মানবজাতির জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত গৃহ হল কাবা শরীফ।

খ. মানবজাতির জন্য প্রথম উপাসনালয় হল এই গৃহ।

অনেক তফসীরকার এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলতে চান

কাবাশরীফ হল পৃথিবীর বুকে প্রথম প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয়—এবাদাতখানা, কিন্তু প্রথম বাসগৃহ নয়। আবার অনেক তফসীরকার এমন কি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত মুজাহিদ, হযরত কাতাদাহ, হযরত সুদ্দী প্রমুখ সাহাবী এবং তায়েবীগণের মতে—বায়তুল্লাহ অর্থাৎ কাবাশরীফই বিশ্বমানবের জন্য প্রথম বাসগৃহ এবং প্রথম উপাসনালয়, এর পূর্বে মানুষের কোন বাসগৃহ ছিল না। দুই দলের মধ্যে মতদ্বৈততা থাকলেও কাবাশরীফই যে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম উপাসনালয় এ বিষয়ে সকলে এক মত। এখন প্রশ্ন থাকে এটি প্রথম বাসগৃহ কিনা। এটি যে বাসগৃহ নয় সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই কেননা কাবাশরীফ বসবাসের জন্য নির্মিত হয়নি, হয়েছিল কেবল এবাদাতের জন্য। তবে এমন হতে পারে হযরত আদম, প্রথম মানুষ এবং প্রথম পয়গম্বর, পৃথিবীতে এসেই নিজের বসবাসের গৃহ অপেক্ষা আপন প্রভু আল্লাহর এবাদাতের জন্য একটি ঘরের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব ও উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী আল্লাহর নির্দেশে জিবরাইল আ কর্তৃক ইংগিত ও বাণীপ্রাপ্ত হয়ে হযরত আদম প্রথমে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং কাবাশরীফই একাধারে বিশ্বের প্রথম গৃহ এবং প্রথম উপাসনালয়। এরপর অন্যান্য বাসগৃহ নির্মিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে এমনও হতে পারে, বাসগৃহ পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল, এবাদাতের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত গৃহ হল কাবাশরীফ। খলিফা হযরত আলি আ এই মতটি সমর্থন করেন।

আল্-কোরআনের কয়েকটি আয়াত এবং বিচ্ছিন্ন কিছু হাদীস এর উপর সম্বল করে বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ কাবাশরীফের নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে যে ধারণা করেন তা আমরা একে একে উল্লেখ করছি। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা আছে আবার বেশ কিছু কিংবদন্তীও মিশ্রিত হয়েছে। এই কিংবদন্তীগুলি রসুলুল্লাহ স-এর জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বের কিছু অর্ধ-ঐতিহাসিক ঘটনার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আবার এই কিংবদন্তীগুলির সঙ্গে আল্-কোরআনের আয়াতের

কিছু সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলি অনেকেই সত্য বলে বিশ্বাস করেন। পূর্বের ঘটনা যাই হোক, হযরত মুহম্মদ স-এর আমল থেকে কাবাশরীফ সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট এবং ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বাংলাভাষায় এই পবিত্র গৃহের সঠিক ইতিহাস আজ পর্যন্ত কেন রচিত হয়নি তা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। 'কাবার পথে' ইতিহাস রচনার অবকাশ কম, আমি কেবল একটি রূপরেখাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

হযরত আদম আ ও বিবি হাওয়া যখন বেহেশত হতে নির্বাসিত হন তখন তাঁরা পৃথিবীতে এসে বিছিন্ন হয়ে পড়েন, অবশেষে যখন পুনর্মিলিত হন, হযরত আদম আ কাতর কণ্ঠে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন ঃ হে আল্লাহ ! বেহেশতে অবস্থানের সময় আমি ফেরেশতাগণের সঙ্গে সপ্ত আসমানে বায়তুল মামুর নামে যে আলোকিত গৃহটিকে প্রদক্ষিণ করতাম এবং যেখানে আপনার এবাদাত করতাম, তেমন একটি উপাসনা গৃহ আমার জন্য পৃথিবীতে দিয়ে দিন। এই আত্মনিবেদিত প্রার্থনা কবুল হয় এবং বায়তুল মামুরের অবিকল প্রতিকৃতি পৃথিবীতে নেমে আসে, সেই প্রতিচ্ছবিই হল কাবাগৃহ। এ প্রসঙ্গে একটি বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে হযরত আদম আ বেহেশত থেকে পৃথিবীতে মক্কায় নিক্ষিপ্ত হন। হযরত জিবরাইল আ তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং আপনার নূরের পাখা দ্বারা মাটিতে আঘাত করেন ফলে একটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয় এবং তা পৃথিবীর নিম্নতম সপ্তম স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করে। তখন অন্যান্য ফেরেশতাগণ লেবানন তূর জুদী এবং হেরা পর্বত হতে প্রস্তরখন্ড এই ভিত্তিমূলে ফেলতে থাকেন এবং অচিরে তা পূর্ণ হয়ে যায়। এখানেই আল্লাহ একটি তাঁবু প্রেরণ করেন, আদম আ ঐ তাঁবুতে বসবাস করতে থাকেন। আর ফেরেশতাগণ যেমন 'আরশ' এর চার পাশে সম্ভ্রমে ও বিনীতভাবে তওয়াফ করেন, আদম আ-ও ঐ ভিত্তির চারপাশে তেমনভাবে তওয়াফ শুরু করেন।

বায়হাকী বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ স বলেন ঃ হযরত আদম আ ও বিবি হাওয়া পৃথিবীতে আগমনের পর আল্লাহ তাঁর

দূত জিবরাইল-এর মাধ্যমে তাঁদের কাবাগৃহ নির্মাণের আদেশ দেন। এ গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে তাঁদের তা প্রদক্ষিণ করবার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং বলা হয়, আপনি সর্বপ্রথম মানব এবং এ গৃহ সর্বপ্রথম গৃহ যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। —ইবনে কাসীর।

হযরত আদম আ-এর পর তাঁর তৃতীয় পুত্র হযরত শীশ আ (প্রথম দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল) কাদা এবং পাথর দিয়ে কাবাকে পুনর্গঠিত করেন। এভাবে বহু বছর কেটে যায়—এর পরের ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তারপর হযরত নূহ আ-এর সময় নেমে আসে সর্বধ্বংসী মহাপ্লাবন। এই প্লাবনে পৃথিবীর সব কিছু বিনষ্ট হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় কাবা শরীফও, কেবল রক্ষা পায় হাযরে আসোয়াদ বা পবিত্র কৃষ্ণ পাথরটি। বন্যার সময় ফেরেশতাগণ এই পাথরটি তুলে নিয়ে পার্শ্ববর্তী আবু কুবায়স পর্বতে সযত্নে রেখে দেন।

মহাপ্লাবনের পর আবার বহু বছরের ইতিহাসে নেমে আসে সম্পূর্ণ অন্ধকার, এ সময়ের ইতিবৃত্ত সকলের অজ্ঞাত। কাবা শরীফ সম্পর্কেও সমকালীন ইতিহাস আমাদের কোন তথ্য সরবরাহ করে না। সুতরাং ঐতিহাসিকতার দিক থেকে বিচার করলে একথা আমাদের মানতেই হবে যে কাবা শরীফের ইতিহাসে আনুপূর্বিক কোন ধারাবাহিকতা বজায় নেই।

মহাপ্লাবনের পরে, কাবা শরীফের ইতিহাসের পরবর্তী সূত্র পাই আল্-কোরআনের ঘোষণায়। সূরা হজের ১৬ সংখ্যক আয়াতে মহামহিম আল্লাহর ঘোষণা ঃ "ঐ সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহিমকে কাবা গৃহের স্থান নির্দেশ করে দিলাম"... এবং এই সঙ্গে সূরা বাকারার ১২৭ সংখ্যক আয়াতটিও আমরা দেখে নিতে পারি ঃ "স্মরণ কর, যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল।" প্রথম আয়াত থেকে আমরা হযরত ইবরাহিম আ-কে কাবা শরীফের ভিতের স্থান নির্ণয়ের কথা এবং দ্বিতীয় আয়াত থেকে সেই নির্দিষ্ট স্থানে পিতা-পুত্র কর্তৃক গৃহ নির্মাণের

কথা সঠিকভাবে জানতে পারছি।

এই আয়াতগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন তফসীরকারগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। আল্-কোরআনের যে তফসীর পৃথিবী জোড়া সম্মান ও সমাদর পেয়েছে সেই "তফসীরে ইবনে কাসীর" থেকে যে ইতিবৃত্ত পাচ্ছি তা সংক্ষেপে এই ঃ হযরত ইবরাহিম আ তাঁর শিশু পুত্র ইসমাইল আ-কে নিয়ে সিরিয়ায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি অবগত হন যে আল্লাহ্ তাঁকে কাবা শরীফের স্থান নির্দেশ করবেন এবং তিনি যেন সেখানে গৃহ নির্মাণ করে তাকে পাক-পবিত্র রাখেন। এর কিছুকাল পরে হযরত জিবরাইল আ বোরাক নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হন এবং হযরত ইবরাহিম, ইসমাইল ও হাজেরাকে নিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে যেখানেই জনবহুল বসতি দেখতে পান সেখানেই হযরত ইবরাহিম আ আগ্রহ সহকারে হযরত জিবরাইল আ-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের কি এখানেই অবতরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? আল্লাহর দূত অগ্রসর হতে হতে উত্তর দেন, না। আপনাদের গন্তব্য আরো সম্মুখে। অবশেষে কাবা শরীফের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে, হযরত জিবরাইল আ বললেন, এখানে অবতরণ করুন। তখন মক্কার এই এলাকায় কোন জনবসতি ছিল না, কিছু কাঁটা জাতীয় গুল্ম এবং বাবলা গাছ ছাড়া আর কোন গাছপালাও ছিল না। দূরে অল্প কিছু লোকজন বাস করত, তাদের 'আমালীক' বলা হত, বন্যায় কাবাশরীফ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং তার ভিতটুকু বালির নিচে চাপা পড়েছিল। সমগ্র এলাকাটি লাল বালুর একটা ঢিবি হয়েছিল মাত্র, কাবা শরীফের কোন চিহ্ন ছিল না।

এক মশক পানি আর সামান্য কিছু খেজুর মা হাজেরাকে দিয়ে হযরত ইবরাহিম আ রওনা হলেন, কেননা তাঁর প্রতি সেখানে থাকার কোন নির্দেশ ছিল না।

মা হাজেরা ছুটতে ছুটতে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, সামান্য এক মশক পানি সহ আমাদের এই নির্জন ভূমিতে ফেলে আপনি কোথায় চললেন ? হযরত ইবরাহিম আ পিছনে ফিরে

তাকালেন না বা কোন উত্তর দিলেন না। কাতর কণ্ঠে মা হাজেরা বার বার জিজ্ঞেস করেন কিন্তু কোন উত্তর পান না। অবশেষে দূর থেকে চিৎকার করে তিনি শুধালেন, আপনি কি আল্লাহর তরফ থেকে কোন নির্দেশ পেয়ে আমাদের এভাবে ত্যাগ করে যাচ্ছেন ? এবার খলিলুল্লাহ মস্তক আন্দোলিত করে জানালেন, হ্যাঁ। একথা জেনে মা হাজেরা আবেগপ্লুত কণ্ঠে বললেন, আপনি নির্দ্বিধায় চলে যান। যিনি আপনাকে আমাদের এখানে রেখে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন, কিছুতেই তিনি আমাদের ধ্বংস করবেন না।

এর পরের ঘটনা ত সকলের জানা।

কেউ কেউ মনে করেন, বিবি হাজেরা সংক্রান্ত ঘটনার পূর্বেই আল্লাহ হযরত ইবরাহিম আ-কে কাবা শরীফ নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন। আবার এমন মতও প্রচলিত আছে যে, 'সকীনা' নামে পরিচিত এক প্রবল বায়ু প্রবাহ হযরত ইবরাহিম আ-কে আরবে উড়িয়ে আনে এবং কাবা শরীফের ভিত্তির উপর নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলে 'এখানে নির্মাণ কর'। কোন কোন মতে আছে যে একখন্ড মেঘ কেবল ভিতটুকুতেই ছায়া করে দাঁড়ায়, সেই অনুসারে খুঁড়ে ইবরাহিম আ পুরাতন ভিত পেয়ে যান। আবার এমন মতও প্রচলিত দেখা যায় যে আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল আ ভিতের চারপাশে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে দেন।

ঘটনা যাই ঘটুক আল্লাহর নির্দেশে যে কাবা শরীফের ভিত চিহ্নিত হয় এবং হযরত ইবরাহিম আ যে এই পবিত্র গৃহ পুনর্গঠিত করেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হযরত ইসমাইল ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। পাথর, পানি ও সুরকি প্রভৃতি উপকরণ বয়ে দিয়ে তিনি তাঁর পিতাকে এই পবিত্র গৃহ নির্মাণে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন।

এ সময় কাবা নির্মাণের জন্য পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল পাঁচটি পর্বত থেকেঃ ক. হেরা খ. সাবীর গ. লেবানন ঘ. তূর ঙ. মক্কার সন্নিকটস্থ জাবাল আল-আহমার থেকে। কিছু কিছু বর্ণনায় মক্কার অন্যান্য পর্বতেরও নাম রয়েছে। একটি প্রশ্ন

স্বাভাবিকভাবে মনে জাগে যে এই গৃহ নির্মাণের সময় পিতা-পুত্র অন্য কারও সাহায্য নিয়েছিলেন কি না। নানান বর্ণনা থেকে আমরা জেনেছি যে সে সময়ে এলাকাটি জনবিরল ছিল, দূরে দু-এক ঘর লোক ছিল মাত্র। সুতরাং হযরত ইবরাহিম আ অন্য কারও সাহায্য নিতে পারেন আবার নাও নিতে পারেন। অন্য কারও সাহায্য না নিয়েও গৃহটি গেঁথে তোলা সম্ভব, কেননা সে সময় কাবাগৃহে কোন ছাদ ছিল না, পিতা-পুত্রে কেবল চার পাশের দেওয়াল গেঁথে তুলেছিলেন মাত্র। ইমারতটি কিছু উঁচু হলে কাজের সুবিধার জন্য হযরত ইবরাহিম আ একটি পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করতেন। ঐতিহাসিক এবং ভূতত্ত্ববিদগণের মতে এই পাথরটি একটি বেলে পাথর অর্থাৎ খুব শক্ত নয়, নরম জাতীয় পাথর। দীর্ঘদিন এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করার জন্য এই বেলে পাথরের বুকে হযরত ইবরাহিম আ-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে যায়। অনেকে পাথরে এই পদচিহ্ন অঙ্কিত হবার কথা অস্বীকার করেন কিন্তু অস্বীকার করা বা উড়িয়ে দেওয়ার কোন উপায় নেই, স্বয়ং আল্লাহ কালাম পাকে 'মাকামে ইবরাহিমের' কথা উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া কাবা শরীফের ঠিক পাশেই একটি সুরক্ষিত আধারে পদচিহ্নসহ এই পাথরটি আজো রক্ষিত আছে, যে কেউ দেখে আসতে পারেন।

ঘর গাঁথা হয়ে গেলে হযরত জিবরাইল আ আবু কুবায়স পাহাড় থেকে পবিত্র হাযরে আসোয়াদ পাথরটি এনে হযরত ইবরাহিম আ হাতে অর্পন করেন, এভাবে লুপ্ত পাথরটি আবার কাবা শরীফ সংলগ্ন হয়ে যায়।

পিতাপুত্রের অমানুষিক এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে যখন নিখিল বিশ্বের এই পবিত্রতম গৃহের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহিম আ-কে আদেশ করেন ঃ "আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তওয়াফ করে এবং নামাযে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে"—২২ ঃ ২৬। রহমানুর রহীম আল্লাহ আরো নির্দেশ দেন ঃ "এবং মানুষের নিকট হজ ঘোষণা করে দাও, ওরা তোমার নিকট পদব্রজে ও সর্বপ্রকার দ্রুতগামী উটের পিঠে

আসবে, ওরা আসবে দূর দূরান্ত পথ অতিক্রম করে”—২২ ঃ ২৭। হযরত ইবরাহিম আ-এর কাছে এই নির্দেশ আসার পর তিনি কাতর কণ্ঠে আপন প্রভুর কাছে নিবেদন করেন ঃ আল্লাহ ! আমি ডাক দিলে কজন লোকই বা তা শুনতে পাবে আর কজন লোকই বা আসবে ? আল্লাহ নির্দেশ দেন ঃ ইবরাহিম, তোমার কাজ ডাকা, আমার কাজ সে ডাককে সর্বত্র পেঁৗছে দেওয়া। এই নির্দেশ পেয়ে হযরত ইবরাহিম আ এর শংকা দূর হয়, তিনি নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সকলকে কাবা গৃহে হজ করতে আসার জন্যে আহবান করতে থাকেন। এই ডাকে আশ্চর্য ফল পরিলক্ষিত হল, দূর দূর থেকে অনেকেই দলবন্ধ হয়ে কাবাগৃহের সম্মুখে পবিত্র হজব্রত সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এসে উপস্থিত হতে থাকেন। কোথা থেকে এত মানুষ এলেন তা ভেবে অবাক হলেন হযরত ইবরাহিম আ, যা ছিল স্বপ্ন আর অকল্পনীয় তাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করল। সেই থেকে কাবা শরীফে হজের সূচনা হল। সুতরাং বলা যায় আল্লাহর এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত ইবরাহিম আ সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহয় মহান হজব্রতের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বে কোন নবী হজ বা অনুরূপ এবাদতের নির্দেশ পেয়েছেন বলে মহাগ্রন্থ আল্-কোরআনে উল্লেখ নেই। অবশ্য এই পবিত্র গৃহ তওয়াফের রীতি হযরত আদম আ থেকেই প্রচলিত রয়েছে।

এমন মতও প্রচলিত আছে যে কাবা শরীফের নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে যখন হযরত ইবরাহিম আ এর কাছে আল্লাহর নির্দেশ এল তখন তিনি আপন মাকামে (ঐ পাথরের উপরে) দাঁড়ালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তা এত উঁচুতে উঠে গেল যে চার পাশের পর্বতের চূড়াও তার কাছে নিচু মনে হল। এর উপর দাঁড়িয়েই খলিলুল্লাহ সকল মানুষের উদ্দেশ্যে হজ ঘোষণা করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে অসংখ্য লোক লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক—আমি হাজির, হে আল্লাহ আমি হাজির—এই ধ্বনি দিতে দিতে কাবায় এসে সমবেত হলেন। এভাবেই হযরত ইবরাহিম আ কর্তৃক পুনর্গঠিত কাবা শরীফে হজ প্রথা চালু হয়ে গেল।

দু হাজার খৃষ্টাব্দ পূর্বে হযরত ইবরাহিম আ তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হযরত ইসমাইল আ-কে সঙ্গে নিয়ে এই নির্মাণকার্য করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এরপর আবার কয়েক শত বছরের ইতিহাস অন্ধকার! পৃথিবীর বহু ধর্মপ্রাণ মনীষী-গবেষক এই সময়ে কাবার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন কিন্তু তাঁরা জমাট অন্ধকারে কোন নতুন আলো ফেলতে পারেন নি। টলেমির গ্রন্থে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর বর্ণনায় Macoraba বা ম্যাকোরাবার উল্লেখ আছে কিন্তু এর থেকে নিশ্চিতভাবে মক্কা বা কাবা শরীফের কথা বোঝায় না। এরপর কাবা শরীফের সঠিক ইতিহাস-সূত্রের জন্য আবার আমাদের আল্-কোরআনের উপর নির্ভর করতে হয়। সূরা ফীল-এ (হস্তী) আছে উদ্ধত আবরাহার ইতিবৃত্ত, সে এসেছিল কাবা শরীফ ধ্বংস করতে, শেষে সে এবং তার বিশাল বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। আল্-কোরআনের ভাষায়ঃ "তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক হস্তি-বাহিনীর প্রতি কি করেছিলেন? তিনি কি ওদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নি? ওদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন, যারা ওদের ওপর কংকর নিক্ষেপ করে! অতঃপর তিনি ওদের ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।" এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে—৫৭০ সালের মুহররম মাসে আর এ বছরের ১২ রবিয়ল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন রসূলুল্লাহ স। সুতরাং এ ঘটনা থেকে সুনির্দিষ্ট ভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাবা শরীফের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল।

হযরত ইবরাহিম আ থেকে রসূলুল্লাহ স-এর মধ্যবর্তী সময়ে কাবা শরীফের ইতিবৃত্তের কেবল এইটুকু জানা যায় যে সময়ের অগ্রগতিতে এবং কালের অমোঘ নিয়মে গৃহটি এক সময় বিশেষরূপে জীর্ণ হয়ে পড়ে এবং এক দুর্ঘটনায় তার একদিকের প্রাচীর সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। সংস্কারের জন্য এগিয়ে এলেন 'জুরহাম' গোত্রের লোকেরা আর এঁদের সহযোগিতা করেন আমালীক সম্প্রদায়। এখানে বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য যে হযরত ইসমাইল আ বয়ঃপ্রাপ্ত

হলে এই জুরহাম গোত্রের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। প্রকৃতপক্ষে জুরহাম আর আমালীক এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ সময়ের এই সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ হয়।

সময়ের অগ্রগতিতে হযরত ইবরাহিম আ প্রবর্তিত এক আল্লাহতে আত্মসমর্পণকারী মানুষের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে, ধীরে ধীরে তার জায়গায় বহু ঈশ্বরবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং পবিত্র কাবাপ্রাঙ্গণ মূর্তি পূজার প্রধান আখড়ায় পরিণত হয়। রসুলুল্লাহ স-এর জন্মের বহুপূর্বে থেকেই কাবা শরীফের অবস্থা এরকমই দাঁড়িয়ে যায়। এই সংগে এই পবিত্র গৃহের প্রাচীর নানাভাবে জীর্ণ হতে থাকে। প্রকৃত অবস্থান অনুযায়ী কাবাশরীফের চার দিকেই পাহাড়, গৃহটি মাঝখানে অবস্থিত—ফলে বৃষ্টি হলে চারদিক থেকে পাহাড়ি জলস্রোত প্রবল বেগে নিচে নেমে প্রাচীর গাত্রে আঘাত হানতে থাকে, এভাবে গৃহটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সময়ে পরপর আরো দুটি ঘটনা ঘটে যার ফলে গৃহটির আশু সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। একটি ঘটনা থেকে জানতে পারছি ঃ একজন মহিলা সুগন্ধি দ্রব্য দগ্ধ করার জন্যে কাবার সন্নিকটে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, বায়ু-তাড়িত হয়ে সেই অগ্নিতে আকস্মিকভাবে গৃহটি ভস্মীভূত হয়। দ্বিতীয় ঘটনাটি হল চৌর্যবৃত্তির। কাবাগৃহে ছাদ ছিল না এ তথ্য আমরা পূর্বেই অবগত হয়েছি। একজন অসৎ চরিত্রের মানুষ সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে প্রাচীর পার হয়ে কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করে এবং ঠাকুর-দেবতাদের সমুদয় মূল্যবান অলংকার নিয়ে অন্তর্হিত হয়। এ ঘটনার পরই কাবার সেবাইতগণ গৃহে ছাদ-আঁটার কথা বিশেষরূপে চিন্তা করতে থাকেন। গৃহটি ত এমনিতেই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল তারপর শেষোক্ত দুটি ঘটনায় এই সংস্কার অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দেয়। কুরেশরা দলবদ্ধভাবে সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসেন কিন্তু নতুন একটি ভয়াবহ বিপদ দেখা দেয়। কাবা শরীফের ভিতরে একটি গর্ত ছিল। কাবা নির্মাণের সময় হযরত ইবরাহিম আ চুন-সুরকি মিশ্রিত করার জন্য এটি খনন করেন, এই গর্তে কিছু জঞ্জাল জমা

হয় এবং বৃষ্টিতে পচে ওঠে, কোথা থেকে একটি বিশাল পাহাড়ি সাপ এসে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে মাঝে মাঝে প্রাচীরের উপর ঘুরে বেড়াত এবং কোন কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে বহুদূর থেকে তার শব্দ শোনা যেত। এই বিষধর সর্পটির জন্য কুরেশরা ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়ল, বলা যেতে পারে গৃহ সংস্কারের চিন্তা সাময়িকভাবে তাঁদের মন থেকে দূর হয়ে গেল। একদিন ঘটনাচক্রে সাপটি যখন প্রাচীরের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কোথা থেকে একটা বড় পাখি এসে ছোঁ মেরে তাকে নিয়ে দূরের এক পাহাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। কুরেশদের মুখে আবার হাসি ফুটল, তাঁরা ভাবলেন নিশ্চয়ই তাঁদের মনোভাবে দেবতা খুশি হয়েছেন, তাই এই মূর্তিমান বিপদটিকে এক পাখি পাঠিয়ে দূর করেদিলেন। কুরেশরা নবোদ্যমে সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

এই সময় আকস্মিকভাবে আরো একটি ঘটনা ঘটল যাতে সংস্কারের উপকরণ সংগ্রহের কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়ে গেল। গ্রীকদের একটি অতিকায় বাণিজ্য জাহাজ লোহিত সাগর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ প্রবল তুফানের মধ্যে পড়ে যায় এবং জেদ্দার উপকূলে সংঘর্ষিত হয়ে ভেঙে পড়ে। যথাসময় এ সংবাদটি কুরেশদের কাছে পেঁছালে তাঁরা অলীদ এবং আরো কয়েকজনকে জেদ্দায় পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা অনেকগুলি ভাল তকতা কিনে মক্কায় নিয়ে এলেন। এগুলি ছাদ তৈরীর কাজে অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল।

উপকরণ সংগৃহীত হয়ে গেলে কুরেশরা কাবা সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজে হাত দেন। হযরত মুহম্মদ স তখন ৩৫ বছরের যুবক। এই সংস্কারের কাজে কুরেশদের সঙ্গে তিনিও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন, এমন কি অস্বাভাবিক বাস্তব বুদ্ধির প্রয়োগে শোণিত-শপথে উন্মাতাল যুদ্ধংদেহী গোত্রগুলিকে শান্ত করে তিনি হাযরে আসোয়াদ বা পবিত্র কৃষ্ণপ্রস্তরকে বসিয়েছিলেন কাবার চত্বরে। কিন্তু কুরেশদের এই নির্মাণে হযরত ইবরাহিম আ নির্মিত কাবাগৃহের ভিত্তির বেশ পরিবর্তন ঘটে যায়। পরিবর্তনগুলি

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত ঃ

ক. হযরত ইবরাহিম আ যত বড় জায়গায় কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, কুরেশগণ তার উত্তর-পশ্চিম দিকের কিছু অংশ বাদ দিয়ে কাবাগৃহকে অপেক্ষাকৃত ছোট আয়াতনে নির্মাণ করেন। উত্তর পশ্চিম দিকের এই অর্ধগোলাকার অংশটির নাম 'হাতীম' যা কাবার মূল অংশ এবং বর্তমানে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু শ্বেত পাথরের প্রাচীর বেষ্টিত, ভিতরে প্রবেশের জন্য কাবার দেওয়াল বরাবর দুদিকে দুটি প্রশস্ত খোলা পথ আছে।

খ. হযরত ইবরাহিম আ নির্মিত কাবাগৃহে দরজা ছিল দুটি, একটি প্রবেশের জন্য এবং অন্যটি পশ্চাৎমুখী হয়ে বের হয়ে আসার জন্য কিন্তু কুরেশরা দরজা রাখেন মাত্র একটি এবং সেটি পূর্বদিকে অবস্থিত।

গ. পূর্বে দরজা ছিল সমতল ভূমির সঙ্গে লাগোয়া এর ফলে বৃষ্টি হলে জলস্রোত সঙ্গে সঙ্গে কাবাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করত। দর্শনপ্রার্থীরাও অবাধে অন্দরে প্রবেশ করতেন। এই অবাধ জনস্রোত এবং জলস্রোত থেকে রক্ষার জন্য কুরেশরা অনেক উঁচুতে, মাটি থেকে প্রায় সাত ফুট উপরে দরজা নির্মাণ করেন। এই নির্মাণে জলস্রোত ত বাধা পেলই উপরন্তু যে কেউ যখন তখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা থেকে নিরস্ত হল, বরং কুরেশরা যাকে অনুমতি দেবেন সেই যেতে পারবে। এমনও দেখা গেছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে তাঁরা উপর থেকে গড়িয়ে নিচে ফেলে দিয়েছেন।

অষ্টম হিজরীতে ঐতিহাসিক মক্কা-বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ স কাবা শরীফের কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নি কেবল ভিতরের মূর্তিগুলিকে অপসারিত করেন। কাবার অভ্যন্তরে প্রধান মূর্তিটি ছিল হোবল-এর, নির্মাণ করেছিল আমর ইবনে লুওয়ায়ি, আর ছিল বিশেষভাবে নির্মিত বিভিন্ন যুগের নবীদের প্রতিমূর্তি। কাঠের তৈরি একটা কবুতর ছিল পৌত্তলিকদের বিশেষ আকর্ষণীয়, সব মিলিয়ে মূর্তি ছিল ৩৬০ টি, রসুলুল্লাহ স আপন যষ্ঠি দিয়ে প্রতিটি মূর্তিতে আঘাত করেন এবং তাঁর আদেশে পরে সেগুলি

ভেঙে ফেলা হয়।

সহী হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ স একবার হযরত আয়েশা রা-কে বলেন ঃ আমার ইচ্ছে করে বর্তমান কাবা শরীফ ভেঙে দিয়ে হযরত ইবরাহিম আ-এর নির্মাণ অনুযায়ী 'হাতীমকে' অন্তর্ভুক্ত করে নতুন কাবা শরীফ নির্মাণ করি কিন্তু কুরেশগণসহ লক্ষ লক্ষ পৌত্তলিক সদ্য ঈমান এনেছে, মুসলমান হয়েছে—তাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে মনে করে বর্তমান অবস্থা বহাল রাখছি। —বুখারী। নওমুসলিম কুরেশদের এমন ভুল ধারণার কারণ, পৌত্তলিক অবস্থাতেও তাঁরা কাবাগৃহের পবিত্রতায় অপরিসীম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশের অল্প কিছুদিন পর রসূলুল্লাহ স পৃথিবী হতে মহাবিদায় গ্রহণ করেন।

এদিকে হযরত আয়েশা রা-র ভাগ্নেয় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মহানবীর এই ইচ্ছা বিশেষরূপে অবগত হয়েছিলেন। ফলে সমগ্র মক্কা শরীফের উপর তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হলে তিনি ৬৪ হিজরী মোতাবেক ৬৮৩ খৃস্টাব্দে কাবা শরীফের কিছু সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে মনোনিবেশ করেন। এই সময় বিদ্রোহী এবং প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফা হিসেবে তিনি উমাইয়া সেনাপ্রধান হুসান ইবনে নুমার কর্তৃক মক্কায় অবরুদ্ধ হন। মক্কার চারদিকের পাহাড়ে 'মানজানীক' (প্রস্তর ক্ষেপণাস্ত্র) বসিয়ে যুবায়ের এর উপর অসংখ্য পাথর নিক্ষেপ করা হয়, যুবায়ের এবং তাঁর সঙ্গীগণ তখন কাবা শরীফের পাশে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছিলেন. এই আশ্রয়গ্রহণকে স্মরণীয় করার জন্যে পরবর্তীকালে তিনি 'কাবায় আশ্রয় গ্রহণকারী' বলে নিজেকে আখ্যায়িত করেন। এরপর কাবায় অগ্নিসংযুক্ত হওয়ায় তা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে পবিত্র হাযরে আসোয়াদটি ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যায়।

উমাইয়া সৈন্যদল চলে গেলে আবদুল্লা ইবনে যুবায়ের মক্কার প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে কাবার পুনর্গঠন সম্পর্কে আলোচনায় বসেন কিন্তু কেউই এই সংস্কারের কাজে এগিয়ে এলেন না, উৎসাহও

দিলেন না বরং সকলে তাঁকে নিরুৎসাহ করলেন। তাঁদের একটা ধারণা হয়েছিল যখনই কাবা-সংস্কারের কাজে কেউ এগিয়ে এসেছেন তখনই নানাবিধ দুর্যোগ—যুদ্ধবিগ্রহ, ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত, তুফান—ইত্যাদি দেখা দিয়েছে। আল্লাহর গজবের ভয়ে কুরেশরা নগর ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, এমন কি হযরত আব্বাস রা পর্যন্ত নগর পরিত্যাগ করে এক পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করলেন। অগত্যা ধ্বংস স্তূপ অপসারণের জন্য যুবায়ের নিজেই কুঠার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। অন্যান্য লোকেরা যখন দেখলেন যে যুবায়ের বহাল তবিয়তে সম্পূর্ণ অক্ষত আছেন তখন তাঁরা একে একে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ফলে সংস্কারের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল।

রসুলুল্লাহ স-এর আবির্ভাব এবং ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পরও কুরেশদের মধ্যে এই ধরনের একটি জাহেলিয়ত-যুগীয় কুসংস্কারের মনোভাব কি করে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই!

যা হোক, স্বয়ং যুবায়ের দার আল-নাদ্‌ওয়ায় কিংখাবে মোড়া কৃষ্ণপাথরের প্রহরায় নিযুক্ত থাকতেন আর রাজমিস্ত্রী এবং অন্য সকলে গাঁথনির কাজ করতেন। কাবা শরীফ সম্পূর্ণরূপে মক্কার পাথর আর ইয়েমেনের চুন-সুরকিতে নির্মিত হয়েছিল। বলাবাহুল্য এ নির্মাণে হযরত ইবরাহিম আ-এর নির্মাণকেই আদর্শ করা হয়েছিল। যেমন ক. দরজা হল দুটি—একেবারে সমতল ভূমির সঙ্গে সংলগ্ন, খ. হাতীমকেও কাবা গৃহের অন্তর্ভুক্ত করা হল ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর এই পরিবর্তন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ৭৪ হিজরী মোতাবেক ৬৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ মাত্র দশ বছর পর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সসৈন্যে মক্কা আক্রমণ করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে শহীদ করেন। এরপর সমগ্র মক্কায় তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তিনি সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা ও প্রবলভাবে প্রচার করে দিলেন যে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রসুলুল্লাহ স-এর আমলের কাবাগৃহ ধূলিস্মাৎ করে মহাঅন্যায় কাজ করেছেন,

বর্তমান কাবাগৃহ ভেঙে রসূলুল্লাহ স-এর* আমলের গৃহের অনুরূপ গৃহ হওয়াই উচিত। প্রচারের ধরনে জনগণ তা সমর্থন করল ফলে আবার বায়তুল্লাহকে ভাঙা হল সম্পূর্ণরূপে। কুরেশগণ যেভাবে নির্মাণ করেছিলেন, পুনরায় কাবা গৃহকে অবিকল সেরূপেই ৭৪ হিজরিতে পুনর্গঠিত করা হল, ফলে রসূল পাক যেভাবে কাবা গৃহকে রেখে গিয়েছিলেন—এই অতি পবিত্র গৃহ সেরূপই ফিরে পেল এবং এখনো সেরূপেই বহাল আছে।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পর, উল্লিখিত হাদীস অনুযায়ী, কোন কোন বাদশাহ কাবা শরীফকে ভেঙে ইবরাহিমী-নির্মাণের রূপ দিতে চেয়েছিলেন একান্তভাবে কিন্তু তৎকালীন ইমাম হযরত মালেক ইবনে আনাস কঠোরভাবে ফতোয়া দেন যে, এভাবে ভাঙাগড়া চলতে থাকলে এই মহান পবিত্র গৃহের ঐতিহ্য নষ্ট হবে। এবং অদূরে ভবিষ্যতে তা একটি খেয়াল খুশির খেলায় পরিণত হবে সুতরাং কাবাগৃহকে আর ভাঙা উচিত নয়, বর্তমানে যে অবস্থায় আছে এরূপেই থাকতে দেওয়া উচিত।

বলাবাহুল্য বিশ্বের মুসলিম সমাজ এই ফতোয়াকে খুবই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে করেন এবং সর্বান্তকরণে মেনে নেন। ফলে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সর্বশেষ যেভাবে কাবাগৃহ নির্মাণ করে গিয়েছিলেন এবং যেভাবে স্বয়ং রসূলুল্লাহ বায়তুল্লাহকে রেখে গিয়েছিলেন—বর্তমান কাবাগৃহ ঠিক সে রকমই আছে। তবে ছোটখাট মেরামত সব সময়েই হচ্ছে, সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তা অবশ্য জরুরী।

১০৭৪ হিজরী মোতাবেক ১৬৬৩ খৃস্টাব্দে তুরস্কের বাদশাহ সুলতান মুরাদ সর্বশেষ বারের মত ব্যাপকভাবে মেরামত কার্য সম্পন্ন করেন। বলাইবাহুল্য তিনি ব্যয়বহুল ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবে রূপায়িত করলেও এই পবিত্র গৃহের কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নি। কাবাচত্বরের সংলগ্ন চারপাশের গুম্বজওয়ালা মসজিদগুলি সুলতান মুরাদই নির্মাণ করেন, এগুলি এখনো বর্তমান আছে। এই মসজিদ সংলগ্ন দু-তলা বিশালায়তন

দৃশ্যবহুল মসজিদগুলি সৌদি-সরকার তৈরি করেছেন। সম্প্রতি এই মসজিদগুলি নির্মাণ করতে সৌদি-সরকার দুশো কোটি রিয়াল অর্থাৎ প্রায় ছশো কোটি টাকা ব্যয় করেছেন।

পুণ্যলোভাতুর পৃথিবীর সকল মুসলিম সম্রাট বাদশাগণ মাঝে মাঝেই কাবাশরীফে কিছু না কিছু স্বকীয় অবদানের চিহ্ন রাখার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এই পবিত্র গৃহকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের মনে যে ভাবাবেগ উৎসারিত হয়ে ওঠে তা এই সকল সম্রাটের অহেতুক হস্তক্ষেপে প্রবল বাধার সৃষ্টি করেছে। পূর্ববর্তী যুগের মত পরবর্তীকালেও প্রবল বৃষ্টিস্রোত কাবাগৃহের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এই গৃহকে রক্ষার জন্য ১৬১১ খৃস্টাব্দে এর চারপাশে একটি শক্তিশালী তাম্রের বেষ্টনী দেওয়া হয় কিন্তু অল্প বৃষ্টি স্রোতকে পরাস্ত করলেও প্রবল বর্ষণের প্রচন্ড জলস্রোতকে এই বেষ্টনী কিছুতেই রোধ করতে পারেনা। সুতরাং কাবার অবস্থা আবার বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। মহাকাল আপন নিয়মে এগিয়ে চলে। কয়েক শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের আশাতীত উন্নতি ও বিস্তার লাভ ঘটে। সুতরাং সর্বাধুনিক বিজ্ঞান সম্মতভাবে কাবাগৃহকে নির্মাণ, আলোর ব্যবস্থা, পানি নিকাশী বন্দোবস্ত ইত্যাদি কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য ১৯৩০ খৃস্টাব্দে সৌদি সরকার এক অতিব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং সংস্কারের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এবার কাবাগৃহ নির্মাণের সময় যতদূর সম্ভব পুরাতন পাথরই ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষরূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এবারের এই সংস্কারে পবিত্র বায়তুল্লাহর ভিত্তিভূমি, আয়তন, উচ্চতা ইত্যাদির কোন রকম এতটুকু মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হয়নি, পূর্বে যা ছিল যেমন ছিল ঠিক সেরকমই আছে। কেবল আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে যতদূর সম্ভব সব কিছুই পূর্বাপেক্ষা মজবুত ও দৃঢ়তর করা হয়েছে।

এখন আর বৃষ্টিধারা কাবাগৃহের কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারে না। এবারে, এই ১৯৩০ খৃস্টাব্দের এগারই অক্টোবর সোমবার

প্রায় সারাদিন বৃষ্টি হল। আসরের পর থেকে প্রায় এশা পর্যন্ত যে ভাবে অবিরল ধারায় বর্ষণ হল তা ঠিক আমাদের পশ্চিম বাংলার আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মত, বরং তার থেকেও বেশি। এ ধরনের বৃষ্টি কলকাতায় হলে ট্রামবাস এবং লোক চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং কলকাতা সমুদ্রে পরিণত হয়, সব কিছু ভাসতে থাকে। অথচ আশ্চর্য কাবাশরীফে কিছুই হল না, সব চেয়ে ভারি বর্ষণের সময় মনে হল কাবার চত্বরে ছ'ইঞ্চির মত পানি দাঁড়িয়ে গেছে এবং এমনও মনে হল তওয়াফ বন্ধ হয়ে যাবে এবং এশার নামায আজ চত্বরে হবে না। কিন্তু বৃষ্টি একটু কমে আসতেই দেখলাম জমা পানি মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

আল্লাহর ঘর—বায়তুল্লাহকে ঠিক মত হেফাজাত করার জন্যে এ ধরনের মেরামত ও সংস্কারের প্রয়োজন সকল সময় আছে এবং থাকবে। একদিন দেখলাম কয়েকজন মিস্ত্রী হরম শরীফের একটি সুন্দর সফেদ পাথরকে ভাঙতে বসেছেন। এটা নামাযের জায়গা। আমি কৌতূহল বশতঃ নিকটে গেলাম। দেখলাম, পাথরটিতে ফাটা-ফাটা কয়েকটি দাগ পড়েছে কিন্তু ফেটে যায় নি, নামায পড়তেও কোন অসুবিধা নেই অথচ সেই পাথরটিকে কেটে তুলে নতুন পাথর বসান হল। বর্তমান সৌদি আরবের বাদশাহ তাঁর সরকারের মাধ্যমে সারা বছরই কাবা-মেরামতের অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত।

কাবা সম্পর্কে যে সব কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাদের মধ্যে অন্যতম আরো একটি হল এই যে কাবাকে (মক্কা) পৃথিবীর নাভিস্থল বলা হয়। কেউ কেউ মনে করেন পৃথিবী সৃষ্টির দু হাজার বছর পূর্বে বিশ্বসমুদ্রে পবিত্র কাবার স্থানটি একটি পিণ্ডের আকারে অবস্থান করছিল। মহান আল্লাহ এই বিন্দু বা পিণ্ডকে কেন্দ্র ধরে পৃথিবীকে বিস্তারিত করেন। এর ফলে প্রথমে পৃথিবীর সারভাগ, পরে বেহেশত এবং সবশেষে পৃথিবী সৃষ্টি হয়। আরবী লোক সাহিত্যেও কাবাকে পৃথিবীর নাভিস্থল বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআন শরীফেও মক্কাকে 'উম্মুল কুরা' (৬ : ৯২) অর্থাৎ পৃথিবীর শহর সমূহের মাতা বলা হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা

করলে আল কোরআনের এই ঘোষণার সঙ্গে প্রচারিত কিংবদন্তীগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ স-এর চাচা হযরত আব্বাস রা, অন্য বর্ণনায় হযরত আলি রা কাবাশরীফের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন কিন্তু হযরত স বলেন, এখন থেকে পূর্বের সকল ব্যবস্থা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেবল জমজমের পানি প্রদান এবং কাবার তত্ত্বাবধান এ দুটি প্রথাই বর্তমান থাকবে। প্রথম দায়িত্বটি পেলেন হযরত আব্বাস রা এবং দ্বিতীয় কর্তব্যের ভার দেওয়া হল হযরত উসমান ইবনে তালহা রা-র হাতে। পরে হযরত উসমান তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা হযরত শায়বাকে আপনার প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই মহান শায়বার বংশধরগণই বর্তমান কাল পর্যন্ত কাবার দ্বার রক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক। হজযাত্রীদের খাদ্যদানের যে দায়িত্ব আবু তালিবের উপর ন্যস্ত ছিল, নবম হিজরীতে হযরত আবুবকর রা তা গ্রহণ করেন। তাঁর পরে এ কাজ খলিফাগণই করতেন। এখন হজের দিন, আরফাতের ময়দানে, এক ওয়াক্ত অর্থাৎ ঐ দিনের মধ্যাহ্নের খাদ্য সম্ভার সকল হজ যাত্রীর মধ্যে সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে মুয়াল্লিম মারফৎ বিতরিত হয়।

কাবা গৃহের আয়তনাদি সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা হল এই ঃ হযরত আদম আ প্রতিষ্ঠিত এবং হযরত ইবরাহিম আ কর্তৃক পুনর্গঠিত কাবাশরীফ ছিল ৩০ হাত দীর্ঘ, ২২ হাত প্রস্থ এবং ৯ হাত উচ্চ—অনেকে উচ্চতা ৫ বা ৬ ফুট ছিল বলেও মনে করেন। স্বাভাবিকভাকে মনে প্রশ্ন জাগে হযরত আদম আ বা হযরত ইবরাহিম আ এর আমলে নির্মিত গৃহের মাপ হাজার হাজার বছর পর সঠিকভাবে কি করে পাওয়া যেতে পারে ? প্রশ্নটা খুবই সঙ্গত। আমাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি বার বার প্লাবন এবং মহাকালের আঘাতে এই পবিত্রগৃহ কখনো ভূপতিত হয়েছে , কখনো বিধ্বস্ত হয়েছে, কখনো বা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু গৃহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও সকল সময় ভিত্তিভূমি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং যতবার সংস্কার বা পুনর্গঠিত হয়েছে, পুরাতন ভিতকে কেন্দ্র করেই হয়েছে।

এর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই ভিত্তিভূমি থেকেই হযরত আদম আ-এর সময়ের দৈর্ঘ্য প্রস্থের সঠিক মাপটি পাওয়া যায় কিন্তু উচ্চতা নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে, ছাদ যে ছিল না এ বিষয়ে সকলেই একমত। কুরেশনির্মিত বায়তুল্লাহর দৈর্ঘ্য সাড়ে তেইশ হাত, প্রস্থ ২২ হাত এবং উচ্চতা ১৮ হাত অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ৩০ হাতের স্থলে সাড়ে ছয় হাত ছোট হয়েছে প্রস্থ ঠিক আছে এবং উচ্চতা ৯ হাতের স্থলে বেড়ে ১৮ হাত হয়েছে অর্থাৎ দ্বিগুণ হয়েছে। ৬৪ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা-এর পুনর্গঠিত বায়তুল্লাহর মাপ ছিল দৈর্ঘ্য ৩০ হাত, প্রস্থ ২২ হাত এবং উচ্চতা ২০ হাত অর্থাৎ তিনি উচ্চতা আরো ২ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে ৭৪ হিজরীতে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এর পুনর্গঠিত কাবাগৃহের মাপ দাঁড়ায় দৈর্ঘ্য ৪০ ফুট, প্রস্থে ৩৫ ফুট এবং উচ্চতা ৫০ ফুট। কাবা শরীফের একটি মাত্র দরজা যা ৭ ফুট উপরে অবস্থিত। এই মাপই বর্তমানে বহাল আছে।

ইতিমধ্যে শব্দ তরঙ্গে ভেসে উঠল মুয়াজ্জিনের মধুর কণ্ঠে জোহরের আযানঃ আল্লাহ হু আকবর...। কোথায় দাঁড়িয়ে মুয়াজ্জিন আযান দিচ্ছেন তা দেখার জন্যে আমি খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। সামান্য একটি শব্দ উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষারত নামাযীদের মধ্যে যে শৈথিল্যের ভাবটা ছিল তা মুহূর্তে অবলুপ্ত হল, সকলেই অত্যন্ত আগ্রহী আর আন্তরিকতার সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন, যেন এখুনি সকলে এক নিবিড় আর মধুর প্রার্থনায় ডুবে যাবেন। দৃশ্যটা আমার খুবই ভাল লাগল। আযান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই নামায শুরু হল। অনেক সময় আযানের পর ধীরে সুস্থে চার রেকাত সুন্নত নামায পড়ারও সময় থাকে না, জামাত শুরু হয়ে যায়। আজ সুন্নত নামায পড়ার সময় পেলাম। কিছু পরেই কাবাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর বিশালতম জামাত। মধ্যস্থলে বায়তুল্লাহ—চারপাশে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিঃশব্দে এবং বিনীতভাবে ইমামকে অনুসরণ করে এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে আভূমি নত হয়ে আপ্লুত

চিত্তে রুকু যাচ্ছেন, সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন। সেই বেহেশতি দৃশ্য না দেখলে কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। মরুর মধ্যাহ্ন সূর্য জ্বলছিল অথচ প্রচণ্ড উত্তাপকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাবার চত্বরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নামাযের জন্য বসে অপেক্ষা করছেন—একমাত্র নিবেদিত প্রাণ ছাড়া এমন অসহনীয় উত্তাপ হজম করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এক সময় নামায শেষ হল। আমি আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গেই বাসায় চলে এলাম।

বাসায় এসে দেখি পুরো কামরাটার হাল ফিরে গেছে। সব কিছুই সাজান গোছান। প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিস একেবারে হাতের কাছে মৌজুদ। টুথপেস্ট ব্রাস সাবান চিরুণী আয়না তোয়ালে কাপড়-চোপড় সব কিছুই প্রস্তুত। আমার বেডের ওপর বিশ্বনবী, হজ সংক্রান্ত বই, ডাইরি কলম সব কিছুই পর পর রাখা আছে। এত সব কাজ সেরে জোহরের নামায পড়ে শুয়ে হজের বই পড়ছিলেন আমার স্ত্রী। বললাম, বেশি বিলম্ব করা যাবে না—আসরের ওয়াক্তে গিয়ে পৌঁছতে হবে। সে কথার জবাব না দিয়ে তিনি ব্যগ্র কণ্ঠে পাল্টা শুধালেন, কাবা শরীফে ভিড় কি খুব বেশি ? বললাম, ভিড় ত আছেই এবং প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে—বর্ষায় যেমন নদী ফুলতে থাকে, হজের আগের রাত পর্যন্ত এরকমই চলবে। হজ শেষ হলে এ ভিড়ও ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে যাবে। ঠিক বর্ষার শেষে নদীর পানি যেমন কমতে থাকে, তেমনি আর কি।

একটু বিশ্রম নিয়ে আমরা আসরের ওয়াক্তে বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে আমার স্ত্রী আর দিল্লির সেই বৃদ্ধা মহিলা হাশমি ইশরাত। তাঁকে নিয়ে চলতে আমাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছিল, তা হলেও আমরা ধৈর্য সহকারে তাঁকে যতটা এবং যত রকম ভাবে সাহায্য করা যায় করছিলাম। আমার স্ত্রী ত তাঁর সেবায় সারাক্ষণ বিশেষরূপে তৎপর ছিলেন। আর এই তৎপরতার বিশেষ প্রয়োজনও রয়েছে। হজের একটি বড় শিক্ষা হল কষ্ট সহ্য করা, সর্বব্যাপারে ধৈর্য ধরা আর পরার্থে আত্মনিবেদিত হওয়া। সকল রকমে সহযাত্রীদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রতিটি হজযাত্রীর এক

বিশেষ মানবীয় কর্তব্য। অপরের অসুবিধাগুলির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে যদি আত্মতৃপ্তিই প্রধান হয়ে ওঠে তা হলে হজের মূল লক্ষ্য থেকেই আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। এই বৃদ্ধা মহিলাকে আমাদের সঙ্গী করে দিয়ে হয়ত মহান আল্লাহ নানান ব্যাপারে আমাদের পরীক্ষা করতে চাইছেন।

মসজিদুল হারামে পৌঁছেই আমরা আমাদের অবস্থান সম্পর্কে প্রথমে সচেতন হলাম। এখানে, কেবল এখানে কেন পৃথিবীর সর্বত্র, পুরুষ এবং মহিলা এক সঙ্গে এক কাতারে নামায পড়তে পারে না— ইসলামে কঠোরভাবে এ নিষিদ্ধ। এক ইমামের পিছনে সকলেই নামায পড়েন। কিন্তু মেয়েদের জামাত পৃথক, একেবারে পিছনে। সুতরাং এখানে আমাদের পৃথক হতেই হবে, একত্রে থাকার উপায় নেই। বায়তুল্লাহর চত্বরে, জমজমে নামার সিঁড়ির পাশেই, কাবা শরীফের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য যে কাঠের সিঁড়িটি ব্যবহার করা হয়, সাদা রং মাখান সেই উঁচু সিঁড়িটি রয়েছে দেখলাম। চারপাশ প্রত্যক্ষ করে দেখলাম যে এইটিই প্রথমে চোখে পড়ে। আমরা দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম আসর মগরিব এবং এশা পড়ে তওয়াফ সমাপ্ত করে যিনিই আগে আসবেন তিনি যেন ঠিক ঐ লক্ষ্য বস্তুর পাশেই এসে অপেক্ষা করেন। ইতিমধ্যে কেউ যেন আমরা কাউকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা না করি। বলেই আমরা অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে পরস্পর অদৃশ্য হয়ে গেলাম। যাঁদের সঙ্গে মহিলা যাবেন তাঁদের এরকম একটি নিশানা বা লক্ষ্যস্থল প্রথমেই নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত জরুরী। হরম শরীফের মধ্যে দেখেছি সঙ্গীকে খুঁজে না পেয়ে অনেক মহিলা এবং অনেক পুরুষ উন্মাদের মত একে অপরকে অন্বেষণ করছেন।

আসর পড়েই আমি মুয়াল্লিমের ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। কেননা ইয়াকুব আদম বিশেষ অনুরোধ করেছেন আমরা সকলে যেন আজ রাতের মধ্যেই তাঁর ঘরের ভাড়া মিটিয়ে দিই। দেখলাম এখানে সকলেই ভাড়াটা দু-এক দিনের মধ্যেই মিটিয়ে দেবার তাগাদা দেন। সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার ফলে মক্কাবাসীরা আগন্তুক হজযাত্রীর পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং

যার জন্যেই এই তাগাদা। সাধারণতঃ হাজীদের হাতে টাকা থাকলে বেশি খরচ করে ফেলেন, বাজারে নয়নাভিরাম ও চিত্তাকর্ষক বিলাস-দ্রব্যের অভাব নেই—কেউ কেউ সেগুলি কিনে ঘর ভর্তি করেন, আবার মিনাতে গিয়ে সাধ্যের অতিরিক্ত মূল্যের পশু ক্রয় করে কুরবানী দিয়ে এমন ফতুর হয়ে পড়েন যে শেষ পর্যন্ত আর ঘরের ভাড়া দেবার মত অবস্থা থাকে না। সুতরাং মক্কা বা মদিনায় সাধারণ রেওয়াজ চালু হয়েছে যে ঘর ভাড়া নেবার সঙ্গে সঙ্গে বা দু-এক দিনের মধ্যে চুক্তিমত সম্পূর্ণ ভাড়া মিটিয়ে দিতে হবে।

ভাড়া মিটিয়ে দিতে আপত্তি নেই, আপত্তি হবারও কথা নয় কিন্তু মুয়াল্লিমের বাড়ির দিকে যেতে যেতে আমি দ্বিধায় পড়ে গেলাম, কাল যাঁর কাছে টাকা দিয়ে এসেছি আজ গিয়ে চাইব কি করে আর তিনিই বা কি ভাববেন ? আমরা কি তাঁকে অবিশ্বাস করছি ? নানান ভাবনা চিন্তা আর সঙ্কোচে দুলতে দুলতে এক সময় সীমাহীন কুণ্ঠার সঙ্গে তাঁর সামনে গিয়ে সালাম করে দাঁড়ালাম। আর কি আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজে থেকে বললেন, টাকা চাই ? বলে একটু হাসলেন এবং তারপরই আমার নাম লেখা বাণ্ডিল বার করে মাথা পেছু ৩৫০ রিয়াল কেটে নিয়ে অবশিষ্ট ফেরৎ দিলেন। বললেন, মিনা-আরফাত-মুজদালিফা আর মদিনার খরচ। আমি কোন কথাই বললাম না, মগরিবের সময় হয়ে আসছিল, ধীরে ধীরে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এলাম।

বাবুল উমরা দিয়ে একেবারে মসজিদুল হারাম-এর চত্বরে নেমে এলাম। শেষ বিকেলের মায়াময় আলো পড়েছে কাবা শরীফের উপর, হেরেম শরীফের সুউচ্চ মসজিদের দীর্ঘ ছায়া বায়তুল্লাহর পাদদেশ স্পর্শ করেছে, এখন বায়তুল্লাহর অন্য রূপ, অন্য সৌন্দর্য। তওয়াফে জামাত ভারি, মধ্যাহ্নের দাবদাহ নেই, বিকেলের নরম আলোয় সকলেই তওয়াফের জন্য উন্মুখ, সুতরাং বিশাল এলাকা জুড়ে চক্রকারে তওয়াফ চলছে, সে এক জান্নাতি দৃশ্য।

আমি আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে একেবারে বায়তুল্লাহর দেওয়ালের কাছে চলে এলাম আর এখানে এসেই আমি দিনের স্পষ্ট

আলোয় 'হাতীম' প্রত্যক্ষ করলাম। যে অর্ধবৃত্তকার অংশটি বাদ দিয়ে বর্তমান কাবা শরীফ নির্মিত, সেই বাদ দেওয়া অংশটির নাম হাতীম। হাতীম হল কাবা শরীফের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাতীমের মধ্যে নামায পড়ার অর্থই হল কাবা শরীফের ভিতরে বসে নামায পড়া। আর হাতীম বায়তুল্লাহর অবিচ্ছেদ্য মূল অংশ হওয়ায়, তওয়াফ করার সময় হাতীমসহ সমগ্র কাবাশরীফকেই তওয়াফ করতে হয়, অন্যথায় তওয়াফ সম্পূর্ণ হয় না। হাতীম বর্তমানে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু শ্বেতপাথরের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ভিতরে প্রবেশের জন্যে কাবা শরীফের দেওয়াল সংলগ্ন দু দিকে দুটি খোলা পথ আছে।

হাতীমের দিকেই আছে বহু সম্মানিত 'মীজাবে রহমত'। মীজাবে রহমত অর্থাৎ একটি নল যা কাবা শরীফের ছাদের সঙ্গে সংলগ্ন এবং বৃষ্টির সময় এই একমাত্র নল দিয়ে ছাদের সমুদয় পানি হাতীমের মধ্যে পড়ে। মীজাবে রহমত দিয়ে ঝরে পড়া বৃষ্টির পানিকে অত্যন্ত পবিত্র আর বরকতময় মনে করা হয়। বৃষ্টির সময় এই পানি সংগ্রহের জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীদের মধ্যে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়।

হাতীম অংশটি পৃথক করলে কাবা শরীফ একটি চতুষ্কোণ বিশিষ্ট কিউব। এক একটি কোণের এক একটি নাম আছে। পশ্চিম কোণ শাম দেশের দিকে বলে এর নাম 'রোকনে শামী', দক্ষিণ কোণ ইয়েমেনের দিকে বলে এর নাম 'রোকনে ইয়ামানী', পূর্ব কোণে হাজরে আসোয়াদ আছে বলে এর নাম 'রোকনে আসোয়াদ' এবং উত্তর কোণ ইরাকের দিকে আছে বলে এর নাম 'রোকনে ইরাকী'।

'মোলতাজেম' আর একটি বিশেষ বরকতময় স্থান। কাবা শরীফের দরজা (দরজা একটিই) থেকে হাজরে আসোয়াদ পর্যন্ত এই স্বল্প পরিসর কমবেশি চার হাত পরিমাণ স্থানটুকুকেই বলা হয় মোলতাজেম। মোলতাজেমের অর্থ আশ্রয় গ্রহণের স্থল কারণ হাজিগণ আল্লাহর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের সময় এখানে তাঁদের বক্ষস্থল সংলগ্ন করেন।

কাবা শরীফের আর একটি বরকতময় স্থানের নাম 'মোসাল্লায়ে

জিবরীল'। বায়তুল্লাহয় প্রবেশের সময় ডান দিকে গৃহের সংলগ্ন একটি ছোট গর্ত[১] আছে—এরই নাম মোসাল্লায়ে জিবরীল। এখানে দাঁড়িয়ে হযরত জিবরাইল আ দু দিনে রসূলুল্লাহ স-কে নামায শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আমি আমার ভক্তিবিনত দেহমন নিয়ে কাবা শরীফ ঘুরে ঘুরে, কখনো স্পর্শ করে এই সব অতিপবিত্র চিহ্ন সমূহ দেখছিলাম, দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে তন্ময় হয়েছিলাম হঠাৎ দেখি তওয়াফে ভিড় একেবারে কমে গেছে, সকলে কাতারবন্দী হয়ে বসে পড়ছেন। আমার খেয়ালই হয়নি ইতিমধ্যে কখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, হরম শরীফের চারপাশের ছাদ থেকে সেই অত্যুজ্জ্বল আলোকমালা জ্বলে উঠেছে এবং বায়তুল্লাহকে আলোকিত করেছে, পশ্চিম আকাশে লাল রং-এর বিচিত্র সমারোহ, ঠিক সেই মুহূর্তে মাইকে মুয়াজ্জিনের মধুর কণ্ঠ ভেসে উঠল, আর মুহূর্তে এক অলৌকিক যাদুমন্ত্রে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠ একেবারেই নীরব হয়ে গেল। এখানে এসে কোন কণ্ঠই উচ্চ হয়ে ওঠে না, তবুও এতক্ষণ নিজেরা ফিসফাস করে যে সব কথার আদান প্রদান করছিলেন এখন তাও নিভে গেল। বিশাল কাবা শরীফের অপরিসীম গাম্ভীর্য ভেদ করে বাতাস দুলিয়ে দুলিয়ে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ যেন কোথায় ভেসে যাচ্ছে, আকাশে বাতাশে সব কিছুতেই এখন আল্লাহর মহিমা, আল্লাহরই গুনগাণ। আমরা সকলেই কাবাকে কেন্দ্র করে সেই অনন্ত অসীমের কাছে আত্মসমর্পিত হবার জন্যে নামাযের কাতারে বসে গেলাম। আমার কি সৌভাগ্য আমি একেবারে প্রথম কাতারে স্থান পেয়ে গেলাম, সামনেই কাবা শরীফের দেওয়াল, আমার পাপে ভরা অপবিত্র মস্তকের সিজদা একেবারে সেই অতি পবিত্র দেওয়ালের কোলেই পড়বে! হাজার হাজার মাইল দূরে পশ্চিম বাংলার এক অখ্যাত গ্রাম সোলেমানপুরের আরো এক অখ্যাত জীর্ণ কুটিরে দাঁড়িয়ে আমি কেবলাহমুখী হয়ে প্রতি নামাযের নিয়েতে বলতাম,

---

১· মোহম্মদ আকরম খাঁ এই গর্তটিকে একটি কূপ বলেছেন। দ্র : মোস্তফা চরিত।

"কাবাতিশ শারিফাতে"—আমার মুখ কেবলাহর দিকে, কাবাকে দেখতে পেতাম না কেবল অনুমান করতাম, আজ আমার নসিব কত ভাল যে সেই গৃহ মাত্র এক হাত দূরে, কাবা শরীফের সঙ্গে আজ আর আমার কোন ব্যবধান নেই। আল্লাহ গো—আমি কি বলে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব ! কোন কিছুই যেন আমি বিশ্বাস কবতে পারছিলাম না, কোন কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছিল না, সব কিছুই যেন স্বপ্নের ঘোরে ঘটে যাচ্ছিল, বাস্তব চেতনা হারিয়ে আমি বার বার কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিলাম।

একামত শেষ হতেই আমরা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। নামাযেও আমি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না, পা কাঁপছিল না কিন্তু বুকটা উথাল পাতাল হয়ে উঠছিল। সেই উথাল পাতাল মানসিকতায় তুফান তুলে দিলেন ইমাম সাহেব। ঠিক আমার উল্টো দিকে মাকামে ইব্রাহীম বরাবর মোলতাজিমের পাশে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব নামায পরিচালনা করছিলেন, তাঁকে আমি দেখতে পাইনি কিন্তু তাঁর কণ্ঠের সুর, তাঁর উচ্চারণ ভংগি আমাকে পাগল করে দিল। এই প্রথম আমি কাবা শরীফের ইমাম সাহেবের কোরআন পাঠ শুনলাম। এই তেলাওয়াত শোনার আর এইভাবে নামায পড়ার—কি তীব্র বাসনা নিয়েই না আমি ছুটে এসেছি। ভেবেছিলাম কাবার ইমাম, কোরআন শরীফের কোন অজানা স্থান থেকে না জানি কত বড় রুকুই না পড়বেন কিন্তু কি আশ্চর্য প্রথম রেকাতে পড়লেন অদ্দোহা এবং দ্বিতীয় রেকাতে আলাম নাশরাহ লাকা। একমাত্র ফজরের নামায ছাড়া কোন দিন ইমাম সাহেবকে আমি দীর্ঘ কোন কেরাত পড়তে শুনিনি, অধিকাংশ সময় তাঁরা আমপারার প্রথমদিকের ছোট ছোট সুরা পড়তেন। আমাদের দেশের আলেমগণ এ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের নামায অধ্যায়ের একটি হাদিসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হযরত মাআজ ইবনে জাবাল কোন এক মহল্লার মসজিদে ইমামতি করতেন। জনৈক ব্যক্তি এসে রসূলুল্লাহ স-এর কাছে অভিযোগ করল ঃ আআজ এত লম্বা করে নামায পড়ান

যে আমি তাঁর পিছনে নামায পড়তে অসমর্থ হয়ে পড়ি। হযরত আবু মাসউদ আনসারী বর্ণনা করেন যে এই অভিযোগ শুনে হযরত স এমনভাবে ক্রুদ্ধ হলেন যে আমি কখনো এভাবে তাঁকে আর ক্রুদ্ধ হতে দেখিনি। উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে তিনি ভাষণ দিলেন ঃ তোমরা যারা নামায পড়াও তারা সংক্ষিপ্ত নামায পড়াবে। কেননা নামাযীদের মধ্যে বৃদ্ধ, দুর্বল এবং কাজকর্মে ব্যস্ত লোকজনও থাকেন।

কাবা শরীফে এই হাদীস অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হয়। আজকের ইমাম সাহেব যখন কেবলমাত্র আলহামদো লিল্লাহ এইটুকু পড়লেন আমার ব্যাকুল মন তাঁর কণ্ঠের সেই অসাধারণ সুর মাধুর্যে দুলে উঠে, অজানতে বলে উঠল, হ্যাঁ ইনি যথার্থই কাবার ইমাম ! এত মিষ্টি এত মধুর স্বর আমি আমার জীবনে শুনিনি। হেরেম শরীফের ছাদের চারদিকেই অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক বসান। সামনে মাইক পিছনে মাইক সকল দিকেই মাইক। আমার মনে হল যেন মক্কার উপর জান্নাত থেকে সেই মধুর স্বর ভেসে আসছে, এসে কাবার আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে, সকলের দেহমন ছুঁয়ে তাদের পবিত্র করছে। আমার আত্মার সমুদ্রে যে তুফান জেগেছিল, বিরামহীন সুরের পরশে তা মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে অন্য রূপে আত্মপ্রকাশ করল। আমি বিগলিতে হয়ে গেলাম, বুক ভিজে গেল। আমার বার বার মনে হচ্ছিল, আমি এ পৃথিবীতে নেই, অন্য কোথাও অন্য কোন বেহেশতলোকে চলে গেছি, যেখানে মাটির পৃথিবীর কোন মালিন্য পেঁছুতে পারে না, স্পর্শ করতে পারে না, যে লোক নুরের তাজাল্লিতে আলোকিত, আর হুরপরীদের কলকণ্ঠে উতরোল ! এই পরিবেশ, এই ইমাম, এই কালাম পাঠ আর এই নামায—মানুষকে কোথায় না পেঁছে দিতে পারে !

যতক্ষণ নামায হল আমি কাঁদলাম, কেঁদেই চললাম। সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনি করে তন্ময় হয়ে কেঁদেছিলেন—নামায শেষ হতেও তার রেশ কাটল না, সেদিন বাস্তবের মাটি স্পর্শ করতে আমার বহু সময় লেগেছিল।

মগরিবের নামাযের পর আমি দীর্ঘক্ষণ বসে রইলাম চুপচাপ, বসে বসে কেবল কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

এশার নামাযের পর বিনীতভাবে তওয়াফ করলাম। তওয়াফ শেষ হলে ধীরে ধীরে জমজমের পাশে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যস্থল সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এলাম। দেখলাম আমার স্ত্রী আর হাশমি ইশরাত দু জনে এসে দাঁড়িয়েছেন। স্ত্রী চোখ মুখ দেখে বুঝলাম তাঁরও মনের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। তারপর সে রাতের মত কাবা শরীফ ছেড়ে বাবে আবদুল আজীজ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মিসফালার পথে পা বাড়ালাম।[১]

---

১. বি. দ্র. কাবা শরীফের প্রাথমিক নির্মাণ সম্পর্কে নানান মতবাদ প্রচলিত আছে, এখানে কিছু পুনরুক্তি হলেও, আমরা সেই চিত্রটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এ সম্পর্কে তফসীরকারদের মধ্যে যে সব মতবাদ পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে এগুলি বিশেষরূপে প্রনিধানযোগ্য : ক. অনেক বিদগ্ধ আলেম তফসীরকার মনে করেন কাবা শরীফ সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহিম আ এর হস্তেই নির্মিত হয়েছিল। খ. কিন্তু অধিকাংশ আলেম সাহাবী তফসীরকারগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই পবিত্র গৃহ হযরত আদম আ-ই সর্বপ্রথম নির্মাণ করেছিলেন, হযরত ইবরাহিম আ ধ্বংসপ্রাপ্ত এই প্রাচীন গৃহকে পুনর্গঠিত করেন মাত্র। গ. অনেকে আবার মনে করেন, হযরত আদম আ-এর পৃথিবীতে আগমনের বহু পূর্ব হতেই এ গৃহের অস্তিত্ব বর্তমান ছিল। সম্প্রতিকালের শ্রদ্ধেয় লেখকগণের মধ্যে মাওলানা আকরাম খান প্রথম মতের এবং কবি গোলাম মোস্তফা তৃতীয় মতকে বিশেষরূপে সমর্থন করেন আর অন্যান্য কমবেশি সকলেই দ্বিতীয় মতের সমর্থক। অবশ্য এই দ্বিতীয় মতের সমর্থকের সংখ্যাধিক্য কেবল বাংলায় নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই বিশেষ রূপে পরিদৃষ্ট হয়।

এখন এই মতবাদগুলি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। ইসলাম-প্রাণকেন্দ্র এই পবিত্রতম গৃহ সম্পর্কে কোন কিছুই অস্পষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় নয় মনে করেই আমরা এ বিষয়ের গভীরে কিছু আলোকপাতের চেষ্টা করছি। বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় কাবা শরীফের কোন প্রামাণ্য তথ্যাদিও আজ

পর্যন্ত বিশেষ প্রকাশিত হয় নি।

এই পরস্পর বিরোধী মতবাদ সৃষ্টি হবার প্রধান কারণ পবিত্র কোরআন শরীফের দুটি আয়াত : ১· একটি সূরা আল ইমরানের ৯৬ সংখ্যক আয়াত যা আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করেছি এবং ২. অন্যটি সূরা বাকারার ১২৭ সংখ্যক আয়াত যার অনুবাদ হল এই : "যখন ইবরাহিম ও ইসমাইল কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল"...এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাওলানা আকরাম খাঁন তাঁর তফসীরে লিখেছেন : "আয়াত হইতে জানা যাইতেছে যে, হযরত ইবরাহিম নিজের তরুণ পুত্র হযরত ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়া কাবার নির্মাণ কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের রাবীরা বলিতেছেন, প্রথমে কাবা নির্মাণ করেন ফেরেশতারা, তৎপর হযরত আদম, হযরত শীশ। কিন্তু এই বিবরণগুলি রাবীদের ব্যক্তিগত মত। তাহা ছাড়া হাদীস পরীক্ষার নিয়ম অনুসারে অগ্রহণীয়। 'এই শ্রেণীর রেওয়াতগুলির অধিকাংশই নাসরাদের পুরাণ-পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে।' (ইবনে কাসীর)। কোরআন শরীফ. ১ খণ্ড, পৃ ১৭৬-১৭৭। তফসীরের অন্যত্র অর্থাৎ আল ইমরানের ৯৬ সংখ্যক সূরার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন : "মাসজেদুল হারাম বা কাবা মসজিদই হইতেছে. বস্তুতঃই দুনিয়ার প্রথম ইবাদাতগৃহ এবং হযরত ইবরাহিম হইতেছেন তাহার প্রতিষ্ঠাকারী। কাবা যে হযরত ইবরাহিমের নির্মিত, কোরআন মজীদে তাহা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে।" কোরআন শরীফ, ১ম খণ্ড. পৃঃ ৫১৫। অর্থাৎ তিনি পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে কাবা শরীফ হযরত ইবরাহিম সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন। সূরা বাকারার ১২৭ সংখ্যক আয়াতে "কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল" বা 'ভিত্তি উত্তোলন করছিল' অর্থ দ্ব্যর্থবোধক। এর দ্বারা একথা বোঝা যায় যে ক. কাবার ভিত হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল গেঁথে তুলেছিলেন খ. আবার এমন অর্থ হয় যে পুরাতন ভিতের উপরেই তাঁরা পিতাপুত্রে নতুন প্রাচীর গেঁথে তুলেছিলেন। এবং এটাই হওয়া স্বাভাবিক। হযরত ইবরাহিম যে কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন এ কথা আল্-কোরআনের বহুস্থলে রয়েছে ঠিকই কিন্তু কোথাও স্পষ্ট করে এমন কথা বলা নেই যে তিনি এ গৃহটি সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তির উপর এবং সম্পূর্ণ নতুন করে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট করে বলা রয়েছে যে "কাবা শরীফই হল পৃথিবীর প্রথম গৃহ।"

হযরত ইবরাহিমের পূর্বে হযরত আদম আ থেকে শুরু করে হযরত নূহ আ পর্যন্ত বহু নবী পৃথিবীতে এসেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এবং অবশ্যই কোন না কোন গৃহে বসে আল্লাহর এবাদাৎ করেছেন। কিন্তু হযরত ইবরাহিম আ কে কাবা শরীফের প্রথম নির্মাতা ধরলে এ সিদ্ধান্ত সতঃসিদ্ধ হয়ে পড়ে যে তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবী কোন গৃহে বসে আল্লাহর এবাদাৎ করেন নি এবং যা বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে একেবারেই অসম্ভব। হযরত নূহ আ-এর মহাপ্লাবনের আগে বিশাল নৌকা নির্মাণের কথা সকলেরই জানা, সুতরাং যাঁরা অতিকায় নৌকা নির্মাণ করতে পারেন তাঁরা যে বাসগৃহ ও উপাসনালয় নির্মাণ করতে পারতেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া এই মহাপ্লাবনে প্রাণিসহ এই সব গৃহাদি ধ্বংস করাই মূল লক্ষ্য—কেননা এসব ছিল অত্যাচারী সম্প্রদায়ের। সুতরাং পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কাবাশরীফ পৃথিবীর প্রথম গৃহ হলে হযরত ইবরাহিম আ এর পূর্বেই তা নির্মিত হয়েছিল।

আল কোরআনে আছে বিবি হাজেরা এবং শিশু ইসমাইলকে মরুতে নির্বাসিত করে ফেরার পথে যখন তাঁর স্ত্রী-পুত্র দৃষ্টি-সীমার বাইরে চলে গেল তখন হযরত ইবরাহিম আ আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানালেন: "হে প্রভু আমি আমার সন্তান-সন্ততির এক অংশ শস্যফলহীন মরু উপত্যকায় তোমার গৃহের সন্নিকটে রেখে এলাম যাতে তারা তোমার এবাদাৎ করতে পারে, অতএব তুমি মানুষের মনকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট কর এবং কিছু ফলমূল তাদের দাও, হয়ত তারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।" এই আয়াত থেকেও দেখতে পাচ্ছি হযরত ইবরাহিম আ কাবা শরীফের (তোমার গৃহ) অস্তিত্ব পূর্ব থেকেই অবগত হয়েছিলেন। হযরত ইসমাইল আ যখন যুবক তখন তাঁকে নিয়ে পিতাপুত্রে কাবা শরীফ পুনর্নির্মান করেছিলেন অথচ এই আয়াতের প্রার্থনা যখন তিনি শিশুপুত্র ও স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে আসেন সেই সময়ের এবং সে সময়েই তিনি তাঁর প্রার্থনায় প্রাচীন গৃহের কথা উল্লেখ করেছেন।

"এবং আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে আদেশ দিলাম: আমার গৃহকে পবিত্র কর"...২ : ১২৫, এই আয়াত থেকেও বোঝা যায় পূর্বেই গৃহ ছিল এবং যা অপবিত্র হয়েছিল. আল্লাহ তা পিতাপুত্রকে পবিত্র করতে নির্দেশ দিলেন। গৃহের অবস্থান না থাকলে গৃহকে পবিত্র করার নির্দেশদানের

কোন অর্থই হয় না।

পিতাপুত্র যখন কাবাশরীফের ভিত্তি গেঁথে তুললেন তখন তাঁদের প্রতি হজের বিধিবিধান এল। এই বিধানের একস্থানে আল্লাহ ঘোষণা করলেন : "(যারা হজ করতে আসবে) অতঃপর তারা যেন তাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে।" 'এবং তাদের মানত (কোরবাণী) পূর্ণ করে এবং প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে। ২২ : ২৯। যে গৃহ পিতাপুত্র সদ্য গেঁথে তুললেন সে গৃহ কখনই 'প্রাচীন গৃহ' হতে পারে না। অথচ এই আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বায়তুল্লাহকে প্রাচীন গৃহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াত থেকে দ্বিধাহীন ভাবে প্রমাণিত হয় যে হযরত ইবরাহিম আ-এর বহুপূর্ব হতেই এই পবিত্র গৃহের অবস্থান বিদ্যমান ছিল।

এ প্রসঙ্গে আর একটি মাত্র আয়াতের উল্লেখ করব যার আংশিক অনুবাদ এই : "এবং সেই সময়কে (স্মরণ কর) যখন কাবাগৃহকে মানবজাতির পুনর্মিলনক্ষেত্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম" ২ : ১২৫। এই আয়াতে মাছাবা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর জনগনের পুনর্মিলনের স্থান। মাওলানা আক্রাম খাদ এর এক অর্থ করেছেন এই ভাবে যে সারা বিশ্বে বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে কিন্তু হজের সময় এই বিচ্ছিন্ন দলগুলি পুনর্মিলিত হয়। বলাবাহুল্য এ অর্থ কষ্টকল্পিত। তিনি নিজের মতবাদটি স্থির রাখার জন্যে সহজ গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটিকে উপেক্ষা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আদম আ হতে হযরত নূহ আ পর্যন্ত কাবাগৃহের মোটামুটি একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় ছিল কিন্তু মহাপ্লাবনে এই গৃহ ধ্বংস হয়ে যাবার পর এই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। হযরত ইবরাহিম আ কর্তৃক বায়তুল্লাহর পুনর্গঠনের পর সেই বিচ্ছিন্নতায় মিলনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, কাবা শরীফ আবার তীর্থক্ষেত্র ও পুনর্মিলনস্থলে পরিণত হয়। এই আয়াতে 'সেই সময়ের পুনর্মিলনের কথা' বলা হয়েছে—বর্তমান সময় উদ্দিষ্ট নয়।

১২.

আট সেপ্টেম্বর বুধবার শেষ রাতে যখন ঘুম ভাঙল তখন ভোর চারটে দশ। চারদিকে বেশ অন্ধকার। তবুও বুঝলাম তাহাজ্জদ পাব না। তিনটে চল্লিশের দিকে তাহাজ্জদের আযান হয় কাবা শরীফে। হ্যাঁ—এখানে একটি কথা বিশেষ রূপে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কাবা শরীফে প্রতিদিন আযান হয় ছ বার। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচ বার এবং তাহাজ্জদের জন্য একবার। চারটে দশে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে অজু সেরে কাবা শরীফে যেতে যেতেই ফজরের আযান হয়ে যাবে। হলও তাই। আমি যখন কাবা শরীফে পৌঁছলাম, দেখি হরমের চত্বর, চারপাশের মসজিদুল হারাম, বারান্দা ভর্তি হয়ে সিঁড়ি উপচে জনস্রোত রাস্তায় নামাযের কাতার দিয়ে বসে গেছেন। আমি থেমে, কাত হয়ে, পাশ কাটিয়ে অতি সন্তর্পণে মসজিদুল হারাম পার হয়ে একেবারে কাবার চত্বরে নেমে পড়লাম। যতটা সামনে যাওয়া যায় তার চেষ্টা করে প্রায় একেবারে পবিত্র গৃহের সম্মুখে এসে হাজির হলাম। যেখানে এক ইঞ্চি জায়গা খালি ছিল না সেখানে কিভাবে আমি এতটা কঠিন দূরত্ব অতিক্রম করে একেবারে মঞ্জিলে মাকসাদে পৌঁছে গেলাম তা নিজেই বুঝতে পারি নি। এখন ঠিক স্মরণ করে বলতেও পারব না কিন্তু আমি প্রায় কাবা শরীফের সামনে এসে হাজির হলাম। ভাবছিলাম এবার দাঁড়িয়ে অন্ততঃ দু রাকাত তাহাজ্জদ পড়ে নেব আর ঠিক তখনই ফজরের আযান হয়ে গেল। বাতাসে দুলে দুলে কাবার মুয়াজ্জিনের সেই মিষ্টি মধুর এলাহান যেন দূর দূ-উ-র কত দূ-উ-উ-র ভেসে গেল! আর সেই সুরে আমার মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি আরো সূক্ষ্ম হয়ে কোন অসীম শূন্যে আর এক মহাশক্তির সঙ্গে মিলনাকাঙ্খায় উধাও হয়ে গেল। এ যেন উন্মত্ত অধীর আবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বাঞ্ছিত জনের সঙ্গে এক দিওয়ানা-হৃদয়ের মধুর যোগসূত্র রচনা।

জামাত শেষ হল এক সময়। অন্ধকার রয়েছে তখনো।

অনেকেই বাসায় ফেরার জন্যে কাবা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। আবার অনেকেই তওয়াফের বৃত্তকার বিপুল রেখায় জমায়েত হলেন। হাযরে আসোয়াদ বরাবর একটি দীর্ঘ কালো রেখা টানা আছে। হাযরে আসোয়াদ বা এই রেখা থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হয়। আমি ধীরে অতি ধীরে এই রেখার নিকটবর্তী হলাম তারপর তওয়াফের নিয়েত করে ও ইসারায় পাথর চুম্বন করে বিনীত ভাবে কাবা প্রদক্ষিণ শুরু করলাম।

তওয়াফে আমার গতি ছিল ধীর স্থির এবং শান্ত। অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে আমি অতি ধীরে পা ফেলে এগুচ্ছিলাম। কালো গিলাফে ঢাকা বিশাল কাবাকে পাশে রেখে মোলতাজেম এবং মাকামে ইবরাহিমের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় বার বার আমার মাথা নুয়ে আসছিল। আমার চিত্ত ও চেতনা এক সুমহান ঐতিহ্য ও পবিত্রতার সংস্পর্শে এসে উথাল-পাতাল, সেখানে এখন দিনরাত সকল সময় এক অখন্ড অনন্ত খুশির তুফান বয়ে চলেছে। এত পাওয়া সইব কি করে? সত্যই সইতে পারছিলাম না। মনে হচ্ছে এক বুবুক্ষু দীন দরিদ্র কঙ্কালসার ম্লান মজুর একেবারে ভীষণভাবে আলোকোজ্জ্বল জমকাল আর সুসজ্জিত এক অভিজাত রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে এসে পড়েছে অকস্মাৎ, খুশির দমকা হাওয়ায় প্রায় হেলে পড়া মাটি ছুঁই ছুঁই নারিকেল গাছের মত এই কম্পমান বেতসলতাটি এখুনিই মাটিতে আছড়ে পড়ল বলে। এক সময় আবার দেখি বাতাস কাটিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে কাত হওয়া প্রায় ভেঙে পড়া নারিকেল গাছ, বেতসলতাটি কাঁপতে কাঁপতে কখন আবার স্থির হয়েছে—শুধু পাতাগুলি আনন্দের আতিশয্যে তির তির করছে হাওয়ায়। আমার সমগ্র অঙ্গব্যাপী নারিকেলের এই দীর্ঘ আর সরু পত্রের তির-তির কম্পন শুরু হয়েছে, বেতসলতার মত কাঁপছে সারা দেহটাই। কখনো মুহূর্তের জন্যে স্থির হয় ত মনের পত্রপল্লবে কম্পন থামে না, অদৃশ্য তুফানে অনাহত পত্রগুলি কেবল দুলছে দুলছে আর দুলছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—অনুচ্চ স্বরে পাঠ করতে করতে আমি

এগুচ্ছিলাম। আমার দেহমন ভিজে আসছিল বারবার। মাকামে ইবরাহিম পার হয়ে এক সময় আমি হাতিম-এর পবিত্র দেওয়াল স্পর্শ করলাম। ডুকরে কেঁদে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কিন্তু চোখ মুছে আমি আবেগকে সংযত করলাম। অসংখ্য মানুষ তওয়াফ করছেন, তাঁদের ব্যাঘাত ঘটবে, তন্ময়তা কেটে যাবে। তাছাড়া এতগুলি মানুষ আমাকে দেখে কি ভাববেন? পাগল? অর্ধোন্মাদ? খুব কষ্ট করে, বলা যেতে পারে মনের সঙ্গে লড়াই করে, আমি আবেগকে পরাস্ত করলাম। মাত্র কয়েক পা অগ্রসর হতেই আমার সমগ্র অন্তর জুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। ভাবলাম, এই কলেমা প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে রসুলুল্লাহ স-কে কি নির্যাতনই না ভোগ করতে হয়েছে। কোন অনন্ত শক্তিতে বুক বেঁধে তিনি এই পাশবিক অত্যাচারগুলি হাসি-মুখে সহ্য করেছিলেন? সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিপরীক্ষা আর দুঃস্বপ্নের দিনগুলিতে কোন পবিত্র আলোকে আলোকিত হয়ে উঠেছিল তাঁর অন্তরলোক?

আমার পার্শ্বে, মাত্র কয়েক গজ দূরে সাফা পর্বত। এই পর্বতেরই এক নিভৃত গুহায় বসে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন রসুলুল্লাহ স। শত্রুরা ঠিক বাড়িতে বসে নিরিবিলি আল্লাহর জিকর করার সুযোগ দিত না তাঁকে। অবশেষে হন্যে হয়ে অন্বেষণ করতে করতে সাফার নিভৃত গুহাভ্যন্তরেই এসে হাজির হল শয়তান দলপতি আবু জেহেল। প্রথমে কদর্য প্রশ্ন, পরে অশ্লীল গালিগালাজ এবং তাতেও যখন রসুলুল্লাহর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে পারল না তখন সরাসরি পাথর নিয়েই আক্রমন করল। মস্তকে আঘাত লেগে ফোয়ারার মত রুধির ধারায় সিক্ত হয়ে গেল পবিত্র মুখমণ্ডল, রঙিন হয়ে উঠল সফেদ লেবাস। কপালে হাত চেপে আল্লাহ বলে লুটিয়ে পড়লেন দীন দরিদ্রের রসুল, মানুষের নবী মুহম্মদ স। আকাশ-বাতাস-ফেরেশতারা শিউরে উঠল ক্ষণিকের জন্য। আর আপন মহাকীর্তির ফল প্রত্যক্ষ করে সাফা পর্বতের গুহা-কন্দর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে হেসে উঠল আবুজেহেল।

হজের মওসুমে দূরাগত মানুষের ভিড়ে কাবা চত্বর পরিপূর্ণ।

সত্য দ্বীনকে প্রচার করার এই ত সময়। কাবাকে কেন্দ্র করে নির্ভিক রসূলুল্লাহ স উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ— আল্লাহ ছাড়া কেউই উপাস্য নেই। তিনিই আমাদের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা পালনকর্তা—সকলে একমাত্র তাঁরই উপাসনা কর। মিথ্যা কথা বল না। ব্যাভিচার কর না, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা কর, সন্তান হত্যা মহা পাপ...সকলেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছেন হযরত মুহম্মদ স-এর কথা। তাঁদের অন্তরের বীণাতন্ত্রীতে কোথায় যেন সূক্ষ্ম আঘাত লাগছে, আওয়াজ উঠছে মৃদুমন্দ ভাবে, লোকটা কে বটে ? বড় ভাল কথা বলছে ! সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ধেয়ে আসছে আবু লাহাব আর তার অনুচরের দল। মুঠো মুঠো ধুলো নিক্ষেপ করছে রসূল করীম স-এর চোখে মুখে সর্বদেহে আর চিৎকার করে বলছে, তোমরা কেউ এই শয়তানটার কথা শুনো না, এ একজন বড় যাদুকর, কেউ এর কাছে এস না। ধুলাবালির ঝাপটা খেয়ে রসূলুল্লাহ স প্রায় অন্ধ আর মুমূর্ষ হয়ে পড়েন। ক্লান্ত দেহমনে বাড়ি ফেরেন। বাড়ি ফেরেন সকলের মনে দোলা জাগিয়ে, কাবায় এসে আমাদের দেবদেবীর বিরুদ্ধে এত কথা বলে গেল ! কি কথা ? এক মহাজিজ্ঞাসার সামনে এসে স্তম্ভিত হয়ে যায় সকলে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র মহামন্ত্র গুঞ্জিত হয়ে ফেরে তাদের কর্ণে হৃদয়ে অন্তরে। সকল সময়। সারাক্ষণ। এই ত সেই মহান কাবা। এখানে বসেই নামায পড়ছিলেন হযরত মুহম্মদ স। সুগভীর আন্তরিকতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়েছেন আল্লাহর দরবারে। মস্তক তুলছেন না, তাঁর পবিত্র ললাট মৃত্তিকা স্পর্শ করে আল্লাহর নিকট সমর্পিত হয়েই আছে। এই ত উপযুক্ত সময় শয়তানীর। দুষমণ কুরেশদল অনতিদূরে কাবার প্রাঙ্গনেই চক্রান্তে লিপ্ত। শত্রু সর্দার আবু জেহেল বলল ঃ অমুক জায়গায় একটা উট জবাই হয়েছে কেউ গিয়ে গোবর ভরা সেই বিশাল ভুঁড়িটা এনে যদি মুহম্মদের পিঠে চাপিয়ে দিতে পার তা হলে খুব মজা হয়। রসূল পাককে যারা দৈহিক নির্যাতন করেছে উকবা ইবনে আবু মুইত তাদের অন্যতম। সে উঠে বলল, এ কাজ আমি করব। তারপর

যথা সময় সে উটের বিশাল ভুঁড়িটি এনে সিজদারত রসূলুল্লাহ স-এর পিঠের উপর সজোরে নিক্ষেপ করল। সঙ্গে সঙ্গে কাবা-প্রাঙ্গনকে সচকিত করে উল্লাসে ফেটে পড়ল শয়তানের দল। পশুরা রসূলুল্লাহ স-কে হত্যা করতেই চেয়েছিল। দূর থেকে এ দৃশ্য নজরে পড়েছিল মা ফাতেমার। তিনি চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে এই অপবিত্র আর ভীষণ দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষগুলি সরিয়ে কোন রকমে সে যাত্রা তাঁর আব্বাকে মুক্ত করে বাড়ি নিয়ে এলেন।

লা ইলাহা ইল্লাল্লা ! এই সত্যকে প্রচার করতে গিয়ে আরো কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়েছে রসূলুল্লাহকে। তওয়াফ করতে করতে এসব কথা যত বেশি আমি স্মরণ করছি ততই দেখি আমার মনের মাটি গভীর তলদেশ থেকে সিক্ত হয়ে উঠেছে ক্রমে ক্রমে। আজ আমি যার চার পাশে তওয়াফে মগ্ন, এই ত সেই স্থান—যেখানে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন রসূল আকরাম স। নিবিষ্ট চিত্তে নামাযে মগ্ন, এগিয়ে এল পাষাণের দল। এই দলেরও সর্দার উকবা ইবনে আবু মুইত। সে এসে তার চাদরকে অতর্কিতে রসূল পাকের গলায় পরিয়ে দু দিক থেকে দ্রুত পাকাতে শুরু করল। ফলে ফাঁস লেগে দম বন্ধ হয়ে গেল রসূলুল্লাহর। চোখের কোণে রক্ত জমে গেল। একেবারে অসহায় অবস্থা। এই পথ দিয়েই যাচ্ছিলেন হযরত আবুবকর রা। ছুটে এলেন তিনি, উকবাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে অনেক লাঞ্ছনার বিনিময়ে রক্ষা করলেন রসূলুল্লাহকে।

হযরত মুহম্মদ স তাঁর পরিবার আত্মীয়-স্বজন সকলে শোয়েবে আবুতালেব-এর গিরি উপত্যকায় অন্তরীন হতে বাধ্য হলেন। কুরেশ সর্দারের নির্দেশ মত এই পবিত্রত্মাদের সঙ্গে সকলে শুরু করল সর্ববিধ বয়কট—খাদ্য সরবরাহ বন্ধ, পানি বন্ধ, সর্বপ্রকার লেনদেন ও আত্মীয়তা বন্ধ। একদিন নয়, দুদিন নয়—বছরের পর বছর। অচিরে খাদ্য ফুরিয়ে গেল, নিঃশেষ হয়ে গেল পানির শেষ সম্বলটুকু। খাদ্যের জন্য পানির জন্য শিশুদের করুণ ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ব্যথাতুর হয়ে ওঠে, বাইরে থেকে সেই করুণ কাতরানি

শুনে পাষাণের দল আনন্দ-নৃত্য করে। সাহাবাগণ বলেন ঃ এ সময় আমরা গাছের পাতা সিদ্ধ করে ক্ষুধার অগ্নিজ্বালা নিবারণের চেষ্টা করতাম। পানি নেই—গাছের পাতাই সম্বল। এভাবে ঘাস লতাপাতা খেয়ে আমাদের মল ছাগমেষাদির মলের মত কালো আর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। শুষ্ক চামড়া ভক্ষণ করা যায় না, কেউ কেউ তাও চিবিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে সেই চামড়া পুড়িয়ে তার ছাই খেয়েছেন। এই অবস্থাতেও সকলে তাঁদের প্রিয় নেতার উপর, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উপর পরিপূর্ণ রূপে আস্থাশীল। মৃত্যু আসন্ন, সকলে প্রতিনিয়ত মৃত্যুযন্ত্রনাই ভোগ করছেন—অথচ নেতার বিরুদ্ধে কারও কোন ক্ষোভ নেই। মহাসত্য প্রচারের জন্য এই যন্ত্রনা ভোগের কোন নজির নেই, এই ধৈর্যের কোন তুলনা নেই, এই নির্ভরশীলতারও কোন দ্বিতীয় নেই।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। এ মহাসত্যকে প্রচার করতে গিয়ে পথে নামলেন রসূলুল্লাহ স। শয়নের স্বপ্ন নিদ্রার স্বপ্ন দিবসের স্বপ্ন জাগরণের স্বপ্ন—এ সার্থক করতেই হবে। এ মহাসত্যের প্রতি আহ্বান জানাতে পথ বেয়ে চলেছেন রসূলুল্লাহ। পাষাণের দল পাথর ছুড়ল—একটি দুটি তিনটি অসংখ্য। কপাল কাটল, ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল—আহা! রঙিন হয়ে গেল পবিত্র মুখমন্ডল! ভ্রূর উপর কাটল, মাথা কাটল, চিবুক-বাহু বুক-পিঠ ক্ষত-বিক্ষত হল, ঝাঁজরা হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। বৃষ্টি ধারার মত পাথর পড়ছে। পাষন্ডদের ব্যথা নেই, দরদ নেই—উল্লাস চিৎকারে ক্রমে উন্মত্ত হয়ে উঠছে তারা। আরো জোরে আরো উৎসাহে পাথর ছুড়ছে। অবসন্ন রসূলুল্লাহ আর চলতে পারছিলেন না, রক্তাক্ত দেহে বসে পড়লেন। কিছু পরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সর্বশক্তি দিয়ে যেই উঠে দাঁড়ালেন, আবার শুরু হল পাথর বৃষ্টি। রক্তে গায়ের পিরহান জড়িয়ে গেছে গায়ে, সিক্তবসন যেমন গায়ে এঁটে বসে। কয়েকটি পাথর একই সঙ্গে এসে লাগল মাথায়, বোধহয় সে আঘাতে পিষ্ট হয়ে গেল মাথাটা।

হাঁটু থেকে পায়ের পাতা—পায়ের হাড় চূর্ণ বিচূর্ণ। কি কঠিন সেই মুহূর্ত ! অসংখ্য বর্বর পশুর আক্রমণে যেন কোমল মেষ শাবকের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে একটি নিষ্পাপ দেহ। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হল না রসূলুল্লাহর, মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন তিনি। আল্লাহ—আপনার বাণী প্রচার করতে এসে আপনার রসূল আজ মাটিতে ঢলে পড়লেন !

ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি কেন তখন পৃথিবীতে জন্মালাম না ! আমি কেন সেদিন আপনার পাশে থাকলাম না ! ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমি থাকলে আমার চোখ দিয়ে আপনার চোখ রক্ষা করতাম, আমার অপবিত্র মস্তক দিয়ে আপনার শির মুবারক অক্ষত রাখতাম, আমার নাপাক বুক দিয়ে আপনার বিশাল বক্ষদেশ ঘিরে রাখতাম, আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কেউ আপনাকে স্পর্শ করতে পারত না !

আল্লাহ গো !

জালিমের অত্যাচারে মহাসত্য প্রচার করতে গিয়ে আবু আবদুল্লার এতিম আজ মরুর ধূলায় লুটিয়ে আছেন ! তওয়াফ করতে করতে কখন কোন অবচেতন মুহূর্তে আমি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেছিলাম আমার মনে নেই। যখন হুঁশ হল তখন আর সে ক্রন্দন রোল থামল না। হুঁশের মধ্যে বেহুঁশ অবস্থা ! দেখলাম আমি জোরে জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলছি আর আদিম মানুষের মত ডুকরে ডুকরে কাঁদছি। অনেকেই আমার দিকে তাকিয়ে আছেন মনে হল কিন্তু এই মুহূর্তে কারো যে কোন অসুবিধা হচ্ছে তা আমার মনে করার কোন অবকাশই থাকল না। যে আবেগকে খানিক আগে আমি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সংহত করেছিলাম, সেই আবেগ এখন আমাকেই সংযত করল। এখন আমি তার হাতের পুতুল। হৃদয়ের কোন গভীর তলদেশ থেকে যে এ ক্রন্দন ভেসে উঠছে তা আমি জানি না, শুধু এইটুকু উপলব্ধি করলাম এই অশ্রুবিসর্জন যেন আমার স্বকীয় নয়, আমার মধ্যে আর কেউ যেন আমার হয়ে এভাবে ক্রন্দন করছেন। এবং যা আমার আয়ত্তের বাইরে। আমি ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার রসূলুল্লাহ

স পাথরের উপর রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছেন। হঠাৎই আমার ক্রন্দনের শব্দ বেড়ে গেল, ভীষণ বেড়ে গেল। হয়ত আমাকে কেউ নির্বোধ ভেবেছিলেন, অর্ধোন্মাদও ভাবতে পারেন কেউ। যাঁর যা ইচ্ছে হয়েছিল তিনি তেমন ভেবেছেন, শুধু আমি জানি এই পাগল হওয়াতে আমার কোন হাত ছিল না।

আর জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি এভাবে পাগল হয়ে কাটিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি ?

এক সময় দেখলাম সম্পূর্ণ কাবা শরীফকে একবার ঘুরে হাযরে আসোয়াদ বরাবর সেই কালো রেখাটির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। অর্থাৎ এতক্ষণে আমার একবার পরিক্রমা শেষ হল, এমনি ভাবে সাতবার পরিক্রমা শেষ হলে তবে একটি তওয়াফ সম্পূর্ণ হবে।

তওয়াফ আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন, ভালবাসেন। তবে এর মধ্যে অবশ্যই বিনীত হওয়া চাই, আত্মসমর্পণের আকুতি থাকা চাই। সপ্ত আসমানে বায়তুল মামুরকে ঘিরে ফেরেশতারা বিনীত নম্রনত আর আত্মসমর্পিত হয়েই তওয়াফ করেন। তওয়াফে অহমিকা আর উদ্ধত অহংকারের ভাবকে একেবারেই ত্যাগ করতে হবে, লোক দেখান মনোবৃত্তিকে ধ্বংস করতে হবে সমূলে। তওয়াফের মধ্যে এসবের কিঞ্চিৎ প্রকাশ ঘটলে সব কিছুই ব্যর্থ হয়ে যাবে। মনে রাখা দরকার পৃথিবীর সকলের নিকট বাহবা পাওয়া গেলেও সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। একমাত্র অন্তরের আকুলতাকে তিনি ভালবাসেন, ধর্মনিষ্ঠাতেই তিনি খুশি হন।

তওয়াফের মধ্যে, আমি দেখলাম, এই আন্তরিকতার বড় অভাব। কয়েকজন বেশি সংখ্যায় তওয়াফের জন্যে ঘোড়দৌড়ের মত দৌড়ুচ্ছেন। ফলে তাঁরা কারও পা মাড়িয়ে দিচ্ছেন, কারও গায়ের উপর পড়ছেন, কাকেও বা ঠেলে দিচ্ছেন—প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে এমনি নানান অঘটন ঘটছে প্রতিনিয়ত। পরস্পরের মধ্যে বার্তাবিনিময়ের ব্যাপারটিও লক্ষ্য করেছি তওয়াফের মধ্যে বহুবার। অনেকে আবার দলছুট থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে পরস্পরের কাপড় বা হাত ধরাধরি করে

এগুতে থাকেন। সাধারণতঃ এটা অশিক্ষিত মানুষের আর মহিলাদের মধ্যে বেশি মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। এ'রা এমন ভাবে বিরাট এলাকা জুড়ে দলবদ্ধভাবে পথ চলেন যে অন্যের তওয়াফে ভীষণ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এটিও বাঞ্ছনীয় নয়।

যা হোক, এক সময় দেখলাম, একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে আমি কালো রেখার উপর দাঁড়িয়ে আছি। এখানে এসেই, নিয়ম অনুযায়ী আসোয়াদ পাথরকে প্রতিবার তিনবার করে চুম্বন করতে হয়। কিন্তু তাকিয়ে দেখলাম হাযরে আসোয়াদের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। আমার মত একজন মানুষের পক্ষে এই প্রচণ্ডতম ভিড় অতিক্রম করে পবিত্র প্রস্তরের ধারে কাছে যাওয়াও সম্ভব নয়। আমি চেষ্টাও করলাম না। দূর থেকে দুই হাতের তালু পূর্বের মত হাযরে আসোয়াদের দিকে প্রসারিত করে, যেন স্পর্শ করলাম এই ভাবে, সেই হাতের তালুতে চুমু খেলেই প্রস্তরে চুম্বন করা হয়ে যায়। আল্লাহ এটাই কবুল করে নেন। আমি তিন বার তাই করলাম।

এসময় এক অভাবিত দৃশ্য চোখে পড়ল। কয়েকজনকে দেখলাম, কাবার গিলাফ ধরে দেওয়ালের উপর দিয়ে হাযরে আসোয়াদের কাছে গিয়ে, যাঁরা চুম্বন করছিলেন তাঁদের ঘাড়ের উপর লাফ কেটে পড়ছেন তারপর কনুইয়ের ঘুসিতে তাদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরা চুম্বনের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন। ব্যাপারটি নিঃসন্দেহে নীতিহীন এবং দৃষ্টিকটু। নিচে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও যাঁদের গায়ে জোর বেশি এবং যাঁরা শক্তিশালী তাঁরা ধাক্কা দিয়ে অন্যদের হটিয়ে কাজ হাসিলের চেষ্টা করছেন। আর এই সব কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকদের শায়েস্তা করার জন্যে ঠিক হাযরে আসোয়াদের পাশে একটি উঁচু জায়গায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন। ছাদের উপর থেকে একটি শক্ত রসি ঝুলান আছে। সেটি ধরে তিনি ভারসাম্য রক্ষা করছেন আর এই সব নীতিহীন লোকদের মাথায় লাথি মারছেন। সজোরে লাথি মেরে হটিয়ে দিচ্ছেন।

একেবারে পবিত্র কাবা শরীফ স্পর্শ করে এই সব কাণ্ড হচ্ছে

দেখে আমি ভীষণভাবে আহত হলাম, ব্যাথা পেলাম। এই হাজি সাহেবদের কি এতটুকু ধৈর্য নেই? হাযরে আসোয়াদ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান নেই? এই পাথরে চুম্বন করা সুন্নত আর চুম্বন করতে গিয়ে অন্য হাজিদের কষ্ট দেওয়া আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধ এবং সরাসরি হারাম। অর্থাৎ এই সব আসোয়াদ-পাগল লোকগুলি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, ফরজ ত্যাগ করে, হারাম কাজ করে নবীর আদেশ পালন করতে যান সুন্নত আদায় করতে যান এবং পরিণামে পুণ্যের বদলে নিজেদের কঠিন পাপে নিমজ্জিত করেন। কাবার পথে যাঁরা পড়ছেন এবং এঁদের মধ্যে যদি কেউ হজ করতে যান, আল্লাহর ওয়াস্তে কথাগুলি মনে রাখবেন। ফরজ ত্যাগ করে সুন্নত আদায় করতে যাবেন না, মনে রাখবেন কোন মুমেনকে কষ্ট দেওয়া হারাম। দূরে নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে দুই হাতের তালু হাযরে আসোয়াদের উপর প্রসারিত করে সেই হাতেই চুম্বন করবেন, আপনার কর্তব্য তাতেই পূর্ণ হবে।

ব্যাপারটি নিয়ে আমি অনেক সময় ভেবেছি। হাযরে আসোয়াদ নিয়ে আমাদের ভুল ধারণা এবং মিথ্যা বিশ্বাসই এসব অঘটনের মূল বলে আমার মনে হয়েছে। অনেক হাজির ধারণা এই পাথরে সরাসরি চুম্বন না করলে হজ কবুল হয় না, অনেকের ধারণা এই পাথরে কোন রকমে একবার চুম্বন করতে পারলেই সারা জীবনের সব পাপ দূর হয়ে যাবে। আমাদের অনেক আলেম-ওলামাও এ ধরণের কথাবার্তা বলে থাকেন। উনিশ শ বিরাশি সালে বাংলাদেশ হজ কমিটি থেকে যে হজপুস্তিকা মুদ্রিত হয়েছে কাবা শরীফে এক বাংলাদেশীর নিকট থেকে নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আমি নিজে পড়েছি হাযরে আসোয়াদ মানুষের পাপ শুষে নেয়। বাংলাদেশ হজ কমিটি থেকে যে পুস্তিকা মুদ্রিত ও প্রচারিত হল এতবড় মিথ্যা কথা সেখানে স্থান পেল কি করে তা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই।

মনে পড়ে পার্কসার্কাস ময়দানে একবার একটা মেলা বসেছিল। গেটের পাশেই ছিল একটি বৃহৎ স্টল, তাতে পৌত্তলিকতার বিভিন্ন দিক চিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের সম্মুখে বিবৃত করার ব্যবস্থা

ছিল। হিন্দিতে যে ভদ্রলোক বিষয়গুলি বুঝিয়ে বলছিলেন তিনি একটি শিবলিঙ্গের চিত্র দেখিয়ে বললেন, এই পাথরকে সব জাতি পূজো করে। মুসলমানেরা কাবায় গিয়ে পাথরই পূজো করে, না করলে হজ হয় না। এই পাথর-পূজোর জন্যই তারা মক্কায় যায়।

তওয়াফে দাঁড়িয়ে আজ এই মুহূর্তে সেই ভদ্রলোকের কথা বিশেষ করে মনে পড়ল। হাযরে আসোয়াদের প্রতি এই অন্ধ বিশ্বাস আর ভক্তি প্রায় পূজোর সামিল হয়ে যাচ্ছে। অথচ হাযরে আসোয়াদ একটি পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। পরিবারের লোকদের কাছে সেই পরিবারের মরহুম কর্তাব্যক্তির কলম পিরহান বা অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিষ যেমন পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়, নিখিল মুসলিম-পরিবারের কাছে হাযরে আসোয়াদ তেমনি বাবা আদমের এবং হযরত ইবরাহিমের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন।

এ প্রসঙ্গে হযরত উমরের একটি উক্তিই যথেষ্ট। হযরত উমর রা এসেছেন হজ করতে। হজ-মৌসুমে অসংখ্য মানুষের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি অতি উচ্চ কণ্ঠে হাযরে আসোয়াদ সম্পর্কে সকলের সকল ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়ে ঘোষণা করলেন : 'আমি নিশ্চিত রূপে জানি যে তুমি (হাযরে আসোয়াদ) এক টুকরো পাথর মাত্র, কারও উপকার বা অপকার করার কোন শক্তি তোমার নেই।' পাপ শুষে নেওয়া ত দূরের কথা, হাযরে আসোয়াদ কেবল একখণ্ড পাথর। তার কোনই ক্ষমতা নেই, সে কিছুই করতে পারে না। তবে এ অবশ্যই একটি স্মৃতিচিহ্ন, এমন মহান স্মৃতি যাতে হযরত ইবরাহিমের স্পর্শ আছে, যার অঙ্গে রসুলুল্লাহ স-এর চুম্বন অঙ্কিত। আর এ জন্যেই সকল হজযাত্রী একে সম্মান করেন। একে কেন্দ্র করে নামায পড়া হয় না, কোন উপাসনা করা হয় না। যদি কেউ করেন তিনি কাফের হয়ে যাবেন।

ধীর স্থির গতিতে আমি আবার দ্বিতীয় পরিক্রমা শুরু করলাম। সাত চক্রের জন্যে সাতটি দোওয়া আছে, অনেকেই দেখলাম বই দেখে দেখে সে সব দোওয়া পড়ছেন। কিন্তু আমার কোন কিছু পড়তে ভাল লাগল না। অন্তরে গুঞ্জিত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বুকে

ধ্বনিত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে নিঃসৃত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে গেল যেন আমার দেহের প্রতিটি রক্তকণাও এই মহামন্ত্রে আলোড়িত হয়ে উঠছে বারবার। আমি আর অন্য কোন দোওয়া-দরূদ পাঠের কথা চিন্তাই কবতে পারলাম না।

ধীরে ধীরে মাকামে ইবরাহিমের কাছে এসে গেলাম এক সময়। এখানে এসে একজনের উৎকট চিৎকারে দরূদপাঠ আমার এবং অনেক তওয়াফকারীর তন্ময়তায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করল। দেখলাম তিনি নয়-দশ জনের একটি কাফেলাকে তওয়াফ করাচ্ছেন। যাঁরা তওয়াফের নিয়মকানুন জানেন না তাঁদের ঠিকমত তওয়াফ শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এঁদের যাঁরা তওয়াফ করান তাঁদের একই সঙ্গে কিছু পয়সা আর পুণ্য অর্জন হয়ে যায়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত শব্দে যে অন্য অসংখ্য মানুষের ধ্যান ভগ্ন হয় এই সহজ সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না। অনেকে ব্যক্তিগতভাবে তওয়াফ করতে করতে উচ্চকণ্ঠে দোওয়া পাঠ করে থাকেন. এটিও ঠিক নয়। এ বিষয়ে সকলেই যদি কিছু কিছু সংযত হতেন !

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন। রসূলুল্লাহ স তওয়াফ করছিলেন কাবা শরীফ। কেমন ভাবে ? অবশ্যই নীরবে এবং নিবিষ্ট চিত্তে। নীরব ছিলেন তিনি কিন্তু তাঁর আত্মা নত হয়েছিল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। যে কুরেশরা তাঁকে মক্কা থেকে বিতাড়িত করেছিল, আজ তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করে বিজয়ীর বেশে তিনি সেই পবিত্র শহরে প্রবেশ করেছেন। নিঃশঙ্ক চিত্তে তওয়াফ করছেন চিরবাঞ্ছিত কাবা, ঠিক যে পথ বেয়ে আমি তওয়াফ করছি আজ সে পথেই পা ফেলে এগুচ্ছিলেন তিনি। মুখে সেই মহা কলেমা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, কোন উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া, আল্লাহই সত্য—পরম নির্ভরস্থল। হঠাৎ দেখতে পেলেন ফোজালা ইবনে উমর, এক দুর্দান্ত মদ্যপ মক্কাবাসী, অতি সন্তর্পণে এগুচ্ছেন তাঁর দিকে। ফোজালার আপন স্বীকারোক্তি এ রকম ঃ মক্কা বিজয়ের পর হযরত সকলকে ক্ষমা করে দিলেন কিন্তু আমরা তাঁকে ক্ষমা

করতে পারলাম না। আমাদের মধ্যে শয়তানী বুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল প্রবলভাবে। তাই মক্কা-বিজয়ের দ্বিতীয় দিনে তওয়াফ-রত হযরতকে অতর্কিতে হত্যা করার জন্যে আমি গুপ্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে অতি সতর্কভাবেই তাঁর দিকে এগুচ্ছিলাম হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল আমার উপর। তাঁর চোখের দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বিহ্বল হয়ে পড়লাম। সব তাল গোল পাকিয়ে গেল, আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, কে ফোজালা নাকি ?

আমি বললাম, জি হ্যাঁ।

তিনি শুধালেন, কি অভিসন্ধি নিয়ে এসেছ ?

আমতা আমতা করে আমি বললাম, না—কিছু না, কিছু না—এই আল্লাহ আল্লাহ করছি।

আমি স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম, আমার কু-মতলবের কোন কিছু বুঝতে বাকি নেই রসুলুল্লাহর। ভীষণ, ভীষণ ভীত হয়ে পড়লাম আমি। জীবন নিতে এসে জীবনের ভয়ই এখন প্রধান হয়ে উঠল আমার কাছে। আমি নীরবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, যদি আল্লাহ আল্লাহই করে থাক তবে তওবা কর তাঁর কাছে, ক্ষমা প্রার্থনাও কর তাঁর কাছেই।

ভয়ে ভাবনায় অনুতাপে আত্মগ্লানিতে একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে উঠলেন ফোজালা। রসুলুল্লাহ স একেবারে তাঁর কাছে সরে এলেন তারপর নিজের ডান হাত ধীরে ধীরে স্থাপন করলেন অনুতপ্ত ফোজালার বুকের উপর। ফোজালার নিজের কথায় ঃ তখন আমার সমস্ত চাঞ্চল্য আর মানসিক অশান্তি দূর হয়ে গেল। আমি যেন এক বেহেশতি তৃপ্তি অনুভব করলাম।

ইচ্ছা করলে রসুলুল্লাহ স ফোজালাকে শাস্তি দিতে পারতেন, হত্যা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিলেন। প্রাণের বৈরীকে মাফ করে দিলেন হযরত মুহম্মদ স। এভাবে মাফি পাওয়ায় প্রানের দুষমন হয়ে উঠলেন প্রানের দোস্ত। ক্ষমা দিয়ে বিশ্বজয় করেছেন রসুলুল্লাহ স। ক্ষমা ইসলামের এক বড় বৈশিষ্ট্য।

একনিষ্ঠভাবে মুসলমান হয়ে মক্কার পথ বেয়ে বাড়ির দিকে

ফিরছিলেন ফোজালা। এ সমস্ত লোকের অবসর মুহূর্তগুলি রঙিন করে তোলার উপকরণ ছিল মদ এবং রক্ষিতা। ফোজালাকে দ্রুত চলে যেতে দেখে গলি থেকে তাঁর এক আদরের রক্ষিতা ডাক দিল, প্রাণেশ্বর ! এক দন্ড ঘন হয়ে কাছে এস—খুব জরুরি কথা আছে। পরিবর্তিত ফোজালা ঘৃণাভরে সেদিকে না তাকিয়ে উত্তর দিলেন, সকলের প্রাণেশ্বর একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ কর, শান্তি পাবে। 'আল্লাহ আর ইসলাম এখন আমাকে তোমার নিকট থেকে পৃথক করে দিয়েছে।'

অতিদ্রুত বাড়ির পথে মিলিয়ে গেলেন ফোজালা।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! ধীর স্থির বিনীত বিগলিত গতি। তওয়াফের তৃতীয় চক্রের পরিক্রমা শুরু করলাম আমি। মুলতাজেম মাকামে ইবরাহিম অতিক্রম করে হাতিমের পাশ দিয়ে এগুচ্ছি, দৃষ্টি পড়ল বাবুস সালামের দিকে। ঐ ত আমার রসুল এগিয়ে আসছেন অসংখ্য সাহাবীদের সঙ্গে নিয়ে। দুঃখের দিন বুঝি শেষ হয়েছে রসুলুল্লাহর, একুশ বছরের কঠিন সংগ্রামের বুঝি আপাতঃ অবসান। মদিনা থেকে যাত্রা করেছিলেন আঠারই রমযান, অষ্টম হিজরী। সঙ্গে দশ সহস্র বীর যোদ্ধা—রসুল-প্রেমী সাহাবী, আল্লাহ-সমর্পিত জিন্দাদিল ভক্তবৃন্দ। শ্বেত উষ্ট্রী আল কাসোয়ার পৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন রসুলুল্লাহ। বালুময় পথ, উপত্যকা-অধিত্যকা অতিক্রমের সময় দশ সহস্র বীরের চলার ছন্দ তরঙ্গের আকারে আন্দোলিত হয়ে উঠছিল. অযুত কণ্ঠের তকবীর ধ্বনিতে হেজাজের প্রান্তর মুখরিত, এই বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় হযরতের মস্তক নত হয়ে পড়ছিল বার বার। 'মররজ জহরান' থেকে পবিত্র শহরে প্রবেশের সময় বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় তাঁর মস্তক এমন নত হয়ে পড়েছিল যে তা 'পালানের কাঠি' (উঠের পিঠে যে জিনিষের উপর তিনি বসেছিলেন তার কাঠি) স্পর্শ করেছিল। আজ এই চরম বিজয়ের মুহূর্তে, সকল কিছুতে, সকল ক্রিয়াকর্মে তিনি সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর বিপুল শক্তি আর অদৃশ্য পরিচালনা অনুভব করছিলেন। এ মহাসাফল্যের মর্মমূলে তিনি তাঁর কোন

সত্তাকে আদৌ অনুভব করতে পারলেন না।

ঐ ত রসুলুল্লাহ স বাবুস সালাম দিয়ে হযরত আবুবকর রা, হযরত উমর রা আর দশ সহস্র সাহাবী নিয়ে চিরবাঞ্ছিত বায়তুল্লায় প্রবেশ করছেন। এখানেও, এই শ্রেয়তম মুহূর্তেও, বিনয়ে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় তাঁর উজ্জ্বল ঋজু দেহ নত হতে হতে একেবারে সিজদার মত নুয়ে পড়েছে। চরম বিজয়-মুহূর্তে চরম নতি স্বীকার—এই ত রসুল-চরিত্রের পরম বৈশিষ্ট্য। এমন ভক্তি-প্লুত আনত শিরেই আমার রসুল পবিত্র কাবার চত্বরে নেমে এলেন তারপর যোগ দিলেন তওয়াফে।

তওয়াফে চলতে চলতে এক সময় দেখলাম আমার উদ্ধত অপবিত্র অহংকারী মস্তকও অজানিতে, কখন সামনের দিকে একেবারে ঝুঁকে গেছে। আমি আবার ডুকরে কেঁদে উঠলাম। এ কি হল আমার! আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম রসুলুল্লাহ স তওয়াফে হেঁটে যাচ্ছেন আমার সামনে। বিগলিত ভীষণ বিগলিত আর মথিত কণ্ঠে চিৎকার করলাম, আবার ঠিক চিৎকারও নয়, কেমন যেন বোবা শব্দ—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহম্মদুর রসুলুল্লাহ। আমার মাথাও নত হয়ে আসছিল। যেন সিজদায় লুটিয়ে পড়তে পারলে ভাল হয়। দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছিলাম, চলার শক্তিও আর থাকছিল না। আমার সমগ্র দেহে মনে প্রাণে যেন এক অদৃশ্য শক্তির সুস্পষ্ট শিহরণ অনুভব করলাম। সেই মহাশক্তিই আমার পরিচালক, আমার নিয়ন্তা। আমি আমার অন্তরের সব আকৃতি একত্রিত করে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললাম, লাব্বায়েক। দেখলাম আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ কান্নায় একেবারে ভেঙে চুরে আবেগে আপ্লুত আর সিক্ত শিথিল হয়ে গেছে। যেন আমি ফিস ফিস করে অনন্তের কানে কানে বললাম, লাব্বায়েক—হাজির, আপনার পবিত্র দরবারে গোলাম হাজির। ঘৃণিত লাঞ্ছিত অপবিত্র হয়ত শুকরের চেয়েও অপবিত্র এক আত্মা—যে শুধু কলঙ্কিত আর কলঙ্কিত, আপনার পবিত্র মজলিশে হাজির। কিন্তু আপনি আর আমাকে কোথাও তাড়িয়ে দিতে পারবেন না। মারুন কাটুন যত ইচ্ছা সাজা দিন—

দূরতম কোনে পড়ে থাকব, কিন্তু আমি এ মজলিশ ছেড়ে আর কোথাও যাব না। মা তার শিশুকে যত মারে অবোধ শিশু ততই ত মাকেই জড়িয়ে ধরে, আমিও ত এক অবোধ শিশু, আমিও আপনার রহমতের রজ্জুকে সর্ব শক্তি দিয়ে এই ধরলাম, আর ছাড়াতে পারবেন না। প্রভু আমার ! কারো বাড়িতে কুকুর গেলে সে কোন কিছু না দিক একটা ঝুটো কাঁটাও ফেলে দেয়, আপনি আমাকে খালি হাতে ফেরাতে পারবেন না। প্রভু আমার ! যদি এই অপবিত্র অত্যাচারিত পিপাসিত মূর্খকে আপনার রহমতের সাগর থেকে নিরাশ করে ফিরিয়ে দেন, সে ত আপনার শানের খেলাফ হয়ে যাবে !

ঠিক সেই সময় কালো গেলাফে ঢাকা বিশাল কাবার দিকে পলকে নজর পড়ল। আর মুহূর্তে মনে হল, এই ত আপনার রহমত, এই ত মানুষের জন্যে আপনার বেহেশতি সওগাত। কাবার দিকে নজর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মুহূর্তে মনের মধ্যে যে কি তুফান জেগে উঠল ! মনে হল কাবা ত শুধু কয়েকটা পাথরের সমষ্টি নয়, এ যেন বিশ্বের একমাত্র সংযোগ-কেন্দ্র, যা মানুষের অন্তরকে আল্লাহর জ্যোতির সঙ্গে মুহূর্তে যুক্ত করে দেয়। এর আগে কয়েকবারই কাবাকে দেখেছি কিন্তু ঠিক এই উপলব্ধি হয়নি একবারও। এখন যেন ব্যাপারটা দিবসের উজ্জ্বল আলোর মত স্পষ্ট। এখন যেন আমি হৃদয় দিয়ে একান্ত করে উপলব্ধি করতে পারছি সব কিছু।

সত্যই ত, কাবা যদি কেবল পাথরে গড়া একটা শাদামাটা ঘর হবে—আর প্রকৃতপক্ষে কাবা পাথরে তৈরি একটি ঘর, যার কোনই বাহ্যিক সৌন্দর্য নেই—তা হলে বিশ্বের এত মানুষ পাগলের মত এখানে ছুটে আসবে কেন ! নিখিলের সর্বত্র অণুতে পরমাণুতে আল্লাহ আছেন, কিন্তু এখানে এলে যেন অতিসহজে তাঁকে পাই, হৃদয়ে পাই, একান্ত করে পাই।

বুকের ধনকে অনায়াসে বুকে ফিরে পাওয়া যায় এখানে।

অশ্রু মুছে চতুর্থ চক্রের পরিক্রমা শুরু করলাম আমি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আরো ধীর, স্থির, আরো বিনীত গতি। আমার চারপাশে বৃত্তাকার পবিত্র পথরেখায় যখন প্রায় সকলেই দ্রুত

হতে দ্রুততর পদচিহ্ন এ'কে এগিয়ে চলেছেন, আমার গতি তখন আশ্চর্যভাবে মন্থর হয়ে আসছে। আমি যেন কোন অনন্ত আলোর রাজ্যে হারিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গতি হারিয়ে যায়, দৃষ্টি ফুরিয়ে যায়। এই মুহূর্তে পা থেকেও যেন আমি স্থবির, চোখ থেকেও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। এ এক অপূর্ব আলোকিত ভূখণ্ড, এ জগৎ জ্যোতির জগৎ। এ জগৎ পরিপূর্ণ উপলব্ধির জগৎ। আবেগে অশ্রুতে আলোতে মাখামাখি হয়ে একটু একটু করে যেন ঝরে পড়ছে আমার পাপ, আমার কালো, আমার অন্ধকার। ধুয়ে মুছে ঝরে আমি যেন একটু একটু করে হালকা হয়ে উঠছি।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ !

দশ হাজার বীর সৈন্য তকবীর ধ্বনির সঙ্গে এই কলেমা উচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে আসছেন কাবার পথে। উম্মুল কোরা মক্কা, পবিত্র শহর মক্কার পথপ্রান্তর আজ উতরোল। দশ সহস্র বীর সেনানীর পদশব্দে রাজপথ মুখরিত। সেনাপতি সাদ ইবনে ওবায়দার হস্তে শোভা পাচ্ছে ইসলামি পতাকা, অধীর হাওয়ায় হিল্লোলিত হচ্ছে বার বার। চিরশত্রু আবু সুফিয়ানকে ম্লান মুখে এক চূড়ায় বসে থাকতে দেখে দীপ্ত কণ্ঠে সাদ ঘোষণা করলেন, আজ মারাত্মক সংঘর্ষের দিন, আজ কাবার সম্ভ্রম নষ্ট হবে—সেখানে রক্তপাত ঘটবেই।

এ কথায় পরাজিত কুরেশ নেতা ভীষণভাবে আহত আর চিন্তিত হল। সে ধরেই নিয়েছিল আজ একজন অত্যাচারীও রেহাই পাবে না। তবে পবিত্র কাবা প্রাঙ্গনেই যে এই রক্তপাত ঘটবে এতটা কল্পনা করেনি। সে ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে উঠল। আল আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে তখনই সে ছুটে গেল রসুলুল্লাহর নিকটে। বিনীত আর আর্দ্র কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল সে, মুহম্মদ—কুরেশরা কি তোমার আত্মীয় নয়? তুমি কি তোমার স্বজনদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছ?

আনসার বাহিনীর সঙ্গে তখন ছিলেন রসুলুল্লাহ স। আনুপূর্বিক ঘটনা অবগত হয়ে এক অশ্বারোহী হরকরাকে সঙ্গে

সঙ্গে তিনি পাঠিয়ে দিলেন সেনাপতি সাদের কাছে। অশ্বারোহী গিয়ে সাদকে জানালেন, এ ধরনের উদ্ধত মিথ্যা উক্তির জন্য সেনাপতির পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সাদ বিন ওবায়দা মাথা পেতে নিলেন সৈন্যাধ্যক্ষের এ নির্দেশ। নবনিযুক্ত সেনাপতির হস্তে পতাকা অর্পন করে একজন সাধারণ সৈনিক বেশে তিনি চললেন মক্কার পথে। এক মুহূর্ত পূর্বে যিনি ছিলেন সেনাপতি এখন তিনি একজন সাধারণ সৈনিক মাত্র। অথচ কোন প্রতিবাদ নেই। কলেমা মানুষকে মহৎ করে, মহীয়ান করে।

কাবা ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছিল। রসূলুল্লাহ একবার আকাশের দিকে তাকালেন। সারাক্ষণই তিনি স্মরণ করছিলেন মহান আল্লাহর অনুগ্রহের কথা। তারপর আবেগগাঢ় কণ্ঠে আবু সুফিয়ানকে বললেন, সাদের কথা সত্য নয়। আজ কখনই সংঘর্ষের দিন নয়—আজ প্রেমের দিন, আজ ভালবাসার দিন, আজ করুণা প্রকাশের দিন, আজ কাবার পবিত্রতা চিরতরে প্রতিষ্ঠিত হবার দিন।

শিশির ধোয়া নির্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ঔজ্জ্বল্যে দশদিক আলোকিত করে কাবায় প্রবেশ করলেন রসূলুল্লাহ স। শান্ত পদক্ষেপ, বিনীত গতি, নত মস্তক, মুখে তকবীর ধ্বনি আর সেই মহামন্ত্রের গুঞ্জিত উচ্চারণঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! হ্যাঁ, তখন হেরেম শরীফের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অসংখ্য নরনারী—ভীতিবিহ্বল, বেদনাম্লান, শঙ্কাতুর। ওরা কারা? ইসলামকে যারা পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন করতে জীবনপণ করেছিল ওরা তারা। ওদের মধ্যে আছে রসূলুল্লাহকে যারা হত্যা করতে চেয়েছিল তাদের অনেকেই, যারা নির্যাতন করেছিল, যারা কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছিল, যারা তীর নিক্ষেপ করেছিল, যারা উন্মুক্ত তরবারি উত্থিত করেছিল, যারা রক্তাক্ত করেছিল, ফাঁস লাগিয়েছিল, যারা পশুর মত মৃত সাহাবীদের বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃৎপিণ্ড চর্বণ করেছিল, যারা নাড়ি-ভুড়ি কেটে টুকরো-টুকরো করেছিল, যারা নিরীহ মুসলমানদের আগুনের উপর শুইয়ে বুকে পাথর চাপাত, যারা আল্লাহ প্রেমী দরিদ্র মুসলমানদের পিঠে চাবুক মেরে মেরে অজ্ঞান করে ফেলত, যারা

রসুলভক্ত কঙ্কালসার ক্রীতদাসগুলোর গলা টিপে জিব বার করত, যারা জ্বলন্ত লাল কয়লা দিয়ে জিন্দাদিল মুসলমানদের চামড়ায় দাগ কেটে খেলা করত, যারা বর্শার আঘাতে তাদের দেহকে কোমল মেষ শাবকের মত ছিন্নভিন্ন করত, যারা শূলবিদ্ধ খোবায়েবের দেহ থেকে টুকরো টুকরো গোশত কেটে নিয়ে তিলে তিলে যন্ত্রণাদায়ক পাশবিক হত্যা করেছিল—ওরা তারা, সেই নির্যাতনকারী মহামান্য পশুর দল। শ্রেণীবদ্ধ এই পশুদের ঠিক পশ্চাতেই দশ সহস্র উন্মুক্ত তরবারি, রসুলুল্লাহর সামান্যতম ইংগিতের অপেক্ষায় দৃঢ়মূল, স্থির। আর কিছু না কেবল একটু ইশারা, একটু মাত্র ইশারা—আল্লাহর শত্রু, রসুলের দুষমন, ইসলামের হত্যাকারী—চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভয়ঙ্কর সেই সংকটময় মুহূর্ত। চরম নিস্তব্ধতা নেমে এল কাবার চত্বরে। তওয়াফ শেষ করে অকস্মাৎ মুখ খুললেন রসুলুল্লাহ ঃ হে কুরেশগণ ! বলো, তোমাদের সঙ্গে আজ আমি কেমন ব্যবহার করব ? তটস্থ সকলে চারদিক থেকে শেষ আশাটুকু সম্বল করে ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে প্রার্থনা জানাল ঃ হে আমাদের মহান ভ্রাতা ! হে আমাদের মহান ভ্রাতুস্পুত্র ! তুমি বিজয়ী। তুমি আজ দণ্ডদানে সমর্থ। আমরা অবশ্যই অত্যাচারী এবং অপরাধী। তবুও তোমার কাছে আমরা সদ্ব্যবহার আশা করছি, কল্যাণ আর মঙ্গল আশা করছি।

চরম নৈঃশব্দ্যে কাবা প্রাঙ্গণ কৃষ্ণ প্রস্তরের মত স্তব্ধ। এই সেই চরম মুহূর্ত। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জীবনপণ যে সংগ্রাম চলছিল, যে সীমাহীন পাশবিক অত্যাচার তিনি সহ্য করেছেন সেই সব পশুদের ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ গ্রহণের চরম ক্ষণ ! আবার মুখ খুললেন রসুলুল্লাহ। প্রেম এবং করুণায় কণ্ঠস্বর উদ্বেলিত। নিঃসঙ্কোচ এবং দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করলেন ঃ "লা তাসরেবা আলায়কুমুল ইয়াওমা"—আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আবেগে তাঁর কণ্ঠ কেঁপে উঠল। এই পরম স্মরণীয় মুহূর্তে তিনি গভীরভাবে স্মরণ করলেন আল্লাহকে। সমবেত সকলেই ভাবছেন প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের

সর্বাধিনায়ক মুহম্মদ, তিনি যা করবেন তাই হবে, যা বলবেন কার্যকর হবে তাই আর রসূলুল্লাহ স স্বয়ং সব কিছুতে অনুভব করছেন আল্লাহর অনন্ত শক্তির অস্তিত্ব, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন নিজেকে রঞ্জিত করার স্বর্ণসুযোগ উপস্থিত, তিনি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট করলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে, বললেন ঃ "ইয়াগফেরুল্লাহ লাকুম অ হুয়া আর হামুর রাহেমীন"—আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন, তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়াময়। অবশেষে প্রেম-বিজড়িত কণ্ঠে রায় দিলেন ঃ "এজ হাবু আফানুতুমুত্ তুলাকাও"—যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।

দশ সহস্রের বিশাল বাহিনী যখন মররজ জাহরানে এসেছিল তখনই রসূলুল্লাহ মক্কা বিজয় করেছিলেন, এখন করলেন মক্কাবাসীর হৃদয় বিজয়। প্রেম-ভালবাসা-ক্ষমার এই উজ্জ্বল আদর্শে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুহূর্তে নিখিল মানব কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে গেল !

হায় ! আমরা যদি এভাবে আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করতে পারতাম !

রোকনে ইয়ামানী পার হয়ে ধীরে ধীরে আবার আমি হাযরে আসোয়াদের নিকট উপস্থিত হলাম। শুরু হল পঞ্চম চক্রের পরিক্রমা।

কাবায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কি করেছিলেন রসূলুল্লাহ স ? কি সেই আনুপূর্বিক বর্ণনা ? তওয়াফে দাঁড়িয়ে আমার চিত্ত ক্রমেই উদ্বেল হয়ে উঠছিল, আমি যেন সকল কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। এ ত গল্প নয়, এ ত উপকথা নয়, পুরাণের কোন কল্পিত কাহিনীও নয়—ঘটে যাওয়া অতীত স্বরূপে ঝলমল করে উঠল আমার সামনে। ইসলামের অস্তগামী অতীত যেন দিগন্তরেখা ভেদ করে হঠাৎ অন্ধকারের আড়াল থেকে আমার বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে তার কিরণজাল ছড়িয়ে দিল।

আহ্বান পেয়ে ছুটে এলেন বীর্যদীপ্ত হযরত উমর ফারুক রা, তাঁর উপর ভার পড়ল বিগ্রহগুলি ফেলে দেবার। দেওয়ালে ছিল

হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইলের কল্পিত চিত্র, আর এক স্থানে ছিল যীশু ক্রোড়ে মেরীর কল্পনার রূপায়ণ। সেগুলিও মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন রসুলুল্লাহ স। যেগুলি উঠল না, জাফরাণের পানি দিয়ে অবলুপ্ত করা হল। তারপর পবিত্র কাবার ভিতরে বহুবাঞ্ছিত প্রবেশ করলেন রসুলুল্লাহ স। তখনও ধাতু তৈরি যে বিগ্রহগুলি ছিল, হাতের ছড়ি দিয়ে তাদের কপালে খোঁচা মেরে উদাত্ত স্বরে আবৃত্তি করলেন কোরআন শরীফের এই আয়াত ঃ ''জায়াল হাক্‌কো অজাহাকাল বাতেল, ইন্নাল বাতেলা কানা যাহুকা'' —সত্য এল মিথ্যা বিলুপ্ত হল, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তারপর আবেগভরে কাবার প্রতিটি কোণে কোণে তিনি পাগলের মত দৌড়ে গেলেন এবং প্রাণভরে তকবীর ধ্বনি দিলেন। বাইরে সাহাবার কণ্ঠে সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরল। কুরেশরা ভীত সন্ত্রস্ত, অপমানে হতাশায় মুহ্যমান। প্রথম দিন তওয়াফ এবং তকবীর ধ্বনির মধ্যেই কেটে গেল সকলের। আনন্দ এবং ভাবের ঘোরে উন্মাদ অবস্থা! সুদীর্ঘ দিন পর বিতাড়িত এবং লাঞ্ছিত মানুষেরা ফিরেছেন স্বদেশের স্নিগ্ধ ছায়ায়, মাতৃ বঞ্চিত পেয়েছেন মায়ের শান্ত কোল। প্রাপ্তির এই আকস্মিক উন্মাদনায় এবং মহান আল্লাহতে আত্মসমর্পিত হবার বিনীত ব্যাকুল আকাঙ্খায় সকলেই প্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য। সবার সম্মুখে তখন জীবন্ত ও জ্বলন্ত আদর্শ রসুলুল্লাহর অশ্রুসজল সমর্পিত সিজদানত দেহ মুবারক ত ছিলই, সকলকে আল্লাহর প্রেমে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তা ছিল যথেষ্ট। এই অবস্থায় দ্বিতীয় দিনের সুবেহ সাদেকের আলো অন্ধকারে হযরত বিলাল রা-কে আযান দেবার নির্দেশ দিলেন।

তখন কাবায় কোন মিনার ছিল না। একটি উঁচু মত জায়গায় উঠে হযরত বিলাল মধুর কণ্ঠে আযান দিতে শুরু করলেন। একে ত সদ্যবিজিত মক্কার অনুকূল পরিবেশ, তার উপর ভক্তি বিহ্বল কণ্ঠে বিলালের শিরিন সুরের হৃদয় উদ্বেলিত আযান, শিশির স্পর্শে শিউলি ফোটার মত স্ফুটোন্মুখ সহস্র মানুষের হৃদয় কুসুম

যেন আপনি খুলে গেল, লক্ষ কণ্ঠে সেই আযানের প্রতিধ্বনি দুলে দুলে মক্কার দূর দূরান্তে ভেসে গেল। বহু শতাব্দীর কুসংস্কার ও অন্ধকারের কঠিন প্রস্তরে আঘাত হেনে সেই আযান ধ্বনি যেন মক্কার অলিতে গলিতে, পথে-প্রান্তরে এক বেহেশতি দ্যোতনা ছড়িয়ে দিল। সত্যের স্পর্শে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না কুরেশদের। হাত আড়াল করে সূর্য ঢেকে আর বলা গেল না, এখন অন্ধকার। ফজরের নামায শেষ হতে না হতে দেখা গেল বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে শত্রুরা, মিত্র হবার জন্যে ছুটে আসছে কাবায়।

মুহূর্তের মধ্যে আগন্তুকদলের ক্রমবর্ধমান আগমনে কাবা চত্বর পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। হযরত মুহম্মদ স কি করেন তা দেখার জন্যে কুরেশদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমের চাঞ্চল্য পড়ে গেল। নামায শেষ করে সমবেত সকলকে উদ্দেশ্য করে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে রসূলুল্লাহ স সর্বপ্রথমেই আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন ঃ

ক. আল্লাহর শোকর যিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, যিনি তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন এবং একা উপজাতি সমূহকে পরাজিত করেছেন।

ছোট্ট তিনটি কথা, তিনটি বাক্য মাত্র অথচ এই সামান্য কথাগুলির মধ্যে সমগ্র রসূল-চরিত্রমাধুরী বিকশিত হয়ে উঠেছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে রসূলুল্লাহ ছিলেন আল্লাহ সমর্পিত। সকল কাজে, সকল কর্মে, নিদ্রায়-জাগরণে, শয়নে-স্বপ্নে আল্লাহ ছাড়া তাঁর কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমরা সাধারণ মানুষেরা এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও বিজয়ের মধ্যে, রসূলুল্লাহর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সুনিপুণ রণকুশলতা, সৈন্যাধ্যক্ষ হিসেবে তাঁর অতুলনীয় যোগ্যতা ইত্যাদি কত কিছুই না প্রত্যক্ষ করে উল্লসিত হই, মুগ্ধ হই, বিস্মিত হই ! অথচ দেখতে পাচ্ছি রসূলুল্লাহ নিজেকে মাত্র একজন দাস বলেছেন এবং সকল কৃতিত্ব এবং সাফল্যের মূলে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই প্রত্যক্ষ করেছেন, এমন কি তিনি নিজে যে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর যে কোন ভূমিকা ও অস্তিত্ব ছিল

একথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হয়েছেন, একটি বারের জন্যেও এসব কথা মনে হয়নি তাঁর।

আল্লাহর রসূলের সঙ্গে আমাদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই। আমরাও যদি রসূলুল্লাহর মত আমাদের সমগ্র কর্মধারা ও জীবনাচরণের মধ্যে মহান আল্লাহর অনন্ত স্পর্শ এই ভাবে অনুভব করতে পারতাম!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, কোন নির্ভরস্থল নেই, কোন সাহায্যকারীও নেই। সকল কিছুর উৎস তিনি। সকল কিছুর উপরে তাঁর স্থান। হযরত মুহম্মদ স সেই বিপুল শক্তিতে চির নির্ভরশীল, আমরাও সেই অনন্ত শক্তিতে আত্মসমর্পনকারী!

তওয়াফ সেই আত্মসমর্পণের বহিঃপ্রকাশ।

খ. সকলে শ্রবণ কর! অন্ধকার যুগের সকল অহঙ্কার, তা অর্থের বা রক্তের যাই হোক, আমার পদতলে পিষ্ঠ হয়ে চিরকালের জন্য রহিত হয়ে গেল।

গ. হে কুরেশজাতি! অন্ধকার যুগের (পূর্বের) অহমিকা ও কৌলিন্য গর্ব আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদম হতে আর আদম মাটি হতে (সৃষ্ট)।

অর্থাৎ মানুষকে সব কিছু সহ্য করতে এবং মাটির মত অহঙ্কার শূন্য হতে হবে।

চত্বরে ভিড় হওয়ায় রসূলুল্লাহ অতি নিকটে একটি প্রশস্থ জায়গা বেছে নিলেন। তিনি গিয়ে বসলেন সাফা পর্বতের উপত্যকায়, সামান্য উঁচুতে—যাতে সকলের পক্ষেই তাঁকে দেখা ও তাঁর কথা শোনার সুবিধা হয়। দলে দলে কুরেশরা সেখানে গিয়েই তাঁর কাছে ইসলামে দীক্ষা নিতে শুরু করল। একদল আসছে, দীক্ষা নিয়ে চলে যাচ্ছে। তারপর আসছে অন্যদল। তারপর অন্যদল। ঢেউ এর পর ঢেউ। তরঙ্গের পর তরঙ্গ। ঠিক তওয়াফে যেমন নতুন মানুষের ঢেউ আছড়ে এসে পড়ছে প্রতি মুহূর্তে।

তওয়াফ সেরে চলে যাচ্ছেন একদল, সঙ্গে সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছেন অন্যরা। কর্মমুখর রসূলুল্লাহ স বসে বসে কাজ করছেন অবিরাম। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন একজন অতি সাধারণ আরব এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে। কিন্তু সে কাঁপছে, ভীষণ কাঁপছে। কিছুতেই ঠিকমত পা ফেলে এগুতে পারছে না সে। মনে হচ্ছে কেউ না ধরলে এখুনিই পড়ে যাবে। লোকটার বার বার মনে হচ্ছে, সে যেন এগিয়ে যাচ্ছে এক মহাশক্তিশালী সম্রাটের দরবারে, যিনি এই মুহূর্তে বিশ্ববিজয়ী, যাঁর মত সম্রাট পৃথিবীতে আর একজনও নেই। তার মত একজন দীন হীন লোক এই সম্রাটের দরবারে যাবে কি করে ! তার না ফাঁসি হয়ে যায় ! প্রকৃত পক্ষে ফাঁসির আসামীর মত ভয়ে শংকায় আতঙ্কে সে দিশেহারা, সংজ্ঞাহীন। অনবরত কাঁপছিল সে। তার অবস্থা দেখে খুবই ব্যথিত হলেন রসূলুল্লাহ স। তাঁকে দেখে কেউ ভীত হোক এ ত তিনি চান নি, এমন কাজও তিনি করেন নি। অথচ লোকটা ভীত হয়েছে। খুবই বেদনাবোধ করলেন দীন-দুঃখীর নবী হযরত মুহম্মদ স। তিনি ত মানুষের নবী, সকল মানুষের জন্যেই আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁকে। তাঁরও জন্ম দরিদ্র পরিবারে, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছেন তিনি। দরিদ্ররা তাঁর আপনজন। দুঃখীর নবী মুহম্মদ স আর স্থির থাকতে পারলেন না। সজল চোখে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সাগ্রহে দু বাহু বাড়ালেন সেই মানুষটির দিকে, যেন অভ্যর্থনার হাত বাড়িয়েছেন। নিস্তব্ধ জনতার সহস্র ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সে জান্নাতি দৃশ্যের দিকে। জীর্ণ-শীর্ণ লোকটিকে কি ফিরিয়ে দেবেন তিনি ? ভর্ৎসনা করবেন ? সকলেই উদগ্রীব। আল্লাহর রসূল, দীন-দরিদ্রের নবী মহুম্মদ স সজল চোখে আবেগগাঢ় কণ্ঠে লোকটিকে বললেন ঃ ভয় করছ কেন ? আমি কোন রাজা নই। আমি একজন মানুষ। তারপর গভীর বেদনার স্পর্শে তাঁর কণ্ঠস্বর অধিকতর গাঢ় হয়ে এল। নামান কণ্ঠে তিনি বললেন ঃ আমি এমন এক মহিলার সন্তান যিনি ক্ষুধার জ্বালায় শুকনো গোশত চিবিয়ে খেতেন !

রসূলুল্লাহ গো !

আর নয়, আর আমরা সইতে পারব না !

ইয়া রসূলুল্লাহ ! বিলাস বসনে উম্মত্ত আপনার এই অক্ষম অনুপযুক্ত পাপী উম্মতকে ক্ষমা করুন ! মাফ করুন !! কদম মুবারকে আশ্রয় দিন !!!

তওয়াফ চলছে। দেখলাম, আবেগের বশে কেউ কেউ সম্পূর্ণ কাবা শরীফের চার পাশের দেওয়ালের গেলাফ স্পর্শ ও চুম্বন করতে করতে এগুচ্ছেন। ভিড়ের চাপে অনেক সময় সব জায়গাটা স্পর্শ করা হচ্ছে না কিন্তু যেই সুযোগ পাচ্ছেন অমনি কাবার দেওয়ালে হাত দিচ্ছেন এবং চুম্বন করছেন—যেন কাবার সারা দেওয়ালেই পবিত্রা ছড়িয়ে আছে, যে কোন স্থান স্পর্শ করলেই পরিশুদ্ধ হওয়া যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়। অথচ কাবার দেওয়ালের যেখানে সেখানে স্পর্শ করা বাঞ্ছনীয় নয়, এতে শৃঙ্খলা থাকে না, নিয়মানুবর্তীতায় আঘাত লাগে। তওয়াফের সময় রসূলুল্লাহ কেবল মাত্র রোকনে ইয়ামানী এবং হাযরে আসোয়াদ এই দুই স্থানই স্পর্শ ও চুম্বন করতেন অন্য কোথাও নয়। সুতরাং সুন্নাত মোতাবেক কেবল মাত্র এই দুই স্থানেই চুম্বন করা যায়— তাও যদি সম্ভবপর হয়, অন্যথায় তকবীর ধ্বনি দিয়ে হাতের ইশারায় চুম্বন করলেই যথেষ্ট হবে, আল্লাহ তাই কবুল করে নেবেন। মানুষের অন্তর দেখেন আল্লাহ—আড়ম্বর নয়।

ওহোদ যুদ্ধে যে পিশাচিনী শহীদশ্রেষ্ঠ বীর হযরত হামযার বক্ষ বিদীর্ন করে নাড়িভুঁড়ি বার করে টুকরো টুকরো করেছিল, নাক-কান কেটে পায়ের মল তৈরি করেছিল আর হৃদপিন্ড বার করে চিবিয়েছিল নরখাদকের মত, মক্কা বিজয়ের পর সেই হিন্দা ভিড়ের মধ্যে নেকাবে আত্মগোপন করে এগিয়ে এল রসূলুল্লাহর দরবারে। গতকাল আত্মসমর্পিত নেতা আবু সুফিয়ান যখন দ্রুত ফিরে এল মক্কায় তখন কম্পমান কুরেশরা সকলে ঘিরে ধরল তাকে। সকলের ব্যাকুল প্রশ্ন, উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসা ঃ মুহম্মদের হাত থেকে রক্ষার

জন্যে তুমি কি করলে আমাদের ? কি করে এলে ? মুহম্মদ কতদূর ?

রসূলুল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া নির্ভয়-নির্দেশ শুনিয়ে দিলেন সকলকে। আবু সুফিয়ান বললেন, মুহম্মদ ত মক্কা জয় করবেই। তাঁকে রোধ করার মত শক্তি আর আমাদের নেই। তবে—

সমবেত সকলে গভীর শঙ্কায় তাকাল তার মুখের দিকে। সে বললে, তবে যে আমার ঘরে আশ্রয় নেবে তার কোন ভয় নেই......

স্বামীর পাশেই দাঁড়িয়েছিল হিন্দা, সে আবু সুফিয়ানের দীর্ঘ গোঁফ টেনে ধরে কুরেশদের বললে, তোমরা এই চর্বির বস্তাটাকে সাবাড় করে দাও ত। আহা—জাতির কত বড় রক্ষাকর্তা ইনি !

সেই বীরাঙ্গনা হিন্দা আজ নিরুপায় হয়ে ঘোমটায় আত্মগোপন করে সাফা পর্বতের উপত্যকায় এসে দাঁড়াল। এখানেও সে দুরভিসন্ধি নিয়েই এসেছিল, কোন রকমে একবার ইসলামে দীক্ষা নিতে পারলে তার জীবন বেঁচে যাবে তারপর যথারীতি সে চলবে তার নিজের পথে। সাপের মত বুকে হেঁটে বিবরের দিকে এগিয়ে যাবে—কখনো মাথা তুলবে, কখনো ছোবল মারবে—মুখে বিষের থলি থাকবে ঠিকই।

পুরুষদের দীক্ষা গ্রহণের পর এল মেয়েদের পালা। মেয়েদের বাইয়াত গ্রহণ করাচ্ছিলেন হযরত উমর রা। রসূলুল্লাহর ঠিক সামনেই বসেছিলেন তিনি। নিজের স্ত্রীদের (যে সব নারী তাঁর জন্য বৈধ) ছাড়া হযরত মুহম্মদ স জীবনে কোন স্ত্রীলোকের (যে সব নারী তাঁর জন্য অবৈধ) শরীর স্পর্শ করেন নি। হিন্দাও এই দলের মধ্যে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। এই দীক্ষা গ্রহণ পর্যন্তই সে ছিল কিছু শঙ্কার মধ্যে এবং নিশ্চুপ। কার্যসিদ্ধির পর সে তার স্বভাব ফিরে পেল। রসূলুল্লাহ স যখন সমবেত নারীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা আল্লাহর অংশী করোনা। হিন্দা বললে, আল্লাহর শপথ আপনি আমাদের উপর এমন একটা শর্ত আরোপ করেছেন যা পুরুষদের উপর করেন নি, এ শর্ত আমরা পালন করব। রসূলুল্লাহ বললেন, আর ব্যাভিচারে লিপ্ত হবে না। হিন্দা বললে, কোন স্বাধীনা মেয়ে কি ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় ? এই সব উত্তরে আল্লাহর

রসূল এতটুকু বিচলিত হলেন না। তিনি বললেন, আমি যা আদেশ দিই তোমরা তার অবাধ্য হবে না। হিন্দা বললে, অবাধ্য হতে চাইলে আমরা এতক্ষণ বসে থাকতাম না। রসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা চুরি করবে না। হিন্দা বললে, আল্লাহর শপথ, আবু সুফিয়ানের টাকা আমি মাঝে মাঝে নিতাম—জানিনা সেগুলি আমার জন্যে বৈধ কিনা। আবু সুফিয়ান সেখানে ছিল। সে বললে, যা হয়ে গেছে তা ছেড়ে দাও। এই প্রশ্নোত্তরে রসূলুল্লাহ সুস্পষ্ট ভাবে হামজার বিকলাঙ্গকারিণী হিন্দাকে চিনলেন। একটি বার তাকালেন। সকলেই তটস্থ, না জানি এবার কি হয়! কিন্তু রসূলের দৃষ্টিতে কেউ কোন উত্তেজনা বা তপ্ত আভাস দেখতে পেলেন না। তিনি শুধু তাকালেন কিন্তু কিছুই বললেন না। একটু নীরব থেকে আবার শপথ বাক্যে এগিয়ে গেলেন। বললেন, তোমরা সন্তান হত্যা করবে না। হিন্দা এই পরিস্থিতিতেও নিশ্চুপ থাকল না। বললে, আমরা ত তাদের মানুষ করেছিলাম কিন্তু বদর যুদ্ধে আপনি তাদের হত্যা করলেন। সুতরাং আমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে আপনিই ভাল জানেন। সকলেই লক্ষ্য করলেন এবার কথা বলতে গিয়ে হিন্দার কণ্ঠটা কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। কথায় যেন আগের দীপ্তি নেই, তেজ অনেকখানি নিভে এসেছে। কোন রকমে কথাগুলি বলেই হিন্দা থেমে গেল। এবারেও কোন কঠোর নির্দেশ দিলেন না রসূলুল্লাহ। পরে বললেন, তোমরা কারো বিরুদ্ধে নিন্দা রটাবে না। হিন্দা পূর্বের মত উচ্চকণ্ঠে কিছু একটা বলতে গেল কিন্তু কি যেন একটা বিরাটের স্পর্শে তার কণ্ঠ ধীরে ধীরে শীতল হয়ে এল। বিনীত কণ্ঠে সে শুধু বললে, নিন্দা রটান সত্যই লজ্জার কাজ। শেষের দিকে তার কণ্ঠ একেবারেই স্তব্ধ হয়ে গেল। সে শুধু রসূলুল্লাহর জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাকিয়েই রইল। তাকিয়েই রইল। সাফা পাহাড়ের উপত্যকায় বসে বহুদিনের বহু পাপের কথা স্মরণ হচ্ছে তার। বদর-ওহোদ-খন্দক যুদ্ধ, অত্যাচার-নির্যাতন, হামজার ব্যাপার ত আছেই—স্মরণ করে শিউরে শিউরে উঠছিল হিন্দা। আবু লাহাব আবু জেহেল এমন কি

তার স্বামী আব্ সুফিয়ান এদের সকলের চেয়ে বেশি সক্রিয় ছিল সে-ই। অথচ আজ হাতে পেয়েও রসুলুল্লাহ স কিছুই বললেন না ! একটিবার মুখেও আনলেন না ও কথা !

আমার মত পাতকীকে নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করে দিলেন !

রসুলুল্লাহর দরবারে বসে এসব কথা ভাবতে ভাবতে ক্রমেই উন্মনা হয়ে পড়ছিল হিন্দা। সে বসে আছে চুপচাপ কিন্তু একুশ বছরের পিছনের দঃসহ অতীত তাকে যন্ত্রণায়-অনুশোচনায় অস্থির করে তুলছিল। অথচ আকাশে তখন পূর্ণিমা, বুকের তরঙ্গে জোরের উচ্ছ্বাস। বেদনায় বিহ্বল হয়ে উঠছিল হিন্দা। তার মনে হল, তার কল্পনায় গড়া মুহম্মদের সঙ্গে সাফা উপত্যকায় এই লোকটির ফারাক দুস্তর, দুয়ের মধ্যে উদয়-অস্তের মত দূর ব্যবধান। বুকের আন্দোলন আর এলোমেলো ভাবনার মধ্য থেকে তাব মনটা অকস্মাৎ খাড়া হয়ে উঠল ভীষণ। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তারপর কোমল আর সিক্ত কণ্ঠে অন্তরের সব আকুতি ঢেলে দিয়ে উচ্চারণ করল, ইয়া রসুলুল্লাহ ! স্বর সিক্ত আর একেবারেই বিগলিত। বললে, কিছুক্ষণ আগেও আপনার তাঁবুর চেয়ে ঘৃণ্য তাঁবু পৃথিবীতে আমার কাছে আর একটিও ছিল না, আর এখন আপনার তাঁবুর চেয়ে কোন প্রিয় তাঁবু আমার চোখে একটিও নেই।

পরশ পাথরে এমনি করেই লোহা সোনা হয়ে যায় !

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! তওয়াফ চলছে। আমিও বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে বৃত্তাকারে পা ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছি। তওয়াফে এসব ঘটনা নিবিড় হয়ে ছবির মত আমার সামনে ফুটে উঠছিল একের পর এক। দেখতে পেলাম কত পিশাচ এ ভাবে পবিত্র সাহাবীতে পরিণত হল ! লোহা সোনা হয়ে গেল ! কেবল—ইয়া রসুলুল্লাহ—এই নাপাক অধম গোনাহগারের উপরের জংটুকুও ছাড়ল না, মালিণ্যটুকুও উঠল না, লোহাই রয়ে গেল—সোনা আর হল না। এই পাক দরবারে এসেও কি আপনার শুভদৃষ্টি পাব না ? অনন্ত রহমত হতে বঞ্চিত হব ?

রোকনে ইয়ামানীতে ভিড় ছিল, হাবরে আসোয়াদে ত কথাই

নেই। সুতরাং বিসমিল্লাহে আল্লাহ হু আকবার বলে ইশারায় এ দু স্থানে চুম্বন করে আমি ষষ্ঠ চক্রের পরিক্রমা শুরু করলাম। গতি ক্রমেই ধীর হয়ে আসছিল, ক্রমেই যেন আমি মহাসাগরের সমীপবর্তী হচ্ছিলাম।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আমি মাকামে ইবরাহিমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

মররয যাহারান থেকে মহাবিজয়ী মুকুটহীন সম্রাট উষ্ট্রী আল কাসোয়ায় চড়ে এগিয়ে চলেছেন মক্কার পথে। এই মহাবিজয়ের দিনে এই মহাসম্রাটের উষ্ট্রে তাঁরই সম্মুখে বসেছিলেন উসামা। না—উসামা কোন সম্ভ্রান্ত বিরাট ধনীর পুত্র নন, তাঁর কোন বংশাভিজাত্যও ছিল না, তিনি হলেন ক্রীতদাস যায়েদের পুত্র অর্থাৎ ক্রীতদাসের পুত্র কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস। কোথায় কুরেশবিজয়ী বীর সৈন্যাধ্যক্ষ রসুলুল্লাহ স আর কোথায় ক্রীতদাসের পুত্র সামান্য ক্রীতদাস ! অথচ এই মহা ঐতিহাসিক দিবসে তাকেই উষ্ট্রের সম্মুখে বসিয়ে সকলের বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে বিজয়ী ধীর সেনানায়ক প্রবেশ করলেন উম্মুল কোরা পবিত্র মক্কা নগরীতে। ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন রসুলুল্লাহ। তাঁর এই বিদ্রোহ কেবল মুখের কথায় সীমিত থাকেনি, প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আচার-আচরণে, জীবনের সকল ক্রিয়াকর্মে। সুতরাং আজ মক্কাবিজয়ের দিন নয়, কুরেশ বিজয়েরও দিন নয়—আজ বিপুল প্রেমে পাশবিক লাঞ্ছনার চির অবসানের দিন, অসীম ভালবাসায় মহামানবতার চির প্রতিষ্ঠার দিন, ভক্তি-শ্রদ্ধায় প্রেম-প্রীতিতে আপ্লুত হবার দিন, আজ সাম্য মৈত্রী প্রতিষ্ঠার দিন। অন্তজ ক্রীতদাস আর লাঞ্ছিত কালো মানুষের শিরদাঁড়া আর কখনো এমন ভাবে ঋজু হয়নি, তাদের গৌরবোজ্জ্বল শির আর কোনদিন এমন ভাবে উচেচ ওঠেনি।

সেই উসামার কাছে এসে দাঁড়াল বনী মখযুম গোত্রের সম্ভ্রান্ত দলপতিরা। এরা কুরেশদেরই গোত্র। তারা এসে উসামাকে ওকালতি করার জন্যে রসুলুল্লাহর কাছে পাঠাল। প্রথমে হযরত

উসামা যেতে চাননি কিন্তু পরে মখযূমীদের অনুরোধ-উপরোধে রাজি হয়েছিলেন। এই গোত্রটি ছিল খুবই সম্ভ্রান্ত, অর্থ বংশ সামাজিক মর্যাদা সকল দিক দিয়েই তাদের কৌলিন্য ছিল গর্বের মত। অথচ মক্কা বিজয়ের ঠিক পরে পরেই এই গোত্রের এক মহিলা চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ধৃত হন। সুতরাং আইন মোতাবেক তার হাত কাটা যাবেই। এই অপমান ও গ্লানি থেকে নিজেদের কৌলিন্য রক্ষার জন্যে গোত্রের লোকজন এসে ধরল উসামাকে। যে উসামাকে রসূলুল্লাহ এত ভালবাসেন নিশ্চয়ই তাঁর কথা ফেলে দেবেন না। সব শুনে রসূলুল্লাহর উজ্জ্বল মুখে ভাবান্তর ফুটে উঠল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে শুধু বললেন ঃ উসামা ! তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির ব্যতিক্রম করার জন্যে আমার কাছে অনুরোধ করতে এসেছ ?

সরল হৃদয় উসামা এইটুকুতেই অসহায় এবং অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর অনুরোধের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে বার বার প্রার্থনা জানালেন, ইয়া রসূলুল্লাহ ! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন !

সমবেত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে এক ভাষণে রসূলুল্লাহ স বললেন, জাহেলিয়াত যুগে দরিদ্র মানুষের জন্য এক রকম আর সম্ভ্রান্ত মানুষের জন্য অন্য রকম বিচার প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিচার কখনো দু রকম হয় না। বিচারে এই নিরপেক্ষতার অভাবেই অতীতে বহু জাতি সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। একটু থেমে আবেগগাঢ় কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন ঃ যাঁর হাতে আমার জীবন সেই আল্লাহর শপথ, আমার প্রাণাধিক কন্যা ফাতেমাও যদি চুরির অপরাধে ধরা পড়ে আমি তার হাত কাটতে কুণ্ঠিত হব না।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। ছোট বাক্য। ছোট কথা। ব্যাপ্তিতে বিশাল। ছোট শিশিতেই আতর থাকে, হীরা রাখার জন্য সিন্দুকের প্রয়োজন হয় না। এই ছোট বাণীটুকু ইসলাম-দেহের হৃৎপিণ্ড। বিশ্বমানবিকতার প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই এখান থেকে জীবন-প্রবাহ সঞ্চালিত হয়। এই মহাবাণীর উদ্গাতা আজ প্রতিষ্ঠা করলেন ন্যায় বিচার। পাপে দণ্ড,

পুণ্যে প্রশান্তি—এ আল্লাহরই বিধান। সুতরাং যিনি এ বাণী উচ্চারণ করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, ঈমান এনেছেন তিনি কখনও একজন পুণ্যাত্মাকে কোন অজুহাতেই শাস্তি দিতে পারেন না, তেমনি পারেন না কোন অবস্থাতেই একজন পাপীকে বিনাবিচারে অব্যহতি দিতে, তা তিনি বংশাভিজাত্য আর কৌলিন্যে যত বড়ই হোন। দিলে অন্যায় করবেন এবং আল্লাহর কাছে দায়ী হবেন। এ বাণী উচ্চারণকারীর, একজন ঈমানদারের কর্তব্য-অকর্তব্য আল্লাহর সঙ্গে বাঁধা হয়ে যায়। তাই রসুলুল্লাহ নির্দ্বিধায় সকলের হা-হুতাশ উপেক্ষা করে ঐ সম্ভ্রান্ত সুন্দরী রমনীর হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। হাত কাটা হল এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌর্যবৃত্তি দেশ থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল।

আর একজন কলেমা প্রতিষ্ঠাকারীর পক্ষেই মহাবিজয়ের দিন ক্রীতদাস পুত্র ক্রীতদাসকে সসম্মানে সম্মুখে বসিয়ে বিজিত রাজধানীতে প্রবেশ করা সম্ভব। যাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে উপাস্য করে তারা মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক কার্যক্ষেত্রে একজন নীচতম জাতির মানুষের সঙ্গে আহারে বসতে দ্বিধাগ্রস্থ ! কিন্তু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারী যেহেতু একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করনে, তিনি নির্দ্বিধায় উসামাকে সঙ্গে নিয়ে সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

ক্ষমা করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মহামন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রসুলুল্লাহ নিঃসঙ্কোচে ক্ষমা করেছিলেন সাপিনী হিন্দাকে, হত্যায় উদ্যত ফোজালাকে, চিরশত্রু আবু সুফিয়ানকে, আবু জেহেলের পুত্র ইকরামাকে, সারা জীবনের বহু অত্যাচার নির্যাতনের অসংখ্য নায়ক সমগ্র কুরেশ জাতিকে এবং আরো অনেককে। একজন কলেমা পাঠকারীর পক্ষেই ক্ষমার এই বিপুল ঔদার্যে বিনীত হওয়া সম্ভব।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যিনি এ কলেমা পাঠ করেন তিনি মুসলমান। তিনি ঈমানদার। এক ইহুদি এল রসুলুল্লাহর বাড়িতে। ইহুদি বললে, আমি ক্ষুধার্ত।

রসূলুল্লাহ তাঁর পবিত্র হাতে একটি ছাগী দোহন করে সম্পূর্ণ দুধটা সেই ইহুদির সম্মুখে ধরে বললেন, খাও। আহা—কতক্ষণ খাওয়া হয় নি তোমার! কিন্তু পেটুক ইহুদি একে একে যতগুলি ছাগী ছিল সেই সাতটি ছাগীর দুধ অনায়াসে পান করে তবে তৃপ্ত হল। রসূলুল্লাহ প্রতিবারই অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে দোহন করে এনে দুধের বাটি সাগ্রহে এবং সাদরে সেই বিধর্মী ইহুদির মুখের কাছে ধরেছেন এবং হৃদয়ের সব দরদ আর আন্তরিকতা উজাড় করে বলেছেন, খাও বাবা—আহা কতদিন খাওনি গো! এভাবে অতিথি আপ্যায়ন করে তাঁরা গোটা পরিবার সে রাতে অভুক্ত থেকে গেলেন। একজন কলেমা পাঠকারীর পক্ষেই এ ধরনের অতিথি আপ্যায়ন সম্ভব।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কলেমা পাঠ করে সেই ইহুদি মুসলমান হয়ে গেল পরে। আর কি আশ্চর্য, তখন তার একটি বকরীর দুধই যথেষ্ট হত। খাওয়ায় এই সংযম একজন সত্যকার ঈমানদারের পক্ষেই সম্ভব। এই মহামন্ত্র আমাদের আহার-বিহারকে সংযত করে দিয়েছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! তিনজন মুসলমান সৈনিক যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত, মৃতপ্রায়। পাশাপাশি পড়ে তাঁরা পানি পানি করছেন। একজন ছুটে গিয়ে অতিকষ্টে অল্প একটু পানি সংগ্রহ করে এনে প্রথম সৈনিকের মুখে দিতে যাবেন তিনি ইশারা করে পানিটা আগে দ্বিতীয় সৈনিকের মুখে দিতে বললেন অর্থাৎ পাশাপাশি পড়ে থেকে করুণ কাতরানি শুনে তাঁর মনে হয়েছে তাঁর থেকেও দ্বিতীয় জনের পানির প্রয়োজন সর্বাধিক। সুতরাং যিনি পানি এনেছিলেন, গেলেন দ্বিতীয় জনের কাছে। দ্বিতীয় সৈনিক ইশারায় তৃতীয় সৈনিককে দেখালেন, তৃতীয় জনের কাছে যেতে তিনি নিজে পান না করে দেখালেন আবার প্রথম জনকে। পানি সরবরাহকারী প্রথম সৈনিকের নিকট এসে দেখলেন যে তিনি ইতিপূর্বেই শারাবান তহুরা পান করে শাহাদাৎ লাভ করেছেন, দ্বিতীয় জনের দেহও শীতল হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, তৃতীয় জনের কাছে গিয়ে দেখা গেল তিনিও ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না...। জীবনের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে,

মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও এই যে আত্মত্যাগ, এই যে বিশ্ববিপ্লবী বিরল উদারতা এ কেবল ঈমানদারের পক্ষেই সম্ভব, কেবলমাত্র একজন কলেমা পাঠকারীই পারেন এই অকল্পনীয় অসম্ভবকে সম্ভব করতে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! রসূলুল্লাহ এবং আর কয়েকজন সাহাবীকে দাওয়াত করলেন এক দর্জি। যথাসময়ে রসূলুল্লাহ হাজির হলেন সেখানে। রুটি, লাউয়ের তরকারী আর খাসীর কাবাব হাজির করা হল। বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর রসূল একটা লাউয়ের টুকরা তুলে নিলেন। উত্তম খাদ্যগুলি রাখলেন তাঁর সঙ্গীদের জন্যে। একজন কলেমা পাঠকারী ঈমানদার কখনো আগে উত্তম খাদ্যগুলি খেতে পারেন না। কলেমা আর ঈমান আমাদের খাওয়া আর আচরণকে আশ্চর্যভাবে চেতনার উজ্জ্বল শিকলে বেঁধে দিয়েছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! কলেমা সংযত করেছে আমাদের দৃষ্টিকেও। রসূলুল্লাহ হযরত আলিকে বললেন, হে আলি ! তোমার প্রথম দৃষ্টিপাতে কোন দোষ নেই কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিপাত শয়তানের। অর্থাৎ আকস্মিকভাবে হঠাৎ অশালীন কোন কিছু দেখে ফেললে বা চোখে পড়লে তাতে কোন পাপ নেই কিন্তু দ্বিতীয় দৃষ্টিপাতটি সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত সুতরাং লালসার এবং তা পাপের হয়ে যায়। এ ভাবে কলেমা আমাদের চলা-বলা-খাওয়াকে সংযত ও সত্যমুখী করে দিয়েছে।

সুবেহ সাদেকের পবিত্র আলো যেমন রাতের অন্ধকার আর দিনকে পৃথক করে দেয়, এই কলেমা তেমনি পাপ আর পুণ্যকে পৃথক করে দিয়েছে, সত্য থেকে মিথ্যাকে দূর করে দিয়েছে।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ! গভীর আবেগে আল্লাহর ঘরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর এ বাণী উচ্চারণ করলাম আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল ঃ এ পবিত্র কলেমা উচ্চারণ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই। এ দুর্গন্ধযুক্ত মুখ দিয়ে আমি কোন দাবীতে এ বাণী উচ্চারণ করব ? এ মিথ্যুক জিভ দিয়ে আমি কি করে মহাসত্য বাণী বলব ?

আল্লাহ ! আমি হয়ত আপনার এ পবিত্র কলেমার সম্ভ্রম নষ্ট করে দিলাম—আমায় ক্ষমা করুন। কোন পুণ্যই আমার নেই, সারা জীবন আমি পাপ করেছি, শুধু পাপ পাপ আর পাপ। সুদীর্ঘ একান্ন বছরের ফেলা আসা দুর্গন্ধময় যন্ত্রনাদায়ক ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত অতীত আমার সামনে রূপ ধরে দাঁড়াল। তার বীভৎস রূপ দেখে আমি ভয় পেলাম। সারা জীবনে একটি পুণ্যের কাজও আমি করিনি। দেখলাম আমার ভয়ঙ্কর কুৎসিত কদাকার চেহারা আমার সামনে দাঁড়িয়েই আমার সমগ্র চৈতন্যকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করছে। আমি আমার স্বরূপের মুখোমুখি হয়ে তাকে চিনলাম। দেখলাম ঃ আমি লোভী, আমি স্বার্থপর, আমি চোর, আমি ডাকাত, আমি পিতা-মাতার আদেশ অমান্যকারী, আমি নারী-লোভী, আমি লম্পট, আমি ব্যাভিচারী, আমি ভীষণ অহঙ্কারী—রূপের অর্থের সর্ববিষয়ের, আমি পুণ্যবতী স্ত্রীর প্রতি অন্যায়কারী, আমি অর্থলোলুপ, আমি কটুভাষী, আমি জুলুমকারী, আমি শপথ ভঙ্গকারী, আমি মিথ্যুক, সর্বোপরি আমি আল্লাহর বহু আদেশ অমান্যকারী এক পাপিষ্ঠ দুরাত্মা ! আমি কি করে এ বাণী উচ্চারণ করব !

আমি কাঁদছিলাম কিন্তু কিছুতেই জোরে কাঁদতে পারছিলাম না, বোধহয় সে শক্তি আমার ছিল না। কেউ যেন আমার দেহকে দুমড়ে ভেঙে চুরে ভুনা গোশতের মত একটা দলা পাকিয়ে দিয়েছে। বাণীহারা কোন আদিম মানুষের মত আমার কণ্ঠ দিয়ে একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরুচ্ছিল কেবল, কি বেরুচ্ছিল তা আমি নিজেও জানি না। আমার অন্তরের সব আবেগ, দেহের সব রক্তবিন্দু আর আকুতির সব অশ্রুজল মিলে মিশে একাকার।

সপ্তম চক্রের পরিক্রমা শুরু করেছিলাম এইটুকু মনে আছে—তারপর আর কিছু মনে নেই। সম্ভবত বেশ কিছুক্ষণ বাহ্যিক কোন জ্ঞান আমার ছিল না, যেমন অনেকেরই থাকে না। ক্রন্দন করতে করতেই আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম, কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না, দেখার কোন দৃষ্টিও আমার ছিল না। মহান কাবার তওয়াফের পথে পবিত্র ধূলিকণায় মিশে যাবার জন্যে দেহমন আকুল হয়ে উঠেছিল, বোধহয়

মিশেও গিয়েছিলাম। কলেমা আর ক্রন্দন এ দুটিই ছিল আমার সম্বল, আর কিছুই নয়। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে আমি এগুচ্ছিলাম। মোলতাজিম দেখতে পেলাম না, মাকামে ইবরাহিমও নয়, কোন তওয়াফকারীকেও নয়—কেবল যেন আমি একা সেই পবিত্র পথরেখায় উন্মাদের মত ঘুরছি। হঠাৎ কে যেন আমার অন্তরে সাহস সঞ্চার করল। আমি ফিস ফিস করে আমার প্রভুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বললাম, অত্যন্ত বিনীতভাবে বললাম, প্রভু ! আমি ত এসেছি আপনার পাক দরবারে পরিশুদ্ধ হতে, আপনার অনন্ত করুণার এক কণার ছটা পেতে! আমি অবশ্যই কলেমা উচ্চারণকারীদের একজন হতে চাই, শুধু আপনার রহমত প্রভু ! আপনার রহমত !!

প্রাণভরে তওয়াফের মধ্যে আবার কলেমা উচ্চারণ করতে পারলাম আমি। শিশুর মুখে যেমন কোন বাক্য নয় শুধু মা মা থাকে আর কোন কিছুই জানে না সে, আমার মুখেও শুধুই কলেমা, আর কিছুই নয়। একবার আভাসে বিশাল কাবার কিঞ্চিৎ ঝিলিক চোখে পড়েছিল তারপর কাবাও অবলুপ্ত হয়ে গেল, বিশ্বসংসার সবকিছু কোথায় তলিয়ে গেল। অন্তরে জারি থাকল কেবল কলেমা আর চোখে থাকল অশ্রু। উন্মাদেরাও ত খানাখন্দক দেখে পা ফেলে, সে অবস্থাও রইল না আমার।

লাব্বায়েক, প্রভু লাব্বায়েক ! আমার সব দীনতা, সব পাপ, সব কলঙ্ক, সব চরিত্রহীনতা, সব অন্ধকার নিয়ে আমি হাজির, প্রভু —আপনার পবিত্র মজলিশে হাজির ! আমার সব পাপ, সব আয়েব সর্বজন সমক্ষে গোপন করে এই অধমকে বড় ইজ্জতের সঙ্গে আপনার আলোকিত দরবারে এনেছেন—কিয়ামতের দিন কি আপনার এই অনন্তকরুণা থেকে বঞ্চিত হব ? বললাম ঃ প্রভু ! কোথায় ধূলিমলিন অখ্যাত অজানা সোলেমানপুর আর কোথায় আপনার বিশাল আলোকিত জান্নাতি দরবার ! ধুলো থেকে তুলে এই দীন পাপিষ্ঠকে যখন আপনার বিশাল দরবারের এক কোণে ঠাঁই দিয়েছেন —আর তাড়িয়ে দেবেন না প্রভু ! সব চেয়ে অবহেলিত আর দূরতম কোণে ফেলে রাখবেন, আমি দু চোখ ভরে শুধু আপনাকে দেখব,

দেখব আর দেখব। আর কিছু না, কোন প্রার্থনা নেই আমার, কোন আকাঙ্খা নয়—শুধু আপনার দিদার! প্রভু, আপনার মুবারক দিদার!!

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! আরো দু একবার উচ্চারণ করেই হঠাৎ আমার মনে প্রশ্ন জাগল, এই শব্দের মধ্যে কি আল্লাহর সম্পূর্ণ স্বরূপ বিধৃত আছে?

আল্লাহু হো আকবর—আল্লাহ মহান। মনে হল এটাও কোন অর্থবহ সর্বার্থবোধক শব্দ নয়। আল্লাহ মাফ করুন, মনের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াল যে এক সময় ভাবলাম, এ দুটো বাক্য অনেকখানি অসম্পূর্ণ। এ কথাগুলির মধ্যে পুরো সত্য ধরা পড়েনি। একথায় যেন সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহকে ছোট করা হয়, তাঁর বহুবিধ ব্যাপক ক্ষমতা ও মহিমাকে সংকুচিত করা হয়। আল্লাহ ছাড়া আর কে উপাস্য আছে যে আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাঁর বিশাল মহিমাকে সীমিত করব? আল্লাহর থেকে কে বড় আছে যে আমি শুধু তাঁকে আল্লাহু হো আকবর বলব? যত গভীরে যাই—তোলপাড় হয়ে মনে প্রশ্ন জাগে, এ কি কোন কথা হল? কাবার প্রাঙ্গণে তওয়াফের পথরেখায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলাম আল্লাহ এসবের অনেক উপরে, তিনি অনেক বিপুল—অনন্ত এবং অসীম। তিনি কেবল মাত্র 'তিনি'ই। তাঁর কোন উপমা নেই, কোন দ্বিতীয় নেই। তিনি সব উপমার অতীত, অদ্বিতীয়।

যাঁর ইচ্ছা তিনি এসব কথা বলুন, আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এসব বিশ্বাস নিয়েই জন্মেছি, আমার বুকে রয়েছে এই কলেমা, প্রতি নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহর নাম। শয়নে আল্লাহ স্বপনে আল্লাহ নিদ্রায় আল্লাহ জাগরণে আল্লাহ আমি মারা গেলেও আমার প্রতি রক্তবিন্দু থেকে উচ্চারিত হবে আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রতি লোমকূপ থেকে ধ্বনি উঠবে আল্লাহ আল্লাহ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আবার সেই প্রশ্ন জাগল ঃ এটা কি কোন কথা হল? আমার কাছে এর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে উপাসনা করবে না কে?

আল্লাহ ছাড়া এ পৃথিবীতে বাঁচবে কোন নরাধম ? আল্লাহকে উপাস্য হিসেবে ঘোষণা করা যেন একটা বাড়তি ব্যাপার। তাঁর পবিত্র শানের খেলাপ। পানি ছাড়া মাছ বাঁচে ? আকাশ ছাড়া তারা ? বায়ু ছাড়া প্রাণী ? মানুষের উপাস্য আল্লাহ—এত স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এর জন্যে কোন ঘোষণার প্রয়োজন নেই, অন্ততঃ এই মুহূর্তে—আমার কাছে।

এক সময় দেখলাম আমার মুখে আর কোন কথা নেই, আমি শুধু আল্লাহ আল্লাহ বলছি। আর কিছু নয়—শুধু আল্লাহ আল্লাহ। রহমান নয়, রহীম নয়, খালেক নয়, মালেক নয়—অন্য কোন নাম নয়, শুধু আল্লাহ। মনে হল ঃ আল্লাহ শব্দের মধ্যে যে ব্যাপকতা—সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, ধ্বংসকর্তা, রক্ষাকর্তা, সম্মানদাতা, জীবিকাদাতা ইত্যাদি—তা যেন আর কোন নামেই নেই। আল্লাহর এক এক নামে এক এক মাধুর্য আর সব মাধুর্যে ভরা শুধু আল্লাহ নাম। তাই বাহ্যজ্ঞান শূণ্য হয়ে আমি শুধু এই নামই উচ্চারণ করছিলাম।

একটু আগে মনে হয়েছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেয়ে আর কোন বড় সত্য নেই, এখন মনে হচ্ছে 'আল্লাহ'র চেয়ে আর মধুর শব্দ ও শাশ্বত সত্য নেই। এ যেন আমার প্রভুর নাম নিয়ে আমার মান-অভিমান খেলা, এতে আর কারো কোন অংশ নেই, বিশ্ববাসীর কোন সংশ্রব নেই। এ খেলা একান্ত ভাবে আমার প্রাণের, আমার আত্মার।

উচ্চারণ করছিলাম আমার প্রভুর নাম কিন্তু আমার মুখে কোন কথা ছিল না, সম্পূর্ণ মূক হয়ে গিয়েছিলাম। একটু আগে যে ফিস ফিস করছিলাম এখন তাও স্তব্ধ হয়ে গেল। ভাবের ঘোরে কোন অনন্তলোকে সব কিছু যেন হারিয়ে গেল। চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল অথচ সব কিছুই আমি গভীরতম ভাবে উপলব্ধি করতে পারছিলাম। অবশেষে এল জীবনের সেই দুর্লভতম চরম মুহূর্ত, যে মুহূর্ত আমি আমার জীবনে আর কখনো ফিরে পাইনি। বাহ্যজ্ঞান শূন্য অথচ উপলব্ধি করলাম

(আমার মনে হল ঃ) আমার কালব আল্লাহ্ আল্লাহ্ বলছে আর প্রতিটি রক্তকণা থেকে যেন তার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি উঠছে। দৃষ্টিশক্তি অবলুপ্ত অথচ এমন স্পষ্ট করে আমি জীবনে আর কোনদিন কোন কিছু দেখতে পাইনি। এক অজানা জ্যোতির আলোয় আমার অন্তঃকরণ ভরে উঠল, আমি সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম। সেই বেহেশতি নূরে আমার দেহমন ভরে উঠেছে, উজালা দশদিক, আলোর ফোয়ারায় আদিগন্ত ভেসে যাচ্ছে। সুদূর আকাশ থেকে কাবার উপরে পড়েছে সেই অনির্বান জ্যোতির ঝলক, সেই নূরে আমি সম্পূর্ণ সিক্ত, আপ্লুত। আমার সম্মুখে যে তওয়াফকারী সহস্র মানুষের ভিড় ছিল তারা কেউ নেই, তওয়াফের পথরেখা নেই, মোলতাজেম নেই, মাকামে ইবরাহিম নেই, হাতিম নেই, মিজাবে রহমত নেই, রোকনে ইয়ামানী নেই, হাযরে আসোয়াদ নেই, জমজম নেই, চারপাশের সুউচ্চ হেরেম শরীফ নেই, অতি নিকটে কালো গিলাফে ঢাকা বিশাল কাবাও নেই,—এ সবের স্থলে আছে এক অপূর্ব আলোর বন্যা, এক বেহেশতি জ্যোতির উচ্ছ্বাস—সেই আলোর মধ্যে আমি একা। আমার মধ্য থেকে 'আমি' অবলুপ্ত হয়ে গেছে, অস্তিত্বহীন অস্তিত্ব নিয়ে একা সেই আলোর রাজ্যে একেবারে বিভোর। পাথরের কাবাকে ফেলে রেখে, দেহকে ত্যাগ করে আমার আত্মা সেই জ্যোতির সঙ্গে মিশে যেন কোন অপার্থিবলোকে উধাও হল ! সে নূরের রাজ্যে পাথরের কাবারও কোন অস্তিত্ব নেই। রক্তমাংসের আদম-শরীরেরও কোন প্রবেশ নেই সেখানে। শুধু আলো আর আলো ! জ্যোতি আর জ্যোতি !! নূর আর নূরের প্লাবন!!! পবিত্র আর পরম প্রশান্ত সেই অলৌকিক আলোর গভীরে যত প্রবেশ করা যায় ততই শান্তি, নিবিড় অপার্থিব আরাম। সে আলো কেমন ? বলা যাবে না। সে তৃপ্তি কেমন ? বোঝান যাবে না। শুধু দেখলাম বিপুল আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়ে সেই আলোর ঝরণা পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ছে অবিরাম। সে সময় আমি কি করেছিলাম আমার মনে নেই। কেঁদে ছিলাম ? বোধ হয় না। চিৎকার করেছিলাম ? জানি না। যাই করে থাকি,

আমার দেহমন আত্মা প্রতিটি রক্তকণা প্রতিটি লোমকূপ সর্ব শরীর সর্বাঙ্গ পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল, পূর্ণ হয়ে গেল। মনে হল, মুহূর্তে যেন জন্মান্তর ঘটে গেল আমার। আমি ধন্য হলাম !

যখন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল তখন দেখলাম প্রচন্ড ভিড়ে অসংখ্য মানুষের চাপে হাযরে আসোয়াদ রেখাটা পার হয়ে আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। সপ্তম চক্রের পরিক্রমা শেষ হয়েছে, আমার একটি তওয়াফ সম্পূর্ণ হল। তখনো ঘোর কাটেনি। হঠাৎ কাবার দিকে নজর পড়ল আর মনে হল বিশাল কাবার উপর থেকে নূরের ছটা গুলো গুটিয়ে গুটিয়ে সুদূর অপার্থিবলোকে ফিরে যাচ্ছে। আর সেই জ্যোতির তলদেশ থেকে গিলাফে ঢাকা সুউচ্চ বিশাল কালো রং-এর কাবা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল। কাবার আত্মপ্রকাশ ঘটল।

কাবা ঘরের ভিতর আলো জ্বলে না। সেখানে অন্ধকার।

প্রিয়-র ঘরে যদি আলো না জ্বলে তার থেকে অন্ধকার গৃহ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

প্রেমিকের হৃদয়ের আলোয় বোধহয় সেখানে এমনি ভাবে আলো জ্বলে ওঠে, জ্যোতির প্লাবনে ভেসে যায়।

কিন্তু আল্লাহ আমার ! এই পাপী কলঙ্কিত নরাধম গোনাহগার আপনার প্রেমিক হতে পারল কই ? সারা জীবনের এত পাপ, এত দুর্গন্ধ নিয়ে যে আমি আপনার সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। প্রভুগো ! আমি কোথায় যাব ! আপনি আমায় ক্ষমা করুন !! কাঙাল আমি—মাফী প্রার্থী !!!

১৩

বড় সাধের প্রাণ মাতান হৃদয় ওলট-পালট করা একটি তওয়াফ শেষ হয়েছিল আমার। শেষ হয়েছিল কিন্তু আনুষঙ্গিক আরো কিছু করণীয় বাকি ছিল। প্রতি তওয়াফের শেষে দু রাকাত নামায পড়তে হয়—এ নামায ওয়াজেব সুতরাং জরুরি এবং অবশ্য পাঠ্য। অনেকে এই নামাযকে নফল মনে করেন—এটা ঠিক নয়। ফরজ বা নফল যে কোন তওয়াফের শেষে এ নামায ওয়াজেব, সুতরাং এ নামাযের প্রতি সকল হাজিকে ক্ষুধার অন্নের মত যত্নবান হতে হবে। বায়তুল্লাহকে সামনে রেখে মাকামে ইবরাহিমের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এ নামায আদায় করতে পারলে খুব ভাল। আল কোরআনে পাই ঃ আত্তাখাজু মাকামে ইবরাহিমা মুসাল্লা—তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে মুসাল্লা (নামাযের পাটি অর্থাৎ নামাযের স্থান) কর। সর্বপ্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর এ নির্দেশ অনুযায়ী প্রায় সকলেই কাবা শরীফ এবং মাকামে ইবরাহিমকে সামনে রেখে নামায পড়ার জন্যে ভীষণ ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। কিন্তু মাকামে ইবরাহিমের পরিসর মাত্র তিন ফুট। সুতরাং বাস্তব চিত্র এই যে এই পবিত্র স্মৃতিকে সামনে রেখে পাশাপাশি মাত্র দু জন আর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালে এক সঙ্গে বড় জোর তিন জন নামাযে দাঁড়াতে পারেন। অথচ এই স্থানটিকে অতি পবিত্র জ্ঞানে এক সঙ্গে বিশ হাজার, কখনো ত্রিশ চল্লিশ হাজার আল্লাহ প্রেমিক মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়েন। ফলে বেসামাল অবস্থাটা যে কোন পর্যায়ে চলে যায় তা সহজেই অনুমান করা চলে। অনেকে ,আবার প্রতিজ্ঞা করে আসেন, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছে, যে তিনি ওখানে যে কোন খেসারতের বিনিময়ে নামায আদায় করবেনই। বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এঁরা দলবদ্ধ ভাবে আসেন এবং তিনজন বা চারজন নামাযে দাঁড়িয়ে যান আর অন্যেরা হাত ধরাধরি করে একটি লৌহ যবনিকার সৃষ্টি করেন ফলে অন্য কোন নামাযী ত দূরের কথা দ্রুত ধাবমান অসংখ্য তওয়াফকারীও ওপথে অগ্রসর হতে পারেন না, তওয়াফ বন্ধ হয়ে যায়, যা কোন অবস্থাতেই বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্ষার আলে পচা বাবলা কাঁটা বসিয়ে ব্যাকুল চাষীদের যাতায়াত সীমিত করার মত এইভাবে তওয়াফে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নামায পড়ার মানসিকতা হাজি সাহেবানরা যে কি করে অর্জন করেন তা ভাবতে কষ্ট হয়। মাকামে ইবরাহিমকে সম্মুখে রেখে নামায পড়া অবশ্যই মঙ্গলের কিন্তু তার বিনিময়ে অন্যকে কষ্ট দেওয়া এবং তওয়াফে বিঘ্ন সৃষ্টি করা অনেক বেশি অমঙ্গলের, এতে হিতে অহিত হয়। মাকামে ইবরাহিমের সন্নিকটে জায়গা না পেলে বায়তুল্লাহর চার পাশের বিশাল উন্মুক্ত চত্বরের যে কোন এক স্থানে বসে নামায পড়লে যথেষ্ট হবে। আর ভিড়ের মধ্যে অসম্ভব চাপে ঠেলাঠেলি করে প্রতিযোগিতা মূলক অমনোযোগী নামায পড়ার চেয়ে অপেক্ষাকৃত নিরালা জায়গার নামাযে অনেক বেশি আন্তরিক হওয়া যায়। আর আল্লাহর কাছে নিবেদিত আত্মারাই সম্মানিত।

মিসফালার বাড়িতে যখন ফিরে এলাম তখন সূর্য বেশ কিছুটা উপরে উঠে গেছে। ঘরে ফিরে অনুভব করলাম আমি ভীষণ ক্লান্ত। এত ক্লান্ত যে ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। কোন কিছু চিন্তা না করে আমি বেশ কিছুক্ষণ সময় ঘুমিয়ে নিলাম। উঠে অল্প কিছু বাজারের প্রয়োজন ছিল, মিটিয়ে এলাম। আমার স্ত্রী আর গুজরাটি মহিলা দুজনে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। আমি চলে গেলাম গোসলখানায়। কাপড় চোপড় ময়লা হয়েছিল—তার কিছু কেচে স্ত্রীর কাজ কিছুটা হালকা করে দিলাম। অথচ বাড়িতে এসব কাজে তিনি আমাকে হাত দিতেই দেন না। সফরেও যে খুব বেশি করতে দিয়েছেন তাও নয়, ভাবি এই কাজটা সেরে এসে কাচাকুচিতে হাত দেব, ফিরে দেখি সফেদ পোশাক গুলি হাওয়ায় দোল খাচ্ছে।

গুজরাটি মহিলার উৎকৃষ্ট কিমা রান্না আর স্ত্রীর আলু ভাতে ভাত—অত্যন্ত পরিতৃপ্তির আহার হয়ে দাঁড়াল সকলের কাছে। খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ ডায়রি লিখলাম। সাড়ে তিনটায় আবার বেরিয়ে পড়লাম পবিত্র কাবা শরীফের উদ্দেশ্যে। এরপরের অংশটুকু গুছিয়ে না লেখা হুবহু ডায়রি থেকে ঃ

"আসর পড়ে তওয়াফ এবং এই তওয়াফে কোথা থেকে জানি না,

কোন অলৌকিক শক্তির প্রেরণায় সারা দেহমন উথাল্‌পাতাল, চোখের এমন কোন সাধ্য নেই যে পানিকে বাঁধ দিয়ে রাখবে। আমি ত দেখছি আমার চোখের বাঁধ বারবার ভেঙে যাচ্ছে। অনেকে সশব্দে ক্রন্দন করছেন দেখলাম, একেবারে দিওয়ানা অবস্থা। চোখের সামনে ঘর নেই সংসার নেই ছেলেমেয়ে নেই ধন-দৌলতের অহংকার নেই—বিশ্বভুবন অবলুপ্ত। আছে শুধু কালো গিলাফে ঢাকা জান্নাতি কাবা। চারদিকে বেভুল পথিক—আল্লাহর মেহমান, রং-এর প্রভেদ অবলুপ্ত ঐশ্বর্যের বিভেদ নিঃশেষিত, ভাষার পার্থক্য বিলীন, মুখে এক ধ্বনি আল্লাহ হো আকবার, কখনো বা লাব্বায়েক—প্রভু গো! গোলাম হাজির। লক্ষ লক্ষ মানুষ মুহূর্তে এক দেহ এক প্রাণ এক আশা এক ভরসা এক মঞ্জিলের উদ্দেশ্যে ধাওয়া এক কাবাকে তওয়াফ এক আল্লাহতে আত্মসমর্পণ এক মহান শক্তি ও নূরের তাজাল্লিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়া।...

এমনটা সারা পৃথিবীর কোথাও আমার লক্ষ্যে পড়েনি।

গতকাল কাফন নিয়ে গিয়েছিলাম হেরেম শরীফে জমজমের পানিতে ধুয়ে নেব বলে কিন্তু অসুবিধার জন্যে তা সম্ভব হয়নি—আজ প্লাস্টিকের ড্রাম এনেছি পানি নিয়ে যাবার জন্যে।...

পরে বাড়িতে এসে এই পানিতেই আমরা আমাদের কাফন দুটি ধুয়ে নিয়েছিলাম।

জমজমের পবিত্র পানি পান করার জন্যে মাটির নিচে জমজম কূপের ঠিক পাশেই ঢালাও ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সৌদি সরকার। এক সঙ্গে প্রায় পাঁচ-ছ শো মানুষ পানি পান করতে পারেন, বুক সমান উঁচু প্লাটফর্ম বাঁধানো, তাতে এক হাত অন্তর অন্তর কল বসান। প্রতিটি কলের সঙ্গে একটি করে প্লাস্টিকের গ্লাস দেওয়া আছে। হাজি সাহেবেরা ইচ্ছামত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি সহকারে আকণ্ঠ পানি পান করছেন। জমজমের পানি দাঁড়িয়েই পান করতে হয়।

লক্ষ্য করলাম, হাজি সাহেবগণ পানি যতটা পান করছেন, নষ্ট করছেন তার থেকে বেশি। কথায় আছেঃ স্বভাব যায় না মলে।

আল্লাহর মেহমান হয়ে তাঁর আঙিনায় সমবেত হয়েও অনেক মানুষই স্বভাব পাল্টাতে পারেন নি। এসব মানুষ বেহেশতে গিয়েও কি করবেন আল্লাহ মালুম ; দেখলাম পিপাসার পানি নিয়ে অনেক হাজি অজু করছেন, এক পাশে দাঁড়িয়ে গোসল করছেন কেউ কেউ, আকসার পা ধুচ্ছেন প্রায় সকলেই। যেসব মক্কাবাসী কূপের সীমানায় ডিউটিতে নিযুক্ত ছিলেন, ছুটে এলেন তাঁদের কয়েকজন। যেমন কুকুর তাড়া করে, আরবী জবানে তেমনি রুক্ষ ও রূঢ় ভাবে হাজি সাহেবদের তাড়া করলেন। আমি গিয়েছিলাম মগরিবের সময়। সারা দিন অতিথিদের নিষেধ করে বোধহয় সহ্যের সীমা হারিয়ে ফেলেছিলেন তাঁরা। মক্কাবাসীদের রুক্ষ মেজাজ সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি, তুলনায় মদিনাবাসীরা অনেক শান্ত এমন কথা বলেছেন কেউ কেউ। কোন অধিবাসীদের নিন্দা-প্রশংসা না করেও পর্যবেক্ষণী দৃষ্টিপাতে এর কারণ কিছুটা অনুভব করা যায়। হজ উপলক্ষে মক্কা শরীফে যত পুণ্যার্থী আসেন তার সিকি ভাগও মদিনায় যান না, তাই মক্কাবাসীদের যে ধরনের বেয়াড়া ধকল সইতে হয় মদিনাবাসীদের তা হয় না। ফলে এমনিতে ব্যবহারে কিছু তারতম্য হতেই পারে।

অবশ্য মদিনাবাসীদের আমার অধিকতর শান্তই মনে হয়েছে। কাবা শরীফের চত্বরে এক বিশেষ জামায়েতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল আসরের নামাযের পর। বায়তুল্লাহর চার পাশে যে খালি জায়গা রয়েছে দেখলাম সেখানে বিভিন্ন স্থানে ত্রিশ চল্লিশটি চেয়ার ফেলা আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অতি বিখ্যাত আলেম-ওলামাগণ সেই চেয়ারে বসে ওয়াজ-নসিহত শুরু করেছেন ঠিক আসরের পর। তাঁদের ভাষা বিভিন্ন—কেউ বলছেন আরবীতে, কেউ নাইজেরিয়ানদের ভাষায়, কেউ তুর্কীতে, কেউ ইংরেজিতে, কেউ উর্দুতে। যাঁর যা মাতৃভাষা তিনি সে ভাষাতেই ওয়াজ করছেন। আর স্বাভাবিক কারণেই ইরাণের লোকেরা বসে গেছেন তাঁদের মাওলানার কাছে, মিশরিগণ ভিড় জমিয়েছেন তাঁদের পীরের কাছে, কালো বিশালকায় হাবশীরা সমবেত হয়েছেন তাঁদের দেশীয় আলেম-

ওলামার নিকট। কম বেশি বিশ্বের অনেক ভাষাতেই বক্তৃতা হচ্ছে কেবল বাংলা ভাষার আসন শূন্য ছিল। অথচ কিছু না হোক পনের থেকে বিশ হাজার বা তারও বেশি বাঙালি হজ করতে এসেছেন। স্বদেশে বাঙালি পীর ওলামাদের দাপট যে কি প্রচন্ড এবং ভয়াবহ তা আমরা প্রতিদিন টের পাচ্ছি অথচ পবিত্র কাবা শরীফের চত্বরে বাংলার সেই শূন্য আসনটি পূরণ করার মত একজন বাঙালি আলেমকে পাওয়া গেল না।

দেখলাম পাকিস্তানীদের দাপট প্রচন্ড। একাধারে দু-তিনটি স্থানে উর্দুতে বক্তৃতা হচ্ছে। অবশ্য এর মধ্যে উর্দু ভাষাভাষী ভারতীয় ও বাংলাদেশীরাও সামিল হয়েছেন। সারা চত্বরে প্রধান বক্তা একজন, তিনি সৌদি আরবের পৃথিবী খ্যাত আলেম জনাব আবদেল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায। এঁর ওয়াজ শোনার জন্যে দেখলাম কাবা শরীফের অধিকাংশ মানুষ উৎসুক হয়ে থাকতেন। ভাষা আরবী, বর্ণনাভংগী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী—একমাত্র এঁর ভাষণই মাইকে প্রচার করা হত। মেদহীন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় মানুষটি কিন্তু জন্মান্ধ, জন্ম থেকেই দু চোখের দৃষ্টি সম্পূর্ণ হারিয়েছেন, অথচ এক অবিশ্বাস্য স্মৃতি শক্তির জোরে আজ তিনি বিশ্ববিখ্যাত আলেম। ঘনিষ্ঠ মহল থেকে অবগত হলাম ঃ বর্তমানে আবদেল আযীয আবদুল্লাহ বিন বায অর্থাৎ এই অন্ধ মানুষটি সৌদি সরকারের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ সরকারীপদের মহাপরিচালক। এই অন্ধ মানুষটির অপরিসীম পান্ডিত্য, কোরআন ও হাদীসের উপর অসামান্য দখলের জন্য সৌদি সরকার সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে তাঁকে গবেষণা, ফতোয়া, দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করেছেন। কাবা শরীফ, মদিনা শরীফ, হজ, ইসলামিক আইন-কানুন প্রভৃতি ব্যাপারে যখন কোন প্রশ্ন ওঠে বা জটিলতা দেখা দেয়, এঁর মীমাংসাকেই সকলে মেনে নেন।

পরে শুনেছিলাম, বিশ্বের সমবেত হাজি সাহেবদের হজ ওমরা প্রভৃতি বিষয়ের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার জন্যে সৌদি সরকার

আযীয সাহেবকে পাঠিয়ে ছিলেন। আসরের পর কিছুক্ষণ ওয়াজ করতেন, তারপর শুরু হত প্রশ্নোত্তর। হাজি সাহেবগণ তাঁদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসা কাগজে লিখে জমা দিতেন, একজন সাহায্যকারী একটি একটি করে পড়ে শোনাতেন আর কি আশ্চর্য শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি সেই সব জটিল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে দিতেন। মগরিবের কিছু পূর্বেই ওয়াজ নছিয়ত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেত, শুরু হত আবার নামাযের পর, চলত এশার পূর্ব পর্যন্ত। আটটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে এশার নামায শেষ হয়ে যেত আর এশার নামাযের পর ব্যক্তিগত এবাদত এবং তওয়াফ ছাড়া ওয়াজ-নছিহত ত দূরের কথা সমগ্র কাবা শরীফে টুঁ শব্দটি পাওয়া যেত না। কাউকে ওয়াজ করতে দেখলে ঘাড় ধরে বার করে দেওয়া হত।

ঠিক একই জিনিষ দেখেছি মসজিদ নববীতে। সেখানেও এশার নামাযের পর দেড়-দু ঘণ্টার মধ্যে সকলকে টেনে টেনে বাইরে বার করে গেটে তালা দিয়ে দেওয়া হত। কাবা শরীফ—আল্লাহর ঘর। সেখানে তালা দেওয়া সম্ভব হত না কিন্তু এশার পর ব্যক্তিগত এবাদত আর তওয়াফ ছাড়া আর সকল কিছু বন্ধ হয়ে যায়, বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রসুলুল্লাহর জীবনীতেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ঃ এশার নামাযের পর তিনি আর কারো সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলতেন না, ওয়াজ-নছিহতও করতেন না, কখনো প্রয়োজন হলে অতি সামান্য সময় কিছু জরুরী কথা বলতেন। কোরআন শরীফে বার বার বলা হয়েছে ঃ রাত সৃষ্টি করেছি বিশ্রামের জন্য।

অথচ আমাদের দেশের পীর-মাওলানা-মৌলবীগণ বর্তমানে ব্যাপকহারে ঠিক এর বিপরীত কাজটিই করে চলেছেন। ব্যাপকহারে তাঁরা সারা রাত্রব্যাপী মিলাদানুষ্ঠান করছেন। একবারও বলছেন না যে এই ধরনের জলসার অনুষ্ঠান ঠিক নয়। একটি দুর্বল নফল পালন করতে গিয়ে কতজনের কত অসুবিধা হয় এ কেউ ভেবে দেখেন না। প্রথমতঃ মাইকে সারা রাত চিৎকার করলে

ছাত্রদের পড়াশুনার অসুবিধা হয়, প্রতিবেশী সকল পরিবারের নিদ্রায় বিঘ্ন ঘটে, যারা অমুসলিম এক্ষেত্রে তাঁদের উত্তেজনা স্বাভাবিক, রুগী থাকলে তাদের যন্ত্রণা হয় সর্বাধিক, সারারাত জাগার পর অনেকের ফজরের নামায কাজা হয়ে যায়, যাদের কাজা হয় না অনিদ্রাজনিত ক্লান্তির জন্যে তাঁরা শৈথিল্যের সঙ্গে নামাযে হাজির হন, অনেক দরিদ্র মানুষ পরের দিন কাজ করতে না পেরে রুজিহারা হন, শীতে সারা রাত ওয়াজ শোনার পর সর্দি কাশি এবং জ্বরে জড়িত হয়ে পড়েন কেউ কেউ—অথচ এই সারা রাত্রি জাগরণে তাহাজ্জদ নামায পড়ানোর ব্যবস্থা হয় না কোথাও, যা কাবা এবং মদিনা শরীফে এক জরুরী বিষয়। সুতরাং আত্মার বিশেষ মঙ্গল নিয়ে যে কেউ বাড়ি ফেরেন এমন নয়। এমন কি গভীর রাতে সকলেই ঢুলতে থাকেন তাতে মহফিলের ইজ্জত কিছুমাত্র বাড়ে না। সকল দিক দিয়ে বিচার করলে সারা রাত্র ব্যাপী মিলাদানুষ্ঠান আমাদের জন্য কোন মঙ্গল বয়ে আনে না বরং অমঙ্গলের দ্বার খুলে দেয়। আল কোরআনে মহান আল্লাহই সারা রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর রসুলকে উদ্দেশ্য করে বলছেনঃ "হে বস্ত্র আচ্ছাদনকারী! (হে মুহম্মদ!) উপাসনার জন্য রাত্রি জাগরণ কর, রাত্রির কিছু অংশ বাদ দিয়ে। অর্ধরাত্রি জাগতে পার কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশী।" ৭৩ঃ ১-৪। "তোমার প্রতিপালক তো জানেন তুমি কখনও রাত্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ, এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ উপাসনার জন্য জাগরণ কর।" ৭৩ঃ ২০। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সর্বজ্ঞ আল্লাহর-সাক্ষ অনুযায়ী এবাদাতের জন্য তাঁর রসুলও সারা রাত জাগেন নি। এ ছাড়া পবিত্র কোরআন শরীফে আরো বহু ঘটনা আছে যার থেকে প্রতীয়মান হয় সারা রাত না জেগে রাত্রির বেশ কিছু অংশ রসুলুল্লাহ বিশ্রাম করতেন, নিদ্রা যেতেন এবং সেমত সকলকে নিদ্রা যেতে বলতেন। মহান আল্লাহও সেই নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের। অথচ আমাদের পীর মাওলানাগণ প্রতি রাতে চাহিদা অনুপাতে তিন-চারটি করে দাওয়াত গ্রহণ করে সারা রাত্রব্যাপী যাত্রাভিনয়ের

মত সারা রাত্রব্যাপী মিলাদানুষ্ঠানে মেতে ওঠেন। যারা এ সব অনুষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন তাঁরা এই সব ফতোয়া জানেন না এ আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু ইসলামের এবং সমগ্র মুসলিম জাতির মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি তাঁদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, মিলাদ শেষে তাঁরা তাঁদের মোটা অঙ্কের পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে নিয়ে রাত দুটোর সময় আরো বেশি অঙ্কের অর্থ লোলুপতায় তৃতীয় কোন গ্রামের জলসায় বক্তৃতা দিতে চলে যান। এই সামান্য ছিদ্রপথে ইসলামে একটি বড় পাপ অনুপ্রবিষ্ঠ হয়! অবশ্য ফুরফুরা শরীফের বড় হুজুর কেবলাহ সারা রাত মিলাদ সমর্থন করতেন না, বর্তমান মেজ হুজুর কেবলাকেও এই জঘন্য প্রথার বিরুদ্ধে সরব হতে দেখছি। এই ইসলামী নজিরবিহীন প্রথার এখুনিই অবসান ঘটা দরকার।

আসর নামাযের পর তওয়াফ সম্পূর্ণ করেও কিছু সময় ছিল হাতে। আমি একটা নিরালা জায়গার অন্বেষণে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রভাতের আলো ফোটার আগেই কোকিল কুহরিত হবে বলে যেমন পল্লবিত শাখার নির্জন কোনটি বেছে নেয়, আমার মনটিও তেমন নির্জনতার অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল অথচ আমি ভাল করেই জানি, আমার আত্মার কুহরিত হবার শক্তি নেই। অনেক অন্বেষণ এবং অনেক নির্বাচন নাকচ করার পর শেষমেষ অপেক্ষাকৃত একটা হালকা জায়গা পেয়ে গেলাম। সেখানে বসে চুপচাপ চেয়ে থাকলাম চিরবাঞ্ছিত বিশাল কাবার দিকে। সব কিছুই হচ্ছে. সব কিছুই ঘটছে অথচ সব কিছুই স্বপ্নময়। অতিবাস্তব হয়েও যেন আর এক জগতের মনে হয় সব কিছু।

কাবার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, নিষ্পলকে তাকিয়েই ছিলাম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল ঃ হায়! একদিন এই বেহেশতি সওগাত ছেড়ে আমাকে কোন সুদূরে চলে যেতে হবে! আর দেখতে পাব না একটি বারের জন্যও! যেমন মনে হওয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরটা যেন দু টুকরো হয়ে গেল। তারপর কয়েক লক্ষ কোটি টুকরো কুচিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে একাকার হয়ে গেল। হু হু করে অবিরল অশ্রুধারা বইতে শুরু করল। পলকেরও কম

সময়ে আমার মনের উপর দিয়ে যে প্রলয়ের ঝড় তুফান বয়ে গেল তা কেউই দেখতে পেলেন না, বাইরে যেমন তওয়াফ চলছিল তেমনি চলছে।

শেষে চোখ মোছা ছেড়ে দিলাম। এখানে এসে চোখ মুছে পারা যায় না। এ জগৎ অশ্রুর জগৎ!

বসেই থাকলাম চুপচাপ। অশ্রু গড়াচ্ছে অবিশ্রাম। আর মনের মধ্যে সেই এতিম বালকের হাহাকার ঃ এই বেহেশতী সওগাত ছেড়ে চলে যেতে হবে একদিন? একদিন চলে যাব সোলেমানপুরের সেই ক্ষুদ্র মলিন গৃহাঙ্গনে। ভাবতেই পারছি না।

আল্লাহ গো!

রাতে শোবার সময় আমি সকলের কাছে সকাতর অনুরোধ রাখলামঃ এই পবিত্র মাটিতে যদি শুয়েই কাটালাম তা হলে এত কষ্ট করে এসে লাভ কি? কাল থেকে আসুন আমরা সকলেই তাহাজ্জদ নামাযে সামিল হই। অতি উৎসাহে আমার আগ্রহের সঙ্গে আগ্রহ মিলিয়ে সকলেই 'এক বাক্যে-'র সম্মতি জানালেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ ঘুম থেকে উঠলেন না। আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন তাহাজ্জদের ওয়াক্ত চলে গেছে। কোন রকমে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ফজরের জামাত পেলাম। শরীরটা ভাল ছিল না তবুও নামাযের পর একটা তওয়াফ সম্পূর্ণ করে ফিরে এলাম। মেসফালার মসজিদে পড়লাম জোহর। একটু বিশ্রাম নিয়ে বায়তুল্লাহয় চলে এলাম আসরের ওয়াক্তে, সঙ্গে এলেন আমার স্ত্রী আর হাশমি ইশরাত। আসর সমাপ্ত করেই আমি বাইরে চলে এলাম। পূর্বের কথামত আমার স্ত্রীও নামায শেষ করে ভারতীয় হজ অফিসের সামনে আমার সঙ্গে মিলিত হলেন। ভারতীয় হজ অফিসটি কাবা শরীফের একেবারে কাছে, মাত্র এক-দেড় মিনিটের পথ। যে সব ভারতীয় হজ ব্রত উৎযাপন করতে আসেন তাঁরা এখান থেকে নিয়মিত নানা রকম খবরাখবর পান, হাজি সাহেবেরা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে এখানকার লোকজন তার উত্তর দেবার সাধ্যমত চেষ্টা করেন, আর এখানে যে কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে সম্পন্ন হয় সেটি হল চিকিৎসা।

ভারত সরকার এবং বম্বে হজ কমিটি এটা খুবই ভাল ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের মধ্যে যে সেবার মনোভাব আছে, তাঁরাও যে বিদেশগামী হাজিদের সুখ-দুঃখে আন্তরিক অংশীদার হতে চান এই ব্যবস্থা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। এই অফিস রাত দিন খোলা থাকে—বিশেষ করে এর চিকিৎসা বিভাগ। মেয়েদের জন্য কয়েকজন ভারতীয় মহিলা ডাক্তার আছেন আর পুরুষদের জন্য আছেন অনেক ডাক্তার। আমার শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছিল না, সামান্য গড়বড় হতেই হজ অফিসে গেলাম। এক ডাক্তার ভাই অত্যন্ত যত্ন করে পরীক্ষা করে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী এখান থেকে বিনামূল্যে ঔষধপত্র দেবার ব্যবস্থা আছে। আমিও প্রয়োজনীয় ঔষধ বিনামূল্যে পেয়ে গেলাম। আমি বার বার স্বীকার করব, বিদেশ বিভূঁয়ে একজন হাজির জন্যে এটা খুবই উত্তম ব্যবস্থা, বিশেষ করে ভারতীয়দের জন্য। কেননা আমরা ত কেউ মেরুদন্ড সোজা থাকতে হজে যাই না। আর বৃদ্ধ বয়সে ছোঁয়ার আগেই মানুষ আঠারো ঘায়ের শিকার হয়ে যায়।

হজ অফিসের সংলগ্ন কয়েকটি হোটেল বেশ চালু। দেখলাম এখানে একেবারে আমাদের কলকাতার মতই খাবার দাবার সাজানো রয়েছে। আমি এবং আমার স্ত্রী দুটি চেয়ারে বসে গেলাম। একটি চাপাতি, একটি মগজ রান্না আর এক কাপ চা নিয়ে দুজনে ভাগাভাগি করে খেলাম। বাড়িতে কত ভাল জিনিষ কত হেলাফেলায় ছড়াছড়ি যায় অথচ এখানে ? এই কৃচ্ছ্র সাধন, আর একটা চাপাতি এইভাবে ভাগ করে খাওয়াতেও দেখলাম আমার স্ত্রী যেন জান্নাতি খাওয়া খেলেন, তাঁর চোখ মুখ দিয়ে খুশি উপছে পড়ছিল। আর আমি ? এ কাঙাল ত পরিপূর্ণ রূপে লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। আমাদের সব কিছুই তখন আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহর মেহমান হয়ে তাঁর দরবারে এসে এসব কাজ করছিলাম বলেই প্রতিটি মুহূর্তে এক নতুন আনন্দের স্বাদ পাচ্ছিলাম।

একটি চাপাতি, একটি মগজ রান্না আর এক কাপ চা—দাম দিলাম সাতাশ টাকা। ভাবা যায় না।

জামাতে মগরিব পড়ে ভাঙা শরীরটার জন্যে ভাবছিলাম আজ আর তওয়াফ করব না। মনের মধ্যে গড়িমসি ভাব দেখা দিতেই আর এক মন হঠাৎ ভিতর থেকে ভয়ানক গর্জ্জন করে উঠল ! কি—তওয়াফ করবে না ? হজ অফিস থেকে এইমাত্র ওষুধ এনেছ যা এখনো তোমার পকেটে। তাছাড়া কতটা অসুস্থ তুমি ? দিব্যি ত ঘুরছ, বেড়াচ্ছ। কাবার চত্বরে দাঁড়িয়েও শয়তানের হাতে বন্দী ?

আর নয়, আর নয়। এবপর হয়ত যন্ত্রনায় বেহাল হব।

তওবা, তওবা। দেখলাম আমি তওয়াফের বিপুল জনতার মাঝে কখন সামিল হয়ে গেছি। আশ্চর্য আমার মনটা এক মুহূর্তও আমাকে স্বস্তিতে (!) থাকতে দেবে না।

সৌদি বাদশাহর ছোট ভাই আবদুল্লাহ বিন আযীয এসেছিলেন এশার একটু আগে। বিশাল পুরুষালি অভিজাত রাজকীয় চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেলল জায়গাটা। পুলিশ নয় সম্ভবতঃ এরা সৈন্য—সামরিক বাহিনীর লোক। ঘন কালচে ধরণের খাকি রঙের প্যান্ট সার্ট পরা। এরা আসতেই আবদুল্লাহ বিন আযীয খুবই বিরক্ত হলেন মনে হল। ইংগিতে তিনি সৈন্যদের সরে যেতে বললেন। তারা কিছুটা দূরে গেলেও একেবারে কাবার চত্বর ছেড়ে চলে গেল না। মাত্র কয়েক বছর আগে সৌদি আরবের বাদশাহ্‌কে গুলি করে হত্যা করেছিলেন তাঁর ভাইপো। সেই থেকে রাজ পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সঙ্গে দেহরক্ষী মোতায়েন থাকে সকল সময়। কাবা এবং মাকামে ইবরাহিমকে সামনে রেখে দু রাকাত নামায পড়লেন আবদুল্লাহ বিন আযীয। তারপর মুনাযাত করে চলে গেলেন।

এশার আযান হলে জমাতে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করলাম দু পাশ থেকে বেশ চাপের সৃষ্টি হচ্ছে। বুঝলাম সাগরে পানি বাড়ছে। প্রতিদিন নিকটবর্তী হচ্ছে হজ, লোকসংখ্যা বাড়ছে ক্রমেই। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছড়ে পড়ছে, জোয়ার জেগেছে মহাসমুদ্রে—প্রেমের জোয়ার। দূরাগত জোয়ারের কল্লোলধ্বনিতে আকাশ বাতাস উদ্বেলিত, আলোড়িত। নিখিল বিশ্বজুড়ে এই তরঙ্গের উল্লাস,

এক মহাতীর্থে সেই তরঙ্গ কেন্দ্রীভূত।

আবেগে উল্লাসে, বেদনায় অশ্রুতে কাবার চত্বর এখন পরিপূর্ণ। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দশ দিগন্ত থেকে অবিরাম ধ্বনি ভেসে উঠছে ঃ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক। প্রভু গো ! আপনার দরবারে, আমি হাজির, গোলাম হাজির !

উম্মুল কোরা মক্কা শরীফের পবিত্র মৃত্তিকা প্রথম স্পর্শ করেছিলাম সোমবার ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩০ রাতে, আর আজ ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার। সুতরাং আল্লাহ্ রাজি থাকলে আজই আল্লাহর ঘরে প্রথম জুমআর নামায পড়ব। ঠিক মত বসার জায়গা পাওয়ার জন্যে বাড়ি থেকে দশটা কুড়িতে হেরেম শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। পথে নেমে দেখি ইতিমধ্যেই মানুষ স্রোতের মত চলতে শুরু করেছে কাবার পথে। আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতকে নিয়ে আমরাও যথাসময় পৌঁছে গেলাম। ওখানে পৌঁছে ও'রা চলে গেলেন মেয়েদের জামাতে আর আমি এমন একটা জায়গায় বসলাম যেখান থেকে কাবাকে স্পষ্ট দেখা যায়। জীবনে বড় সাধ ছিল কাবা শরীফে জুমআর নামায পড়ার। সেই মহালগ্ন উপস্থিত। কিছুক্ষণ বসতেই মনও প্রস্তুত হয়ে গেল। নামায শুরু হতে এখনো দীর্ঘ দুঘণ্টার অধিক সময় বাকি। আমি তন্ময় হয়ে কাবা শরীফের দিকে চেয়ে আছি, দেখি ঠিক আমার সামনেই একদল ভীষণ কালো নাইজেরিয়ান—হাবশি বা নিগ্রো যাই বলুন—নির্বিকার চিত্তে তাদের চরণ দুখানি ঠিক কাবা শরীফের দিকে প্রসারিত করে বসে আছেন। একজন নয়, দুজন নয়—প্রায় সকলেই। এই লোকগুলির কেউ কেউ সবল বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী, ঠিক 'কুন্দে যেন নিরমান', উচ্চতায় বিশাল। তবে অধিকাংশই রুগ্ন এবং (আল্লাহ্ মাফ করুন) দেখতে ভীষণ কুশ্রী। মানুষ যে কত কদর্য হতে পারে এরা যেন তারই নিদর্শন। কেবল দেখতেই কদর্য নয়, ব্যবহারেও এদের অধিকাংশকে আমি অত্যন্ত অমার্জিত অবস্থায় পেয়েছি। তেলে-বেগুনে জ্বলা মেজাজ, রুক্ষতায় মরুর মধ্যাহ্ন! যে বায়তুল্লাহর দিকে সম্ভ্রমে আমি ঠিক মত তাকাতে পর্যন্ত পারছিলাম না, যার দিকে দিনে পাঁচবার আমরা সিজদায় লুটিয়ে পড়ি সেই পবিত্র গৃহের ঠিক সম্মুখে বসে নগ্ন পদ যুগলকে বর্বরের মত মেলে ধরাকে আমার কিছুতেই সহ্য হচ্ছিল না। ভিতরে সিংহের গর্জ্জন অথচ মুখে

কিছুই বলতে পারছি না। আমি ওদের ভাষা জানি না। অবশেষে আমার প্রচন্ড উত্তেজনাকে অসম্ভব সংযত করে বিনীতভাবে এক হাতে কাবা দেখালাম এবং অন্য হাতে ইশারায় পা গুটিয়ে নেবার অনুরোধ জানালাম। অনুরোধে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পা গুটিয়ে নিলেন তবে যে খুব অন্যায় হয়েছে এমন বোধে নয়, যেন একজন বলছেন আচ্ছা পা গুটিয়ে নিই—এমনি ভাবে। দেখলাম অন্যত্র অনেকেই এই কালো মানুষদের পা গুটিয়ে বসতে অনুরোধ করছেন। এক হাজি সাহেব আমার কাছে আক্ষেপ করলেন ঃ দেখবেন একটু পরে যে কে সেই—আবার কাবার দিকে পা লম্বা করে দিয়েছে এরা।

আল্লাহ মাফ করুন! কালো মানুষদের প্রতি কোন ঘৃণা বা অন্যায় আরোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, যা প্রত্যক্ষ করেছি সেগুলির উল্লেখ না করলে সত্য অপ্রকাশিত থেকে যায়। এই সব মানুষদের মধ্যে আর একটি সংকীর্ণ স্বার্থপরতা লক্ষ্য করেছি ঃ এঁরা অনর্থক অনেকটা জায়গা দখল করে বসে থাকেন এবং সেখানে অন্য কেউ নামাযের জন্য দাঁড়াতে চাইলেও সাধারণতঃ জায়গা ছাড়েন না অথচ আর এক কালো মানুষকে দেখলে তাকে সাদরে টেনে নিয়ে বসিয়ে দেন, প্রয়োজনবোধে পাশের মানুষকে বেশ বিব্রত করেও। অবশ্য তাঁদের এই স্বজাতি প্রীতি প্রশংসার্হ কিন্তু নামাযে দাঁড়াতে এক ইঞ্চি ভূমির জন্যে যেখানে হাজার হাজার মানুষ পাগলের মত ঘুরে বেড়ায় সেখানে এই স্বার্থপরতা ? অবশ্যই তা অধিকতর ঘৃণার্হ।

আমার মনে হয় ইসলামের সঠিক পরিচয়ের সঙ্গে এঁরা পরিচিত নন, অবশ্য আমরা অনেকেই এ পরিচয় থেকে বঞ্চিত। আফ্রিকার গহন অরণ্যে সত্যকার ইসলামের আলো এখনো ঠিকমত মৃত্তিকা স্পর্শ করে নি।

কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে মনটাকে আবার প্রস্তুত করছিলাম, এবার বাধা এল পিছন থেকে। এক ভদ্রলোক, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, মনে হল তুর্ক, ঠিক আমার পিছনে বসে বেশ শব্দ করে দুলে দুলে পড়ছেন ঃ আল্লাহুম্মা বেহামদিহি—আল্লাহ সমুদয় প্রশংসা আপনার, লক্ষ্য তাঁর কাবার দিকে স্থির। কিন্তু তাঁর এই সশব্দ পাঠ,

আমার ত বটেই, আমার মত অনেকের একাগ্রতায় প্রচণ্ড রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। একটু আগে যে দলের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলাম তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ভদ্রলোকের প্রতি আমার এতটুকু উন্নত ধারণা হল না বরং মনে মনে আমি কিছুটা অভদ্র রকম উগ্র হয়ে উঠলাম। মনে হল ঃ লোকটা অহেতুক লোক শোনানোর জন্য এভাবে চিৎকার করছেন। পিছন ফিরে কিছুটা অসংযত কণ্ঠে আমি তাঁকে আস্তে পড়ার কথা বললাম। জ্বলন্ত মোমের শিখায় ফু দিলে যেমন তা দুলে ওঠে, দেখলাম লোকটির কণ্ঠস্বর সঙ্গে সঙ্গে খাদে নেমে গেল। তাঁর চোখে সুদূরের স্বপ্ন, কালো গেলাফে ঢাকা রৌদ্রোজ্জ্বল বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে তিনি তেমনি দুলে দুলে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে সুর করে পড়ে চলেছেন ঃ আল্লাহুম্মা বেহামদিহি, আল্লাহুম্মা বেহামদিহি। কয়েক মিনিট পর মনে হল তাঁর স্বর ভাঙা ভাঙা, পিছন ফিরে দেখি দুই গণ্ড বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছে। কাবার দিকে তাকিয়ে তিনি তেমনি ভাবে দুলে দুলে পড়ে চলেছেন। সুবাস যেমন ক্রমাগত বৃত্তাকারে চারপাশে ছড়িয়ে যায়, হৃদয়কে স্পর্শ করে, তাঁর অশ্রুসিক্ত স্বর তেমনি আশপাশের সকল আত্মাকে সশ্রদ্ধ অনুভবে উদ্বেল করে দিল। একে ত কাবা শরীফ, তার উপর জুমআর এই পবিত্র পবিবেশ —কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি অনেকেই অঝোর ধারায় অশ্রুপাত করছেন। একটি পবিত্র প্রভাব মানুষের মনে এইভাবেই তরঙ্গের মত বৃত্তাকারে ছড়িয়ে যায়। অথচ এই মানুষটিকে প্রথমে আমি কত তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলাম।

কোন ঝিনুকে মুক্তা থাকে কজনে তার খোঁজ রাখে !

ঠিক সাড়ে বারটায় হল আযান। আযানের প্রায় পরে পরেই হল খুৎবার আযান, মাঝে চার রাকাত কাবলুল জুমআ পড়ারও সময় ছিল না। আজকের নামায পরিচালনা করছিলেন কাবার প্রধান ইমাম, একেবারে বয়ঃবৃদ্ধ গৌরবর্ণ, এলাহান যে খুব মিষ্টি তা নয় তবে আন্তরিকতায় গভীর—সহজে মানুষের মনকে দুলিয়ে একাকার করে দেয়। নাতিদীর্ঘ খুৎবা পড়লেন, খুৎবার এক স্থানে ছিল

'রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানতাঁও অফিল আখেরাতে হাসানতাঁও অকেনা আজাবাননার'—এই অংশটুকু পড়ার সময় ইমাম সাহেব কেঁদে ফেললেন, মাইকে তাঁর কান্নার শব্দ শুনে কয়েক লক্ষ হাজি সাহেবানদের চোখও ভিজে গেল, এমনই একটা পবিত্র আবেশ সৃষ্টি হয়েছিল যে অতিপাষাণের প্রাণও মোমের মত গলে পড়ছিল। মাকামে ইবরাহিম বরাবর মোলতাজেমের পাশে দাঁড়িয়ে খুৎবা পড়লেন এবং নামায পড়ালেন। ভাবছিলাম নামাযে না জানি কত বড় বড় আয়াত পড়বেন কিন্তু রোদের তীক্ষ্ণতা, কয়েক লক্ষ মানুষের সুবিধা অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে দুটি অতি পরিচিত ছোট সুরায় নামায শেষ করলেন তিনি। প্রথম রাকাতে পড়লেন "লেই লাফে" আর দ্বিতীয় রাকাতে "কলহু আল্লাহ হু আহাদ"।

একটার কিছু পরে নামায-পর্ব সমাপ্ত হল।

ডায়রী থেকে কিছু অংশ ঃ "মগরিবের পর একবার এবং এশার পর দু-বার তওয়াফ। মগরিবের তওয়াফের পর নামায এবং মুনাযাতে ভীষণ কান্নাকাটি করেছি। মনটা কেমন যেন উদাস, সারা জীবনের এত পাপ আল্লাহ কি ক্ষমা করবেন? ক্ষমা পাবার উপযুক্ত নই কিন্তু তাঁর রহমতের উপর ভরসা করি। মগরিবের আগে ইমাম সাহেবর সঙ্গে মুসাফাহ করলাম। প্রায় শীর্ণ মানুষ, ইবাদাতে জীর্ণ—কাবার উপযুক্ত ইমাম। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন!"

কাবা শরীফে নামাযে শরীক হবার পর থেকেই দেখছি প্রতি নামাযে এক বা একাধিক লাশ আসছে জানাজার নামাযের জন্য। মৃত দেহকে যথারীতি গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে ইমাম সাহেবের কাছাকাছি এনে রাখা হয়। প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামায শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে জানাজার নামাযের কথা মাইকে ঘোষণা করে দেন মুয়াজ্জিন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েক লক্ষ হাজি সাহেব দাঁড়িয়ে যান। দু মিনিটেরও কম সময়ে জানাজার নামায খতম হয়ে যায়। কত ভাগ্যবান এই সব দেশ-বিদেশের হাজি ভাইগণ, যাঁরা এই পবিত্র কাবা শরীফে এসে মৃত্যুবরণ করলেন! পৃথিবীর আর কারও জানাজায়

এত লক্ষ হাজি, এত আলেমওলামা সম্ভবতঃ যোগ দেন না। শুনেছি, এই সব মহান সৌভাগ্যবান আত্মার গোরাজাব নেই। এ'দের সকলকে দাফন করা হয় মক্কার ঐতিহাসিক গোরস্তান জান্নাতুল মায়াল্লায়।

বাড়ি থেকে হজে রওনা হবার সময় আমরা দুজনে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলাম সৌদি আরবের মাটিতে পা দিয়ে নিজেদের ব্যবহারের জন্য কোন সৌখিন জিনিষ কিনব না। আমরা যাচ্ছি আল্লাহর প্রেমে আল্লাহর জন্য, সুতরাং পার্থিব কোন প্রলোভনই যেন আমাদের এই সংকল্প থেকে টলাতে না পারে। কলকাতায় বসেও হাজিদের দুর্গতি দেখেছিলাম, বোম্বে এসে যা শুনেছিলাম তাতে লজ্জায় অপমানে মাথা হে'ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় অধিকাংশ হাজিই হজ থেকে ফেরার পথে সঙ্গে আনেন বহু মূল্যবান রঙিন টিভি, দুর্মূল্য ভিডিও, টেপ রেকর্ডার, রেডিও, ইলেকট্রনিক জিনিষপত্র আর বিদেশী কাপড়-চোপড় এবং প্রসাধন সামগ্রির ত কথাই নেই। কোন কোন হাজির কাছে লক্ষাধিক টাকারও জিনিষপত্র থাকে। হাজিদের জাহাজ আসার দিন থাকলে সারা বোম্বে রটে যায় ঃ আজ চোরেদের জাহাজ জেটিতে ভিড়ছে। প্লেনের ব্যাপারেও ঠিক একই রকমে পুরো এয়ার পোর্ট এলাকায় সোরগোল পড়ে যায়। অথচ এ'রা সকলেই আল্লাহর ঘর জিয়ারত করে হাজি হয়ে দেশে ফিরছেন। হায়রে !

১১ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম ভাঙতে যখন দেখলাম কিছুতেই কাবা শরীফে গিয়ে জামাতে ফজরের নামায পাওয়া যাবে না, যেন পাগলের মত হয়ে গেলাম। প্রতিদিন যাতায়াত, তওয়াফ ইত্যাদিতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে ঘুমুলে আর কিছুতেই সময়মত ওঠা যায় না। অথচ পশুর মত নিদ্রার জন্যে ত এখানে আসিনি। আমরা আমাদের সংকল্পে স্থির থাকতে পারলাম না। আল্লাহ মাফ করুন, সেদিন সকালেই ৮৫ রিয়েল দিয়ে একটি জাপানি এলার্ম ঘড়ি কিনে নিয়ে এলাম। দেখা যাক এরপর তাহাজ্জদ এবং ফজর ঠিকমত পাওয়া যায় কি না।

মহাদিন এগিয়ে আসছে। হু হু করে মানুষ বাড়ছে। নির্দিষ্ট দিনে সকল হাজিকেই মক্কা থেকে চলে যেতে হবে। সর্বপ্রথম মিনায়, মিনা থেকে হজের দিন সকালে যেতে হবে আরাফাতের ময়দানে—হজ কোন নামায নয় বরং নির্দিষ্ট সীমানায় আরাফতের মাটি স্পর্শ করলেই হজ হয়ে যায়। ঐদিন সূর্যাস্তের পর আরাফাত থেকে মুজদালেফায় এসে রাত্রিযাপনের পর প্রভাতে আবার মিনায় আসতে হয়। এই মক্কা-মিনা-আরাফাত-মুজদালেফা-মিনায় গমনাগমনের সময় এমন অসম্ভব ভিড় থাকে যে প্রাথমিক কিছু পূর্ব ধারণা না থাকলে অনেকের পক্ষেই ঠিকমত হজের আনুষঙ্গিক বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব হয় না। হজযাত্রী সকল হাজির প্রতি আমার বিনীত অনুরোধ ঃ মক্কায় পৌঁছে সকলেই যেন এই প্রাথমিক ধারণাটুকু আগে থেকে সঞ্চয় করে নেবার ব্যবস্থা করেন। যার জন্য এত অর্থ ব্যয় এত কষ্ট স্বীকার করে এই পবিত্র ভূমিতে আসা সেটাই যদি ঠিক মত সম্পন্ন না করা যায় তা হলে বেদনা রাখার জায়গা থাকে না। অথচ এর জন্যে যে খুব বেশি অর্থ আর সময় ব্যয় করতে হয় তা নয়। কিছু কম আড়াই ঘণ্টা সময়ে সব কিছু আনন্দের সঙ্গে দেখে শুনে আমরা ঘরে ফিরে এসেছিলাম, খরচ পড়েছিল মাথাপিছু মাত্র বিশ রিয়েল। বলা যেতে পারে ঃ কিছুই নয়।

ইতিমধ্যে গুজরাটি ভদ্রলোকের মেয়ে-জামাই এসেছেন লণ্ডন থেকে হজ করতে, তাঁরাও এসে উঠেছেন আমাদের রুমে। সুতরাং বর্তমানে আমাদের রুমের বাসিন্দা সাত জন। পরিকল্পনা মত ইয়াকুব আদম একটি খসুসী (প্রাইভেট) গাড়ির ব্যবস্থা করল, আমরা আট জন (ইয়াকুব আদম সহ) মক্কা মোয়াজ্জমের নিকট থেকে বেশ সকালেই যাত্রা শুরু করলাম। মক্কার ঘরবাড়ি পার হয়ে প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল মিনার দিকে। পবিত্র মহানগরীর সাত-আট কিলোমিটার পূবে মিনা আসলে একটি মরুময় পার্বত্য উপত্যকা। পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত এই উপত্যকার উত্তর দখিনে উঁচু পর্বতরাজি আজো সমানে তাদের গর্বোত্থিত শির

উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝের ছোটখাট পাহাড়গুলিকে কেটে সমতল করে দেওয়া হয়েছে, তার উপর দিয়ে চলে গেছে অসংখ্য জাতীয় সড়ক। এই সড়কগুলি সৌদি আরবের সমস্ত অংশের সঙ্গে যুক্ত এবং দর্শনীয়। রীতিমত ব্যয়বহুল আধুনিক এই সড়কগুলির যত্রতত্র ফ্লাইওভার। এই মিনাতেই যত ফ্লাইওভার আছে, সম্ভবতঃ আমাদের সমগ্র ভারতে তা নেই। হাওড়া আর শিয়াদহ দুটি ফ্লাইওভার করতেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাই অথচ বালির রাজ্যে কি অসাধ্য সাধনই না এ'রা করছেন !

মিনার পথে প্রথমেই পড়ল জুমরাতুল আকাবা (বড় জুমরা বা বড় শয়তান), এখান থেকে মাত্র এক শো পনের মিটার দূরে জুমরাতুল উসতা (মেজ জুমরা বা মেজ শয়তান) এরপর দেড় শ মিটার দূরে জুমরাতুল উলা (ছোট জুমরা বা ছোট শয়তান), অল্প ব্যবধানে পর পর তিনটি জুমরা রয়েছে। হযরত ইবরাহিম আ যখন তাঁর শিশুপুত্র হযরত ইসমাইল আ-কে কুরবানী করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলেন, শয়তান এই তিন স্থানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কুমন্ত্রণা দেয় এবং কুরবানী করা থেকে বিরত রাখার জন্যে নানান ভাবে প্রলুব্ধ করতে থাকে। হযরত ইবরাহিম আ বিরক্ত হয়ে সজোরে প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাকে দূর করে দেন। সেই পুণ্যস্মৃতির স্মরণে হাজি সাহেবরা এই তিন জুমরায় কাঁকর নিক্ষেপ করেন। জুমরা বলতে দেখলাম পাথরের তৈরি একটি স্তম্ভ মাত্র, কোন আকৃতি অবয়ব বা মূর্তি নয়—আসলে এটিকে উপলক্ষ করে শয়তানের স্মরণে কাঁকর মারা হয়, মূল উদ্দেশ্য হযরত ইবরাহিম আ যেমন কুপ্রবৃত্তিকে দমন করেছিলেন আমরাও যেন প্রত্যেকেই আমাদের রক্তে মিশ্রিত যাবতীয় পাপবৃত্তির ধ্বংস সাধন করি, কুরবানীর মহান ঘটনা স্মরণ করে আমরা যেন আমাদের জীবনাচরণের সর্বক্ষেত্রে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠি। শয়তানের এই স্তম্ভগুলি নির্মাণে কেউ যেন পৌত্তলিকতার কোন সূত্র আবিষ্কার না করেন, এই স্থির নিশানাগুলি না থাকলে হাজিসাহেবগণ যিনি যে দিকে পারতেন পাথর ছুঁড়তেন ফলে নিদারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত আর

প্রস্তরাঘাতে জখমের সংখ্যা বেড়ে যেত, কোন দিক দিয়েই তা শুভ হত না। শুনলাম হজের নির্দিষ্ট দিনে এখানে প্রচন্ড ভিড় হয়, এমন ভিড় যে বহুলোক অজ্ঞান হয়ে পড়েন, কোন কোন সময় কেউ কেউ ইন্তেকালও করেন কিন্তু আজ আমাদের গাড়ি ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়ে তিন জুমরা এবং পার্শ্ববর্তী সুদৃশ্য পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে মিনা উপত্যকায় পোঁছে গেল। মিনায় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটেছিল। জুমরা এলাকার আর এক নাম আকাবা। রসুলুল্লাহর হাতে হাত রেখে মদিনার আনসারগণ এই আকাবাতেই প্রথম এবং দ্বিতীয় বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং যা পরবর্তীকালে শিশু ইসলামের বিকাশের জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছিল। পূর্বদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আছে বিশ্বখ্যাত মসজিদ—মসজিদ আল খায়েফ। সময় আর শ্রম বাঁচানোর জন্য আমাদের ড্রাইভার তাঁর যন্ত্রযানকে আর ওদিকে নিয়ে গেলেন না. আঙুল বাড়িয়ে ম্যাপ পয়েন্টিং-এর মত করে তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন।

মিনার অর্থ প্রবাহিত হওয়া, অবশ্যই কুরবানীর রক্ত প্রবাহের কথাই বলা হয়েছে। সাবীর পাহাড়ের দখিন দিকের ঢালু জায়গায় হযরত ইবরাহিম আ পুত্র ইসমাইলের গলায় ছুরি চালান এবং পরে এখানেই প্রথম কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করেন (৩৭ ঃ ১০২-১০৭)। পরে এই পবিত্র স্থানটিতে কুরবানীর উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থার প্রচলনের মাধ্যমে সেই পুণ্য স্মৃতিকে অবিনশ্বর রাখা হয়েছে। কিন্তু এই ঐতিহাসিক স্থানটিও দেখার সৌভাগ্য হল না আমাদের। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে দেখে ফিরে আসতে যে সময় ব্যয় হবে ততক্ষণে আমাদের চতুষ্পদ যানটি নাকি আরাফাতে পোঁছে যাবে। সুতরাং আমাদের ড্রাইভারের লক্ষ্য এখন মিনা থেকে দশ-এগার কিলোমিটার দূরে আরাফাতের দিকে। গাড়ি প্রায় এক শো কিলোমিটার গতিতে সেই মহাময়দানের দিকেই এগিয়ে চলল।

বালির রাজ্যে সংখ্যাতীত ছোট বড় পাহাড় চারদিকে। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে দৃশ্য পাল্টে যায়। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আরাফাতে পোঁছে গেলাম। মসজিদ নোমারার পাশ

দিয়ে গিয়ে আমাদের গাড়ি থামল একটি পাহাড়ের পাদদেশে। বিশাল ময়দান একেবারে ফাঁকা অথচ এখানে এসে দেখলাম পুণ্যলোভাতুর মানুষের ভিড়ে জায়গাটি রীতিমত জমজমাট। মক্কা থেকে প্রায় পনের কিলোমিটার দূরে এই পাহাড়টির নামই জাবালে রহমত বা দয়ার পাহাড়। আর এই পাহাড় সংলগ্ন বিশাল প্রান্তরটিই আরাফাত। দেড় শো থেকে দুশো ফুট উচ্চ এই পাহাড়টি ঐতিহাসিক। এখানেই পৃথিবীর প্রথম মানব দম্পতির প্রতি বৃষ্টিধারার মত নেমে এসেছিল আল্লাহর রহমত, এখানে হযরত আদম আ-এর সকাতর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন এবং তাঁর পাপ ক্ষমা করে দেন, এই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করে রসুলুল্লাহ তাঁর বিশ্ববিশ্রুত বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, এখানেই অবতীর্ণ হয় দ্বীন ইসলামকে পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণতা দান করার আয়াত। পাহাড়ের উপরে ওঠার ধাপগুলি বাঁধান এবং একেবারে উপরে বেশ কিছুটা এলাকাকে সমতল চত্বরে পরিণত করা হয়েছে। দেখলাম সকলেই এই 'দোওয়া কবুলের স্থানে' আন্তরিকভাবে নামায পড়ছেন এবং আল্লাহর দরবারে বিনীতভাবে হাত তুলে অশ্রুপাত করছেন। আমরাও একে একে নামায পড়লাম এবং প্রাণভরে আল্লাহর কাছে দোওয়া চাইলাম। সমগ্র আরাফাতে জবলে রহমতই সবচেয়ে বরণীয় স্থান। হজের দিন যখন আমরা আরাফাতে পৌঁছাই, জবলে রহমতের ধারে কাছে আসতে পারি নি, কেবল দূর থেকে অসংখ্য মানুষের এহরাম বাঁধা একটা শাদা স্তূপের মত দেখেছি। উপরের সমতল চত্বর থেকে একটি সুউচ্চ মিনার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, এটিও জবলে রহমতের আর এক নিশানা।

এই বিশাল প্রান্তরের দ্বিতীয় ইতিহাসবিশ্রুত স্থানটি হল মসজিদে নোমারা। বিদায় হজের দিন রসুলুল্লাহ এখানেই তাঁবু ফেলে অবস্থান করেন। আরাফাত শব্দের অর্থ পরিচয় বা মিলন। বেহেশত থেকে বিচ্যুত হয়ে সুদীর্ঘকাল পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে এখানেই হযরত আদম আ আর বিবি হাওয়া রা-র পুনর্মিলন হয়। আরাফাত তাই আজ বিশ্ববাসীর মিলনকেন্দ্র। পৃথিবীর বিভিন্ন

প্রান্ত থেকে আগত মানুষেরা মক্কায়, মিনায় বা মুজদালেফায় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন—সকলে একত্রিত হন না কিন্তু আরাফাতে সকল হাজিকে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে আবশ্যিকভাবে একই মিলন ভূমিতে মিলিত হতে হয়। সমগ্র হজ পর্বে এই রকম অপূর্ব দৃশ্যটি আর কোথাও কখনও দেখা যায় না।

হজের প্রায় এখনো দু সপ্তাহ বাকি তবুও ফেরার পথে দেখলাম আরাফাত মিনার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে তাঁবু পড়তে শুরু করেছে, মেষ দুম্বা গরু বকরি আমদানি হচ্ছে কুরবানীর জন্যে. এক জায়গায় দেখলাম সুদীর্ঘ গলা উঁচু করে বিশাল একটা উটের পাল দাঁড়িয়ে আছে। আমার বিশ্বাস ছিল কুরবানীর জন্যে বকরি বা গরুর সংখ্যা কম হবে, দেখলাম সে ধারণা ভুল বরং দুম্বা-উটের তুলনায় এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আরাফাত থেকে মুজদালেফায় আসতে বেশি সময় লাগল না। এখানে বৈশিষ্টপূর্ণ স্থানগুলির কথা জিজ্ঞেস করতে ইয়াকুব আদম বা ড্রাইভার বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। আসলে এগুলি ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় গুরুত্বে অনন্য সুতরাং অন্তরের জিনিষ. মক্কায় বসবাস করলেই এগুলি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া যায় না। আল্ কোরআনে মাশআরীল হারাম (২ঃ ১৯৮) এর উল্লেখ আছে, এটি মুজদালেফার একটি ছোট পাহাড়ের নাম, স্থানীয়ভাবে জবলে কোজাহ-ও বলা হয়। বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে রসুলুল্লাহ এখানে অবস্থান করেন। বর্তমানে এখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মিত হয়েছে। হাজি সাহেবগণ এখানে অত্যন্ত বিনীতভাবে নামায পড়ে থাকেন। মাশআরীল হারামের পশ্চিম দিকে প্রায় সাড়ে পাঁচশো হাত দীর্ঘ একটি উপত্যকা বিরান হয়ে পড়ে আছে, এই প্রান্তরটিই সেই কুখ্যাত ওয়াদীয়ে মোহাস্‌সর—একাধারে ঐতিহাসিক এবং ঘৃণ্য। সুরা ফিল এর মধ্যে অহংকারী আবরাহার যে ইতিবৃত্তটি বিবৃত হয়েছে তা এই প্রান্তরেই সংঘটিত হয়েছিল। অতি সংক্ষেপে কাবা ধ্বংসোদ্যত আবরাহা আর আবাবিল পাখির ইতিবৃত্তটি আমরা জেনে নিতে পারিঃ

আবরাহা উদ্ধত। আবরাহা অহঙ্কারী। সে ছিল এক গ্রীক ব্যবসায়ীর ক্রীতদাস। যোগ্যতা এবং কূটচালে এক সময় সে আবিসিনিয়ার হাবশা সম্রাটের অধীন ইয়েমনের গভর্নর হয়ে যায়। ক্রীতদাস থেকে যারা হঠাৎ পদমর্যদার অনেক উপরে ওঠে, অনেক সময় তাদের আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আবরাহারও সে দশা হল। কাবা-ই আরবের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। বহুদেশ থেকে পুণ্যত্মা বহু ক্লেশ স্বীকার করে কাবায় তীর্থ করতে যান, উদ্ধত আবরাহার এটা ভাল লাগল না। সে ছিল খৃস্টান। ইয়েমনের রাজধানী সানায় একটা বিশাল গীর্জা তৈরি করে সেখানে বসবাসকারী সকল আরবকে সেই গীর্জায় হজ তীর্থ করার নির্দেশ দিল। সে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করল ঃ 'আমি আরবদের হজ-অনুষ্ঠান কাবা থেকে এই গীর্জায় স্থানান্তরিত না করে ছাড়ব না।' তার এই সদম্ভ ঘোষণায় ইয়েমনে বসবাসকারী আরবেরা ভিতর ভিতর ভীষণভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে একজন কুরেশ কোনক্রমে গীর্জার মধ্যে ঢুকে মল-ত্যাগ করে এল। এই সঙ্গেই আরো একটি ঘটনা ঘটে গেল হঠাৎ। গীর্জা থেকে অল্প দূরে তিন-চারজন আরব যুবক কোন কারণে আগুন জ্বালিয়েছিল। বাতাসে তাড়িত হয়ে সেই আগুনে আকস্মিকভাবে গীর্জার অনেকটা অংশ ভষ্মীভূত হল। এসব ঘটনা থেকে আবরাহা এত ক্ষেপে গেল যে প্রতিজ্ঞা করে বসল ঃ কাবাকে ধ্বংস না করে সে নিরস্ত হবে না। ষাট হাজার সুশিক্ষিত সৈন্য আর বিশাল হস্তিবাহিনী নিয়ে সে কাবা-ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। তার সেই বিশাল বাহিনী তায়েফে পেঁাছুলে সেখানকার বনু শফিক গোত্রের লোকেরা ভাবল যে আবরাহা তাদের 'লাত'-এর মন্দির ধ্বংস করে দেবে। তারা তাড়াতাড়ি আবরাহার সঙ্গে দেখা করে বলল ঃ আপনি কাবা ধ্বংস করতে এসেছেন সে ত এখান থেকে বেশ দূরে। আমরা একজন পথপ্রদর্শক দিচ্ছি, সে ঠিকমত আপনাকে যথা স্থানে নিয়ে যাবে। অনুগ্রহ করে আমাদের লাত-এর মন্দির নষ্ট করবেন না। আবরাহা এ প্রস্তাবে সম্মত হল। বনু শফিকের লোকেরা আবু রিগাল নামে এক ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শক

করে পাঠাল। এই লোকটি, মক্কার অনতিদূরে আল মুগাম্মাস নামক জায়গায় এসে মারা গেল। সেখানেই তার কবর হল। তার এই পথপ্রদর্শনার কাজকে তখনকার আরবেরা জাতীয় অপরাধ বলে মনে করেছিল এবং দীর্ঘকাল তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা সেই কবরকে লক্ষ্য করে ঘৃণাভরে পাথর ছুঁড়ে মারত। যা হোক, আল মুগাম্মাস থেকে আবরাহা অগ্রবর্তী কিছু সেনাকে মক্কার দিকে পাঠিয়ে দিল। এই সৈন্যদল ভূরিভোজের জন্যে তেহামা অধিবাসী আর কুরেশদের বহু পালিত পশু ধরে নিয়ে এল। এর মধ্যে ছিল রসূলুল্লাহর দাদা আবদুল মুত্তালিবের দু শো উট। ইতিমধ্যে আবরাহা দূত পাঠিয়ে মক্কার গোত্র-প্রধানদের জানিয়ে দিল ঃ 'আমি এসেছি কাবা বিধ্বস্ত করতে, সুতরাং এতে যে বাধা দেবে সে ধ্বংস হবে, বাধা না দিলে নিরাপদ, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে যেন দূতের সঙ্গে চলে আসে।' আবদুল মুত্তালিব ছিলেন সে সময় কাবার সেবাইত এবং কুরেশ গোত্রপ্রধান। দূতের সঙ্গে তিনি এলেন দেখা করতে। অত্যন্ত সুদর্শন আর বলিষ্ঠ ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। তাঁকে দেখে আবরহার মনে সম্ভ্রম জাগল। কথা শুরু হতে আবদুল মুত্তালিব বললেন, 'আপনি আমার দু শো উট ফিরিয়ে দিন।' শুনে অবাক কণ্ঠে আবরাহা বলল, 'সে কি আপনি শুধু উট চাইছেন আমি যে এখুনি কাবা ধ্বংস করব সে সম্পর্কে কিছু বললেন না।' আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত সহজ আর নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'উটের মালিক আমি—তাই সেগুলি আমি ফেরৎ চাইছি। কিন্তু কাবার মালিক আল্লাহ, তিনি তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। এ নিয়ে আমার কোন ভাববার প্রয়োজন নেই।' এ কথা বলে আবদুল মুত্তালিব চলে গেলেন ; কাবার মালিকের উদ্দেশ্যে অবজ্ঞার হাসি হেসে আবরাহা বলল, 'সে আমার আঘাত সহ্য করতে পারবে ত ?' পরদিন প্রস্তুত হয়ে কাবা-ধ্বংসের জন্যে সে তার সৈন্য বাহিনীকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দিল। নিজে উঠে বসল সবচেয়ে বড় হাতির পিঠে আর এটি ছিল একেবারে সামনে। কিন্তু কি আশ্চর্য তাকে কিছুতেই মক্কার দিকে চালনা করা গেল না। দখিন

উত্তর পূব সকল দিকেই সে জোর কদমে ছুটতে থাকে কেবল কাবার দিকে মুখ করলেই সে বসে পড়ে। তাকে মেরে আহত করা হল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সে মাটিতেই বসে থাকল। আর ঠিক সেই সময় লোহিত সাগরের দিক থেকে আকাশ আচ্ছন্ন করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট সবুজ আর হলুদ বর্ণের 'আবাবিল' পাখি উড়ে এল, তাদের প্রত্যেকের ঠোঁটে একটি এবং দু পায়ে দুটি মোট তিনটি করে ক্ষুদ্র মটর দানার মত পাথর ছিল। আকাশ থেকে আল্লাহর এই আবাবিল-বাহিনী সেই পাথরগুলি ষাট হাজার সৈন্য আর বিশাল হস্তিবাহিনীর উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় ঃ এই পাথর কুঁচি দেহের যে অংশে পড়ত সেখানেই ভীষণ চুলকানি শুরু হত এবং পরে ফেটে গিয়ে মাংস ঝরে পড়ত, পুঁজ-রক্তপচন শুরু হত এবং শেষে অস্থি বেরিয়ে পড়ত ও মারা যেত। দলনেতা উদ্ধত অহংকারী আবরাহারও একই দশা হল। তার দেহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল, মাংস ঝরে পড়তে শুরু করল, পুঁজ ও দুর্গন্ধে বীভৎস রূপ পরিগ্রহ করল, পালিয়ে দেশে ফিরতে চাইল কিন্তু আল্লাহর রোষ থেকে বাঁচা সহজ নয়। অবশেষে এক মর্মান্তিক পরিবেশে খাশয়াম অঞ্চলে সে মারা গেল। তার সৈন্যবাহিনীর অনেকে ঘটনাস্থলেই মারা গেল, ছুটে পালাতে গিয়ে কেউ মারা পড়ল পথে, অল্প কিছু অন্ধ-খঞ্জ হয়ে বেঁচেছিল তারা চরম দুঃখের মধ্যে দিন কাটাত। বিবি আয়শা রা বলেছেন, আমি এই দলের মাহুতকে সম্পূর্ণ অন্ধ অবস্থায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে দেখেছি।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কার অতি নিকটবর্তী পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূরে মুজদালিফা ও মিনার মধ্যবর্তী মহাচ্ছাব উপত্যকার কাছে 'মুহাস্সির' নামক স্থানে। আর এটা ঘটেছিল রসূলুল্লাহর জন্ম সন ৫৭০ খৃস্টাব্দে, তাঁর জন্মের ঠিক পঞ্চাশ দিন পূর্বে। নবীজীর জন্ম হয়েছিল রবিয়ল আউয়ল মাসে আর এই ঘটনাটি ঘটেছিল মহরম মাসে। এই বিরল এবং অসাধারণ ঘটনাটি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সারা আরবে অতি অল্পসময়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং

আরবের মানুষ এমনভাবে অভিভূত হয়ে পড়ে যে তারা কিছুদিন কোন দেবদেবীর পূজা না করে অদ্বৈত সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহরই উপাসনা করতে থাকে। আরবের কবিরা কাব্যে গাথায় এই ঘটনাকে অমর করে তুলেছিল।

আবাবিল পাখিরা তাদের কাজ করে চলে যায়। এই পাখিরা এসেছিল সত্যের প্রতীক হয়ে, আলোর প্রতীক হয়ে—মিথ্যার বিরুদ্ধে তারা জেহাদ করে গেল, অন্ধকারে আলো ফেলে গেল। পাপাচার কুসংস্কার গর্ব অহংকারে যখন এই সবুজ পৃথিবীতে বুক ভরে শ্বাস নেবার জায়গা থাকে না, তখন এই আবাবিল পাখিরা আসে, অন্ধকারে আলো জেবলে যুগে যুগে আসে এই আলোর আববিলেরা, তাদের সংগ্রামে মিথ্যা পরাজিত হয়, তাদের সুরে সত্য ঝরে পড়ে, ন্যায় ফিরে আসে—অন্যায় দূর হয়, জাগ্রত হয় কল্যাণ বোধ, কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হয় মানবিকতার বিজয় ঘোষণা

হাজি সাহেবগণ অতিদ্রুত এই আজাবের এলাকা অতিক্রম করে যান। আমরাও দ্রুত গতিতে এই কুখ্যাত এলাকাটি পার হয়ে এলাম।

মুজদালেফা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তনের পথে পড়ল জবলে সুর, গারে সুর বা সওর (সুর পর্বতের গুহা) বলেন কেউ কেউ। এই সেই ঐতিহাসিক পর্বত যার চূড়ার এক গুহায় হিজরতের সময় কুরেশদের নিষ্ঠুর আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার জন্যে হযরত আবুবকর রা সহ রসুলুল্লাহ তিন দিন তিন রাত আত্মগোপন করেছিলেন। দুঃসহ সেই তিন দিন তিন রাত, ভয়ংকর এবং বিভীষিকাময় !

মন্ত্রনাকক্ষে মিলিত হল কুরেশ দলপতিরা—উতবা আবুজেহেল উমাইয়া আবু সুফিয়ান এবং আরো অনেকে। মুহাম্মদ স-কে নিয়ে যে কি করা হবে তা তারা কিছুতেই স্থির করতে পারছে না। একজন বললে, হাত-পা বেঁধে মুহাম্মদকে ঘরে বন্দী করে রাখা হোক। দ্বিতীয় জন বললে, দেশ থেকে বার করে বহু দূরে কোথাও নির্বাসিত করে দিলেই ত গোল চুকে যায়। রক্তের শত্রু আবু জেহেল হুঙ্কার ছাড়ল, থাম তোমরা নাবালকের দল—তোমাদের

বুদ্ধিতে চললেই হয়েছে। এস প্রতি গোত্র থেকে একজন করে নওজোয়ান, তৈরি হয়ে যাও খরশান তরবারি নিয়ে, ঘিরে ফেল মুহাম্মদের বাসগৃহ তারপর তাকে হত্যা কর একযোগে যাতে তার রক্তের দায়দায়িত্ব সকল গোত্রের উপর গিয়ে পড়ে। আর আমাদের সকল গোত্রের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে হাশেম বংশের লোকেরা এগুতে সাহস পাবে না। আবু জেহেলের এ প্রস্তাব 'এক বাক্যের' সমর্থন পেল আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গোত্রের বীরগণ সমবেতভাবে রসুলুল্লাহর বাসগৃহ অবরোধ করে ফেলল।

আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর 'সিরাতুন নবী'তে এই সময়কার সব রকম মোজেজার কথা (সুরা ইরাসিনের প্রথম রুকুর কিছু অংশ পড়ে কাফেরদের দিকে মাটি নিক্ষেপ করা) পরিহার করে লিখেছেনঃ 'কাফেরগণ যখন হযরতের গৃহ অবরোধ করল তখন রাত গভীর, তিনি (হযরত) তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে বাইরে চলে যান।'

যুক্তিবাদী লেখক আকরাম খাঁ-র "মোস্তফা-চরিত"-এ পাই ঃ "এই সময় সদর দিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না দেখিয়া হযরত বাটির অন্য দিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ বহির্গত হইয়া পড়েন। হযরতের পরিচারিকা মাবিয়া বলিতেছেন 'হিজরতের রাতে আমি অবনমিত হইলে হযরত আমার পিঠের উপর পা দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়াছিলেন।"

ঘটনা যাই ঘটুক, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ রূপে নির্ভর করে রসুলুল্লাহ সেই মহাদুর্যোগপূর্ণ রাতে কুরেশবেষ্টিত গৃহ থেকে হিজরতের জন্য বিপদসঙ্কুল পথে বার হয়েছিলেন।

তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী হযরত আবুবকর রা-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা পেঁৗছে গেলেন সুর পর্বতের গুহায়। কয়েক মাস পূর্বে অন্যান্য সাহাবীদের সঙ্গে যখন হযরত আবুবকর রা মদিনায় হিজরত করতে চেয়েছিলেন, রসুলুল্লাহ তাঁকে বলেন, অপেক্ষা কর— আমাদের উপরেও এ আদেশ আসতে পারে। সেই থেকে এই সুদিনের অপেক্ষায় অধীর হয়েছিলেন হযরত আবুবকর রা, প্রস্তুতিও চলছিল সকলের অলক্ষ্যে। বন্ধুর দুর্গম পথে পাড়ি দেবার জন্যে

চার মাস ধরে তিনি দুটি তরুণ উটকে নিয়মিত বাবলা গাছের পাতা খাইয়ে তরতাজা করে তুলেছিলেন। নবীজীর উপর হিজরতের নির্দেশ এলে, হযরত চলে যান আবুবকর রা-র বাড়িতে। সব শুনে উৎসর্গীত হযরত আবুবকর রা জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি আমার মাতা উৎসর্গীত হোন! আমি কি আপনার সঙ্গী হবার সৌভাগ্য লাভ করব? প্রত্যক্ষদর্শী মা আয়শা রা বলেন, সম্মতিসূচক উত্তর পেয়ে আব্বা এত কান্না কাঁদলেন যে আমি তাঁকে জীবনে আর কখনো এভাবে উল্লসিত হয়ে কাঁদতে দেখিনি। জীবনে চলার পথে অনেক সময় আমরা ব্যাকুল আনন্দে অবিরল অশ্রুপাত করি। হযরত আবুবকর রা-র এই হৃদয় ব্যাকুল বিবশ করা আনন্দ কিসের জন্য? চারদিকে শত্রুর পদচারণা, জীবন হত্যার নিষ্ঠুর হুমকি, হিজরতের পথ ভয়ংকর দুস্তর, পথে খাদ্য নেই, পানীয়ের অনটন, যাত্রায় প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম—তবুও মৃদুভাষী সংযত আবুবকর রা উল্লাসে অধীর। এ উল্লাস রসূলুল্লাহর সঙ্গলাভের উল্লাস, মহান পুরুষের পবিত্র সাহচর্যের উল্লাস, জীবনের বিনিময়ে ভয়াল অন্ধকারে তাঁর পরিচর্যার সৌভাগ্যের উল্লাস, প্রতিটি রক্ত বিন্দু দিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে অন্তরতমকে রক্ষা করার উল্লাস, রসূলের জন্য সকল বিপদকে বুক পেতে গ্রহণ করার উল্লাস। এই হল রসূলুল্লাহর প্রতি ভালবাসা। এমন প্রগাঢ় রসুলপ্রেম পৃথিবীর আর কোন পুরুষের মধ্যে দেখা যায় নি।

কায়িফ নিযুক্ত করেছে কুরেশ সর্দারগণ। শিকার হাতছাড়া, তাদের মাথায় তখন আগুন জ্বলছে। কায়িফদের, পদচিহ্ন বিশারদদের সঙ্গে দলবদ্ধভাবে চলেছে কুরেশ সর্দার আর নওজোয়ানেরা। রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোকে উন্মুক্ত তরবারি ঝলকিত হচ্ছে। মক্কা থেকে সূর পর্বতের দূরত্ব তখন ছিল চার কলোমিটারের কিছু বেশি, পথ অবশ্যই দুর্গম। যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করে কায়িফগণ এ-পথ সে-পথ এ-পাহাড় সে-পাহাড় করে অবশেষে সূর পর্বতের পাদদেশে এসে থামল। তারপর পথের

উপর অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে তারা পশ্চাতে দলবদ্ধ জনতা নিয়ে চূড়ার দিকে উঠতে শুরু করল। পায় পায় এত কাছে এসে গেল যে তাদের ছায়া পড়ল গুহার ভিতর। একেবারে সন্নিকটে এসে গেল তারা। কোন অবস্থাতেই আর রক্ষা নেই, অনিবার্য মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ অনুভব করলেন হযরত আবুবকর রা। বুখারী শরীফের বর্ণনায় এই সময়কার চিত্র সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে ঃ "আবুবকর বলছেন, 'আমি মাথা উঁচু করে দেখি, ঘাতকদল একেবারে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছে। তখনই আমি এই ব্যাপারটি হযরতকে নিবেদন করলাম।" হযরত আবুবকর রা ভীত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ 'ওরা অনেক আর আমরা মাত্র দুজন।' কিন্তু রসুলুল্লাহ ছিলেন নির্ভীক এবং সম্পূর্ণ নির্ভয়। তিনি হৃদয় মনে আল্লাহকে এমনভাবে গ্রহণ করেছিলেন, এই পরম সত্যের উপর পরিপূর্ণ রূপে এমন ভাবে আস্থাশীল ছিলেন, অন্তরে বাইরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দীপ্তি ও অফুরন্ত তেজ এমন ভাবে অনুভব করতেন, এক বেহেশতি এবং অলৌকিক অনুপ্রেরণায় তিনি এমনই ভাবে অকুতোভয় হয়ে উঠতেন যে পার্থিব কোন ঝড়-ঝঞ্ঝা দুর্যোগ-বিভীষিকা তাঁকে স্পর্শই করতে পারত না। সর্বশক্তিমান আল্লাহব উপর অপারিসীম বিশ্বাসে এই সময় তাঁকে ভোরের পাহাড়ের মত অটল মনে হয়েছিল। আবুবকরের কথায় তিনি নির্ভিক কণ্ঠে বললেন ঃ "লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মায়ানা—বিচলিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।" "আবুবকর ! দুজনের কথা কি বলছ ? আমরা দুজন আল্লাহ আমাদের তৃতীয়।" বুখারী। আল কোরআনে এই ঘটনার আশ্চর্য বিবরণ রয়েছে সূরা তওবার চল্লিশ সংখ্যক আয়াতে ঃ "যদি তোমরা তাকে (রসূলকে) সাহায্য না কর (তবে স্মরণ কর) আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন অবিশ্বাসীগণ তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দুজনের একজন যখন তারা গুহার মধ্যে ছিল, সে তখন তার সঙ্গীকে বলেছিল, বিষণ্ণ হয়ো না—নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"। ৯ ঃ ৪০

কায়িফ আর কুরেশদের ছায়া তাঁদের পায়ের উপর পড়েছিল, গুহার মুখে উঁকি দিলেই তারা তাঁদের দেখতে পেত কিন্তু উঁকি দেওয়া ত দূরের কথা তারা কায়িফদের প্রচন্ড রকম ধমক দিতে দিতে আরো দূরে সরে গেল। তারা পদচিহ্ন বিশারদদের দোষারোপ করে বললে, গুহার মুখে মাকড়সার জাল আর এর মধ্যে রয়েছে মুহাম্মদ!

সত্য সত্যই গুহার মুখে মাকড়সার জাল ছিল, হাদিসেও এর উল্লেখ আছে। অনেক যুক্তিবাদী আধুনিক লেখক এই ঘটনাকে কল্পকাহিনী বলে উড়িয়ে দিতে চান, মোজেজাকে অস্বীকার করার ভংগিতে এটিকে তাঁরা উপকথা বলে মনে করেন। এই আধুনিকের দল ভুলে যান যে আল্লাহ ইচ্ছা করলে সব কিছুই করতে পারেন। বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি বাতাসে বা কোন কারণে মাকড়সার জাল ছিঁড়ে গেলে সে সঙ্গে সঙ্গে তা মেরামত করে নেয়। তার এই মেরামতের কাজ, আমার বিশ্বাস, আমরা অনেকেই সবিস্ময়ে কোন না কোন সময়ে প্রত্যক্ষ করেছি। কোন কোন সময়ে আমরা এমনও দেখেছি যে এক অসম্ভব দূরত্বে তারা জাল বিস্তার করেছে যা আপাত দৃষ্টে কোন কিছু সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের পক্ষেও অসম্ভব মনে হয়। পার্বত্য এলাকায় মাকড়সা সাধারণতঃ অধিক বয়সের এবং আকারে বৃহৎ হয়। তা ছাড়া সুর পর্বতের গুহার মুখটির প্রস্থ ছিল মাত্র সাড়ে তের ইঞ্চি, একটি লোক কোন রকমে কাৎ হয়ে ভিতরে যেতে পারত। সাড়ে তের ইঞ্চি জায়গায় বুনো মাকড়সার পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে জাল বুনে ফেলাটা কিছুমাত্র বিচিত্র আর বিস্ময়ের নয়।

"ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই ত দুর্বলতম" ২৯ ঃ ৪১ —এই দুর্বলতম অস্ত্র দিয়েই মহান আল্লাহ তাঁর রসুলকে শত্রুদের সমবেত আক্রমণ থেকে রক্ষা করলেন।

সৌদি আরবে অবস্থানের সময় নানান পত্রপত্রিকার বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আমি মাকড়সার জালবোনা আর দুটি কবুতরের বসে ডিম পাড়ার চিত্রটি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি। তেমন কিছু সংবাদপত্র বর্তমানে আমার হেফাজতে আছে।

চতুর্থ দিনে রসূলুল্লাহ আর হযরত আবুবকর অতি সন্তর্পণে গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পূর্ব নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পথপ্রদর্শক সেই তরতজা উট দুটি নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে হাজির ছিল, আল্লাহর নামে যথাসময়ে রসূলুল্লাহ অন্যান্য সকলকে নিয়ে বিপদসঙ্কুল দূর মদিনার পথে পা বাড়ালেন।

এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যেও রসূলুল্লাহ আপন কর্তব্য থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি বরং পরিপূর্ণ সচেতন ছিলেন। দুটি উট সম্মুখে এলে আবুবকর রা বললেন, হযরত যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন। রসূলুল্লাহ বললেন, দাম না মিটিয়ে আমি এ উটের পিঠে সওয়ার হতে পারি না। কোন কথাই শুনলেন না, সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে পরিপূর্ণ মূল্য পরিশোধ করে তিনি আল কাসওয়া নামক উষ্ট্রীকে গ্রহণ করলেন। পৃথিবীর তাবৎ নেতারা এমন বিপর্যস্থ অবস্থায় শিষ্যের এ নিবেদন এ উৎসর্গকে তাঁদের নিজেদের মহত্ব আর কৃতীত্বের পাওনা হিসেবে ধরে নেন এবং ভাবেন এ উপহার গ্রহণ করে তাঁরা শিষ্যদের কৃতার্থ করলেন কিন্তু রসূলুল্লাহ ? তাঁর গগনবিহারী উদার মানসীকতার সঙ্গে ত আমরা এই মাত্র পরিচিত হলাম !

এই উষ্ট্রীটি ছিল সৌভাগ্যবতী—মক্কা বিজয়ের গৌরবময় মুহূর্তে এই উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়েই উন্মুল কোরায় প্রবেশ করেছিলেন রসূলুল্লাহ, হিজরত শুরু করলেন এরই পিঠে চড়ে, আর এরই পিঠে সওয়ার হয়েই উদ্বেলিত লক্ষ জন সমুদ্রের মাঝে দিয়েছিলেন বিদায় হজের ঐতিহাসিক ভাষণ।

বেলা হয়ে গিয়েছিল বলে ড্রাইভার আর সুর পর্বতের পাদদেশে দাঁড়ালেন না, আমরাও ভাবলাম এখন তো বেশ কিছুদিন থাকব—অন্য যে কোনদিন এসে এই পবিত্র গুহাটি দেখে যাব কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে সেই শুভ মুহূর্তটি আর আসে নি, ঐতিহাসিক গারে সুর আমার দেখা হল না, জীবনে আর কোনদিন হবে কিনা তা আল্লাহ জানেন।

আজ রবিবার শেষরাত তিনটা বিশ মিনিটে এলার্ম বাজল নতুন

ঘড়িতে। চাবুকের বাড়ি খেয়ে উঠে পড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। ওযু সেরে তাহাজ্জদের জন্য বেরিয়ে পড়লাম কাবার পথে। দেখলাম অত রাতেও মানুষ পাগলের মত ছুটে চলেছেন দলে দলে, হাজার হাজার, লাখে লাখে। এই পুণ্যাত্মারা নামায পড়বেন, তওয়াফ করবেন। আমি ভেবেছিলাম, এ সময়টা একটু ফাঁকা পাব এবং বেশি সংখ্যায় তওয়াফ করব কিন্তু আমার সে ধারণা একেবারেই ভুল প্রমাণিত হল। দেখলাম, শেষ রাতের এই মহাবরকতময় মুহূর্তটুকু আমাদের মত কেউ অবহেলায় কাটান নি। সকলেই আল্লাহর দরবারে তাঁর অনন্ত রহমতের আশায় তাঁদের শ্রদ্ধাবিনীত শির নত করেছেন।

আমি কাতারের এক পাশে সকলের সঙ্গে তাহাজ্জদে সামিল হলাম।

এত ভোরেও লাশ এল, জানাজা হল। কোন মুহূর্তে যে কার কাছে আযরাঈল উপস্থিত হবেন ! হায়, কত ক্ষণভংগুর এই জীবন! অথচ কি অনন্ত লালসা !!

১৫.

ফুলের সঙ্গে মাটির ঢিল থাকলে তাও সুবাসিত হয়ে ওঠে কয়েকদিনে আর বিষ্ঠার সঙ্গে থাকলে ? অথবা বিষ্ঠা যদি এসে পড়ে ফুলের পাপড়িতে ? ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে আর যদি জোচ্চোর যায় স্বর্গে ? আশ্চর্য, পবিত্র কাবার চত্বরে তওয়াফের প্রচন্ড ভিড়ে পকেটমার হয়ে গেল একজনের। যাঁর গেল তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন আর পিছনের লোকটি সেই মুহূর্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রতায় নিজ হাতে দু কান ধরে বিশাল কাবার দিকে ফিরে নির্দ্বিধায় কসম খেল, লা লা লা—না না না—কাবা সাক্ষী, আমি এ কাজ করি নি। সুতরাং আর কারো কিছু বলার নেই। এত বড় শপথের পর আর কি-ই বা বলার থাকে !

কিন্তু কাবার পথে-র লেখকের কিছু বলার থেকে যায়, যদিও বলতে গিয়ে বেদনায় লজ্জায় অপমানে মাথা নিচু হয়ে আসে। আমাদের পূর্বাঞ্চলের কিছু দেশ থেকে—যার মধ্যে ভারত অন্যতম—বেশ কিছু পকেটমার কেবল এই মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্যেই হজ মৌসুমে হাজি সেজে আরবের মাটিতে পা রাখেন। তারপর সে সব পারদর্শী মহাত্মাদের কৌশলী হাতের সুনিপুণ ক্রিয়াকর্ম চলতে থাকে কাবার প্রচন্ড ভিড়ে, মক্কার বিভিন্ন সুকে (বাজারে), মিনা-আরাফাত-মুজদালেফার ঐতিহাসিক জমায়েতে, রসুলুল্লাহর সম্মুখে মসজিদ নববীতে। নিঃস্ব হাজিরা অশ্রুপাত করেন পথের কিনারায়। বিদেশে এইভাবে সর্বস্ব খুইয়ে এই অভিজাত মানুষদের অনেক সময় হাত পাততে দেখেছি কাবার বিশাল জনতার সামনে। একবার আসরের ওয়াক্তে, নামাযে অপেক্ষমান অসংখ্য জনতার সামনে এমনি এক নিঃস্ব হাজিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন এক সৌদি, লজ্জায় লোকটি যেন মরে যাচ্ছিলেন, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে, মাথা তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছিলেন না, ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য সাড়া পড়ে গেল চারদিক থেকে। কেউ এক কেউ দুই কেউ পাঁচ কেউ দশ রিয়েলের নোট হাতে নিয়ে উঁচু করে ধরে

থাকলেন, একেবারে রিয়েল-বৃষ্টি যাকে বলে। মনে হল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই খোয়া যাওয়া অর্থটা পূরণ হয়ে যাবে তাঁর।

ইতিমধ্যে মদিনা জিয়ারত করে ফিরে এসেছেন অনেক হজযাত্রী—মদিনায় নিঃস্ব হওয়া এক ভদ্রমহিলা তাঁর অনুরূপ দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করলেন আমার স্ত্রীর কাছে। সহানুভূতি জানান ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি।

আমার দামী এক জোড়া চামড়ার স্যাণ্ডেল চুরি হয়ে গেল হেরেম শরীফের জুতো রাখার জায়গা থেকে, সঙ্গের আর এক ভদ্রলোক তাঁর জুতো পেলেন না। বোঝা গেল পূর্বাঞ্চল থেকে মক্কায় বেশ ভাল রকম গাধার আমদানী হয়েছে।

তের সেপ্টেম্বর সোমবার গভীর রাতে তাহাজ্জদ নামাযের জন্য ওযু করে চলে এলাম কাবায়। রাত তিনটের কাছাকাছি সময়ে কাবার অবস্থা দেখে বিস্ময়ে হতবাক। কয়েক লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যে সমবেত হয়েছেন। কেউ নামায পড়ছেন, কেউ তেলাওয়াতে মগ্ন, কেউ বা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন স্বপ্নের বায়তুল্লাহর দিকে। মনে হল, কয়েক লক্ষ মানুষ বুঝি সারারাত জেগেই থাকেন এখানে। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করলাম, আল্লাহ রাজি থাকলে একদিন সারারাত জেগে কাটাব হেরেম শরীফে, দেখব পবিত্র কাবায় বসে কে কি করেন, কেমন করে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয় এখানে।

বহুক্ষণ ধরে ধীর স্থিরভাবে তাহাজ্জদ পড়লাম। নামাযের শেষে ইচ্ছে থাকলেও তওয়াফে সামিল হতে পারলাম না—দু পায়ে ভীষণ ব্যথা, তওয়াফে এবং হাঁটাহাঁটিতে পা ভরে গেছে ফোস্কায়, মাঝে মাঝে ফেটে গেছে, ডান-পা-টা জখম হয়েছে বেশি। আশাহত মনে বসে আছি আমি—বিমর্ষ এবং নিরুদ্যম কিন্তু লক্ষ মানুষ ততক্ষণে বায়তুল্লাহকে ঘিরে তওয়াফের সুদীর্ঘ তরঙ্গায়িত রেখায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছেন—আনন্দে উল্লাসে সমর্পণে আত্মহারা। আমার মত দুর্ভাগার জন্য তাঁদের হৃদয়োল্লাস স্তব্ধ হবে কেন ? নব বসন্তে বনময় অলৌকিক উল্লাসের সাড়া পড়ে যায়, প্রকৃতিতে তখন চলে পোশাক বদলের পালা, পাপ-পঙ্কিল পুরাতনকে ঝেড়ে

নতুন জীবনে জেগে ওঠে তারা। শুধু আমার মত ভাঙা রুগ্ন শাখায় কোন ফুল ফোটে না।

মকবুল হজ—যে হজ আল্লাহ কবুল করেন—মানুষকে নবজীবন দান করে।

আযান হয়ে গেলে যথাসময়ে দাঁড়ালাম ফজরের জামাতে। সবে ইমাম মধুর এলাহানে কেরাত পড়তে শুরু করেছেন, সবে মনটা দুলে উঠতে শুরু করেছে—দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বৃষ্টি আসার পূর্বে শীতল হাওয়া প্রবাহিত হওয়ার মত, হঠাৎ পিছন থেকে এক নিগ্রো দিলে বমি করে। অনেক নামাযির নামায নষ্ট হল, আমার কাপড়ে লাগল ছিটে-ফোটা, দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, নামাযে একেবারেই তৃপ্তি পেলাম না। অস্বস্তির সঙ্গে নামায শেষ করে বাড়িতে এসে গোসল করে ফেললাম।

মধ্যাহ্নে খাওয়া দাওয়ার পর আজ একটি উমরা পালনের জন্যে আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে এলাম বায়তুল্লাহয়। এক শ্রদ্ধাস্পদ হাজি সাহেবের লেখায় উমরার যে ইতিবৃত্ত পড়েছিলাম তা এই ঃ 'মক্কা শরীফে হযরত নবী করীম স ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ করলে বিধর্মীগণ তাঁর উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করে। অতঃপর তিনি অতিষ্ট হয়ে মদিনা শরীফ অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রথম বারে মক্কা শরীফ হতে তিন মাইল উত্তরে তানঈম নামক স্থানে পোঁছে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারলেন না, কাবা শরীফ ও জন্মভূমির আকর্ষণ ও মহব্বতে ঐ স্থানে দু রাকাত নফল নামায পড়ে আবার মক্কা শরীফে এলেন। কিছুদিন পর পুনরায় শত্রুদের অসহনীয় ক্লেশে বিব্রত হয়ে হুজুর আকরাম স ঘরবাড়ি ছেড়ে মদিনা শরীফের দিকে রওনা হলেন। এবারে মক্কা শরীফের উত্তর-পূর্ব কোণে এগার মাইল দূরে জোয়েরানায় পোঁছে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে পারলেন না। আল্লাহর ঘরের বিচ্ছেদ ও জন্মভূমির মায়া তাঁকে অস্থির করে ফেলল। তিনি সেখানে দু রাকাত নফল নামায পড়ে আবার মক্কা শরীফে ফিরে এলেন। হজে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা স-এর এই কাবা শরীফের প্রতি মহব্বতের

অনুকরণ করাকেই উমরা বলে।'

আমার মনে হয় এই বিবরণ সঠিক নয়। হাজি সাহেব প্রদত্ত এই বিবরণ আমি কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে দেখিনি। কাবা শরীফের প্রতি এই মহব্বতের অনুকরণকে উমরা বলা হবে কেন—উমরা ত আল্লাহর আদেশ। সুরা বাকারার ১৯৬ সংখ্যক আয়াতে পাই ঃ "আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য হজ এবং উমরার নিয়ত করলে তা পালন কর।" (২ ঃ ১৯৬) সুতরাং হজ ও উমরা পালন করা আল্লাহর আদেশ আর এ দুয়ের সঙ্গে বায়তুল্লাহর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আল্লাহর নির্দেশে উমরা এমনই গুরুত্ব পেয়েছে যে অনেকে উমরাকে 'ছোট হজ' বলে অভিহিত করেন। উমরার জন্যে বছরের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, হজের সঙ্গেও উমরা করা চলে অথবা বছরের যে কোন সময় উমরার জন্য সকলের দ্বার উন্মুক্ত। রমযান শরীফে, বিশেষ করে এ মাসের শেষের দিনগুলিতে, লায়লাতুল কদরে ত বটেই, সকলকে উমরা পালনের নির্দেশ দিয়েছেন রসুলুল্লাহ। এ সময়ও মক্কা মোয়াজ্জম জমজমাট হয়ে ওঠে।

উমরার জন্যে পবিত্র মক্কা শরীফের নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে হুদায়বিয়া, জিরান বা জোয়েরানা এবং তানঈম এই তিনটি জায়গার যে কোন একটিতে উপস্থিত হয়ে উমরা আনতে হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে চৌদ্দশো সাহাবী নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ অগ্রসর হলে কুরেশরা তাঁদের মক্কায় প্রবেশ করতে দেয় নি ফলে তাঁরা হুদায়বিয়া থেকে উমরা করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা মত জিরানা থেকে একবার উমরা করেছিলেন রসুলুল্লাহ—সম্ভবতঃ হুনাইন যুদ্ধের সময় আর তানঈম থেকে ত তিনি মা আয়েশা রা-কে উমরা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন—সেই থেকে এই তিন ঐতিহাসিক স্থান হতে উমরা আনার প্রচলন হয়েছে। এই তিনটি ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে হুদায়বিয়ার দূরত্ব সব চেয়ে বেশি আর তানঈম সবচেয়ে নিকটবর্তী—মাত্র তিন মাইলের মধ্যে। সুতরাং প্রায় সকল হাজিই উমরার জন্য তানঈমে যান আর উমরার এই অকল্পনীয় ভিড়ের জন্য স্থানটি 'আল উমরা' নামেও খ্যাত।

উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা-র তানঈম থেকে উমরা আনার সঙ্গে হায়েযের (ঋতুর) ব্যাপারটি সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে এবং পৃথিবীর সকল ঋতুবতী নারীই যার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। আর এ এমনই একটা ব্যাপার যা কোন ক্রমেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সুতরাং বিষয়টির একটি স্পষ্ট ধারণা জরুরী। বুখারী শরীফের 'কিতাবুল মানাসিক' অধ্যায়ে উমরার আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে একটি সর্বস্পর্শী উজ্জ্বল বর্ণনা রয়েছে। ভেবে বিস্মিত হই, দেড় হাজার বছরের প্রাচীন হয়েও কত স্পষ্ট আর আশ্চর্য সংযমে অনবদ্য এই বর্ণনা ! একবার হজযাত্রায় "সারাফ নামক স্থানে উপনীত হলে নবী স তাঁর সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, যার সাথে কুরবানীর জন্তু নেই সে উমরা করতে ভাল মনে করলে উমরা করে নাও। আর যাদের সাথে কুরবানীর জন্তু আছে তারা এরূপ করবে না।" এ সময় হজের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে প্রবেশের পূর্বেই মা আয়েশা রা হায়েযা (ঋতুবতী) হয়ে যান। "এরপর এক সময় নবী স আমার (মা আয়েশা রা) কাছে এলেন, আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কাঁদছ কেন ? আমি বললাম আপনি আপনার সাহাবাদের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন, তা শুনেছি। আমার ত উমরা চলবে না। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম, নামায আদায় করতে পারছি না। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি ত আদমের কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত ছিল তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে। সুতরাং তুমি হজের অবস্থায়ই থাক। খুব সম্ভব আল্লাহ ওটিও (উমরা) তোমাকে দান করবেন।" বুখারী শরীফ।

যে কোন অসতর্ক পাঠকের কাছেও এই বর্ণনার আশ্চর্য সতর্কতা আর বিরল সংযম চোখে পড়বেই। কত সহজ সাবলীল আর স্পষ্ট এই বর্ণনা ! কোন কিছু গোপন নেই, কোন কিছু অস্পষ্ট নেই অথচ আশ্চর্য এক আড়াল রয়েছে।

উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা-র বর্তমান অবস্থার সবটুকু শুনে রসুলুল্লাহ বললেন 'হজের অবস্থায় থাক'—অর্থাৎ তাঁর হজ হবে

কেবল হজের পর যে ফরজ তওয়াফ রয়েছে সেই তওয়াফ করতে পারবেন না, অপবিত্র অবস্থায় কাবা শরীফ তওয়াফ করা যায় না। হজের পর ঋতুর কাল শেষ হয়ে গেলে তওয়াফ করলেই হজের করণীয় সব কিছুই সম্পূর্ণ হবে।

হজযাত্রী অসংখ্য মহিলার মনে এই নিয়ে একটা নিদারুণ সংশয় আর অহেতুক ভয় থাকে, যেন হজে গিয়ে ঋতু হওয়াটা তাঁদেরই অপরাধ। অনেকে আবার অহেতুক ভাবে এমনও ভাবতে শুরু করেন যে তিনি স্বয়ং অপবিত্র আর পাপী বলে হজের দিনে ঋতুবতী হলেন আর আল্লাহ নারাজ হয়ে তাঁর হজ কবুল করলেন না। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, এমনটা বিশ্বাস করা পাপ। হায়েয ত নারীদের স্বাভাবিক ব্যাপার, নির্দিষ্ট সময়ে তা হবেই. এর সঙ্গে অবশ্যই পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নেই। আর বুখারী শরীফের বিশুদ্ধ হাদিস ত আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ভেবে অবাক হই, সেই অন্ধকার যুগেও রসুলুল্লাহ কত সংস্কার মুক্ত কত উদার! যখন ঋতুবতী নারীদের অমঙ্গলের প্রতিক ভেবে ঘর থেকে বহিষ্কার করে কালোত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বাইরে রেখে দেওয়া হত, সেই যুগে পবিত্রতম হজ মৌসুমে তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ 'তুমি ত আদম কন্যাদেরই একজন। তাদের জন্য যা নির্ধারিত ছিল তোমার জন্যও তাই নির্ধারিত আছে।' 'সুতরাং তোমার কোন ক্ষতি নেই। . হজের অবস্থায় থাক।' আল্লাহর নবী ছাড়া কোন মানুষের কণ্ঠেই এই দীপ্ত বাণী ধ্বনিত হতে পারে না।

আবার বলি নির্দিষ্ট হজের দিনে 'অকুফে আরাফাত' অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান বা আরাফাতের ভূমি স্পর্শ করলেই হজ হয়ে যায়। কারও যদি হায়েব হয়, আরাফাতের মহাময়দানে তিনি নির্দ্বিধায় অবস্থান করতে পারেন, এতে তাঁর হজ হয়ে যাবে, কোন ত্রুটি বা পাপ হবে না। আর এই পবিত্র দিনে ঋতু হয়েছে বলে তাঁর বিমর্ষ হবার কোন কারণ নেই, তিনি যেন সকল সময় মনে রাখেন, এটি স্বাভাবিক এবং আল্লাহর বিধান। এতে তাঁর নিজের বা অন্য কোন মানুষের কোন এখতিয়ার নেই।

এই নিয়ে আমার স্ত্রীও দেখেছি বিমর্ষ ছিলেন, তাঁর হিসেব অনুযায়ী হজের কাছাকাছি সময়ে তিনি হায়েযা হবেন। আজ তিন দিন তিনিও নামায আদায় করতে পারছেন না, জবলে রহমতে গিয়েও নামায পড়েন নি। দেখলাম সব জেনে শুনেও তিনি খুব মনমরা হয়েছিলেন অথচ ঠিকমত ভাবে পবিত্র ভাবে হজ সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বর্তমানে অপবিত্র অবস্থায় তিনি খুবই খুশি। সব কিছু পড়ে অবগত হয়েও তাঁর এই বিমর্ষতা আর খুশি হওয়ার পিছনে একমাত্র সংস্কারের পিছুটান ছাড়া অন্য কোন যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। আমার অনুরোধ, কোন পুণ্যাত্মা হজযাত্রী মহিলা যেন সংস্কারে আর না ভোগেন।

উমরা আনার জন্যে, আমিও সবচেয়ে নিকটবর্তী আল উমরা অর্থাৎ তানঈমকে বেছে নিলাম। কাবা শরীফের বাবুল উমরা থেকে তানঈমের বাস ছাড়ে, হাজি সাহেবদের দেখলেই বোঝা যায় সকলেই তানঈমের যাত্রী, কোন কোন সময় আল উমরা বলে ড্রাইভারগণও দু-একবার ডাক দেন। বাসের গায় আরবী এবং ইংরাজিতে নম্বর লেখা থাকে, কোন কোন বাসের শরীরে উভয় ভাষায় র‍্যাডো, সিকো প্রভৃতি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের ফলাও বিজ্ঞাপন জ্বল জ্বল করে। আমি একটি বাসে উঠে পড়লাম।

একতলা এবং দুতলা দুরকম বাসই রয়েছে। দূর পাল্লার দুরন্ত গতিসম্পন্ন বাসগুলির অধিকাংশই এয়ার কণ্ডিশণ্ড—তাপ নিয়ন্ত্রিত, এ ধরনের একটি বাসে আমরা মদিনায় গিয়েছিলাম। প্রতিটি বাস দামী, বিদেশী ত বটেই। দৈর্ঘে আমাদের সরকারি বাসগুলির চেয়ে কিছু বড়ই হবে মনে হয়। লাইনে দাঁড়ান প্রতিটি বাস ধোয়া-মোছা ঝকঝকে তকতকে, স্টার্টারের নির্দেশ পেলেই হু হু করে বেরিয়ে যায়। দরজা তিনটা—সামনে, মাঝে এবং পিছনে। যে কোন দরজা দিয়ে ওঠা যায় তবে পিছনেরটি মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট। বাসে কোন কণ্ডাক্টর নেই, কোন হেলপার বা সাহায্যকারী নেই কেবল একজন মাত্র ড্রাইভার। সব কিছুই অটোমেটিক, তাঁর সামনে কয়েকটি পুস বোতাম আছে, সেগুলি টিপে তিনি দরজা খোলেন, বন্ধ করেন।

সামনের গেটে তাঁর পাশেই রয়েছে একটি বাক্স, যাঁরা সামনের গেট দিয়ে উঠছেন, তাঁরা তাতে প্রয়োজনীয় ভাড়া ফেলে ড্রাইভারের কাছ থেকে টিকিট নিচ্ছেন, যাঁরা মাঝের দরজা দিয়ে উঠেছেন তাঁরা পরে এসে ভাড়া ফেলে টিকিট সংগ্রহ করছেন, তাও অসুবিধা থাকলে নামার সময় ভাড়া মিটিয়ে টিকিট নিচ্ছেন। কোন চেকার নেই। সৌদি আরবের মানুষের বিশ্বস্ততা এখন বিশ্বের বিস্ময়। আগে এই জিনিষটি ছিল ইংরেজদের মধ্যে—এখন তাঁরা তা হারিয়েছেন, আমেরিকায় ত খুন-জখম লুট-পাট নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আর আমাদের দেশ ? হায়রে !

সমগ্র বাসটির এক চতুর্থাংশের মত জায়গা কাঠ এবং তারের জালের পার্টিশান দিয়ে পিছনের দিকে পৃথক করে মহিলাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। যে কোন মহিলা নামার জন্যে গেটে এসে দাঁড়ালেই ড্রাইভার দেখতে পান এবং পরবর্তী স্টপেজে বাস থামিয়ে দরজা খুলে দেন, যাত্রীর ওঠানামা শেষ হয়ে গেলে অটোমেটিক দরজা আবাব বন্ধ হয়ে যায় যথারীতি। মহিলাদের জন্যও চিঠি ডাকে দেবার মত পৃথক বাক্স আছে তাঁদের অংশে, সকলেই যে যার টিকিটের মূল্য দিয়ে দেন তাতে। কেউ ফাঁকি দেন না। আসলে মানুষকে সৎ হবার সুযোগ দিলে সে সৎ হয়। কিন্তু আমাদের দেশে সৎ হবার সুযোগ নেই। ঈর্ষায় অবিশ্বাসে হিংসোন্মাদনায় আমরা সততার মূলকে জ্বালিয়ে দিয়েছি।

সৌদি আরবে কোথাও আমি এই অবিশ্বাস জিনিষটি লক্ষ্য করিনি। শুনেছি পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এখানকার অনেক মানুষ এতখানি উন্নত চরিত্রের ছিলেন না, হাজিদের জিনিষপত্র পথেঘাটে আকসার লুট হত, কিন্তু এখন আমূল পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে সৌদি আরব পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে খুন-জখম, চুরিডাকাতি মদ্যপান ব্যাভিচার প্রভৃতি জঘন্য অপরাধগুলি সবচেয়ে কম, এত কম যে সেগুলিকে একেবারেই 'নগণ্য মনে করা যেতে পারে। জাতীয় চরিত্রের এই অসাধারণ উৎকর্ষতার জন্যে আজ সৌদিরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্রুত বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠছেন। উৎকর্ষতা বজায়

থাকলে উন্নতিও স্থায়ী হবে, অন্যথায় পতন অনিবার্য।

একজন মাত্র ড্রাইভার—এত বড় বিশাল একটি যাত্রীবহুল বাসকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, দরজা খুলছেন, যাত্রী নামাচ্ছেন এবং সুশৃংখলভাবে তুলছেন, দরজা বন্ধ করছেন, টিকিট কাটছেন, আবার বাস চালিয়ে গন্তব্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। কোন কথা নেই বার্তা নেই ঝগড়া নেই ফ্যাসাদ নেই—এক মিনিট লেটও নেই। একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় কাজ হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা এত সব কর্তব্যের বিনিময়ে কোন বস্তা পচা ঝাঁজাল অহেতুক অভিযোগ নেই। কাজ না করে তারা দাবী আওড়ায় না। সৌদি আরবের বাসে তানঈমে যেতে যেতে আমার কলকাতার কর্তব্যপরায়ণ ড্রাইভার, মহাচরিত্রবান কন্ডাক্টর আর সৎ চেকারদের কথা মনে পড়ল। একটা তার জুড়ে নিলেই অচল বাসটি আবার চালু হয় অথচ ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে নামতে নামতে বললে, ও কাজ আমার নয়—মেকানিক আসুক, ঠিক করুক তবে চলবে। গাড়ি বোঝাই অফিস যাত্রীরা ড্রাইভারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে পথে নামতে বাধ্য হলেন। ভিড়ের মধ্যে অনেক কন্ডাক্টরকে দেখেছি গাড়ির মধ্যে এক নিরাপদ জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে, মাস গেলে মাইনে পাবার নিশ্চয়তা তো তাঁর আছেই, সুতরাং যাত্রীদের টিকিট কাটার কষ্ট সহ্য করে তিনি কেন সরকারী তহবিল বাড়াতে যাবেন ! এঁদের চেক করতে সরকারকে নিযুক্ত করতে হয় চেকার, সেই চেকারগণ ঠিক মত কাজ করছেন কিনা তা দেখার জন্যে আবার চেকার। আর ট্রেনের চেকারদের পবিত্র আর নিষ্পাপ ক্রিয়াকলাপ ত কারো অজানা নেই। অর্থাৎ পুরো দেশটাই ধীরে ধীরে চোর তৈরির আখড়ায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। জাতীয় চরিত্রের এই আশ্চর্য অলৌকিক উন্নতির জন্য আমাদের নীট ফল দাঁড়াল : ইস্পাতে লোকসান, ট্রেনে লোকসান, কাগজ কলে লোকসান, ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে লোকসান, বাস-ট্রাম ইত্যাকার ব্যাপারগুলি ত ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না। অথচ সৌদি আরবের "Saudi Public Transport Company" নামে বাসের ব্যবসাটির একটি বছরের ১৪০১-১৪০২ হিজরী

মোতাবেক ১৯৩০-৩২ সাল (আমাদের হজের বছরটি) হিসাব দেখলেই আপনারা এর বিপরীত এক উজ্জ্বল চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হবেন ঃ

এখানে বাসের ব্যবসা খুব বেশি দিনের নয়, ১৯৩০-তে সম্ভবতঃ এ ব্যবসার বয়স ছিল মাত্র চার বছর। এটি একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানী যার প্রধান কার্যালয় রাজধানী রিয়াদে। অথরাইজড মূলধন ১০০০ মিলিয়ন রিয়াল, আদায়কৃত মূলধন ৯৯৭৫২৯৪৮৫ রিয়াল। যে বছরের হিসাব দিচ্ছি (১৯৩০-৩২) সে বছরে সব রকম মিটিয়ে মোট বাসের সংখ্যা ১১১০, কর্মচারীর সংখ্যা ৪৮৪৫, এর মধ্যে ক্লিনার ড্রাইভার ঝাড়ুদার ইঞ্জিনিয়ার মেকানিক ওয়ার্কসপের কর্মচারী পেট্রল সংক্রান্ত লোকজন অফিসার ক্লার্ক স্টার্টার একাউন্টেন্ট টাইপিস্ট প্রভৃতি যত রকম লোকজনের প্রয়োজন সকলেই আছেন। আমাদের এখানে বাসপ্রতি যেখানে প্রায় কুড়ি জন কর্মচারী, সৌদিতে সেখানে মাত্র চারজন। এই কুড়ি জন এত মহান উদ্যমে কাজ করেন যে বেলা দুটোর মধ্যে তাঁরা সমূহ কর্তব্য সম্পন্ন করে গৃহের পথ ধরেন। ফলে প্রায় চল্লিশ ভাগ বাস ডিপো থেকে বার হয় না, যে ষাট ভাগ বাস বার হয় তার মধ্যে পঁচিশ ভাগ রাস্তার পাশে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে, অবশিষ্ট ভাঙাচোরা অপরিচ্ছন্ন বাসগুলি কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। ধোয়া-মোছা সারাই মেরামত এসব যেন স্বপ্নের ব্যাপার। অথচ একটি বাসের পিছনে কুড়ি জন ! আর এই কুড়ি জনই কর্তব্যের প্রতি নয়, আপন দাবির প্রতি আশ্চর্যভাবে সচেতন ! সৌদি আরবে পথে কোন বাস খারাপ হয় না, হলে ওয়ার্কশপের ম্যানেজার ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চলেও যায়। সকলেই যে যার কর্তব্যে এমন সচেতন যে পান থেকে চুণ খসার উপায় নেই। আর এই কর্তব্যবোধের জন্য চারজন লোক আর একটি বাস সোনা ফলিয়ে দিচ্ছে। আয়-ব্যয়ের হিসাব দেবার আগে দেশভিত্তিক ৪৮৪৫ জন কর্মচারীর তালিকাটি দিয়ে নিই। বিভিন্ন দেশ থেকে নেওয়া কর্মচারীর হিসাবটি এই রকমঃ বাংলাদেশ ৫০, সোমালিয়া ৫৬,

কেনিয়া ৬৪, ইংল্যান্ড ৬৭, আমেরিকা ৯০, ভারত ১৩৪, অন্যান্য ২১৪, মিশর ২১০, ইয়েমেন ২৪৫, পাকিস্তান ২৪৯, থাইল্যান্ড ৩৫০, ফিলিপাইনস ৫৪৪, ইন্দোনেশিয়া ৫৫৬, সুদান ৭৬৮, কিংডম অব সৌদি এ্যারাবিয়া ১২৩৮।

আর্থিক অবস্থাটি জানার জন্যে আমরা সকলে খুবই উদ্‌গ্রীব, আর সর্বস্তরে লোকসানের মোকাবিলা করে এই জানার আগ্রহটি আমাদের মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। আমরা ত কোন সরকারী কাজে কখনও কোন লাভের মুখ দেখি না। সততা আর কর্মতৎপরতার গুণে ১৯৩০-৩২ সালে যেখানে মোট আয় হয়েছে ১৫৩,৭৬৩,০০০ রিয়াল ১৯৩০-৩২ সালে সেখানে মোট আয়ের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ২২৬,৮০৩,০০০ রিয়াল অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এই আয়ের বৃদ্ধি শতকরা ৪৭ ভাগ। বিশ্বস্ততা আর জাতীয় চরিত্র একটি দেশকে কোথায় পৌঁছে দিতে পারে!

যাক, হিসাব-নিকাশের পর্ব এখানে শেষ হোক। কাবার পথে-র পাঠকদের আর এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা তাঁরা রিয়াল উপার্জন করতে যাবেন না কেউ।

বাসে করে আমি চলছিলাম তানঈমের পথে।

ব্যথিত চিত্তে মা আয়েশা রা রসুলুল্লাহর কাছে অশ্রুপাত করে বলেছিলেন, আমি উমরা করতে পারছি না।

ঋতুর কাল শেষ হলে আল্লাহর রসুল তাঁকে নির্দেশ দিলেনঃ "তানঈম থেকে উমরা আদায় করে নাও"— বুখারী। এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা-র ভাই হযরত আবদুল রহমান রা-কে তাঁর বোনের সঙ্গে তানঈমে যেতে বললেন। অবশেষে উমরা সম্পূর্ণ করে তাঁরা উভয়ে ফিরে এলেন। বুখারী শরীফে মা আয়েশা রা বলেনঃ "আমরা সারা রাত পথ চলে ভোরের আলো-আঁধারীতে তাঁর (নবী স) সাক্ষাত পেলাম।"

উমরা আদায়ের জন্য সেই ঐতিহাসিক তানঈমে চলেছি আমি। অল্প কিছু চলার পরই পবিত্র মক্কার ঘন বসতি পার হয়ে এলাম। এদিকে আধুনিক শহর গড়ে উঠছে, মাঝে মাঝে প্রান্তর। আগে

এসব জায়গা ধু-ধু করত, মরুর তপ্ত হাওয়ারা ঘুরে বেড়াত দাপটে— যেমন ঘুরে বেড়াত উদ্ধত কুরেশরা। দু-একটা প্রান্তর পার হতেই হঠাৎ আমার মনে হল ঃ এখানে কোথাও এই প্রান্তরগুলির একটিতে, অনেকের মতে তানঈমেই, ঘটেছিল সেই অশ্রুসজল ঘটনা, বেদনার মর্মরে মহিয়ান সেই গরিমাদীপ্ত আত্মত্যাগ, যা ইসলামের ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠাকে আলোকিত করে রেখেছে।

দিনের পর দিন কঠিন আক্রোশে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত কুরেশরা ধেয়ে আসছে মদিনার দিকে, দ্বিতীয় হিজরীতে ঘটে গেল ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ, রক্তাক্ত ওহোদ যুদ্ধ শেষ হল তৃতীয় হিজরীতে, মাঝে বহুতর ক্ষুদ্র আক্রমণের মোকাবিলায় জিহাদে নামতে হল মুসলমানদের। সুতরাং বঙ্কিমগতি ক্রুর সরীসৃপকে বিশ্বাস নেই। চতুর্থ হিজরীতে রসুলুল্লাহ দশ জনের একটি অনুসন্ধানী আর পর্যবেক্ষক দল গঠন করে মক্কা আর মদিনার মঞ্জিল ও চৌকিগুলির খবরাখবর সংগ্রহ করে তাঁকে নিয়মিত অবগত করানোর জন্যে পাঠালেন। এই দলের নেতা নির্বাচিত হলেন আসেম ইবনে সাবেত আনছারী। এরপর বুখারী শরীফে পাই ঃ "তারা রওনা হয়ে উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী রোজী নামক স্থানে পৌঁছালে হুযায়েল গোত্রের একটি শাখা (বিশ্বাসঘাতকতা করে) বনী লেহইয়ানকে তাদের আগমণের কথা জানিয়ে দিলে। বনী লেহইয়ান গোত্র প্রায় এক শ জন তীর নিক্ষেপকারীর একটি দলকে আক্রমণের জন্য তাদের পিছনে লাগিয়ে দিল। দলটি তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে এমন এক স্থানে গিয়ে পৌঁছাল যেখানে বসে তারা (মুসলমানেরা) খেজুর খেয়েছে। তারা সেখানে খেজুরের আঁটি দেখতে পেল যা অনুসন্ধানীদল মদিনা থেকে সঙ্গে এনেছিল। তারা বুঝতে পারল যে এগুলি ইয়াসরিবের (মদিনার) খেজুরের আঁটি (মদিনার খেজুরের আঁটি খুবই ছোট হয়)। তাই পদচিহ্ন ধরে তাদের খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত সন্ধান পেয়ে গেল। আসেম এবং তাঁর সঙ্গীগণ ঘটনাটা বুঝতে পারলেন এবং কোন উপায়ান্ত না দেখে একটি টিলার উপর উঠে আশ্রয় নিলেন। এবার শত্রুদল এসে তাদের ঘিরে

ফেলল।...তারপর তিনি (এই গুরুতর পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছে অশ্রুসজল ফরিয়াদ করে) বললেন ঃ "হে আল্লাহ ! আমাদের এ সংবাদ আপনার রসূলকে জানিয়ে দিন।" দশজন বীর মুসলমান তখন মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে. তবু তাঁরা নির্ভয়। পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে নির্ভিক চিত্তে তাঁরা আল্লাহর নাম স্মরণ করছিলেন। নিচে থেকে অবিশ্বাসীর দল বললে, তোমরা নেমে এস—আমরা কাউকে বন্দী করব না, কাউকে হত্যাও করব না, নির্ভয়ে নেমে এস। কিন্তু অবিশ্বাসীদের ছলাকলা সম্পর্কে মুসলমানেরা পূর্ণ অবহিত ছিলেন। উত্তরে নেতা আসেম বললেন, তোমাদের নিরাপত্তায় আমরা আশ্বস্ত নই, তোমাদের মুখ কখনও সত্য কথা বলে না। তখনই শুরু হল তীর নিক্ষেপ। এক শ তীর নিক্ষেপকারীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছিল আরো এক শ পদাতিক। তাদের হিংস্রতা, আস্ফালন ও আক্রমণ বহুগুণ বেড়ে গেল। মুসলমানেরা উপলব্ধি করেছিলেন এই অসম প্রতিরোধ অধিকক্ষণ চলতে পারে না, মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু যখন নিশ্চিত, পর্বত শিখরে ভীত মেষের মত তাকে আলিঙ্গন করব কেন ? তাঁরা তরবারি উন্মুক্ত করে এক সঙ্গে শিখর দেশ থেকে প্রবলবেগে নিম্নে ধেয়ে এলেন, সম্মুখে যতগুলি অবিশ্বাসী পড়েছিল তাদের নিষ্প্রাণ দেহ ভূলুণ্ঠিত হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাত জন মুসলমানের দেহ তীর বৃষ্টিতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা কলেমা শাহাদাৎ উচ্চারণ করতে করতে জান্নাতলোকে চলে গেলেন। তিনজন আহত হয়েছিলেন গুরুতর —খুবায়েব ইবনে আদি, যায়েদ ইবনুদ্দাসেনা আর আবদুল্লাহ ইবনে তারেক, কৌশলে এঁদের বন্দী করা হয়েছিল। অসহযোগিতামূলক ব্যবহারের জন্য আবদুল্লাহকে সেখানেই হত্যা করা হয় আর অন্য দুজনকে নিয়ে গিয়ে অবিশ্বাসীরা বিক্রী করে দেয় মক্কায়। হযরত খুবায়েব বদরযুদ্ধে হত্যা করেছিলেন হারেস ইবনে নওফেলকে, তাই হারেসের পুত্ররা পিতৃহত্যার চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মহাড়ম্বরে হযরত খুবায়েব রা-কে ক্রয় করে নিল। আর হযরত যায়েদ রা-কে খরিদ করল এই গোত্রের সাফওয়ান ইবনে

উমাইয়া। কয়েকদিন ক্রীড়াকৌতুক যন্ত্রণা-কটূক্তির বিষে জর্জরিত করে অবশেষে তাঁদের হত্যার দিন সাড়ম্বরে ঘোষণা করল কুরেশ দলপতিরা। উন্মাদনায় অস্থির হয়ে উঠল মক্কার আকাশ-বাতাস, আবালবৃদ্ধবণিতারা হঠাৎ খুশির প্রচণ্ডতায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ল, এমন উন্মত্ত হল যে খাওয়া-দাওয়া ভুলে যাওয়ার উপক্রম। অথচ যাদের হত্যার জন্য এই উন্মত্ততা, সর্বত্যাগী সেই দুই মুসলমান আল্লাহর উপর প্রগাঢ় বিশ্বাসে অবিচল। তাঁদের কাছে এই মৃত্যু যেন বড় সাধের, বড় আনন্দের। বড় বাঞ্ছিত এই মৃত্যু! আপন প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে তাঁদের হৃদয় মন ব্যাকুল। কিন্তু অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় প্রভুর সান্নিধ্যে যাবেন কি করে! উভয়েই লক্ষ্য করলেন সুদীর্ঘ বন্দীজীবনে তাঁদের নখ-চুল অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। হারেসের এক কন্যার নিকট থেকে ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করার জন্যে হযরত যায়েদ রা একটি ক্ষুর চেয়ে নিয়ে উভয়ে চুল-নখ কেটে অস্বস্তি দূর করে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠলেন। নির্দিষ্ট দিনে হেরেমের সীমানার বাইরে বধ্যভূমিতে (সম্ভবতঃ তানঈমে) নিয়ে এল যায়েদকে, সঙ্গে এল উল্লসিত জনতা—আবালবৃদ্ধবণিতা, চোখে মুখে এক পৈশাচিক উল্লাস, হোবলের শত্রুকে হত্যা করা হবে আজ, টুকরো টুকরো করা হবে, দেখা যাক কে তাকে রক্ষা করে। এই মহা তামাশা দেখার জন্যে কুরেশদের তাবৎ নেতারা এসে হাজির হল ময়দানে, সদ্য ওহোদ যুদ্ধে বিজয়ী গর্বোদ্ধত সর্দার আবু সুফিয়ানও এল যথাসময়। হত্যার জন্য হাত-পা বাঁধা হল হযরত যায়েদ রা-র, উন্মুক্ত খরশান তরবারি মরুর রৌদ্রে আন্দোলিত করে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ক্রীতদাস ঘাতক নাস্তাস এগিয়ে এল এমন সময় কাছে খুব কাছে সরে এল আবু সুফিয়ান। বললে, খুব নম্র কণ্ঠেই বললে, আচ্ছা বলত যায়েদ—তোমার মুক্তির বিনিময়ে যদি মুহম্মদকে ধরে এনে এই যূপকাষ্ঠে হত্যা করা হয় তা হলে কি তুমি খুশি হও না? কথা সমাপ্ত হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন যায়েদ, এক আকাশ বজ্রের হুঙ্কার তাঁর কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এল, খবরদার—অপবিত্র ভাবে ও নাম উচ্চারণ

করো না। একটু থামলেন তিনি, প্রবল ক্রোধে আর উত্তেজনাকে কিছুটা যেন সংযত করলেন, রসুল-প্রেমে নির্ভিক যায়েদ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, জেনে রাখ তাঁকে হত্যা ত দূরের কথা—আমার জীবনের বিনিময়ে রসুলুল্লাহর পায়ে একটি কাঁটাও ফুটতে দেব না। সে নির্ভয় উদাত্ত কণ্ঠ মরুর বাতাসে দোল খেয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল কুরেশ নেতারা, আবু সুফিয়ানও। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও আপন নেতার প্রতি এ কি সীমাহীন শ্রদ্ধা! এ কি অবিচল ভক্তি!! এ কি নিবিড়তম আত্মনিবেদন!!! আবু সুফিয়ানের কণ্ঠে এখন ভোরের আদিগন্ত সাগরের বিস্ময়। সেই ঘোর লাগা স্বরে, যেন আর এক মানুষের গলায় সে উচ্চারণ করল, সত্যিই মুহম্মদের ভক্তরা তাকে যেভাবে শ্রদ্ধা করে ভালবাসে—নিখিল বিশ্বে কোথাও তার তুলনা নেই।

ঘাতক নাস্তাস এসে হযরত যায়েদ রা-র শির দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল। মরুর মৃত্তিকা স্পর্শ করল যায়েদের শির, কিন্তু সে মুখে তখনও তৌহিদের উচ্চরণ! কুরেশ নরনারীগণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্রাণভরে যখন হাসার কথা, তারা হাসতে ভুলে গেল। বধ্যভূমিতে নেমে এল এক ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা!

সত্য কখনও বৃথা যায় না। হযরত যায়েদ রা প্রাণ দিয়ে সকল প্রাণকে দুলিয়ে গেলেন।

হারেস ইবনে নওফেলের পুত্রদের সব ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হয়ে ঘুরছিল হযরত খুবায়েব রা-র উপর। তাঁকে নিষ্ঠুরতম যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুর নানান ফন্দি-ফিকির আঁটছিল তারা। তাঁর সেই নৃশংস হত্যাদৃশ্য দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সকলেই যেন ব্যাকুল। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

হারেসের এক কন্যার শিশু সন্তান একদিন হযরত খুবায়েব রা-র কাছে গেলে তিনি তাকে অত্যন্ত আদর করে কোলে তুলে নিলেন। ঘটনাচক্রে তাঁর হাতে তখন সেই ক্ষুরটি ছিল। শিশুর মাতা অকস্মাৎ বাইরে এসে উন্মুক্ত ক্ষুর হস্তে খুবায়েবকে দেখে

মারাত্মক এক ভ্রান্ত ধারণা করল। হযরত খুবায়েব রা বললেন, আমি এই শিশুকে হত্যা করব এ ধারণা আপনার কি করে হল। আমি ও ধরনের লোক নই। হারেসের পুত্ররা বেরিয়ে এল হৈ চৈ করে। বললে, এ পাপকে আর ঘরে রাখব না। মক্কার সীমানার বাইরে তানঈমের প্রান্তরে ক্রুশ স্থাপিত হল। পশুরা শৃঙ্খলে বন্ধ হযরত খুবায়েব রা-কে জন্তুর মত টানতে টানতে নিয়ে চলল বধ্যভূমিতে। হযরত খুবায়েব রা স্পষ্ট উচ্চারণে পড়ছিলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—তাঁর কথায় কোন জড়তা ছিল না, তিনি চলছিলেন —সে চলা ভয়ে শিথিল নয় বরং প্রভুর মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, তাঁর চোখে ছিল দৃষ্টি—সে দৃষ্টি পরাজিতের ভীরুতায় কম্পিত নয়, বরং সেখানে ছিল এক অনাবিল স্নিগ্ধতা। আর তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল যেন এক অলৌকিক জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। তাঁর সঙ্গে চলছিল অসংখ্য নরনারী, এই হত্যালীলা উপভোগের জন্য আজ কেবল কুরেশ সরদারগণই আসেনি—সঙ্গে এনেছে তাদের স্ত্রীদের। হযরত খুবায়েব রা কে যখন আনা হল, বধ্যভূমিতে তিল ধারনের স্থান নেই। একটা ভয়ঙ্কর উন্মত্ত উল্লাস যেন মরুর প্রান্তরকে কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর করে তুলল। অথচ হযরত খুবায়েব রা-র সমগ্র অবয়বে নূরের তাজাল্লি, ঈমানের দীপ্তালোক খেলা করে বেড়াচ্ছিল। তিনি তখন প্রশান্ত মুখে কলেমা শাহাদাত পাঠ করছিলেন। নির্দিষ্ট ভূমিতে উপস্থিত হয়েই তিনি বললেন ঃ আমার শুধু একটি আরজি, এই শেষ মুহূর্তে তোমরা আমাকে দু রাকাত নামায পড়তে দেবে কি ? আমি প্রাণভরে আমার প্রভুকে স্মরণ করতে চাই। অবিশ্বাসীর দল সম্মত হলে তিনি ক্রুশের পাশেই হাজার হাজার কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নামাযে ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। নিশ্চল স্থির এবং শান্ত ভাব। পরম প্রভুর সঙ্গে তিনি যেন সমর্পিত হয়ে গেলেন। এর পর থেকেই মৃত্যু দণ্ডিত আসামীদের মৃত্যু কার্যকর করার পূর্বে দু রাকাত নামায পড়ার প্রথা চালু হয়ে গেছে। নামায সমাপ্ত হলে হযরত খুবায়েব রা বললেন, মৃত্যুভয়ে নামাযকে দীর্ঘায়িত করছি এমন ভাবতে পার ভেবেই আমি নামাযকে সংক্ষিপ্ত করলাম, অন্যথায় আমি

দীর্ঘতর সময় ধরে নামাযে রত থাকতাম। একটু থেমে আল্লাহর নাম নিয়ে হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, এখন আমি প্রস্তুত—

হারেসের পুত্ররা তাঁকে নিষ্ঠুর ভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে ক্রুশের কাঠের সঙ্গে পেরেক জাতীয় জিনিষ দিয়ে বিন্ধ করে দিল, তার উপর বাঁধন দিল শক্ত করে। এসব প্রাথমিক কাজ সম্পূর্ণ হলে অসংখ্য কৌতূহলী মানুষের সম্মুখে বীরদর্পে এগিয়ে এল এক কুরেশ নেতা। ক্রুশবিন্ধ যন্ত্রণাকাতর হযরত খুবায়েব রা-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আর কেউ রক্ষে করবে না তোমাকে, কোন উপায় নেই আর। তবে হ্যাঁ—বলে ব্যঙ্গের হাসি হাসল সেই নরপিশাচ, তারপর বললে, তবে হ্যাঁ মুহম্মদের ধর্ম ত্যাগ করলে রক্ষা পেতে পার, এখুনি আমরা মুক্ত করে দেব তোমাকে। কথা শুনে অসম্ভব একটা ব্যঙ্গ আর ঘৃণা ফুটে উঠল হযরত খুবায়েব রা-র মুখে, তিনি উত্তরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চারণ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কুরেশ নেতারা হতবাক হল ক্ষণিক, তারা ভেবে পেল না এই অপরিসীম মনোবল এই লোকগুলি পায় কোত্থেকে! তারপর তাদের ইংগিতে এগিয়ে এল একপাল নরপশু, শুরু হল বর্শা বল্লম আর তরবারির অগ্রভাগ দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে খোঁচা দেওয়া এবং বর্বরোচিত আনন্দে ফেটে পড়া। কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর একজন ছুটে এসে শরীরের এক স্থান থেকে কিছু গোশ্ত কেটে নিয়ে চলে গেল, তারপর আর একজন, আরো একজন, আরো এবং আরো...। কোন রকমে জীবিত রেখে দেহকে টুকরো টুকরো করে ফেলার এক নারকীয় তাণ্ডব চলল বহুক্ষণ ধরে। এ সময় ঈমানে অটল হযরত খুবায়েব রা যে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন তাতে তাঁর সমসাময়িক মনোভাব আর যন্ত্রণা-কাতর মৃত্যুর চিত্র অসাধারণ হয়ে ফুটেছে, সমগ্র আরবী সাহিত্যেও কবিতাটি অবিস্মরণীয়। সমকালীন আরবের প্রতিটি মুসলমান এ কবিতা আবৃত্তি করে অশ্রুপাত করতেন। বুখারী শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে কবিতাটি। এই মর্মস্পর্শী হৃদয়বিদারক গাথাটির সম্পূর্ণ অনুবাদ এই ঃ

"তারা আমার চারদিকে দলে দলে সমবেত হয়েছে, সকল গোত্রের লোককে ডেকে এনে খুব সমারোহ করছে।

"তারা সকলেই বিষোদগার করছে, সবাই আমার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত, আর আমি এই বধ্যভূমিতে বন্দী হয়ে আছি।

"তারা তাদের স্ত্রী আর পুত্রকন্যাদেরও ডেকে এনেছে, আর আমি দৃঢ় ও উচ্চ ক্রুশে নীত হয়েছি।

"তারা আমাকে বলছে—ধর্ম ত্যাগ করলে মুক্তি পাবে কিন্তু মরণ যে তা অপেক্ষা অনেক সহজ, আমার চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে কিন্তু তাতে কাপুরুষতার কলঙ্ক নেই।

"আল্লাহ আমাকে এই বিপদে ধৈর্যদান করেছেন, দেখ তারা টুকরো টুকরো করা আমার গোশ্‌ত নিচ্ছে, আমার জীবন-প্রদীপ নিভে আসছে।

"যখন মুসলমান রূপে মরতে পারছি তখন যেরূপ অবস্থায় মৃত্যু হোক তাতে আমার চিন্তা নেই।

"আর প্রকৃত কল্যাণ প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে, তিনি ইচ্ছা করলে আমার দেহের প্রত্যেকটি কাটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাঁর আশীর্বাদ লাভ করবে।"

যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, সমানে কলেমা শাহাদাত উচ্চারণ করে গেলেন হযরত খুবায়েব রা। আঘাতের পর আঘাতে তাঁর কণ্ঠ ক্ষীণতর হয়ে এল, সেই মৃতপ্রায় দেহে শেষ আঘাত হানার জন্যে এগিয়ে এল উকবা ইবনে হারেস। এভাবে নিষ্ঠুরতম পীড়নে ঈমানে বলীয়ান এক জিন্দাদিল মুসলমানের কণ্ঠ চিরদিনের জন্য মরুর ধূলিতে নীরব হয়ে গেল।

অবশ্য হযরত যায়েদ রা-র এবং হযরত খুবায়েব রা-র এই অতুলনীয় আত্মত্যাগ বৃথায় যায় নি। হত্যাকারী উকবা ইবনে হারেস, ক্ষুর প্রদানকারী হারেসের সেই কন্যা এবং হত্যা-দর্শনে সমবেত হওয়া এই হাজার হাজার নরনারীর প্রত্যেকেই পরবর্তী কালে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে ইসলামে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এক প্রাণ নিভে গিয়ে সহস্র প্রাণে তা জ্বলে উঠেছিল।

মৃত্যুতে কিছুই শেষ হয় না। মৃত্যু মানেই নতুন জন্ম ! অথচ মহান বিদ্যাসাগরের দেশ পশ্চিমবঙ্গের শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিকেরা একাধিক গ্রন্থে লিখেছেন এবং যা বর্তমানে এ বঙ্গের হাজার হাজার বিদ্যালয়ে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েরা পড়ছে ঃ "যিশু স্বয়ং তাঁর পরে সেন্ট পিটার, সেন্ট পল প্রভৃতি তাঁর অসংখ্য ভক্ত জীবন দিয়েও দুঃসহ অত্যাচার লাঞ্ছনা বরণ করেই খৃষ্ট ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু মহাম্মদ ও ইসলামের প্রচারকেরা সে পথে যাননি। তাঁরা তরবারি হস্তেই ধর্মপ্রচার করেছিলেন।" হায়রে !

রবীন্দ্রনাথের দেশের এই মহান ঐতিহাসিকেরা কি রাজীর ঘটনা জানেন ? বীরে মাউনার ঘটনা ? হযরত বেলাল রা-র নাম শুনেছেন কি তাঁরা ? হযরত খাববাব ইবনুল আরাত রা, হযরত আম্মার রা, হযরত সামিয়াহ রা, হযরত ইয়াসির রা, হযরত সুহাইর রা, হযরত আবু ফকীহা রা, হযরত লুবাইনা রা, হযরত যুনাইরা রা, হযরত নাহদিয়া রা, হযরত উম্মে আবিস রা, হযরত আবুযর রা, হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রা, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রা এঁদের নাম ? ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা আছে কি এই মহামান্য বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিকদের ? যে দুজন আত্মত্যাগী মহামানবের কথা এই মাত্র আমরা আলোচনা করলাম অন্ততঃ এঁদের সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা উচিত ছিল। তীরবিদ্ধ ওরওয়া, যিনি তায়েফে ইসলামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেলেন রক্তের বিনিময়ে তিনি কে ? যীশুখৃষ্টের আত্মোৎসর্গকে তুচ্ছ করে দেখার কোন কারণ নেই কিন্তু সংখ্যায় তাঁরা মাত্র মুষ্টিমেয় চার বা পাঁচ জন। আমি জানি না ইসলাম সম্পর্কে এই ধরণের একটা অমার্জিত এবং বিজাতীয় ঘৃণ্য এলার্জি আমাদের মহানোদ্ভব ঐতিহাসিকদের মনে কেন বিরাজ করছে। তাঁরা এমনই গভীর মনোনিবেশে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ণ করেছেন যে কোরআন এবং হাদীস শরীফের পার্থক্যটুকুও তাঁদের জ্ঞানগর্বী দৃষ্টির অন্তরালেই রয়ে গেছে !

এই সেই তানঈম ! যার ধূলিতে ইতিহাসের এক সকরুণ অধ্যায়ের বেদনাঘন গুঞ্জরণ !

মিনিট পনের মধ্যে পেঁৗছে গেলাম। সুন্দর ছবির মত সাজান গোছান ছোট্ট জায়গা। ফোয়ারা, ফুলের কেয়ারি, কিছু গাছগাছালি যা মক্কায় দুর্লভ আর আছে ততোধিক সুন্দর একটি মসজিদ। উম্মুল মুমেনিন হযরত আয়েশা রা এখানে এহরাম বেঁধে নামায পড়েছিলেন বলে সেই স্মৃতি সজীব রাখার জন্যে এই মসজিদের নাম রাখা হয়েছে মসজিদে আয়েশা। আমরা ওযু করে ভিতরে গিয়ে এহরামের কাপড় পরে নিলাম, তারপর এই মসজিদে পড়লাম দু রাকাত নামায, নামাযের পর উমরার নিয়েত করে লাব্বায়েক পড়তে পড়তে বেরিয়ে এলাম। আমার উমরা নেওয়া হয়ে গেল। এবার ঐ একই পথে ফিরে যেতে হবে আল মক্কা আল মোকাররমায়, তওয়াফ দু রাকাত ওয়াজে নামায পাঠ এবং সাফা-মারওয়া সায়ী করলে উমরা সম্পূর্ণ হবে।

সারবন্দী বাস দাঁড়িয়েছিল। তালবিয়া পড়তে পড়তে আমি তাদের একটিতে গিয়ে উঠলাম। পড়ন্ত বেলায় মক্কার আকাশ কোমল হয়ে এসেছিল। তখনো রঙের খেলা শুরু হয়নি, কোথাও কোথাও আভাস ফুটছিল তার। দিনের ঔজ্জ্বল্য শেষ হয়ে প্রকৃতিতে বিষণ্ণতা ঝরার ইশারা। সব কিছু ম্লান হয়ে আসছিল ধীরে ধীরে। মহামানব হযরত যায়েদ রা এবং হযরত খুবায়েব রা-র সকরুণ আত্মত্যাগ তখনো আমার চিত্তকে ব্যথাতুর করে রেখেছিল। আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য কি না করেছেন এঁরা ? আর আমরা ? এই সব মহান দৃষ্টান্তের পাশে হঠাৎ যেন নিজেকে তুচ্ছাতি তুচ্ছ মনে হল। সেই প্রান্তরের উপর দিয়ে বাস ছুটে চলছিল। নিজের সীমাহীন ক্ষুদ্রতায় চোখ দুটি ভিজে এল অকস্মাৎ। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে নিবেদন করলাম ঃ প্রভু ! কোন পুণ্য নেই আমার, শুধু পাপ করেছি সারা জীবন—তবু আপনার অনন্ত রহমতের কাঙাল আমি, আমাকে বঞ্চিত করবেন না প্রভু !

১৬.

তানঈম থেকে উমরা নিয়ে যখন কাবায় এসে পৌঁছলাম, হাতে অবশ্যই কিছু সময় ছিল, দৌড় ঝাঁপ করে একটি তওয়াফও হয়ত শেষ করা যেত কিন্তু আমি তা করলাম না। এমন অস্থির পায়চারির মত তওয়াফ করতে আমার মন রাজি হল না। মগরিবের অপেক্ষমান বিশাল কাতারের এক স্থানে বসে গেলাম চুপচাপ। বসে কাবার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। শেষ বিকেলের কমলা-লাল আলো ছিল তখনও। সেই আলোয় আগের দিনের বৃষ্টিধোয়া কালো গেলাফে ঢাকা বিশাল কাবাকে অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে হল। শেষ দিনালোকটুকু খানা-এ কাবার কার্নিশ থেকে হাঁটু দুমড়ে যেন সিজদা নত হয়ে আছে। ডাইরিতে লিখেছি, "আমার সম্মুখে কাবা আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে, চিরকাল যেমন আছে, তেমনি বিস্ময় নিয়ে থাকবেও অনন্তকাল। আজ যখন হেরেম শরীফের এলাকা পেরিয়ে চত্বরে নেমেছি মহিমান্বিত কাবা আপন অপার বিস্ময় নিয়ে আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হায় ! আমি কি দুর্ভাগা —মাত্র কয়েক দিন পর আমাকে এই মহাস্বপ্নের অঙ্গন ছেড়ে চিরদিনের মত চলে যেতে হবে ! ভাবতে পারছি না ! তার চেয়ে আল্লাহ্ যদি আমাকে মহান কাবার ঝাড়ুদার করতেন ! দাল্লারা (ঝাড়ুদারগণ) নিয়মিত ঝাঁট দিতে দিতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে করতে এ পবিত্রতম গৃহকে সামনে রেখে জামাতে দাঁড়াচ্ছেন। এক মুহূর্তের জন্যও আল-হারাম এঁদের দৃষ্টিসীমা থেকে দূরে সরে যায় না। কত সৌভাগ্যবান এঁরা !"

মগরিবের নামাযের পর ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে একটি তওয়াফ করলাম। মাকামে ইবরাহিমের পাশে নামায পড়লাম দু রাকাত, অশ্রুসিক্ত মুনাযাত করলাম তারপর। নামাযের কাতার ছেড়ে নেমে এলাম চত্বরের নিচে—একেবারে জমজম কূপের কাছে। কাঁচ-ঘেরা গভীর কূপ থেকে একটি মোটা পাইপ দিয়ে পানি উত্তোলিত হচ্ছে রাতদিন—অবিরাম। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

প্রাণ ভরে সেই মধুর পানি আকণ্ঠ পান করলাম। দেহ মন সারা শরীর জুড়িয়ে গেল একেবারে। তখনো উমরার আর একটি কাজ বাকি ছিল, সাফা-মারওয়া সাঈ (সায়ী বা দৌড়ান) করা। কিন্তু ঠিক মত সাঈ করতে সময় লাগে প্রায় এক ঘণ্টার মত। এই মুহূর্তে সাঈতে সামিল হলে এশার জামাত পেতে অসুবিধা হবে মনে হল। ঘোড় দৌড়ের মত দৌড়ালে সাঈর কাজ বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটে খতম হতে পারে কিন্তু এখানেও সেই রুচি আর আন্তরিকতার প্রশ্ন। এমন অমৃতকে যার ইচ্ছে সে নাকে মুখে গুঁজে দিক, কিন্তু আমি এ শরাবান তহুরাকে এভাবে পান করতে রাজি নই। প্রতিটি নিশ্বাস দিয়ে, প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে, অনুভূতির প্রতিটি কণা দিয়ে, আত্মার সকল নিবিড়তা দিয়ে সাঈর প্রতিটি পদক্ষেপ আমি উপলব্ধি করতে চাই, অনুভব করতে চাই। সুতরাং আমি দ্রুত সাফা পাহাড়ের দিকে না গিয়ে, এশার নামাযের দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বায়তুল্লাহর অতিনিকটে এক কাতারে একটি জায়গা বেছে নিলাম।

এই ত সেই কাবা ! কত ভাঙা গড়া কত উত্থান পতন ঘটেছে খানা-এ কাবাকে কেন্দ্র করে। ইসলামের কত উজ্জ্বল আর ঐতিহাসিক ঘটনার ধ্রুব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিশাল বায়তুল্লাহ এবং থাকবেও অনন্তকাল।

জমজমের পাশেই দেখা হল লোকটির সঙ্গে হযরত আলির। জীর্ণ বেশবাস, মলিন আর অপরিচ্ছন্ন দেহ। কিছু সময় অনুসন্ধানী আর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে হযরত আলি রা বললেন, আপনাকে ত বিদেশী মনে হচ্ছে। ক্ষীণ কণ্ঠে লোকটি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমি বিদেশী। লোকটির দুরবস্থায় হযরত আলি রা মমতায় ঘনিষ্ঠ হলেন। স্বরে আন্তরিকতার সুধা ঢেলে বললেন, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমার মেহমান হন তা হলে আমি খুব খুশি হই।

বিদেশী লোকটি একেবারেই নিরাশ্রয়। জমজমের পানি পান করে আর কাবার পাশে পড়ে থেকে তাঁর বেদনাদীর্ণ দিনগুলি কেটে

যাচ্ছিল। অযাচিত ভাবে এক রাতের জন্য এরকম একটি নিরাপদ আরামপ্রদ আশ্রয়ের আশ্বাস পেয়ে তিনি আর দ্বিরুক্তি করলেন না, বিনাবাক্যে সেই রাতের জন্য হযরত আলির সঙ্গে তাঁর আশ্রয়ে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু রাতে সংকোচ ও দ্বিধা বশতঃ কেউ কাউকে কোন কথাই জিজ্ঞেস করলেন না। হযরত আলি রা ভাবলেন, বেশি কিছু জিজ্ঞেস করলে লোকটি অন্য কিছু মনে করতে পারেন আর বিদেশী ভাবলেন, এই অচেনা যুবকটির কাছে তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করলে হয়ত অধিকতর কোন অকল্যাণ ঘটে যেতে পারে। সুতরাং রাতটা নিশ্চুপে কেটে গেল। সকালে শয্যা ত্যাগ করে বিদেশী চলে গেলেন। পরের দিনও সন্ধ্যায় ফেরার পথে হযরত আলি রা দেখলেন সেই লোকটি অধিকতর মলিন অবস্থায় সেই জমজম কূপের পাশে তেমনি পড়ে আছেন। দ্বিতীয় দিনও হযরত আলি রা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে আবার নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। কিন্তু এদিনও কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কোন কথাবার্তা বললেন না। কোন ক্রমে রাতটুকু কাটিয়ে পূর্বের মত লোকটি আবার চলে এলেন কাবা শরীফে। এখানে এসে ব্যাকুল ভাবে তিনি যেন কাকে খুঁজতে থাকেন, ভিড়ের মধ্যে তিনি যেন কোন বিশেষ এক বাঞ্ছিত ব্যক্তিকে অন্বেষণ করে ফেরেন। তাঁর চোখ দুটি ব্যাকুল হয় কিন্তু মুখে কাউকে কিছু বলেন না, বলতে পারেন না। তৃতীয় দিনেও হযরত আলি রা লোকটিকে জমজম কূপের পাশে ঠিক আগের মত জীর্ণ আর মলিন অবস্থায় দেখে অত্যন্ত বেদনাবোধ করলেন। আজ তিনি রৌদ্র-ছায়ার পাশাপাশি অবস্থানের মত অতি ঘনিষ্ঠ হলেন লোকটির। বললেন, আপনি কি আজো আপনার গন্তব্য খুঁজে পান নি ? বিষণ্ণ কণ্ঠে বিদেশী উত্তর দিলেন, না। হযরত আলি রা আপনজনের মত আন্তরিক কণ্ঠে শুধালেন, আচ্ছা ঠিক করে বলুন ত আপনি কে, কেন এসেছেন আর কোথায় যেতে চান ? উত্তর দিতে গিয়ে বিদেশী বেশ কিছুক্ষণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইলেন হযরত আলি রা-র মুখের দিকে। মুখমণ্ডলের পবিত্রতায় কিছুটা নিশ্চয়তা উপলব্ধি করে ধীরে ধীরে বললেন,

আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, এ কথা আর কারও কাছে বলবেন না। হযরত আলি রা বললেন, প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন ছিল না, কেননা আমরা মিছে কথা বলাকে ঘৃণা করি—আমাদের মুখের কথাই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমরা কখনও কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি না। তবুও যেহেতু আপনি বিদেশী, আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য প্রতিজ্ঞা করলাম, আপনি এখন নির্ভয়ে আপনার কথা বলতে পারেন। বিদেশী আত্মপরিচয় দিতে শুরু করলেন ঃ

আমার নাম আবু যার গিফারী, প্রসিদ্ধ গিফার গোত্রে আমার জন্ম। আমি শুনেছিলাম মক্কায় এক ব্যক্তি মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী এবং তিনি নিজেকে আল্লাহর রসুল বলে দাবী করেন। এই ব্যক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহের জন্যে আমি আমার ছোট ভাই আনিসকে মক্কায় পাঠিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ঃ সেই লোকের কাছে যাও যাঁর কাছে আকাশ থেকে খবর আসে এবং তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জেনে এস। সে ফিরে গিয়ে যে সংবাদ দিলে তাতে বিশেষ খুশি হতে পারি নি। তাই কিছু খাদ্য আর একটা লাঠি সম্বল করে নিজেই চলে এসেছি মক্কায়। আমি সেই মহামানবের সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আর এ জন্যেই কয়েকমাস এখানে পড়ে আছি ! সঙ্গের খাবার অনেক দিন ফুরিয়ে গেছে, আজ এক মাস হল কেবল জমজমের পানি সম্বল করে বেঁচে আছি। এদিকে রোজই ভাবি কাবাতেই তাঁর দেখা পাব, ভয়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারি না। এখানে ত দেখছি সকলেই তাঁর শত্রু, এখন আপনি যদি দয়া করে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন—

এর পরের ঘটনা সহি বোখারী শরীফ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি ঃ ''তখন হযরত আলি বললেন, আপনি সঠিক পথে চালিত হয়েছেন। আমার মুখ তাঁরই দিকে (আমি হযরতের কাছে যাব)। অতএব আপনি আমার অনুসরণ করুন, আমি যেখানে প্রবেশ করব আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন। আর (পথিমধ্যে) আপনার জন্য (ক্ষতিকর) এমন কোন ব্যক্তিকে যদি দেখি তবে আমি জুতো ঠিক করার ভান করে (রাস্তার পাশে) প্রাচীরের ধারে গিয়ে দাঁড়াব, কিন্তু আপনি

চলতেই থাকবেন (যাতে লোকটি বুঝতে না পারে যে আপনি আমার সঙ্গী)।"

এভাবে তাঁরা উভয়ে রসূলুল্লাহর পবিত্র দরবারে এসে হাজির হলেন। হযরতের জ্যোতির্ময় মুখের দিকে তাকিয়ে আবু যার গিফারী নির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হল বহুযুগ ধরে এমন একটি মাসুম পবিত্র আর জ্যোতির্ময় মুখের অন্বেষণই তিনি করছিলেন। রসূলুল্লাহর মুখে ইসলামের সামান্য ব্যাখ্যা শুনে তাঁর পিপাসিত হৃদয় ভরে গেল, সেখানেই তিনি ইসলামে দীক্ষা নিলেন। সত্য ধর্মে দীক্ষা দেবার পর রসূলুল্লাহ তাঁকে সতর্ক করে বললেন, সব ব্যাপারটি এখন গোপন রাখ এবং স্বদেশে ফিরে যাও। আল্লাহ যখন সত্যকে জয়যুক্ত করবেন তখন চলে এস আমার কাছে। কিন্তু আবু যার গিফারীর অবস্থা তখন সম্পূর্ণ অন্য, অন্ধকার গুহায় হঠাৎ আলো পড়ায় তিনি তখন আবেগে উল্লাসে কাঁপছিলেন। শীতের রিক্ত শাখাগুলি হঠাৎ বসন্তের প্রাতে পল্লবে পুষ্পে ভরে উঠেছিল, উতল হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছিল সবেগে, পুলক শিহরিত কণ্ঠে আবু যার বললেনঃ "সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যের বাহকরূপে পাঠিয়েছেন, তওহীদের এ মহাবাণী নিশ্চয়ই আমি জনসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করব।" সত্য-সূর্যের আলোকমালাকে গোপন করার সংযত কৌশল হযরত আবু যার গিফারীর জানা ছিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্তের মত কাবায় চলে এলেন। সেখানে তখন কুরেশদের কুটিল আলোচনা চলছিল কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আবু যার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ*—আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ তাঁর প্রেরিত রসূল।

অগ্নিশিখায় ঘৃতাহুতি, কুরেশরা একটি বার মাত্র ক্রূর চোখে তাকাল। তারপর চারদিক থেকে শিকারী পশুর মত চিৎকার করতে করতে ছুটে এসে আবু যারকে ঘিরে ফেলল এবং বেদম প্রহারে রক্তাক্ত আর বেহুঁশ করে ছাড়ল। উন্মত্তদের আক্রোশ তখনও প্রশমিত হয়নি, একটা অজ্ঞান দেহের উপর তাদের প্রহার চলছিল সমানে ;

কোথা থেকে ছুটে এলেন হযরত আব্বাস এবং সকলকে সচকিত করে বললেন, করছ কি হতভাগার দল—আর কি কোন দিন সিরিয়ার বাণিজ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবে তোমরা ? এ ত গিফার গোত্রের লোক আর সিরিয়ার পথ গিফারের উপর দিয়েই ! হযরত আব্বাস তখনও মুসলমান হন নি কিন্তু একজন নিরীহকে এভাবে আহত করায় তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। পশুর দল হযরত গিফারীকে ছেড়ে চলে গেল।

সত্যের মহালোকে হৃদয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল হযরত আবু যার গিফারী রা-র, তিনি বায়তুল হারামে আরো কিছুদিন তওহিদ বাণী প্রচার করলেন। তারপর চলে গেলেন দূর সীমান্তে—নিজ গোত্রবাসীর কাছে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় অল্পদিনের মধ্যেই গিফার গোত্রের অর্ধেকের বেশি লোক মুসলমান হয়ে গিয়ে ছিলেন।

হযরত আবু যার গিফারী রা হলেন প্রথম যুগের ইসলাম গ্রহণকারী বিরল সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। সাইয়েদ মানজির আহসান গিলানীর "হযরত আবু যার গিফারী রা" গ্রন্থে পাচ্ছি আবু যার হলেন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি, তাঁর আগে মাত্র চার জন মুসলমান হয়েছিলেন।

এই সেই কাবা—এরই চত্বরে একদিন হযরত আবু যার গিফারী রা-র রক্তাক্ত অচৈতন্য দেহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করার অপরাধে লুটিয়ে পড়েছিল ! হয়ত আমার পায়ের নিচে তাঁর পবিত্র দেহের স্পর্শ মিশে আছে। এশার নামাযের কাতারে বসে আমার সম্মুখে এই মহান আত্মত্যাগীর বিরাট সুন্দর ঈমানী উজ্জ্বল অবয়বকে ঘোরাফেরা করতে দেখলাম, আমি বিস্ময়ে আনন্দে শিহরিত হলাম। অব্যক্ত কণ্ঠে বললাম, হে ইসলামের জিন্দাদিল বীর সিপাহী—তোমায় সালাম !

এখানে, হ্যাঁ ঠিক এখানেই, ঘটেছিল আর এক আশ্চর্য রূপান্তর —শুঁয়োপোকা থেকে প্রজাপতির অলৌকিক রূপান্তরের মত একটি অন্ধকার হৃদয়ে ভাসমান হয়েছিল বেহেশতের চাঁদ—ঈমানের নূর।

কাবার কঠিন মর্মরে যেন সেই ঘটনার ইতিবৃত্ত গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিল।

মসজিদুল হারামের সম্মুখেই নামাযে নিমগ্ন ছিলেন আল্লাহর রসূল। বাতাসে দোল জাগিয়ে তাঁর মধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত ছড়িয়ে পড়ছিল চার পাশে। সেই সুরে আন্দোলিত হল তোফেলের হৃদয়, অথচ আজ এখানে তাঁর উপস্থিত হবার কথা নয়। প্রাণপণে তিনি কাবাকে, হযরত মুহাম্মদ স-কে এড়িয়ে চলছিলেন। দাওস গোত্রের প্রধান, অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি তোফেল ইবনে আমর। তিনি একাধারে সুপুরুষ, বিত্তবান এবং কবি। সুতরাং মক্কায় এলে কুরেশরা চঞ্চল হয়ে উঠল তাঁকে সম্মান জানাবার জন্যে। এবার যখন তিনি মক্কায় উপস্থিত হলেন, সাড়ম্বর আন্তরিক সম্বর্ধনা পেলেন কুরেশদের নিকট থেকে আর সেই সঙ্গে পেলেন অযাচিত উপদেশ। তাঁরা বারবার অনুরোধ করলেন তিনি যেন কখনই হযরত মুহাম্মদের সঙ্গে না মেশেন কেননা লোকটা একটা মস্ত যাদুকর। তাঁর প্রভাবে কুরেশদের দল ভেঙে যাচ্ছে, যে একবার তাঁর সামনে যাচ্ছে সেই তাঁর খপ্পরে পড়ছে। সুতরাং তোফেল যেন জেনেশুনে এ ভুলটি না, করেন, কোন ক্রমেই যেন হযরতের মুখোমুখী না হন।

প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করে চলছিলেন তোফেল ইবনে আমর। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেদিন কাবার কিনারা দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ এক বেহেশতি মধুর সুরগুঞ্জরণে উৎকর্ণ হলেন তিনি, কালাম পাক তেলাওয়াতের আওয়াজে চমকিত হলেন তোফেল, এ কিসের স্বর! এ ধরনের আওয়াজ ত শুনিনি কখনও! তোফেলের হৃদয় দুলে উঠল। অন্তরাত্মা আন্দোলিত হল সবেগে। তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি বিস্মিত হলেন। শেষ রাতের ঘন নির্জনতায় দূর কুঞ্জ থেকে কুহরিত কোকিলের স্বর শুনে তন্দ্রাচ্ছান্ন মানুষ যেমন নিদ্রায়-জাগরণে মোহাচ্ছন্ন হয়ে ওঠেন তোফেলের অবস্থা তেমনি। একবার ভাবলেন, এ বোধহয় যাদুর প্রভাব—ছুটে পালাই। আবার দোলা জাগল অন্তরের গভীরতম প্রদেশে ঃ আমি ত শিশু নই। ভাল মন্দ

বোঝার ক্ষমতা আছে আমার। এ যদি কাব্য হয়—তা হলে আমি ত একজন কবি, যদি দুর্বল কথার মালা হয় তাহলে তা ত্যাগ করব আর কথায় যদি কিছু আলো থাকে তা গ্রহণ করতে দোষ কি ?

তোফেল যাদুগ্রস্ত হয়ে পায় পায় এগিয়ে এলেন কাবার সন্নিকটে, রসুলুল্লাহ নামাযে ধ্যানস্থ, জবান মুবারকে উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহর কালাম, তোফেল তন্ময় হয়ে তা শুনছেন, উপলব্ধি করছেন হৃদয় দিয়ে। এক সময় নামায পাঠ সমাপ্ত হল রসুলুল্লাহর। এবার তিনি বাড়ির পথ ধরলেন। তোফেলও নীরবে অনুসরণ করলেন তাঁর। বাড়িতে পেঁছে কুরেশদের শত নিষেধ এবং আজকের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শোনালেন রসুলুল্লাহ্‌কে। রসুলুল্লাহর কাছে ইসলামের কিছু মর্মকথা শুনে সেইখানে সেই মুহূর্তেই মহাসত্যেয় দীক্ষিত হলেন তিনি। তারপর রসুলুল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানালেনঃ আপনি অনুমতি দিন, আমি আমার গোত্রের কাছে ফিরে যাই। বংশের সকলের উপর আমার ভাল প্রভাব আছে। আপনি দোওয়া করলে আমি তাদের ইসলামে দীক্ষিত করতে পারব।

আপন গোত্রে ফিরে এলেন তোফেল নতুন রূপে, সন্ধ্যার ম্লান সূর্য যেমন নতুন বর্ণরাগে প্রদীপ্ত হয়ে ফিরে আসে প্রভাতে। প্রথমেই তোফেল তাঁর বৃদ্ধ আব্বাকে ইসলাম সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হয়ে গেলেন। স্ত্রীও মুসলমান হলেন কিন্তু সর্বজনমান্য পল্লীবিগ্রহ জুশেরা ঠাকুর সম্পর্কে তাঁর মনে যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। ঠাকুরকে লক্ষ্য করে স্বামীকে শুধালেন, কোলে বাচ্চা শিশু—ঠাকুর কোন ক্ষতি করবে না ত ? কালকেও যার প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ছিল তোফেলের, সেই ঠাকুরের কথা শুনে আজ হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, জুশেরা ঠাকুর ত মাটির, ওকে ত আমরাই গড়েছি। ও মানুষের ভালও করতে পারে না, মন্দও করতে পারে না—মানুষের কোন ক্ষতি করার সামান্যতম ক্ষমতাও নেই ওর। ও কিছুই করতে পারে না। ঘন তমিস্রায় চাঁদের শব্দহীন ফুটে ওঠায় আকাশে যেমন অলৌকিক পরিবর্তন ঘটে, ঈমানের নূর জ্বলে উঠলে

মানুষের জীবনেও তেমনি আশ্চর্য রূপান্তর ঘটে যায়, শুভ বোধেরা দেহের মধ্যে তখন প্রজাপতির ডানার মত শত শত পাখা মেলে আপনি খুলে যায়।

অল্পকালের মধ্যে গোত্রের বেশ কিছু লোক ইসলামে দীক্ষিত হল কিন্তু বিশাল একটা অংশ তখনও রয়ে গেল বাইরে, তারা কিছুতেই ইসলাম কবুল করল না। হিজরতের সময় ষাটজন মুসলমান নিয়ে তোফেল ইবনে আমর রসূলুল্লাহর সঙ্গে মদিনায় মিলিত হলেন, বিশ্ববিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রাহ রা ছিলেন এঁদের মধ্যে একজন। দাওস গোত্রের অনেকের আচবণে তোফেল খুশি হতে পারেন নি, বীতশ্রদ্ধ তোফেল এক সময় রসূলুল্লাহকে অনুরোধ করলেন ঃ আপনি এই গোত্রের প্রতি অভিসম্পাত দিন, এরা কিছুতেই মিথ্যা ত্যাগ করবে না।

আবেদন শুনে ব্যথিত হলেন রসূলুল্লাহ। কিছুক্ষণ নীবব থাকলেন। অকস্মাৎ দুই পবিত্র হস্ত মুবারক আল্লাহর দরবারে তুলে ধরে আকুল কণ্ঠে ফরিয়াদ জানালেন ঃ প্রভু আমাব ! আপনি দাওস গোত্রের প্রতিটি অন্তরে সুমতি দিন ! তাদের সৎ পথে পরিচালিত করুন !!

মুসলমান কখনো কাউকে অভিসম্পাত দেয় না, জীবনের শত্রুকেও না !

তন্ময় হয়ে নিষ্পলকে বিশ্বের কেন্দ্র মসজিদুল হারামের দিকে তাকিয়েছিলাম, পৃথিবীর নাভি না বলে হৃৎপিন্ড হিসেবে চিহ্নিত করতে ভাল লাগছে আমার অথবা মস্তিষ্ক। নিখিল বিশ্বের স্নায়ুর সঙ্গে যার যোগ, শিরা উপশিরার সঙ্গে যার নিবিড় সম্পর্ক কৃষ্টি সংস্কৃতিকে সচল রেখেছে যে, মানবতা আর সভ্যতাকে গতিসম্পন্ন করে উজ্জ্বল গরিমা দান করেছে যে—সেই কাবার প্রতি শ্রদ্ধায় আর সম্ভ্রমে আমার মাথা আরো নুয়ে এল। কত কথা ভাবতে ভাবতে আমি যেন আর এক জগতে চলে গেলাম। হঠাৎ পাশে একটা সোরগোল পড়তেই আমার সুদূর লোকের স্বপ্নেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে

গেল। দেখলাম, কাতারে সঁচ রাখার জায়গার অভাবের মধ্যেই এক নিগ্রো বিশালকায় নাইজেরিয়ান, হঠাৎ নিয়েত বেঁধে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। কি নামায তাও কেউ জানেন না, সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা যা পড়ার নিয়ম তাও পড়েন বলে মনে হয় না, নিয়ত বেঁধে পরক্ষণে রুকু এবং সিজদায় যান আর সিজদায় গেলে যত ভিড়েই থাক হাজি সাহেবগণ সেই জায়গাটুকু খালি করে দিতে বাধ্য হন। আসলে, আমার মনে হয়েছে, এটি কোন নামায নয়, ভিড়ের মধ্যে স্থান করে নেবার এ এক চতুর ফন্দি। আর এ ফন্দিবাজী কেবল নাইজেরিয়ানদেরই করতে দেখেছি। একজনের নয় দুজনের নয় বহুজনের, একবার নয় দুবার নয় বহুবার। ভুল হলে আল্লাহ মাফ করুন!

এশার নামায শেষ হল এক সময়। মুনাযাত সমাপ্ত করে আমি ধীরে ধীরে জমজম কূপ পার হয়ে এগিয়ে গেলাম পূবে সাফা পর্বতের দিকে। বহু প্রতীক্ষিত সাফা-মারওয়া সাঈ শুরু হবে এবার, আমি তার জন্যে দেহমনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। হেরেম শরীফের এলাকা পার হয়ে অবশেষে আমি সাফার পাদদেশ স্পর্শ করলাম। পূর্বে সাফা-মারওয়া হেরেম শরীফের বাইরে ছিল, বর্তমানে মসজিদের এলাকা কিছু বাড়িয়ে সাফা-মারওয়াকে হেরেমের অন্তর্গত করে নেওয়া হয়েছে। কেবল তাই নয়, সাফা-মারওয়া এই সুদীর্ঘ পথটি সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থা হয়েছে প্রচুর আলো হাওয়ার, এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থাও রয়েছে যথারীতি। তাছাড়া সমগ্র পথটি করা হয়েছে প্রশস্ত এবং দুতলা, একই সঙ্গে উপর-নীচে প্রায় এক লক্ষ লোক সাঈ করতে পারেন। পূর্বে সাঈ করার ব্যাপারটি ছিল রীতিমত কষ্টসাধ্য, এখন তা সহজসাজ্য এবং আরামপ্রদ।

সাফা-মারওয়া সাঈ করা ফরজ, আল্লাহর নির্দেশ। সাঈরত হাজিদের দেখে আল্লাহ খুশি হন। "ইন্নাস সাফা অল মারঅ মেন শায়ায়েরেল্লাহ"—'নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত'—আল-কোরআন। অন্য সকলে যখন

দৌড়োদৌড়ি করে সাফা-মারওয়া সাঈ করছিলেন, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর একটিতে পা রেখে আমি কাঁপছিলাম। আমার অবস্থা আমি হয়ত কাউকে কোনদিন বোঝাতে পারব না, তার দরকারও নেই। শুধু প্রার্থনা ঃ কারও কাছে বাড়াবাড়ি মনে হলে তিনি যেন এটিকে আমার আত্মপ্রচার মনে না করেন এবং আমাকে মাফ করেন। আমার বিশ্বাস ইতিহাস এবং আত্মসচেতন যে কোন মানুষ পবিত্র বায়তুল্লাহ এবং সাফা-মারওয়ার মৃত্তিকা স্পর্শ করলে কম্পমান ও ক্রন্দনশীল হবেনই. হতেই হবে, না হয়ে উপায় নেই। বসন্তের হাওয়া বইলে শীর্ণ শাখাটিরও শীর্ষদেশে অন্ততঃ একটিও কুঁড়ি তারার মত হেসে ওঠে।

এই সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বারে আরকাম, সাহাবী হযরত আরকাম রা-র বাড়ি। এই বিরল সৌভাগ্যবান সাহাবী ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগেই মহাসত্যে দীক্ষা গ্রহণ করেন, রসূলুল্লাহর উপর অমানুসিক অত্যাচার হচ্ছে দেখে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান যখন নিভৃতে আলাপ আলোচনা এবং নামাযের জন্য একটি সুরক্ষিত নিরালা গৃহের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন, সেই অসম্ভব জরুরী মুহূর্তে হযরত আরকাম রা সানন্দে এগিয়ে এলেন, সাফা পাহাড়ের নিভৃতে অঞ্চলে তাঁর এই দৃঢ়মূল গৃহটি ইসলাম এবং রসূলুল্লাহর খেদমতে উৎসর্গ করলেন। ইসলাম প্রচারের একেবারে সূচনায় এই ত্যাগ এবং এই মহান উৎসর্গ পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে রইল। হযরত উমর রা সাফা পাহাড়ে এই দ্বারে আরকামে এসেই রসূলুল্লাহর হাতে হাত রেখে কলেমা তৈয়ব উচ্চারণ করে আলোর জগতে প্রবেশ করেছিলেন।

বর্তমানে সাফা এবং মারওয়া পাহাড় দুটি কেটে প্রায় নির্মূল করে ফেলা হয়েছে, কেবল স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সাঈ পথের দুই প্রান্তে কিছু অংশ অবশিষ্ট আছে। সাফা থেকেই সাঈ শুরু করতে হয়। আমি বিসমিল্লাহ বলে সাফা পাহাড়ের যে স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট আছে তার উপরে উঠে এলাম। এখানে দাঁড়িয়ে কাবা শরীফের দিকে ফিরে নির্দিষ্ট দোয়া পড়ে সাঈ শুরু করলাম। সাফা পাহাড় থেকে নেমে

সামান্য কিছুটা পথ অগ্রসর হলেই দেওয়ালে সবুজ রংএর একটি উজ্জ্বল রড লাইট দেখতে পাওয়া যাবে। আনুমানিক পঞ্চাশ মিটার দূরে অনুরূপ আর একটি সবুজ আলো রয়েছে। এই দুই আলোর মাঝের পথটুকু ঈষৎ দৌড়ে পার হতে হয় আর এই পথটুকু পার হবার সময় খানা-এ কাবাকে স্পষ্ট দেখা যায়, অন্য সময় এতটা স্পষ্ট চোখে পড়ে না। মা হাজেরা দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই সমতল পথটুকু পার হবার সময় দৌড়ে পার হয়েছিলেন এবং দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন কাবা শরীফের পাশে শিশুপুত্র ইসমাইলের উপর। সেই স্মৃতি, মাতৃত্বের সেই দুঃসহ বেদনা মনে জাগ্রত রেখে হাজিদেরও তাকাতে হয় বায়তুল্লাহর দিকে, আর এলাকাটুকু দৌড়ে পার হতে হয়। সাফা-মাওয়ার দূরত্ব আধ কিলোমিটারের কিছু বেশি, অবশিষ্ট পথটুকু ধীরে চললেও কোন ক্ষতি নেই, বরং আল্লাহর প্রতি ধ্যানস্থ হয়ে প্রতি পদক্ষেপে তাঁর নিদর্শন-রহমত উপলব্ধি করতে করতে ধীর স্থিরভাবে চলাই বাঞ্ছনীয়। এভাবে এই পথটুকু সাত বার যাতায়াত করলে একটি সাঈ সম্পূর্ণ হয়। সাঈতে অধিকতর মনোযোগী আর একাগ্রচিত্ত হয়ে আমি দৌড়ে দুই সবুজ বাতির মধ্যবর্তী পথটুকু অতিক্রম করে এলাম। এই পথটুকু অতিক্রম করার সময় চোখ স্থির ছিল কাবার দিকে, মনের মধ্যে তুফান উঠেছিল মা হাজেরার বেদনার, আল্লাহ-শব্দের মধুর গুঞ্জরণ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আবেগে উল্লাসে বেদনা বিহ্বলতায় চোখ ভিজে আসছিল বার বার। সবুজ আলোর অংশটুকু পার হয়ে যেই গতি শ্লথ করেছি, হঠাৎ এক ঝলক হিম-হিম হাওয়া এসে চোখ মুখ সারা দেহকে যেন জুড়িয়ে দিল। সে যেন এক বেহেশতি আলিঙ্গন, তার অব্যক্ত ভাষায় প্রবহমান সমীরণ যেন কত কথা বলে গেল। আমি উল্লসিত কণ্ঠে তাকে শুধালাম, হে শান্ত শীতল নিশীথ সমীরণ— তুমি কি সদূর মিশর থেকে প্রবাহিত হয়ে আসছ ? তোমার গন্ধে যেন আমি মা হাজেরার জন্মভূমির সৌরভ পাচ্ছি। তোমার আশ্চর্য হিল্লোলে অতীত ইতিহাস যেন আমূল মর্মরিত হয়ে উঠেছে...

জন্মভূমি ইরাকের বাবেল নগর থেকে যৌবনে দেশ সফরে বেরুলেন হযরত ইবরাহিম আ, এসে পৌঁছলেন শাম দেশে—সিরিয়ায়। এসেই শুনলেন সে দেশের রাজকন্যা স্বয়ম্বরা হচ্ছেন, উল্লসিত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা দলে দলে তাই চলেছেন রাজদরবারে, কৌতুহলী হযরত ইবরাহিম আ-ও গিয়ে হাজির হলেন সেখানে এবং শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা তাঁকেই স্বামীত্বে বরণ করলেন। এভাবেই রাজকন্যা বিবি সারার সঙ্গে তাঁর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। বিবাহের পর তিনি রীতিমত সংসারী হয়ে গেলেন। দিন কেটে যাচ্ছিল দাম্পত্যজীবনের মধুর উল্লাসে হঠাৎ মিশরে যাবার নির্দেশ দিলেন আল্লাহ। ভয়ঙ্কর এক অত্যাচারী আর অসৎচরিত্র রাজা তখন মিশরের জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, বিপন্ন প্রজারা ঘরবাড়ি ছেড়ে ঘুরছিল পথে পথে। মহান আল্লাহর নির্দেশ লাভ করে সেই যালিম রাজাকে হেদায়েত করার জন্য হযরত ইবরাহিম আ সারা বিবিকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন মিশরের রাজধানীতে। এরপরের অংশটুকুর ঐতিহাসিক সত্যতা ও বিশ্বস্ততার জন্য সহি বুখারী শরীফ থেকে তুলে দিচ্ছিঃ "রাজাকে সংবাদ দেওয়া হল যে, এই এলাকায় একজন বিদেশী লোক এসেছে। তার সাথে আছে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা এক রমণী। রাজা তখনই ইবরাহিম আ-এর নিকট (লোক) পাঠাল। তারা তাঁকে রমণীটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, এই মহিলাটি কে ? ইবরাহিম আ বললেন, আমার (দ্বীনী) বোন। (বোন বলাটা অনেকের কাছে মিথ্যা মনে হতে পারে কিন্তু ইসলামে ব্যাপক দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী ধর্মীয় ভাই-বোন। তা ছাড়া এরূপ সম্বোধনের কারণ হল এই চরিত্রহীন রাজার রীতি ছিল সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর হলে স্ত্রীকে জীবিত রেখে স্বামীকে হত্যা করা)। এরপর তিনি (ইবরাহিম) সারার কাছে এসে বললেন, হে সারা—তুমি এবং আমি ছাড়া পৃথিবীর উপর কোন মুমিন নেই। এই লোকটি (তোমার সম্পর্কে) আমাকে জিজ্ঞেস করছিল। আমি তাকে বলেছি যে তুমি আমার বোন, সুতরাং আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করো না। রাজা তারপর সারাকে আনার জন্যে লোক

পাঠাল। সারা যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং রাজা তার দিকে হাত বাড়াল তখনই সে (আল্লাহর গজবে) পড়ে গেল (দেহ পাথর আর চোখ অন্ধ হয়ে গেল)। যালিম রাজা (অবস্থা গুরুতর দেখে) বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমাকে কোন কষ্ট দেব না। তখন সারা আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। যালিম আবার তাঁর প্রতি হাত বাড়াল, তখনই পূর্বের ন্যায় কিংবা আরো ভয়ঙ্কর গযবে পতিত হল। এবারও বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। আবারও তিনি দোয়া করলেন এবং সে মুক্তি পেয়ে গেল। অতঃপর রাজা তার কোন একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা আমার কাছে কোন মানুষকে আননি, এনেছ একজন শয়তানকে। পরে রাজা সারার খেদমতের জন্য হাজেরাকে দান করল। সারা হযরত ইবরাহিম আ-এর নিকট এলেন। ...তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কি ঘটল? সারা বললেন, "আল্লাহ যালিম কাফেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে উল্টো নিক্ষেপ করেছেন। আর রাজা হাজেরা-কে আমার খেদমতের জন্য দান করেছেন।"

সুতরাং হাজেরা হলেন মিশরের রাজকন্যা, যালিম রাজার রূপবতী কন্যা। এবং তিনি হযরত ইবরাহিম আ-এর পরিবারে এসেছিলেন বিবি সারার দাসী হিসেবে। সারা অবশ্য তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। দীর্ঘকাল যখন তাঁদের কোন সন্তানাদি হল না তখন সারা বিবিই জোর-জবরদস্তি করে সন্তান লাভের আশায় বিবি হাজেরার সঙ্গে হযরত ইবরাহিম আ-এর বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু বিয়ের পর বিবি হাজেরা সন্তানসম্ভবা হতেই সপত্নী সুলভ বিদ্বেষে আমূল পাল্টে গেলেন সারা বিবি। এরপর তিনি এমনই প্রতিহিংসা পরায়ণা হয়ে উঠলেন যে বিবি হাজেরার পেট কতখানি স্ফীত হয়েছে তাও লক্ষ্য করতেন আর এই স্ফীত হওয়ার ব্যাপারটি যাতে বুঝতে না পারা যায় তার জন্যে কোমরবন্ধ দিয়ে কষে পেট বেঁধে রাখতেন বিবি হাজেরা। সহি বুখারী শরীফে বিস্তারিত পাই: "নারীজাতি সর্বপ্রথম ইসমাইল আ-এর মাতা (হাজেরা)

থেকেই কোমরবন্ধ তৈরি করা শিখেছে। হাজেরা আপন নিদর্শনাবলী সারার নিকট থেকে গোপন করার জন্যই কোমরবন্ধ লাগাতেন। তারপর (উভয়ের মনোমালিন্য চরমে পেঁছলে আল্লাহর আদেশে) ইবরাহিম আ হাজেরা ও তাঁর শিশুপুত্র ইসমাইলকে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে হাজেরা শিশুকে দুধপান করাতেন। শেষ পর্যন্ত ইবরাহিম আ উভয়কে নিয়ে যেখানে খানা-এ কাবা অবস্থিত সেখানে এলেন এবং মসজিদের উঁচু অংশে জমজমের উপরিস্থ এক বিশাল বৃক্ষতলে তাঁদের রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল কোন জনমানব. না ছিল কোন পানির ব্যবস্থা। তারপর একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে তিনি তাঁদের সেখানেই রেখে গেলেন। ইবরাহিম আ নিজ গৃহাভিমুখে চলতে শুরু করলেন। বিবি হাজেরা (আকুল হয়ে) তাঁর পিছু পিছু ছুটে এলেন এবং চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবরাহিম ! কোথায় যাচ্ছ ? আর আমাদের রেখে যাচ্ছ এমন এক ময়দানে যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী, না আছে কোন (পানাহারের) দ্রব্য। তিনি বার বার তা বলছিলেন কিন্তু ইবরাহিম আ সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এই (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। হাজেরা বললেন, তা হলে আল্লাহ আমাদের ধ্বংস আর বরবাদ করবেন না। তারপর তিনি ফিরে এলেন। ইবরাহিম আ-ও সামনে চললেন। শেষ পর্যন্ত যখন তিনি পার্বত্যপথের বাঁকে এসে পেঁছলেন, যেখান থেকে স্ত্রীপুত্র তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তিনি খানা-এ কাবার প্রতি মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর দু হাত তুলে এই দোয়া করলেন ঃ 'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার পবিত্র ঘরের নিকট এমন এক ময়দানে আমার সন্তান আর পরিজনদের বসতি স্থাপন করে যাচ্ছি যা কৃষির অনুপযোগী। হে প্রভু ! উদ্দেশ্য এই, তারা নামায কায়েম করবে। অতএব তুমি অন্যান্য লোকের মনকে এদিকে আকৃষ্ট করে দাও এবং প্রচুর ফলমূল দিয়ে এদের

আহারের ব্যবস্থা কর যাতে তারা তোমার কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করতে পারে।"

এর পরের বেদনাদীর্ণ ইতিবৃত্তটিও বুখারী শরীফের বিশুদ্ধ হাদিস থেকে আনুপূর্বিক পেয়ে যাই ঃ "ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর হাজেরা ফিরে এলেন। নিজের মশক থেকে পানি পান করতেন আর শিশুর জন্য তাঁর দুধে জোয়ার আসত। পরিশেষে যখন পানি খতম হয়ে গেল, ইসমাইলের মাতা বললেন, হায় ! আমি গিয়ে যদি দৃষ্টিপাত করতাম, সম্ভবত ঃ কোন মানুষ দেখতে পেতাম। ইবনে আব্বাস বলেন, তারপর ইসমাইলের মাতা গেলেন এবং সাফা (পাহাড়ের) উপর উঠলেন। তারপর (এদিক-সেদিক) চেয়ে দেখলেন এবং কাউকে দেখা যায় কিনা এজন্য খুব নিরীক্ষণ করলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। পরে তিনি নিচে নেমে এলেন, খুব দৌড়লেন এবং মারওয়া পাহাড়ে পেঁৗছে গেলেন। এভাবে তিনি কয়েক চক্কর দিলেন। পুনরায় (মনে মনে) বললেন, যদি গিয়ে দেখতাম যে শিশু (ইসমাঈল) কি করছে। অতঃপব তিনি গেলেন এবং দেখলেন যে সে পূর্বাবস্থায়ই আছে, যেন সে মরণাপন্ন হয়ে গেছে। মায়ের মন স্বস্তি পাচ্ছিল না। আবার (মনে মনে) বললেন, যদি (সেখানে) যেতাম এবং (এদিক-সেদিক) দেখতাম ! হয়ত কাউকে দেখতে পেতাম ! তারপর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং (চারদিকে) দেখলেন, আরও দেখলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমন কি তিনি সাতবার (সাঈ, দৌড়দৌড়ি) পূর্ণ করলেন। পুণরায় (মনে মনে) বললেন যদি যেতাম এবং সে কি করছে তা দেখতাম ! অকস্মাৎ একটি আওয়াজ হল, তখন হাজেরা বললেন, সাহায্য কর—যদি তোমার কাছে কল্যাণ শক্তি থাকে। আকস্মিকভাবে তিনি জিবরাইল আ-কে দেখতে পেলেন। ইবনে আব্বাস বললেন, তখন জিবরাইল আ পায়ের গোড়ালি দ্বারা মাটিতে আঘাত করলেন। ...সঙ্গে সঙ্গে পানি বেরিয়ে এল। ...তারপর হাজেরা পানি পান করলেন এবং বাচ্চার জন্য দুধের ধারা বইতে শুরু করল।"...

জমজম থেকে পানি ওঠা শুরু হতেই "হাজেরা এর চারপাশে আপন হাতে বাঁধ দিয়ে তাকে হাউজের আকার দান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তাঁর মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার মশক ভরার পর পানি উছলে উঠতে লাগল। ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, নবী স বলেছেন, আল্লাহ ইসমাইলের মাতাকে রহম করুন— যদি তিনি জমজমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে রাখতেন,...তা হলে জমজম (কূপ না হয়ে) হত একটি প্রবহমান ঝরণা।"

এশার নামাযের পর আমি সাঈ শুরু করেছিলাম ফলে ভিড় কম ছিল এবং একটি নাতিশীতোষ্ণ অনুকূল আবহাওয়া সারাক্ষণ আমার দেহ আর চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটের উপর দিয়ে যখন আমার ভাবনারা ছুটে চলছিল, আমি ভিতর ভিতর বেদনার্দ্র আর অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। আমার সমগ্র সত্তা যেন বেদনাবিহ্বলতায় ফেনিল, আমি ক্রন্দনশীল। এই সেই দুর্গম বন্ধুর পথ—যে পথে মা হাজেরা এক কাতরা পানির জন্য দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছিলেন, তখন এ পথ ছিল বিপদসংকুল, পাথরে পাথরে আছাড় খেয়ে পড়েছেন তিনি আবার উঠেছেন, পবিত্র পদযুগল কেটে ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়েছে বার বার, সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, বন্যজন্তুর ভয়াল দংশন ও আক্রমণের আশংকাও তিনি অগ্রাহ্য করেছেন, শুধু একটিমাত্র ইচ্ছায় তাড়িত হয়েছেন ঃ সন্তানের মুখে একবিন্দু পানি দিয়ে যদি তাকে বাঁচান যায়! বুকের ধন, জীবনের একমাত্র ভরসা, যার জন্যে এই নির্বাসন—যদি তাকে বাঁচান যায়! যদি তার জীবন রক্ষা হয়! মারওয়া পর্বতের শীর্ষদেশে উঠে চতুর্দিকে কোথাও প্রাণের চিহ্ন না দেখে তাঁর সব আশা নিষ্ফল হয়ে যায় আবার নেমে আসেন দ্রুত সন্তানের কাছে, দেখেন কোন বন্যজন্তু আক্রমণ করল কিনা তারপর আবার ছুটে চলেন সাফা পর্বতের দিকে, এক বিন্দু পানির জন্যে আল্লাহর কাছে অনন্ত ফরিয়াদ জানান—প্রভু, আমার সন্তানকে বাঁচান! আমি মরি কোন ক্ষতি নেই, আমার দুঃখের সন্তানের জীবন রক্ষা করুন! এ প্রার্থনায় কোন খাদ ছিল না, কোন ফাঁকি ছিল না। কেবল হাজেরার মুখ নয়, তাঁর দেহের প্রতিটি

লোমকূপ, প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে এ প্রার্থনা উচ্চারিত হচ্ছিল, এ সকরুণ ফরিয়াদ পৌঁছে গিয়েছিল আল্লাহর দরবারে। এ আন্তরিক কাতরতায় কেঁপে উঠছিল আল্লাহর আরশ। আল্লাহ খুশি হলেন। প্রতি মানুষের আন্তরিক আহবানে আল্লাহ খুশি হন। "তুমি আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাকে স্মরণ করব" মহান আল্লাহর এ প্রতিশ্রুতি প্রতিটি সকাতর আহবানে সত্য হয়ে ওঠে। অলৌকিক প্রক্রিয়ায় জমজম সৃষ্টি হল, শিশু ইসমাইল নবজীবন লাভ করলেন।

এই সেই পথ যেখানে মা হাজেরার সজল অশ্রু মিশে আছে। সাঈ করতে করতে আমি যেন পাগলিনী হাজেরার জ্ঞানশূন্য প্রাণপন দৌড়ান, আত্মসমর্পিত প্রার্থনার কাতর ক্রন্দনের কিছুটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আল্লাহর উপর এক অপরিসীম আত্মবিশ্বাস ও নির্ভরতায় এই রাজকন্যা নির্বাসনের সব নির্মম যন্ত্রনা হাসিমুখে সহ্য করেছেন। সাঈ করতে করতে আমি শুনলাম সকলেই আল্লাহর নাম জিকির করেছেন, এই পাথুরে পথের চারদিকেই আল্লাহ নামের এক মধুর গুঞ্জরণ গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছে। চারপাশে আল্লাহ নামের ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল ঃ এই ধ্বনিত ত সাফা-মারওয়ার মধ্যে সীমিত নেই, এ ধ্বনি কাবার আকাশে ভেসে, উন্মুল কোরার গাছ-গাছালির উপর দিয়ে, মরু মেঘ ও সাগর অতিক্রম করে পরিব্যপ্ত হয়ে পড়েছে বিশ্বনিখিলে। দশদিগন্ত থেকেই আজ ধ্বনি উঠছে আল্লাহ ! আল্লাহ !! গগনে পবনে মরু পারাবারে ধ্বনি উঠছে আল্লাহ ! আল্লাহ !!

মারওয়ার পথে অগ্রসর হতে হতে ভয়ে সম্ভ্রমে বিনয়ে হঠাৎ যেন আমার উচ্চতা একেবারে অর্ধেক হয়ে গেল, আমি মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম। আমার বার বার মনে হচ্ছিল ঃ এই পবিত্র পথরেখায়, হাঁটার কোন অধিকার, কোন যোগ্যতা আমার নেই। কোন অবস্থাতেই মা হাজেরার হৃদয়-বিদারক আকুল প্রার্থনায় যে ঈমানী-তাজাল্লী, আল্লাহ-নির্ভরতার যে অনন্ত দীপ্তি ছিল আমরা তার ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারব না। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে আল্লাহর কাছে

বিনীত স্বরে নিবেদন করলাম ঃ প্রভু আমার ! এই পবিত্র মজলিসে এ অধম সব চেয়ে অনুপযুক্ত, সকল দিক দিয়ে সব চেয়ে অযোগ্য, সন্দেহ নেই সব চেয়ে পাপীও ! কিন্তু তাই বলে কি আপনি আমার দূরে ঠেলে দেবেন ? আমি কি আপনার মার্জনা পাব না ? আপনার অনন্ত রহমত থেকে বঞ্চিত হব ?

রাত ক্রমেই গভীর হয়ে আসছিল, জনবিরল হয়ে আসছিল পথঘাট। হাজি সাহেবেরা যে যার আস্তানায় ফিরছেন। এই বিরল নীরবতায় যাঁরা সাঈ করছিলেন, তাঁরা অধিকতর মনোযোগী হবার সুযোগ পেলেন। আল্লাহ ! আল্লাহ !! দেখলাম অনেক প্রেমিক হৃদয় ক্রন্দনরত অবস্থায় পথপরিক্রমা করছেন। মনে হল এই সব মহান হাজিসাহেবদের পদস্পর্শে কঠিন পাথুরে পথ মোমের মত গলে নরম হয়ে উঠেছে। পাথর যেন নিজেরা গলে গিয়ে এ‘দের চলার পথকে কুসুমাস্তীর্ণ করে তুলছে। মন বলে উঠল ঃ এ‘দের সাঈ আল্লাহ কবুল করবেন। আর এইসব মহান হাজিদের কাছে নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হল। তবে এই পবিত্র পথে এই সব মহামানবদের সঙ্গে আমার মত এক অপবিত্র আত্মাও সাঈ করতে পারছে, এই এক বড় সান্ত্বনা !

এই সাঈকে উপলক্ষ্য করেই আমি ‘সাঈ’ কবিতাটি লিখেছিলাম ঃ

সাফা থেকে মারওয়া
অক্লান্ত পরিশ্রমে ফের
সাফার পথে
কেন এই ছুটাছুটি ?

পাথরে আহত হয়ে
উঠে ফের পাথরের পথে
চোখ রেখে মহাতীর্থ কাবায়
সাঈ শেষ করার দুরন্ত শপথে
হে মহাযাত্রী
কেন হও উন্মনা ?

তীর্থ-পথিক নীরব।

আসন্ন সন্ধ্যায়
কালো গেলাবে ঢাকা
কাবাকে শুধালামঃ
কি চাও তুমি
পথিকের কাছে ?

আপন গাম্ভীর্যে
কাবা নীরব।

রাত্রি বাড়ে
নীরবতা নামে হরমের চত্বরে।
কাবার মিনারে জ্বলে
অপার্থিব আলো !

সাফা-মারওয়ায় নামে
নতুন যাত্রীর ঢল
লা ইলাহা ইল্লাল্লার
বিপুল আবেগে—
অশ্রুতে সিক্ত হয়
সফেদ লেবাস।

চলে সাঈ
উতলা বিনীত গতি
শোনা যায় অব্যক্ত ধ্বনি
পাষাণের বুকে নামে
শ্রাবণের সবুজ বিস্তার।

গভীর নিশীথে ফের
কালো কিসওয়াকে ঢাকা
কাবাকে শুধালাম ঃ
কি চাও ?

পুঞ্জিত ধ্বনির মাঝে
ভেসে এল বেহেশ্‌তি দ্যোতনা ঃ
'হাজেরার নিষ্ঠা।'

যে গভীর ঈমানে ফাটে
পাষাণ পাথর
মুক্তি পায় আবে জমজম
সে ঈমানে বিদীর্ণ হোক
হৃদয় তোমার
অফলা পল্লবে ফের
দেখা দেবে জীবন-মুকুল।

যে সব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, খোঁড়া এবং অন্যবিধ কারণে অক্ষম মানুষ চলে ফিরে সাঈ করতে পারেন না, তাঁদের জন্যে হুইল চেয়ার-এর ব্যবস্থা আছে, এ সব চেয়ারে বসিয়ে ঠেলে ঠেলে সাফা-মারওয়া সাঈ করিয়ে দেবার লোকও প্রস্তুত থাকে সকল সময়, মাথা পিছু ব্যয় পড়ে পঞ্চাশ রিয়েল। তওয়াফেও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, ছোট খাটিয়ায় বসিয়ে চারজনে কাঁধে করে কাবা শরীফ তওয়াফ সম্পূর্ণ করিয়ে দেন, দক্ষিনা দিতে হয় পঁচিশ রিয়েল।

যখন সাঈ শেষ করলাম তখন কাবার চত্বর একেবারেই জনবিরল হয়ে এসেছে। সাফা থেকে সাঈ শুরু আর শেষ হয় মারওয়ায়। মারওয়া পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দোয়া-দরুদ পড়ে কেবলামুখী হয়ে মুনাযাত করলাম। এই জায়গাটিও দোয়া কবুলের স্থান। এরপর সাফা-মারওয়া থেকে বাইরে হেরেম শরীফের ভিতর এসে আমি প্রাণ ভরে দু রাকাত নামায পড়ে মুনাযাত করলাম। তৃপ্তিতে দেহমন ভরে গেল। কখনো কখনো নামায পড়ে এক অলৌকিক শান্তি পাওয়া যায়। তারপর বাবে আবদুল আযীয দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সে রাতের মত মিসফালার পথে মিলিয়ে গেলাম।

১৭.

আধো-অন্ধকারে ভোরের হিমেল হাওয়ায় দোল জাগিয়ে ক্রমোচ্চারিত হল ফজরের আযান। কাবার চত্বরে, হেরেম শরীফে, চার পাশের রাস্তায় তখন জন সমুদ্র। আর সেই সমুদ্রে উদ্বেলিত তরঙ্গের মত উঁচু-নীচু আন্দোলন ছড়িয়ে গেল সুদূরলোক থেকে ভেসে আসা এই অলৌকিক আযানের শিরিন সুরে। মানুষের দেহকে স্পর্শ করে, আত্মাকে ছুঁয়ে এই স্বপ্নের শব্দগুলি যেন সমবেত মানুষকে ক্রমাগত পবিত্র পবিত্র আর পবিত্র করে তুলছে। জমাট জনতায় যে কলগুঞ্জন ছিল তা অকস্মাৎ নিভে গেল। বসন্তের হঠাৎ হাওয়ায় মানুষের সমস্ত দেহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি যেন একে একে প্রজাপতির ডানার মত খুলে যাচ্ছে। এক আকাশী পবিত্রতা আর সৌরভে ক্রমান্বয়ে তা কানায় কানায় ভরে উঠছে।

হাযরে আসোয়াদের দিকে কাঁচ ঘেরা একটি দ্বিতল কক্ষে মুয়াজ্জিনের আস্তানা। এখান থেকেই আযান দেওয়া হয়, একামতও দেওয়া হয় এখান থেকেই, এখানেই আছে সমগ্র কাবার মাইক কণ্ট্রোলিং সেণ্টার। প্রথমে বেশ কিছুদিন, কোথায় থেকে আযান ভেসে আসে বুঝতেই পারিনি, বৃথা অন্বেষণে কেবল চারদিক তাকিয়ে দেখতাম এবং শেষ পর্যন্ত কোন কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে রীতিমত নিরুৎসাহ আর বিমর্ষ হয়ে পড়তাম। হঠাৎ একদিন কাঁচ ঘরের দিকে নজর পড়তে দেখলাম এক ভদ্রলোক কাবার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আযানের তালে তালে কানে হাত চাপা দিচ্ছেন, এক একটি বাক্য সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার কান থেকে হাত নামিয়ে দু পাশে ঝুলিয়ে রাখছেন। পরবর্তী বাক্য উচ্চারিত হবার মুহূর্তেই তিনি আবার তাঁর কান চেপে ধরছেন, ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম তাঁর কান চেপে ধরা, ওষ্ঠ উন্মুক্ত করা এবং অঙ্গ ভংগি সকল কিছুর সঙ্গে উচ্চারিত আযানের সুগভীর যোগ রয়েছে। সেদিনই বুঝলাম ইনি কাবার মুয়াজ্জিন। আমাদের এখানে মুয়াজ্জিন যেমন দু হাতের দুই শাহাদাৎ অঙ্গুলি সারাক্ষণ কর্ণ

কুহরে রেখে আযান দিয়ে থাকেন, কাবার মুয়াজ্জিন কিন্তু তা করছিলেন না। তিনি আযানের উচ্চারণের সময়টুকু ছাড়া দু হাত সামনে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আযান দেবার সময় কান চেপে ধরতেন।

আযান অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই কাবাকে কেন্দ্র করে কাতারবন্দী হয়ে বসে গেলেন। যাঁরা চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন তাঁরাও সুবিধামত জায়গা নিয়ে বসে যাচ্ছেন একে একে। তওয়াফ কিন্তু তখনো বন্ধ হয়নি, কোন সময় আযানের সঙ্গে সঙ্গে তওয়াফ বন্ধ হয় না, চলতেই থাকে। নামায শুরু হবার চার-পাঁচ মিনিট আগে কালো চেহারার একহারা এক সদাহাস্যময় পুণ্যবান মানুষ প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্তে কাঁচ ঘর থেকে মাইক হাতে নেমে আসেন তারপর জনতার ভিড় ঠেলে এগিয়ে যান কাবার দিকে। নির্দিষ্ট স্থানে যথা সময়ে মাইক ফিট করে নামাযের জন্য প্রস্তুত রাখেন প্রতিদিন। এই তাঁর কাজ। নামায শেষ হলে আবার মাইকটি উঠিয়ে নিয়ে যান।

ইমাম সাহেবও আসেন নামায শুরু হবার কয়েক মিনিট আগে। হজের ঠিক পূর্বে যখন পুণ্যার্থী হৃদয়ের জোয়ার পূর্ণ উচ্চতা পায় সেই অকল্পনীয় উদ্দাম ভিড়ের মধ্যে কাঁচ ঘর থেকে কাবা পর্যন্ত এই সামান্য পথটুকু অতিক্রমের জন্য দেখতাম কয়েকজন পুলিশ জনতার মধ্যে দিয়ে পথ করে ইমাম সাহেবের চলায় সাগ্রহে সাহায্য করছেন। নামায শুরু হবার কিছু পূর্ব থেকে হাতিমকে (কাবার মূল অংশ—বর্তমানে যা প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত অবস্থায় আছে) সম্পূর্ণ জনশূন্য করে রাখা হয়। ইমাম সাহেব এসে এই হাতিমের মধ্যে অবস্থান করেন। তারপর একামত বা তকবীর শুরু হতেই তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের নামায পরিচালনার জন্য ইমামের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ান। কাঁচ ঘর থেকে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে শোনা যায় তকবীর ঃ

আল্লাহ হু আকবর (দুবার) আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ (একবার), আশহাদু আন্না মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ

(একবার), হাইয়া লাস সালাহ (একবার), হাইয়া লাল ফালাহ (একবার), কাদকা মাতিস সালাহ (দুবার) আল্লাহ হু আকবর (দুবার), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

আমাদের দেশে তকবীরে বা একামতে আযানের যে বাক্যগুলি দুবার উচ্চারণ করি কাবায় তা একবার মাত্র উচ্চারণ করা হয়। মদিনার তকবীরেও কাবার তকবীরের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ সেখানেও একবার করেই উচ্চারণ করা হয়। প্রথম দিকে এই পার্থক্য অনুধাবন করে মনের মধ্যে বেশ কিছুটা চাঞ্চল্য অনুভব করেছিলাম কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি দুবার ও একবারের মধ্যে বিশেষ কোন তারতম্য নেই।

একামত শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই তওয়াফ বন্ধ হয়ে যায়। তওয়াফকারীগণ যে যার জায়গায় নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যান। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাযের সময়টুকুতেই তওয়াফ বন্ধ থাকে, এই সময়টুকু ছাড়া কাবা শরীফকে ঘিরে পুণ্যবান মানুষেরা তওয়াফের বৃত্তাকার পথরেখায় অবিরাম বিনয়নম্র পদচারণা করেন, চলতেই থাকেন, এই চলা বিরামহীন, এই চলা অনন্ত ভবিষ্যতের পথে ক্রমাগ্রসরমান, কিয়ামত পর্যন্ত রাত দিন বিরামহীনভাবে এই তওয়াফ চলতেই থাকবে, পার্থিব কোন শক্তিই একে রোধ করতে পারবে না, স্তব্ধ করতে পারবে না।

তকবীর শেষ হতেই আল্লাহ হু আকবার বলে ইমাম নিয়ত বাঁধলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি শোনা গেল মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে। লক্ষ লক্ষ নামাযীও নিয়ত বাঁধলেন সঙ্গে সঙ্গে। দেখলাম কেউ হাত বেঁধেছেন বুকের উপর, কেউ নাভির নীচে, কেউ বা উপরে, কেউ কেউ আবার হাত বাঁধাবাঁধির ভিতর না গিয়ে দু হাত নির্বিকার চিত্তে ঝুলিয়ে দিয়েছেন দু ধারে। কারও মাথায় টুপি আছে, কেউ টুপির ধার দিয়েও যাননি—খালি শির কিন্তু নম্রনত। কেউ পরেছেন প্যান্ট-সার্ট, কেউ পাজামা-পাঞ্জাবি, কারও পরনে এহরাম, কেউ কেউ আছেন অন্যবিধ পোষাকে। কারও টুপি গোল, কারও চ্যাপটা, কারও নৌকা আকৃতির, কারও টুপি মিশে আছে মাথার সঙ্গে, কারও

উ'চু হয়ে আছে আধ হাত, অথচ সকলেই নামাযে দাঁড়িয়ে। বিচিত্র বেশ, রকমারি পদ্ধতি—এ নিয়ে কারও সঙ্গে কারও কোন মতান্তর নেই, প্রতিবাদ নেই, প্রতিরোধ নেই—সকলের সম্মুখেই এক কাবা, সকলেই এক আল্লাহর উপাসনায় নিমগ্ন, তার উদ্দেশ্যেই ভক্তি বিহ্বল চিত্তে রুকু যাচ্ছেন, অশ্রুসিক্ত চোখে সেই পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে আভূমি নত হয়ে লুটিয়ে পড়েছেন সিজদায়। বায়তুল্লাহর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তে আমার মনে বার বার প্রশ্ন জেগেছে ঃ খোদ কাবাতেই যদি এভাবে নামায হয়, পোষাক-টুপি পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে যদি কোন রকম প্রশ্ন না ওঠে তা হলে আমাদের পশ্চিম বাংলায় ফতোয়াবাজদের এত বাড়াবাড়ি কেন ? এ'রা কি কাবার ইমাম এবং মুফতিদের চেয়ে বিদ্যা বুদ্ধি এবং ইসলামি জ্ঞানে নিজেদের অধিকতর যোগ্য আর জ্ঞানবান মনে করেন ? দাড়ি টুপি আর লেবাসের ফতোয়া দিয়ে এই সব ইসলামপ্রেমীরা পশ্চিম বাংলার অসংখ্য গ্রামে সংখ্যাতীত দলাদলির সৃষ্টি করে সমগ্র মুসলিম সমাজকে প্রায় ধ্বংসের মুখে এনে ফেলেছেন। এ'দের বোঝা উচিত ইসলামের কেন্দ্রিয় শক্তি যে ইমান তা আদৌ দাড়ি-টুপি আর লেবাসের মধ্যে আবদ্ধ নয়, এগুলি নিতান্তই গৌণ ব্যাপার। এই সব ফতোয়াবাজদের কাউকে নামাযে দাঁড়িয়ে আল্লাহ প্রেমে আমি কোনদিন নিজ চোখে অশ্রুপাত করতে দেখিনি।

ইমাম পড়ে চলেছেন সুরা ফাতেহা, কণ্ঠ ত নয় যেন শারাবান তহুরা। পবিত্র কাবার চত্বরে দাঁড়িয়ে এই কণ্ঠে কালাম পাক শোনার পর অশ্রুপাত করবে না এমন পাষাণ হৃদয় কে আছে। অনেকেই 'হাপুরায়' কাঁদতে শুরু করেছেন, আমার মত পাপীরও চোখ ছাপিয়ে বন্যা বইতে শুরু করল এক সময়। তহরিমা বেঁধে নামাযে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে কামনা করছিলাম ঃ এই কালাম পাঠ যেন আর কোনদিন শেষ না হয়, অনন্তকাল ধরে চলতে থাকুক আর কালকে অবহেলায় অতিক্রম করে এভাবে দাঁড়িয়ে আমরা হৃদয় মন আত্মাকে ভরিয়ে নিতে থাকি। নূরের তাজাল্লিতে অন্ধকার ধাক্কা খেয়ে যেমন দূরে মিলিয়ে যায়, এই পবিত্র পরিবেশে কোরআনের সুমধুর

উচ্চারণ যেন অন্তরের সমূহ জমাট পাপকে ভেঙে চূরে গলিয়ে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। অন্ধকারের বদলে অন্তরের গভীরতম তলদেশ থেকে জেগে উঠছে এক অবিরাম পুণ্যবোধ, যা সূর্যোদয়ের মত অন্তরকে আলোকিত করে।

কাবায় এলে (আসার মত এলে) পাপ দূর হয়—যেন নতুন করে এ বিশ্বাসের মুখোমুখি হলাম!

সূরা ফাতেহা শেষ হতেই উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম রোকনে ইয়ামানি হাজরে আসোয়াদ মোলতাজেম হাতিম জমজম দশ দিক থেকে এক মধুর শব্দতরঙ্গ উত্থিত হল 'আমিন'। তরঙ্গ যেমন উপরে উঠে ধীরে ধীরে নিচে নেমে মিলিয়ে যায়, এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চ শব্দতরঙ্গ তেমনি মধুরতর হতে হতে ধীরে ধীরে খাদে নেমে মিলিয়ে গেল। দেখলাম আমিন শব্দটি অনেকেই সুরেলা কণ্ঠে সশব্দে উচ্চারণ করলেন আবার অনেকেই সম্পূর্ণ নীরবে পাঠ করলেন। দেশের মসজিদে এসব ঘটনা ঘটলে লঙ্কাকান্ড বেধে যেত অথচ কাবায় এ নিয়ে একটিবার কেউ কোন কথাই বললেন না। আসলে কে জোরে আমিন বলল, কে আস্তে বলল সেটা কোন বড় ব্যাপার নয়—নামাযে কে কত বিনয়নম্র, লা শরীক আল্লাহতে কে কতখানি আত্মসমর্পিত সেটাই কথা। আল্লাহ লক্ষ্য করেন মানুষের একনিষ্ঠ আন্তরিকতা!

সূরা ফাতেহার পর কালাম পাকের কিছু অংশ পাঠ তারপর রুকু সিজদা এবং এসব কোন কিছুতেই ইমাম সাহেব দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করলেন না, লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা মনে রেখে ঠিক নিয়ম মাফিক সময় দিয়ে সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন। এমনি করে কিছু সময়ের মধ্যে, নামায শেষ হয়ে গেল, ইমাম সাহেব দুই দিকে সালাম ফেরালেন। তাঁর দুই দিকে সালাম ফেরান সম্পূর্ণ হলে তবে মুয়াজ্জিন দুই দিকে সালাম ফেরালেন। ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের এলাকায় দেখেছি ইমাম ডাইনে সালাম ফেরালে মুয়াজ্জিনও ডাইনে সালাম ফেরান, তারপর বায়ে কিন্তু কাবায় বা মদিনাতে ইমামের দুই দিকে সালাম ফেরান সম্পূর্ণ

হলে তবে মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ শোনা যায়।

সালাম ফেরানর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন একটি অত্যন্ত শুভ জিনিষ লক্ষ্য করতাম, যিনি যেখানে যে অবস্থায় আছেন তিনি প্রথমে তাঁর ডান দিকে উপবিষ্ট মানুষটির সঙ্গে সাগ্রহে মুছাফাহ করছেন, পরিচিত-অপরিচিত কিছুই দেখছেন না আন্তরিকতার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, তারপর মিলন হস্ত প্রসারিত করে দিচ্ছেন বাম দিকের লোকটির দিকে। এমনি ভাবে প্রতি ওয়াক্তের ফরজ নামায সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কাবা জুড়ে এক আবেগময় অনন্য মিলনদৃশ্য চোখে পড়ত। আমরা ভারতীয়েরা, যারা এই মিলনের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিলাম না, ফরজ নামায সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখতাম আমাদের সেই অনভ্যস্ত হাত দুটিও কোন অলক্ষ্যে ডাইনে বাঁয়ে প্রসারিত হয়ে গেছে। আকাশ ভরা আলো ফুটে উঠলে অন্ধকারের জীবদের সাধ্য নেই আপন বিবরে তারা চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

ফরজ নামায শেষ হয়ে যেত কিন্তু ইমাম সাহেবকে কোন দিন মুনাযাত করতে দেখিনি, নামায শেষ হতেই যে যার মত উঠে যেতেন, আমরা আমাদের মত মুনাযাত করে পরবর্তী সুন্নত নামাযে মগ্ন হয়ে যেতাম। সৌদি আরবের অধিকাংশ লোককে দেখতাম সুন্নত বা নফল নামাযের দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিচ্ছেন না, এসব নামায আদায় না করেই তাঁরা নামাযরত পুণ্যার্থীদের ঘাড় টপকে মাথা ডিঙিয়ে দ্রুত কাবা থেকে বেরিয়ে আসতেন।

প্রতি ওয়াক্তে এক বা একাধিক লাশ আনা হত জানাজা নামাযের জন্য। লাশ হাজির থাকলে ফরজ নামাযের সালাম ফেরানর সঙ্গে সঙ্গেই মুয়াজ্জিন মাইকে জানাজার কথা ঘোষণা করতেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন সকলে, দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যেত নামায, তারপরই দাফন-কাফনের জন্য খাটিয়া নিয়ে বেরিয়ে যেত মৃতের লোকজন, আত্মীয়-স্বজনেরা। কাবাতে মারা গেলে দাফন করা হয় ঐতিহাসিক গোরস্তান জান্নাতুল মাওয়ালায় আর মদিনায় ইন্তেকাল করলে জান্নাতুল বাকিতে।

১৮

ঘন আঁধারের আড়ালে স্ফুটমান কুঁড়ির পূর্ণ ফুল হয়ে ফুটে ওঠার বিরল দৃশ্যটি দেখার দুর্লভ সৌভাগ্য বড় একটা হয় না কারও। হঠাৎ প্রভাতে শিশির কোমল ডালগুলিতে ফুলেদের তারার মত ফুটে থাকার দৃশ্য দেখে মানুষেরা অবাক হয়, বিস্মিত হয়। বিগত সন্ধ্যায় মাত্র গুটিকয় ফুলের ফুটি ফুটি ভাব দেখে বোঝাই যায়নি যে প্রভাতে বাগানের সবুজ জাজিমে এমন করে সৌন্দর্যের মহফিল বসবে। আজ প্রভাতে অকস্মাৎ কাবায় এমনি এক অনন্ত রূপ যৌবন নওরোজের মেলায় এসে আমি বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলাম। কি বিচিত্র শোভা ! কি বিচিত্র সমাবেশ !

অসংখ্য পুরুষ এবং অসংখ্য নারী—আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর পেলব নিখুঁত ত্রুটিশূন্য মহীয়ান হতে পারে তা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই যেন আজ অকস্মাৎ আল্-হারামে এসে সমবেত হয়েছেন। সারা কাবা আলো করে এক আকাশভরা তারার মত ফুটে আছেন। মানুষের এত রূপ ! পুরুষের এমন পৌরুষ ! নারী দেহে এত সৌন্দর্য ! না দেখলে বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করা যায় না। দু চোখ মেলে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেও মাঝে মাঝে মনে হয় সব স্বপ্ন। শত শত ক্লিওপেটরা ম্যাডোনা যেন এই সব অলৌকিক রূপোসী লাইলী জুলেখার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। এই সব অচিন লাইলী জুলেখারা অবলীলায় পবিত্র সৌন্দর্যে হজ মহফিল আলোকিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বীর পুরুষের দল—যাঁরা অপরিমেয় স্বাস্থ্য এবং অনন্ত সৌন্দর্যের অধিকারী—হয়ত হযরত ইউসুফ বলেই ভুল হয়, লাব্বায়েক বলতে বলতে কাবাকে কেন্দ্র করে রমল করছেন। আমরা হযরত ইউসুফকে দেখিনি কিন্তু এই সব দীর্ঘদেহী অসাধারণ সুন্দর সুঠাম যুবাদের প্রত্যক্ষ করলাম। হযরত ইউসুফ কি আরো সুন্দর ছিলেন ? কোথায় থাকেন এঁরা ? কোন স্বপ্নপুরীতে ? মাটিতে না আকাশে ? মায়াবিনী স্বপ্নচারিণী ইত্যকার শব্দগুলিও যেন নিঃশেষ হয়ে যায় এঁদের অনন্ত রূপরাশির কাছে। এঁদের

উপস্থিতিতে আল্লাহর সৃষ্টি সৌন্দর্য যেন আরো বেশি করে প্রত্যক্ষ করি, তাঁর অপার মহিমা সৌন্দর্যলীলায় অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে !

কাবায় এলাম অর্থাৎ হাজির হলাম বিশ্ব মেলায়। একত্রে নিখিল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরের মানুষ, কালো তামাটে পীত শাদা বাদামী দীর্ঘ বেঁটে মাঝারি সুরূপা (আজ যেন একটিও কুরূপাকে দেখতে পাচ্ছি না, সব অন্ধকার বুঝি রূপের জ্যোৎস্নার আড়ালে আত্মগোপন করে আছে), কত বিচিত্র কত বিপুল, কত বেশ কত ভূষা, কত ভাষা কত ভংগি, কত সাধারণ কত অসাধারণ—ভাবা যায় না, ভাবতে বিস্ময় লাগে, চিন্তা হার মানে, কল্পনা বোবা হয়ে যায়। সব কিছুর মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহর অসীম শিল্পকুশলতা শত বর্ণরাগে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেই মহান শিল্পীর সুষম নিখুঁত এবং বহুবিচিত্র সৃষ্টি ক্ষমতা উপলব্ধি করার এমন দ্বিতীয় স্থান নিখিল বিশ্বে আর কোথাও নেই।

গতরাতে (১৩. ৯. ৩২ সোমবার রাতে) হানিফারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিল, ফলে ভাল ঘুম হয়নি। তাই ফজর নামায হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে এলাম। আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত নামায পড়ে নিয়েছিলেন ইতিমধ্যে, এসে দেখলাম তাঁরা কোরআন শরীফ পড়ছেন। আমি তাঁদের একপাশে ঘুমিয়ে গেলাম। ঘুম যখন ভাঙল বেশ বেলা হয়ে গেছে তখন। দেখলাম শরীরের ভার-ভার ক্লান্তিটা এক পশলা বৃষ্টিতে কালো মেঘ ঝরে পড়ার মত বেশ হালকা আর ঝর ঝরে হয়ে উঠেছে। গরম নাস্তা প্রস্তুত করে আমার জেগে ওঠার অপেক্ষায় সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলেন আমার জীবন-সঙ্গিনী। উঠে বসতেই মধুর হাসলেন তিনি, আবার ঠাণ্ডা করে ফেলব সব—যান মুখটা ধুয়ে আসুন তাড়াতাড়ি।

বাথরুমে যাব কি, গরম নাস্তার সঙ্গে তাঁর অধীর আন্তরিকতার উষ্ণ সান্নিধ্য আমাকে তখন বিহ্বল করে তুলেছিল। বাড়িতে প্রতি মুহূর্তে তাঁর সদাসতর্ক অঢেল সেবা যত্নের মধ্যে থাকি কিন্তু বিদেশ ভূইয়ে এই আন্তরিক সেবার স্পর্শে হঠাৎ আমার মনে হল তাঁকে

সঙ্গে না নিয়ে এলে হয়ত আমার হজ পর্বটি ভয়ানক রকম বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। স্ত্রীর সেবাযত্ন সকলেই পান, পাওয়া উচিত—সম্ভবতঃ সেটা কোন বড় কথা নয়। কিন্তু এই বিদেশে নারী-পুরুষ যেখানে সকলেই হজের ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত থেকে অসম্ভব রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েন, সেখানে নিজের সহস্র ক্লান্তিকে তুচ্ছ করে তশতরি ভরা গরম নাস্তার সঙ্গে উষ্ণ হৃদয়টি এভাবে মেলেধরা কম কথা নয়। হজে অনেকেই স্ত্রীদের সঙ্গে আনেন না কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলব যাঁদের সঙ্গতি এবং সামর্থ আছে তাঁরা যেন তাঁদের স্ত্রীদের অবশ্যই সঙ্গে আনেন। মনে রাখা দরকার পুরুষের মত নারীদেরও হজ ফরজ।

নাস্তা খেয়ে ডাইরি লিখলাম।

এখন থেকে হজের জন্য মিনায় গমনের পূর্বে পর্যন্ত কয়েক দিনের বিবরণ আমি হুবহু ডাইরি থেকেই পর পর তুলে দিচ্ছি। ডাইরির লেখা যদিও সংক্ষিপ্ত, তবু এই বিবরণী থেকে আমাদের প্রতিদিনের কার্যক্রম, মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ও প্রস্তুতি, কাবার অবস্থা এবং পরিবেশ-চিত্র ইত্যাদি পেতে কাবার পথের পাঠকদের কোন অসুবিধা হবে না বলেই আমার বিশ্বাস।

১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার। ...এখন বাথ রুমে কাপড় কাচতে যাচ্ছি। যখন ঘর ভাড়া নিয়েছিলাম তখন এ'রা বলেছিলেন রাতদিন পানি পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে এ'রা মক্কার রোগে আক্রান্ত। সপ্তায় মঙ্গলবার ছাড়া কাপড় ধোয়া যাবে না এমনতর কারফিউ জারি হয়েছে সুতরাং সব ফেলে কাপড় চোপড় সাফ করার ব্যাপারটি আগে সারতে হয়। অবশ্য হজ হয়ে যাবার পর কথামত অঢেল পানি পেয়েছি।

কাপড় ধোয়ার পর্ব সেরে জোহর পড়লাম মিসফালা বাজারের মসজিদে। খাওয়া, নিদ্রা। আসর আল্ হারামে। মিনা-আরাফাতে উসুসি খিমা অর্থাৎ প্রাইভেট তাঁবুর বিষয় কথা বলার জন্যে গিয়েছিলাম মুয়াল্লেমের কাছে কিন্তু দেখা হল না। আগামীকাল এশার পর যেতে হবে। কাবার বিশাল জামাতে পড়লাম মগরিব

এশা এবং প্রতি নামায শেষে তওয়াফ। আজ সারাক্ষণ পায়ের আঙ্গুল বেঁধে তওয়াফ করেছি ফলে ফোস্কাটা আর বাড়তে পারেনি তবে ব্যথা বাড়ছে।

এশার পর তওয়াফ শেষে মনেহল আজ সারা রাত কাবায় থাকতে পারলে ভাল হত। আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। সাধারণত এত সুন্দর আবহাওয়া থাকে না।

১৫ তারিখের ডাইরিতে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আংশিক লেখা আছে, এ সম্পর্কে পরে কোন এক সংখ্যায় বিস্তারিত লিখব ইনশা আল্লাহ।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, বৃহস্পতিবার। ৫ ডিম ২ রিয়েল, ৩ ফলের রস ৩ রিয়েল, ২ বালুশা ২ রিয়েল (সকালের বাজার)।

রাত তিনটে চল্লিশ মিনিট এলার্ম বাজল এবং ঘুম ভাঙল। অযু সেরে আল হারামের দিকে পা বাড়ালাম। অত রাতেও উদ্বেলিত জনস্রোত বিপুল তরঙ্গভঙ্গে ছুটে চলেছে মহাতীর্থের দিকে। রাজপথ নয় জনসমুদ্র, পথ নয় প্রেমের পরাবার। কি বিপুল টান, কি অনন্ত আকর্ষণ—অনিবার এবং অবিরাম। আল্লাহকে আমরা কেউ দেখিনি কেবল তার কালাম পড়েছি এবং সেটাকেই নির্দ্বিধায় শিরোধার্য করেছি। এটাই ঈমান, এটাই মুসলমানিত্বের চিহ্ন, ইসলামের বিরল বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন ধর্মে সম্ভবতঃ এমন প্রশ্নহীন, সংশয়হীন আত্মসমর্পন নেই। আল্লাহ আমাদের ঈমানকে রক্ষা করুন!

হরম শরীফে বসার জায়গা পেলাম না, একেবারে কাবার সামনে ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম এবং এক কাতারের মাঝে কোন ক্রমে বসার স্থান করে নিয়ে তাহাজ্জদ পড়লাম। প্রায় মিনিট কুড়ি পর ফজরের আযান হল, সকলেই দাঁড়িয়ে গেলেন এক ইমামের পিছনে, সকলেই রুকু ও সিজদা করবেন তাঁরই ইংগিতে, তাঁরই পরিচালনায় নামায পড়বেন সকলে। সকলের সম্মুখে কালো গেলাফে ঢাকা বিপুল ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কাবা। আল্লাহ আমাদের দিয়েছেন এক রসুল, এক কোরআন, এক কাবা—কোন দ্বিধা নেই, মত পার্থক্য নেই। এবং এসবের উপরে আছেন মহান পবিত্র আল্লাহ যিনি রাব্বুস্

সামাও অতে অল আরদ, যিনি দ্যুলোক ভূলোকের প্রভু, যিনি জীবন মৃত্যুর মালিক, মহান আরশের অধিপতি এবং বিচারদিনের মহাপরিচালক, যিনি সৃজনকর্তা পালনকর্তা, ভাল এবং মন্দ যা কিছু তিনিই সংঘটিত করেন, তিনি এক এবং অবিনশ্বর, তাঁর উপরে কেউ নেই। এসবে গভীর বিশ্বাসই হল ঈমানের কেন্দ্রীয় শক্তি। এ শক্তিতে যিনি যত বেশি বলীয়ান, পৃথিবী এবং আখেরাতে তিনি সেই পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত।

ফজরের পরে তওয়াফ তারপর বাড়ি ফেরা। আল হারামে জোহর এবং বাড়ি ফিরে খাওয়া ও বিশ্রাম। পুনরায় কাবায় আসর মগরিব এশা। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম তাহাজ্জদ এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাবায় জমাতে ইমামের পিছনে পড়লাম। পাঁচবার তওয়াফ সম্পূর্ণ করলাম। আজ দু তিন বার বুক ভেসে গেল। এক মিশরিকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখলাম। বড় ভাল লাগল।

আগামীকাল তাহাজ্জদ পড়ার জন্য ৩-৩৬এ এলার্ম দিয়ে রাখলাম। ঘুম ভাংলে এবং শরীর ভাল থাকলে ইনশে আল্লাহ যথা সময় বায়তুল্লায় পৌঁছে যাব।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শুক্রবার। শোকর আল্লাহর—আজও তাহাজ্জদ পেলাম। ফজর পড়ে ঘরে এসে বিশ্রাম নাস্তা এবং তারপরই বাজার পর্ব শেষ করলাম। এক পো কিমা পাঁচ রিয়েল, আধ সের খেজুর চার রিয়েল, লেবু চারটি এক রিয়েল, ধনেপাতা এক আটি দেড় রিয়েল। পায়ে ব্যথা, হাঁটা হাঁটিতে উরুর দু পাশে ছড়ে যাওয়ায় কষ্ট পাচ্ছি, সুতরাং আজ তওয়াফ কতটা করতে পারব জানি না।

আজ শুক্রবার। দুপুরে মক্কা শহরের সমস্ত মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, জুমআর নামাযের জন্য কেবল মাত্র কাবার বিশাল দরজাই খোলা থাকে। মক্কার সমস্ত নরনারী ছাড়াও হজের জন্য আগত অসংখ্য মানুষের কল্পনাতীত প্রচণ্ড ভিড়ে আজ সমগ্র নগরী উতরোল। মক্কার পার্শ্ববর্তী জেদ্দা প্রভৃতি দেড় দু শো কিলোমিটার দূরবর্তী অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষ নিজেদের গাড়ি

নিয়ে ছুটে আসেন গৌরবান্বিত মহান কাবায় জুমআর নামাযে সামিল হতে। বলাই বাহুল্য সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই সৌদি আরবের জাতীয় ছুটির দিন শুক্রবার।

আমি আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত—আমরাও নামাযের উদ্দেশ্যে ঠিক সকাল দশটায় বাড়ি থেকে বের হলাম। এত সকালেও দেখলাম এক আকাশ অধীর উল্লাস বুকে নিয়ে সকলে ভিড় করে পথ হাঁটছেন। বায়তুল্লাহতে পোঁছে ত অবাক হয়ে গেলাম। সাত সকালেই যদি এমন ভাবে উদ্বেলিত জনসমুদ্র কাবার চত্বরে আছড়ে পড়ে, নামাযের সময় কি হবে !

আমি কোন রকমে অনেক অন্বেষণের পর এক কাতারের এক ফাঁকে এক টুকু চড়ুই-গলা জায়গা করে নিয়ে বসে গেলাম। গেট থেকেই ও'রা মেয়েদের দিকে চলে গিয়েছিলেন। পরে শুনলাম জায়গা পেতে ও'দের খুবই কষ্ট হয়েছে। নিচে কোথাও বসতে পারেন নি, দুতলায় উঠে অনেক শ্রমের বিনিময়ে কোনক্রমে নামায আদায় করতে পেরেছেন।

তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়ে মিসফালায় ফিরেছিলাম সকালে, ঠিক সোয়া দশটায় আবার এলাম কাবায়। সামান্য এই দু তিন ঘণ্টা কালো গেলাফে ঢাকা আমার প্রিয়তম ছিল দৃষ্টির বাইরে, অথচ এই সামান্য সময়ের মধ্যে হৃদয়ে কেমন যেন অনন্ত বিরহের স্বাদ অনুভব করি, যেন কতকাল ছেড়ে আছি, যেন কত যুগ দেখিনি। ব্যাকুল দু চোখ মেলে বায়তুল হারাম এর দিকে তাকাই, পিপাসিত দৃষ্টিরা আকুল আগ্রহে কি যেন অসীম ধন খুঁজে ফেরে, প্রাণ জুড়িয়ে আসে, বুকে নামে অঢেল শান্তি। আর সবার অলক্ষ্যে চোখে নামে ঘন শ্রাবণের অবিরল ধারা। সজল মেঘমালায় ভরা বর্ষণ মুখর ঘন আকাশের দিকে তাকিয়ে কখনো মনে হয় বাদল বুঝি আজ আর থামবে না, তেমনি আবেগাকুল কম্পমান অবস্থা। সুদীর্ঘ সময় অশ্রু ঝরে গেল নীরবে। আযান হল বারটা কুড়িতে। আযানের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল দীর্ঘ খুৎবা, সুন্নত পড়ার মত সময় ছিল না। নামায শেষ হল একটায়। নামাযে সুরা সংক্ষিপ্ত ছিল।

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ শনিবার। সেই মহাদিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সমগ্র মক্কানগরীসহ মিনা আরাফাত মুজদালেফা এবং কাবাও যেন হজের জন্য প্রস্তুত। এখন আর গিয়েই আগের মত নামাযের স্থান পাওয়া যায় না। হাজিদের মধ্যেও ব্যস্ততা বাড়ছে ক্রমেই। মুয়াল্লিমদের নিকটে গিয়ে বার বার খোঁজ খবর নিচ্ছে সবাই কি করতে হবে, কবে যেতে হবে মিনায়, সঙ্গে কি নিতে হবে এমনি আরো সব প্রশ্নে উত্তরে উত্তজনায় সকলেই আলোড়িত। যে মহাঅনুষ্ঠানের জন্য এত দূর পথ ছুটে আসা, সকলেই মনে মনে তার জন্যে ব্যাকুল, আগ্রহী।

আজ তাহাজ্জদ পড়তে এসে কাবাতে যে নতুন সজ্জার আয়োজন দেখব তা ভাবতে পারি নি। যথা নিয়মে তাহাজ্জদের আযানের পর নামায শেষ হল। তারপরই বাতাসে কেঁপে কেঁপে ছড়িয়ে গেল শেষ রাতে ফজরের আযান। ফজরও শেষ হল এক সময়, যেমন হয় প্রতিদিন, কোন ব্যাতিক্রম নেই। আর ফজরের পরই বহিরাগত মানুষেরা প্রায় সকলেই কাবা থেকে বার হয়ে যান, এ সময় সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাজার-হাটে, দু-বেলার রান্না খাওয়ায়। দেখতে দেখতে তিন ভাগ মানুষ তাঁদের জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন। তওয়াফে যোগ না দিলে সাধারণতঃ আমিও চলে আসি। কিন্তু আজ কি মন গেল জমজমের দিকে বসে দু চোখ ভরে আমি আমার প্রিয়তমকে দেখছিলাম। হঠাৎ দেখি দল দল খাকি প্যাণ্টসার্ট পরা সশস্ত্র মিলিটারি চারদিক থেকে মুহূর্তে কাবাকে ঘিরে সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে গেল। কাবায় মিলিটারি ! তবে কি আবার কয়েক বছর আগে ঘটা সেই হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটবে ? ভয়ে আতঙ্কে শিহরিত হলাম। অথচ চার পাশে ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম কারও মুখে কোন ভীতি নেই, উদ্বেগের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত নেই। তবে ? লোক পরম্পরায় অবগত হলাম সৌদি আরবের বাদশাহ আসবেন, তাই এই সতর্কতা। কিন্তু আজ হঠাৎ এই সময় তিনিই বা কেন আসবেন কাবায় ? বিদেশী হাজিরা কেউ সঠিক কিছু বলতে পারলেন না। চারদিকে লোকজন ভীষণ ব্যস্ত। কাবায় নিযুক্ত

কর্মচারী আর দাল্লারা ত তটস্থ একেবারে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে। বাদশাহ ফাহাদ এলেন ঠিক সাতটায়। সূর্যটা তখন বেশ উপরে উঠে গিয়েছে। জমজমের পাশে যে উচু শাদা রঙের চাকা ওয়ালা সিঁড়িটা এতদিন চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, কয়েকজনে সেটিকে ঠেলে কাবার দরজার সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন। একজন উঠে পরীক্ষা করে দেখে নিলেন। সব ঠিক হলে রাজা উঠলেন অবশেষে। বেশ হাসিখুশি মুখ। কাবার দরজা ধরে দাঁড়ালেন তিনি, এক হাতে চাবি। সোনায় মোড়া কাবার বিশাল দরজার তালায় চাবি লাগানর সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি ক্যামেরার বাল্ব জ্বলে উঠল। এই প্রথম কাবায় সাংবাদিক এবং ক্যামেরা দেখলাম। এই পবিত্র গৃহের ছবি তোলা কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। কোন মানুষকেই এখানে ক্যামেরা নিয়ে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। বিশেষ কারণে কোন ছবি তোলার প্রয়োজন হলে সরকার নিযুক্ত ফটোগ্রাফারগণই তা সম্পন্ন করে থাকেন। কখনও কখনও বিশেষ অনুষ্ঠান মুহূর্তে সাংবাদিকদেরও ক্যামেরাসহ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়।

কাবায় একটি মাত্র দরজা এবং এ দরজাটিকে আজ পর্যন্ত একটি বারের জন্য উন্মুক্ত হতে দেখিনি। স্বাভাবিক কারণে পৃথিবীর এই মহাসম্মানিত গৃহাভ্যন্তরে কি আছে তা জানার অদম্য কৌতূহল জমা রয়েছে বুকের মধ্যে। আজ এই মহালগ্নে যদি সেই দুর্লভ দর্শনটি ঘটে যায় !

আমি একটু উচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলাম বলেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। বায়তুল হারামের দরজা উন্মুক্ত হল এক সময়। দরজাটি এক পাল্লার অসম্ভব কারুকার্যমণ্ডিত, আরবী ক্যালিওগ্রাফির আশ্চর্য নিদর্শন তার সারা দেহে ছড়ান। শুনলাম, সারা বছরে এ দরজা একবারই খোলা হয়। দরজা উন্মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল অভিজাত মানুষ, যাঁরা এতক্ষণ সম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে সকাতর এন্তেজার করছিলেন, বাদশাহর সঙ্গে তাঁরাও অন্দরে প্রবেশ করলেন। এই সম্মানিত মানুষগুলি সম্ভবতঃ কাবার জন্য বাদশাহ কর্তৃক বিভিন্ন গোত্র এবং রাজ পরিবার থেকে বিশেষভাবে

নির্বাচিত, স্বয়ং রসূলুল্লাহ যে গোত্রের হাতে এই সম্মানিত গৃহের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভার অর্পন করেছিলেন সেই গোত্রের কোন না কোন মানুষ সম্ভবতঃ এই দলে রয়েছেন। আলো জাগার মহোৎসব লগ্নে দলবদ্ধ বিহগেরা যে মহাউল্লাসে কাকলিমুখর হয়, এই মানুষদের সারা অঙ্গে খুশির এক সাগর উদ্বেলিত তরঙ্গেরা তেমনি মুখর নীরবতায় ভেঙে ভেঙে পড়ছিল। বিশেষভাবে নির্মিত ফুল ঝাড়ু নিয়ে কেউ দেওয়াল পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত হলেন, কেউ ছাদ পরিষ্কারে, কেউ বা মনোযোগ দিয়েছেন মেঝের দিকে। কেউ আতর মাখাচ্ছেন দেওয়ালে, কেউ ছিটিয়ে দিচ্ছেন উপরে, কেউ ঢেলে দিচ্ছেন পবিত্র চার কোনে। এই ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বায়তুল্লাহর অন্দরে ঝাড়াই মোছাই সাফাই এবং সুবাসিত করার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেল। জমজমের পানি দিয়ে গৃহাভ্যন্তর ধৌত করার বিবরণ কোথাও পড়েছিলাম, এখন আর সেই ব্যবস্থা প্রচলিত নেই।[১] আজ ২৯ জিলকদ-এ অর্থাৎ জিলকদ মাসের শেষ তারিখে [সৌদি আরবের তারিখ অনুযায়ী আজ ১ জিলহজ] কাবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজটি আমার চোখের সম্মুখে সম্পূর্ণ হল।

১। 'হজ সমাধা হইবার পর জুল হজ মাসের শেষের দিকে কাবা ধৌত করা হয়। মক্কার কর্তৃপক্ষ ও কিছু সংখ্যক হাজী এই কার্যে অংশ গ্রহণ করেন। সর্বপ্রথম মক্কার শাসন কর্তা কাবায় প্রবেশ করেন। দুই রাকাত সালাত আদায় করার পর তিনি নিজেই যামযামের পানি দ্বারা মেঝে ধৌত করেন। এই পানি চৌকাঠের নিম্নস্থ একটি ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়। ইহার পর খেজুর পত্রনির্মিত ঝাঁটা দ্বারা দেওয়াল ধৌত করা হয়। অতঃপর শাসনকর্তা গোলাপ পানি ছিটাইয়া দেন। অবশেষে সমগ্র গৃহ নানা প্রকার সুগন্ধি দ্বারা সুবাসিত করা হয়।' সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০। দুঃখের বিষয় বিশ্বকোষের এই তথ্য আধুনিক নয় ফলে নির্ভরযোগ্য নয়। বর্তমানে এই কাজে কোন হাজি অংশ গ্রহণ করেন না, জমজমের পানি দিয়ে মেঝে ধৌত করা হয় না, আর সমগ্র ব্যাপারটি হজ শেষ হবার পরে নয় বরং হজ শুরু হবার আগেই শেষ হয়ে যায়।

ভিতরে যেমন চলছিল সাফাই, বাইরে তেমনি চলছিল কালো গেলাফটি নিচের দিক থেকে গুটিয়ে মাঝ পর্যন্ত তুলে ভিতর থেকে চারদিকে একটি পাতলা শাদা কাপড় ঝুলিয়ে দেবার কাজ। এই কাপড়টিও বেশ উপর পর্যন্ত রোল করে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল। এই শাদা কাপড় ঝুলিয়ে দেবার ব্যাপারটিকে অনেকেই 'কাবা' এহরাম পরেছে' বলে অবিহিত করে থাকেন। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পুণ্যকামী মানুষেরা হজপর্ব সমাধার জন্যে যেমন শাদা কাপড়ের এহরাম পরেন, কাবাও তেমনি আসন্ন হজ উপলক্ষে শাদা লেবাসের এহরাম পরেছে। প্রকৃত পক্ষে আসল ব্যাপারটি এই যে কাবার গেলাফটি বছরে একবার করে পরিবর্তন করা হয়, পুরাতন গেলাফটি খুলে নিয়ে পরিয়ে দেওয়া হয় নতুন গেলাফ। এই বেশ পরিবর্তনের সময় যদি পুরাতন গেলাফটি খুলে নিয়ে কাবাকে একেবারে উন্মক্ত করে দেওয়া হয় তা হলে সেটা খুবই দৃষ্টিকটু হয়ে যায়। পবিত্রতম গৃহের আবরু ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্যই যেন একেবারে উলঙ্গ না করে পুরাতনটি খুলে নেবার পূর্বেই এই শাদা কাপড়টি পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পুরাতনের পরিবর্তে নতুন গেলাফ পরানোয কোন অসুবিধা হয় না। নতুন গেলাফ ঠিকমত পরানোর পর ভিতর থেকে শাদা কাপড়টিও খুলে নেওয়া হয় এক সময়।

আমার সামনে এখন কাবার অনেক খানি দেওয়াল উন্মুক্ত হয়ে আছে, শাদা কাপড়টিও অনেক উপর পর্যন্ত গোটান। এতখানি উন্মুখ অংশ আমি কোনদিন দেখিনি। দেখলামঃ বড় বড় কালো পাথর দিয়ে দেওয়াল গাঁথা হয়েছে, শাদা কোন জিনিষ দিয়ে পাথরের মাঝে জোড় লাগান। পাথরগুলি এক স্কোয়ার ফুট হবে মনে হল, কোন কোনটি আরো বড়। শ্লেট রঙ বা আরো একটু কালো হতে পারে, তবে মিশমিশে কালো নয়। কারু কাজ নেই পাথরে, একেবারে শাদামাটা ব্যাপার। গেলাফ না থাকলে কাবা যে খুব দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠবে এমন নয় বরং আবারণটা আছে বলেই ভাল লাগে, ভাবগাম্ভীর্য ফোটে, না দেখতে পাওয়া কাবার জন্যে মানুষের কল্পনা শত বর্ণরাগে বিকশিত হয়। হৃদয়-মক্কায় যে যেমন ইচ্ছা কাবার

মহান চিত্র কল্পনায় এ'কে নেয়। বিশ্বের সব কিছুই সুন্দর ব্যাপ্তির জন্যে বোধ হয় একটা কিছু মহৎ আড়ালের প্রয়োজন হয়। মেঘের আবরণেই নিশীথের চাঁদকে অনেক বেশি আপন করে পাওয়া যায়।

বিকেলেও গিয়ে দেখলাম বেশ উ'চু পর্যন্ত গেলাফ গোল করে গোটান, নিচের অংশ শাদা কাপড় দিয়ে ঢাকা। দরজা বন্ধ পূর্বের মত। একটি জিনিষ লক্ষ্য করলাম আজ কিন্তু পুরাতন গেলাফটি পরিবর্তন করা হয়নি, সম্ভবতঃ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল আজ।

কি লেখা থাকে গেলাফে ? কাবার এই পবিত্র আবরণে ?

সোলেমানপুরে বা অন্য কোথাও, সম্ভবতঃ কোন মিলাদ মহফিলে শুনেছিলাম, কাবার গেলাফে পুরো ত্রিশ পারা কোরআন শরীফ লেখা আছে। শুনে বিশ্বাস করেছিলাম। বিশ্বের পবিত্রতম গৃহের আবরণে পবিত্রতম গ্রন্থ লিখিত থাকবে এ আর আশ্চর্য কি ? এবং এটাই সংগত। আজ ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম উপর থেকে নিচে এবং চার পাশে সারা গেলাফে কালোর উপর কালো সুতো দিয়ে লেখা আছে আল্লাহ্ এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। এক একটি খোপের মধ্যে এই দুটি কথাই সূচি শিল্পে ফুটে উঠেছে, দ্বিতীয় খোপেও তাই, এমনি করে সারা গেলাফ জুড়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি। উপর থেকে এক তৃতীয়াংশ নিচেয় আছে একটি সোনালি ফিতের বর্ডার, সূচি শিল্পের আশ্চর্য নিদর্শন। এই বর্ডারটি আছে চারদিকেই এবং এর মধ্যে সোনালি সুতোয় লেখা আছে বিসমিল্লাহ হেররহমানের রাহিম তারপর আছে পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা হজ এর মধ্যে থেকে হজ সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াতের উদ্ধৃতি। সম্ভবতঃ দুটি কি তিনটি আয়াত এবং এই আয়াতগুলিই ঐ বর্ডারের মধ্যে আরবী ক্যালিওগ্রাফির অসাধারণ নৈপুন্যে বারবার লিখিত হয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন নকশাদার একটি সোনার ফিতে বসান আছে। সুতরাং ত্রিশ পারা কালাম পাক লিখিত থাকার কথাটি যে এক উর্বর মস্তিষ্কের উর্বরতর কল্পনার ফসল তা বোঝাই যায়। সোনালি বর্ডারের ঠিক নিচে

ছোট ছোট নকশার মধ্যে লেখা আছে মহান আল্লাহর কয়েকটি গুণবাচক নাম ঃ ইয়া হাইয়োল কাইয়ুম এবং ইয়া রহীম ইয়া রহমান। এই শব্দগুলিও বর্ডারের নিচে চার পাশেই কালো গেলাফে ফুল হয়ে ফুটে আছে।

জোহর কাবায় পড়েছিলাম জামাতে তারপর বাড়ি ফিরে খাওয়া এবং বিশ্রাম। আর এই বিশ্রাম করতে গিয়েই আসরের জামাত পেলাম না কিন্তু আসরের নামায একা কাবাতেই পড়লাম। তওয়াফ। মগরিব। তওয়াফ। এশা। ঘরে ফিরে এলাম।

মগরিবের পর তওয়াফে যথেষ্ট কান্নাকাটি। এই প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে কোথা থেকে যে এত অশ্রু আসে ভেবে পাই না। মাঝে মাঝে মনের কোন উপখণ্ড থেকে যে পাহাড়ি ঢল নামে! পাশের লোক তাকায়। লজ্জা পাই। ভয় হয় লোক দেখান আত্মপ্রচার না হয়ে যায়! মানুষ কি ভাবল তাতে কিছু যায় আসেনা কিন্তু আল্লাহ আপনি তো আমার অন্তরকে জানেন, কোন ত্রুটি হয়ে থাকলে অশ্রুসজল ক্ষমাপ্রার্থী।

তবে অশ্রুতে আমি তৃপ্তি পাই। অশ্রুতে যত নিবিড় ভাবে আল্লাহকে অনুভব করি, এমন আর কোন কিছুতে করি না। সুতরাং হে আমার মহান প্রতিপালক আল্লাহ! এই দীন ভিখারির শেষ সম্বল অশ্রুকে আপনি কেড়ে নেবেন না।

মাঝে মাঝে আমার এমনও মনে হয়, বেহেশতে ব্যাকুল অশ্রু দিয়ে আল্লাহকে পাওয়ার আকুলতা যদি না থাকে তা হলে বেহেশত গিয়ে কি হবে! অশ্রুতে যে তৃপ্তি! যে সান্ত্বনা!!

এশার নামায শেষে মিসফালায় প্রত্যাবর্তন করে দেখলাম দরজা তালা বন্ধ। চাবি রয়েছে স্ত্রীর কাছে। হানিফার কাছেও আছে একটি। কিন্তু ওরা কেউ আসেন নি। পাশের ঘরে মিনিট দশেকের জন্য বসতে হানিফারা এসে গেল। কিন্তু স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত? ফেরার পথে সামান্য দু-একটা জিনিষ কেনাকাটার কথা ছিল, অবশ্য তার জন্যে ত এত দেরি হবার কথা নয়!

১৯.

১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, রবিবার। আজ প্রত্যুষে মিসফালা বাজারে পদার্পণ করে যে রক্তপাতের মত এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে হবে তা ভাবিনি। অথচ আজ আমি কোন কিছু কেনাকাটা করতে বাজারে আসেনি, এসেছিলাম একেবারে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। ক্রমাগত দাড়ি না কেটে কেটে প্রায় বনমানুষের পর্যায়ে উঠে গিয়েছিলাম, চেহারা হয়ে গিয়েছিল একেবারে জংলি। রিয়েল বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টায় আমি অনেক প্রয়োজনকেই প্রাণপনে উপেক্ষা করে চলছিলাম, বর্তমানের অদ্ভুদর্শন মুখমন্ডল তাদেরই অন্যতম। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবার জন্যে যখন বাজারের পথে পা বাড়িয়েছি, স্ত্রী তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন, কাজটা আরো কিছুদিন স্থগিত থাকলেই বা কি ক্ষতি ছিল ! তাঁর সরস যন্ত্রনাটুকু উপভোগ করতে করতে আমি বাজারে পেঁাছেই দেখি একেবারে হুলস্থুল কান্ড। হজ যত নিকটবর্তী হচ্ছে, পবিত্র মক্কা নগরীতে লোকসংখ্যা বাড়ছে সেই অনুপাতে, আর সেই সব বহিরাগত মানুষদের চাপ পড়ছে বাজারগুলিতে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য সকলেই ছুটছেন বাজারে, বিশ্বের নানান দেশের লোক তাঁরা, বর্ণ ভিন্ন, ভাষা পৃথক, মেজাজও স্বতন্ত্র্য। ফলে আজকাল বাজারে গেলে কোথাও কোথাও কথা কাটাকাটি শোনা যায়, তর্কবিতর্ক কখনো কখনো চরমে ওঠে। এই নানান মেজাজের বিদেশীদের জন্য হজ মৌসুমে সারা হেজাজের শাসন ব্যবস্থার বিশেষ চাপ পড়ে। সঠিক কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজকের এই রক্তপাতের সূচনা তা জানতে পারিনি, জানার চেষ্টাও করিনি, আমার কাছে তার কোন প্রয়োজনও ছিল না। শুধু উপলব্ধি করলাম, এক ব্যক্তি এক মুদিওয়ালার দোকানে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে, পরে তর্কবিতর্কে ভীষণ উগ্র হয়ে ওঠে যার ফলে এই মারাত্মক বিপত্তি ঘটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দেড় দু মিনিটের মধ্যেই পুলিশ এল, ক্ষতস্থানে হাত চেপে আছেন মুদিওয়ালা, মুখ রক্তাক্ত, প্রথমে তাকে গাড়িতে

তুললেন এক পুলিশ, পরে সেই মেজাজি লোকটিকে। তারপরই গাড়ি চলে গেল হর্ণ বাজিয়ে। মিনিট দশেক পরে এল সদল ইনস্পেক্টর, তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, এবং সঠিক রিপোর্ট নিয়ে চলে গেলেন। মিনিট পনেরর মধ্যে সব শেষ। অসম্ভব ভিড়ে বাজার যেমন জমজমাট ছিল তেমনি সরগরম থাকল। যেন কিছুই ঘটেনি এখানে। আশ্চর্য স্বাভাবিক অবস্থা। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে রায় বেরিয়ে গেল বিচারের। মুদিওয়ালাকে দেখলাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কর্মব্যস্ত আর সেই লোকটির সম্ভবতঃ জেল হয়ে গেল। এখানকার বিচার ব্যবস্থার এবং শাসনযন্ত্রের কার্যক্ষমতা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমাদের দেশে এ ধরণের সামান্য মারপিট থানা পুলিশের কাছে কোন সমস্যাই নয়, খুন হয়ে যাবার দুদিন পর তাঁরা অনুগ্রহ করে আসেন 'স্পটে', অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট প্রমানের পরও আসামীকে ধরা হয় না, বহু টালবাহানায় যদি বা ধরা হয়, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় অদৃশ্য 'খেল' এবং যথারীতি ছত্রিশ বুক ওয়ালা আসামী আটত্রিশ হয়ে মুক্ত হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়, পরবর্ত্তী খুনটা তার কাছে তখন আর কোন সমস্যার ব্যাপারই নয়। এবং এই করে আমাদের পুরো সমাজটা ক্রমান্বয়ে আরণ্যক হয়ে উঠেছে।

সৌদি আরবে এই জিনিষটি হবার উপায় নেই। সেখানে আইন কঠোর এবং তার প্রয়োগ কঠোরতর। বিচারের নামে কোন রকম প্রহসনের মহড়া নেই সেখানে।

পাশাপাশি দুটি দোকান। তাদের একটিতে প্রবেশ করে দাড়ির দিকে ইংগিত করতেই সে দুটি হাতের পাঁচটা পাঁচটা দশটা আঙ্গুল তুলে আমাকে দেখালে। অর্থাৎ দক্ষিণা মাত্র দশ রিয়েল ভারতীয় মুদ্রায় যা দাঁড়ায় সাড়ে আঠাশ টাকা। আমি ছিটকে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে বললাম, মুখে আমি জঙ্গল নিয়ে ঘুরব তবু দাড়ি কাটতে সাড়ে আঠাশ টাকা দেব না। ফিরেই আসছিলাম, কি মন গেল গেলাম পাশের দোকানে। আর আশ্চর্য সে রাজি হয়ে গেল পাঁচ রিয়েলে দাড়ি কাটতে ! আমি বসে গেলাম।

জোহর এবং আসর পড়লাম কাবা শরীফে। আসরের পর পড়ন্ত

বেলায়, আশ্চর্য সেই উজ্জ্বল বিকেলে বায়তুল্লাহর দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম চুপচাপ। বেলা পড়ে এলে, সন্ধ্যার কিছু আগে, সুদূর নীল আসমান থেকে যেন এক বেহেশতি আবেশ অবিরাম ঝরে পড়তে থাকে কাবা শরীফের উপর। এ সময়টা চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগে আমার। এই হিম হিম কোমল পরিবেশে কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে আমি যেন অদেখা কত কি দেখতে পাই, অকথিক কত কথা শুনতে পাই। উপরে অসংখ্য ফেরেশতা যেন চক্রাকারে ঘুরছেন নিচে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী বৃত্তাকার রেখার উপর তওয়াফ রত। মহান আল্লাহ খুশি হয়ে ফেরেশতাদের বলছেন, তোমরা দেখে রাখ আমার এই সব অনুগত বান্দাদের, যারা আমাকে দেখেনি কোনদিন অথচ বিনত শিরে তওয়াফ রত, অশ্রু সজল চোখে সিজদায় ভূলুণ্ঠিত, আর তোমরা সাক্ষী থাক কিয়ামতের দিনের জন্য।

একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ কিছু সোরগোলে জেগে উঠলাম, আর এক জগৎ থেকে পৃথিবীতে নেমে এলাম যেন। সকলেই বেশ ব্যস্ত, কিছু হাঁক ডাকও শোনা গেল। কি ব্যাপার ? কিছু বোঝার আগেই দেখি এক মহিলাকে সকলে ধরাধরি করে তওয়াফের এলাকা থেকে বার করে আনছেন। কিন্তু দূরে কোথাও নিয়ে যেতে পারলেন না, ঠিক আমার পাশেই ভিড়ের মধ্যে এনে শুইয়ে দিলেন। অত্যন্ত আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে সরে গিয়ে জায়গা করে দিলেন সকলেই, এহরামের কাপড় দিয়ে ততক্ষণে হাওয়া করতে শুরু করেছেন কয়েকজনে। একজন ছুটে গিয়ে পানি নিয়ে এলেন জমজম থেকে, হাতে মুখে ছিটিয়ে দেওয়া হল যথা সময় কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাঁর মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণের সময় নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল, পবিত্র বায়তুল্লাহর চত্বরে কাবা শরীফ মুখী হয়ে বার দুই হাত টান টান করলেন, মুখ দিয়ে অল্প কিছু গাঁজা মত থুতু বেরিয়ে এল, তারপর সেই পবিত্র আত্মা নিবিড় শান্তির মধ্যে জান্নাতলোকে চলে গেলেন।

কি প্রশান্ত এই মৃত্যু ! আর কি ভাগ্যবতী এই মহিলা !!

মহিলার শান্ত নিথর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার, আর এক

মহান মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। কি মহান গৌরবে মুখর সেই উজ্জ্বল ঐতিহাসিক মৃত্যু আর কি অনন্ত সৌভাগ্য সেই অখ্যাত মৃত্যু পথযাত্রীর !

এই হজের, রসুলুল্লাহর বিদায় হজের, কিছু কাল পূর্বেই ঘটেছিল এই বিষাদ-ম্লান ছোট্ট ঘটনাটি, যার প্রচার এবং উল্লেখে ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি বড়ই কৃপণ ! অথচ তাবুকের পথে এই সংঘটিত হওয়া এই ঘটনাটি আমার মত পাষাণ এবং পাপী মনে কী দারুণ আন্দোলনেরই না সৃষ্টি করেছে !

আব্বা নাম রেখেছিলেন আবদুল ওজ্জা, ওজ্জার দাস। বড হয়ে পাষাণ দেবতা ওজ্জায় নিবেদিত হবে এই সম্ভবতঃ ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু তিনি কিছুই দেখে যেতে পারলেন না, তাঁর প্রাণের সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাটাও চিরকালের মত নিভে গেল একদিন। পিতৃহীন আবদুল ওজ্জার লালন পালনের ভার নিলেন তাঁর অপুত্রক ধনাঢ্য পিতৃব্য। চাচার কাছে অত্যন্ত বিলাসিতায় মানুষ হয়ে উঠলেন আবদুল ওজ্জা। চাচার বিপুল ধনসম্পত্তির অধিকারী আবদুল ওজ্জাব শাদীও সম্পন্ন হল এক বিরাট বূপসী আরব যুবতীর সঙ্গে। দিন কেটে যাচ্ছিল অধীর উল্লাসে। এমন সময় হেজাজের এক প্রান্ত নড়ে উঠল বিপুল চেতনায়। উদাত্ত কণ্ঠে রসুলুল্লাহ ডাক দিলেন বিশ্ববাসীকে, ডাক দিলেন সত্যের পথে ইসলামের পথে আল্লাহর পথে। সে আহবানে মরুর মানুষের কঠিন মন উথাল-পাতাল। বিলাস বহুল মদ্যপ ব্যাভিচারী জীবনে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন আবদুল ওজ্জা, এ জীবনকে তিনি কোন দিনও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। সত্যের আহবানে অন্যায় বোধগুলি তাঁর অন্তর্দেশে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি করল। শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে আত্মসমর্পনের পথই বেছে নিলেন। সেদিন মরুর আগুনজ্বলা মধ্যাহ্নে তাঁর পিতৃব্য সুবিশাল অভিজাত গৃহের শীতল ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন, নির্ভিক পদক্ষেপে এলেন আবদুল ওজ্জা। চাচাকে সম্বোধন করে বললেন, এই ভ্রান্ত জীবন ত্যাগ করুন, বন্ধ

করুন মদ্যপান ব্যাভিচার দাসদাসীর উপর অত্যাচার আর ওজ্জাকে বিসর্জন দিয়ে দীক্ষা নিন সত্যের।

আরাম শয্যা ত্যাগ করে গর্জন করতে করতে সোজা হয়ে বসলেন পিতৃব্য। ক্রোধে কাঁপছিলেন তিনি। ওজ্জাকে ত্যাগ করার কথা বলতে পারল তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ! চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও। এই বিপুল সম্পত্তিতে এখন থেকে কোন অধিকার নেই তোমার, আমি তোমাকে ত্যাগ করলাম। যাবার আগে মনে রেখ যে জামা কাপড় তোমার অঙ্গে শোভা পাচ্ছে সেও আমার দেওয়া।

কোন কিছুতে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই আবদুল ওজ্জার। কুসুম বনের বিপুল সৌরভে মত্ত ভ্রমরের মত তখন তিনি মহাসত্যের আত্মহারা। কূল ছাপান বেগবান জোয়ারে তখন হৃদয়ের একূল ওকূল ভেসে যাচ্ছে। তিনি নিঃসঙ্কোচে পরণের জামা কাপড় পরিত্যাগ করে পিতৃব্যের দিকে ঘৃণাভরে ছুড়ে দিলেন সেগুলি তারপর একেবারে উলঙ্গ অবস্থায় বৃদ্ধা মায়ের কাছে দৌড়ে এসে কাতরতায় ভেঙে পড়লেন, মা আমার ইজ্জত রক্ষা কর। বহুদিনের একটা পুরাতন চাদর তোলা ছিল, স্বামীর সেই চাদরটি বার করে উলঙ্গ পুত্রকে লজ্জা নিবারণের জন্য দিলেন তিনি। আবদুল ওজ্জা সেটি দু টুকরো করে এক অংশ পরে নিলেন এবং অন্য অংশটি গায় দিলেন। তারপর মা স্ত্রী এবং এতদিনের সাধের সংসার হেলায় ত্যাগ করে অর্ধোন্মত্তের মত মদিনার পথে যাত্রা শুরু করলেন। মহাসাগরে মিলিত না হয়ে নদীর গতি স্তব্ধ হয় না, মসজিদ নববীর সম্মুখে আবদুল ওজ্জার কণ্ঠ বিনীত হল, আমায় দীক্ষা দিন ইয়া রসুলুল্লাহ !

ধূলি ধূসর গাত্রাবরণ আর কণ্ঠের ভক্তিপ্লুত কাতরতা শ্রবণ করেই এই অকৃত্রিম আল্লাহ প্রেমিকের হৃদয়ের সবটুকুই উপলব্ধি করেছিলেন হযরত মুস্তাফা, ক্ষণকাল তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে স্নেহভরা কণ্ঠে শুধালেন, কে তুমি ?

কথা বলবেন কি রসুল পাকের পবিত্র দিদার লাভ করে আবদুল ওজ্জা থরথর কাঁপছিলেন। অসীম শ্রদ্ধায় বিগলিত কণ্ঠস্বরে

আওয়াজ ছিল না, তিনি যেন ফিসফিস করে কথা কইলেন, আমার নাম আবদ্মল ওজ্জা। ভক্তির তুফান-প্লাবনে কথারা ড্মবে নিভে যাচ্ছিল বারবার।

রস্মল্মল্লাহ তাঁকে পরম স্নেহ ভরে কাছে বসালেন, গায়ে হাত ব্মলিয়ে দিলেন। তারপর সেই আল্লাহ প্রেমিকের ম্মখের দিকে তাকিয়ে বললেন, না আবদ্মল ওজ্জা নয়—ওজ্জার দাস কেন হবে তুমি, আজ থেকে তোমার নাম আবদ্মলল্লাহ—আল্লাহর দাস। আর এখন থেকে তুমি থাকবে আসহাবে স্মফফার দলে, আমার সান্নিধ্যে।

এই আবদ্মল্লাহ একদিন বিভোর হয়ে সশব্দে পাঠ করছিলেন কালাম পাক, শব্দে বিরক্ত হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন হযরত উমর রা। রস্মল্মল্লাহ বসেছিলেন সেখানে। বললেন, উমর আবদ্মল্লাহকে কিছ্ম বলো না। এই আবেগ ছিল বলেই ঘর সংসার সব কিছ্ম ত্যাগ করে সে এভাবে আল্লাহর পথে ছ্মটে আসতে পেরেছে।

এই আবদ্মলল্লাহর ইন্তেকাল হল তাব্মকের পথে।

কবর খননাদির কাজে রাত্রি নেমে এল। উপরে অনন্ত আকাশ ব্যাপী নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, নিম্নে আদিগন্ত মর্মর এক কিনারায় ছোট্ট একটি কবর। আবদ্মল্লাহর কি সৌভাগ্য! তাঁর জানাজার নামায পড়ালেন রস্মল্মল্লাহ আর তাঁর লাশ দাফনের জন্য কবরে নামলেন ইসলামের দ্মই মহান ব্যক্তিত্ব হযরত আব্মবকর রা এবং হযরত উমর রা, পাশে দাঁড়িয়ে প্রদীপ ধরে আছেন ইসলামের প্রথম ম্ময়াজ্জিন হযরত বেলাল রা। লাশ কবরে নামানো হচ্ছে, রস্মল্মল্লাহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। হঠাৎ তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, সম্ভ্রমে সম্ভ্রমে—তোমার ভ্রাতাকে সসম্ভ্রমে নামাও। আবদ্মল্লাহর ত্যাগ, তাঁর আল্লাহ প্রীতি, তাঁর রস্মল প্রেম স্মরণ করে হযরত ম্মহম্মদ স-এর হ্মদয় প্রেমে ভালবাসায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁর কণ্ঠ অশ্র্মসিক্ত হয়ে গেল। তিনি এমনই আবেগ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যে 'আস্তে নামাও, সসম্ভ্রমে নামাও' বলতে বলতে স্বয়ং কবরে নেমে এলেন এবং পবিত্র হস্ত

মুবারক দিয়ে আবদুল্লাহর লাশ ধরে কবরে শায়িত করলেন। আকাশে তারারা উজ্জ্বল আলো ছড়াল, সুদূর আসমান থেকে দলে দলে নেমে এল ফেরেশতাবৃন্দ, এভাবে নীরব নিশীথে আল্লাহর রসুল আর মহান সাহাবীদের করস্পর্শে দাফনের কাজ সম্পূর্ণ হল।

কি মহান সৌভাগ্য আবদুল্লাহর! মদিনায় আসার প্রথম মুহূর্তে তিনি মুস্তাফার স্নেহ আর ভালবাসা পেয়েছিলেন, এই অন্তিম মুহূর্তেও নবীর অঢেল ভালবাসা উজাড় হয়ে পড়ল তাঁর দেহের উপর। আর এইটি বোধহয় তাঁর জীবনের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার!

রসুলুল্লাহ গো! জানি আমি পাপী, আমি ঘৃণ্য—তবু কোন দিন কোন ক্ষণে আমি কি আপনার সান্নিধ্য পাব না? আপনার স্পর্শ? এ পাপ দেহ কেন সে স্পর্শের জন্য লোভাতুর হয়ে উঠেছে বারবার!

আসন্ন সন্ধ্যার ম্লানতায় কাবার চত্বরে বসে আমার মন ক্রমশঃ এক বিপুল বিষণ্ণতায় ভরে উঠছিল। আমি সুদূর অতীতে ফেলে আসা এক মহান মৃত্যুর গৌরবোজ্জ্বল বিষণ্ণ স্পর্শ পাচ্ছিলাম। এই ভদ্রমহিলার মৃত্যুও আমার চিত্তে বারবার এক অনন্তের স্পর্শ বুলিয়ে গেল। আমি একেবারে পাথরের মত নীরব হয়ে গেলাম।

কাবার চারদিকে যে সব তদারককারী অফিসার হাতে ওয়ারলেস নিয়ে ঘুরে বেড়ান, সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন। কথা শেষ হতে না হতেই খাটিয়া নিয়ে লোক এসে গেল, লাশ নিয়ে চলে গেলেন তাঁরা. জায়গাটাও পরিষ্কার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে, তারপর যে যার মত নামাযের জন্য বসে গেলেন। যেন কিছুই হয়নি, অথচ যাঁর যাবার তিনি চলে গেলেন!

এমনিই হয়। এমনি করে আমরাও একদিন বিনা নোটিশে এ মমতার সংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। পল্লব-কুসুমে শত কাকলি মুখর ডাল থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ার মত শেষ নিঃশ্বাসটি সকলের অলক্ষ্যে একদিন এমনি করে ঝরে যাবে, সে আর ফিরে আসবে না।

২০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, সোমবার। রুটি কাবার প্রতিটি দু রিয়েল, পুদিনা পাতা এক আটি দেড় রিয়েল, কলা এক সের তিন রিয়েল, ময়দার তন্দুরি চারটি এক রিয়েল।

আজ তাহাজ্জদ পেলাম। কল্পনাতীত ভিড়, ঘন অন্ধকারে উঠে এসেও কাবার বাইরে নামায পড়তে হল। কাবার ইমাম সম্ভবতঃ চারজন। এঁদের মধ্যে একজন প্রধান ইমাম—যিনি সাধারণতঃ জুমআর নামায পরিচালনা করেন, একদিন খুৎবা পড়তে পড়তে এঁকে কাঁদতে দেখলাম, পূর্ব বাংলার এক দাল্লা যিনি কয়েক বছর কাবায় আছেন, এই ইমামের পরিচয় দিলেন এভাবে 'কাঁন্দন দিয়ে নামায শুরু, কাঁন্দনের মধ্যেই নামায শ্যাষ।' অন্য তিন জনের মধ্যে একজন সম্পর্কে ত কথাই ওঠে না, এমন সুমিষ্ট এলাহানে কোরআন পাঠ আমি আমার জীবনে বড় একটা শুনিনি। অতি অমনোযোগীও এঁর পিছনে নামাযে দাঁড়ালে মুহূর্তে মনোযোগী হয়ে উঠবেন, আমি ত কাতারে দাঁড়িয়ে কোন দিনই চোখের পানিকে ধরে রাখতে পারিনি কিন্তু আর একজন যিনি নিয়ত করার আগে 'সাউন, সাউন' এ রকম একটি শব্দ দু বার উচ্চারণ করেন (পরে জেনেছি সাউন এই আরবী শব্দের অর্থ কাতার ঠিক করুন) তাঁর পরিচালনায় নামায পড়তে আদৌ ভাল লাগে না (আল্লাহ মাফ করুন!)। ইনি যখন কাবার ইমাম, নিশ্চই নানান দিক দিয়েই যোগ্য, হাফেজ কারি এবং অতি উচ্চশিক্ষিত ত বটেই, হয়ত আধ্যাত্মিকতায়ও চরমোৎকর্ষ লাভ করেছেন কিন্তু এঁর পড়ার ঢং, সুর ও স্বর আদৌ হৃদয়গ্রাহী নয়, মনকে একেবারেই আকর্ষণ করে না। এঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে এবং মন্তব্য করতে আমার আদৌ ভাল লাগছে না কিন্তু আমি কেবল আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার জন্যে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখছি, কোন রকম বেয়াদবি হলে আল্লাহ মাফ করুন! সত্যিকথা বলতে কি এঁর পরিচালনায় নামায পড়তে কোন রকম স্বতঃস্ফূর্ততা আসে না, কেবল জোর করে 'একজন বড় ইমামের পিছনে আল্লাহর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছি' এই ভাব বজায় রাখতে হয়। আমার বার বার মনে হয়েছে ঃ কাবা শরীফের

ইমাম নিযুক্ত করার সময় অন্যান্য যোগ্যতা বিচারের সঙ্গে সঙ্গে কালাম পাকের বিশুদ্ধ হৃদয়গ্রাহী পাঠ এবং সুমিষ্ট স্বর অবশ্যই বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ঃ বিশ্বের নানান প্রান্তের লক্ষ লক্ষ মানুষ—যাঁরা দিওয়ানার মত বায়তুল্লাহতে ছুটে আসেন তাঁরা ইমামের অন্য কোন চারিত্রিক গুণাবলী প্রত্যক্ষ করেন না, করার সুযোগ পান না, অনেকেই তাঁদের পবিত্র চেহারা মোবারকটুকুও দেখতে পান না, কেবল মাইকযোগে তাঁদের সুমিষ্ট এলাহানের কালাম পাঠের সঙ্গে পরিচিত হন। সুতরাং ইমামের পাঠ একাধারে বিশুদ্ধ এবং শ্রবণ সুখকর হওয়া চাই। মহান আল্লাহ পরিষ্কার এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর প্রিয় রসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "কোরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে —আমি তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি গুরুত্বপূর্ণ বাণী।" সুরা মুযামমেল, ৪ আয়াত।

আজ সকালে তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়ে বাড়ি এলাম। ফেরার পথে কলা আর ডিম নিয়ে এসেছি সংগ্রহ করে। কিছু নিদ্রার পর আটটায় উঠে পাশের হোটেলের গরম ভাজা চারটে পারাটা সহযোগে সকলে মিলে চা খেলাম। বাজার ইত্যাদি কাজ সারতে সারতে এগারটা, সাড়ে এগারটায় চলে এলাম বায়তুল্লায়। জোহর পড়ে আবার বাসায়। খাওয়া, বিশ্রাম। আসর পড়লাম কাবায়। মগরিব। তওয়াফ। এশা। তওয়াফ। কিছু টুকি টাকি জিনিষ কিনে নিয়ে বাসায় প্রত্যাবর্তন।

আরো একটি অপ্রীতিকর বিষয় লিখতে হচ্ছে আমাকে, অবশ্যই যা লিখতে না হলে ভাল হত, আমি খুশি হতাম। কিন্তু সত্যের জন্য এ ঘটনা ডায়রিতে আমি লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছি। তা ছাড়া হজে এসে সকলকেই সম্ভবতঃ কমবেশী এ ধরণের সমস্যার মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়, বিশেষ করে আমাদের মত যাঁরা ভিন্ন পরিবারের সাতজন এক ঘরে থাকেন তাদের ত এ ধরণের সমস্যার পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন উপায়ই নেই।

প্রথম দিকে গুজরাটি দম্পতি আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল

ব্যবহার করছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে এক সঙ্গে থাকলে এবং রান্না-খাওয়া করলে তাঁরা সব রকম কাজ কমবেশি এড়িয়ে যেতে পারবেন এবং খরচপত্রও অনেক কম হবে। কেননা বাজার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনাকাটার জন্যে এই গোলাম হাজির আর রান্নাবাড়ার জন্যে আছেন আমার স্ত্রী, টুকিটাকি জিনিষের প্রয়োজন হলে সেগুলি আমরাই কিনে এনে চালিয়ে নেব। যা হোক প্রথম দিকের কটা দিন বেশ চলে গেল, গুজরাটি মহিলা দু-একদিন রান্নাও করলেন হঠাৎ তাঁর মেয়ে-জামাই এল লন্ডন থেকে। এবং বলা যেতে পারে তারপর দিন থেকেই তাঁদের মুড পরিবর্তিত হয়ে গেল। সকালে মহিলাটি আমার স্ত্রীকে বললেন, ও বুড়ি (হাশমি ইশরাত) কোন কাজ করে না, বসে বসে খায়—ওর কাজ কে করবে ? রাতে দেখলাম মেয়ে-জামাইকে নিয়ে তাঁরা চারজন আলাদা খেতে বসেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই তাঁদের স্বার্থপরতা আর সংকীর্ণতা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠল। যেমনঃ একদিন ঘরে গিয়ে দেখি আমাদের জিনিষপত্রগুলি টেনে একদিকে জমা করে দিয়েছেন, আমাদের যে কোন জিনিষ তাঁরা নির্বিচারে ব্যবহার করছেন অথচ তাঁদের জিনিস সোনার কৌটোয় গোনা-গাঁথা, বাথরুমে তাঁরা আগে যাবেন, গ্যাসে তাঁরা আগে রান্না করবেন। আজ অহেতুক ভাবে কাপড় ধুয়ে সব পানি শেষ করে চলে গেলেন—আমাদের অযুর পানিও থাকল না। এমনি নানান ছোটখাট ব্যাপারে মনটা ভীষণ আহত। তারা যখন দাপটে কাজকর্ম করতে থাকেন আমি স্ত্রীর দিকে তাকাই এবং স্ত্রী আমার দিকে তাকান —তারপর নীরবে হাসেন। অবসর সময়ে আমি বলিঃ কোন দুর্বল মুহূর্তে ধৈর্যহারা হয়ো না, হজের মহাফিলে ধৈর্যের পরীক্ষা, এক বড় পরীক্ষা। আল্লাহ্ সেই পরীক্ষায় আমাদের সুন্দর ভাবে বসিয়ে দিয়েছেন, উত্তীর্ণ হওয়া চাই। স্মিত হেসে মৃদুকণ্ঠে স্ত্রী পাল্টা বলেন, আপনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন, ধৈর্যের মর্যাদা রাখা চাই।

সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, দায় বিদায়ে এই বিদেশ ভুঁইয়ে

সকল হাজিকেই একে অপরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে—হজের ময়দান তাই দাবী করে, আল্লাহও তাই চান। হজে যাত্রা থেকে শুরু করে মক্কায় মিনার আরাফাতে মুযদালিফায় তওয়াফে নামাযে আহারে নিদ্রায় ওঠায় বসায় সকলের ধৈর্যের এক চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে যায়। হজের পরীক্ষা—তাই সবরের পরীক্ষা, ধৈর্যের পরীক্ষা।

ইয়াকুব আদম, যার বাড়ি গুজরাটে, সেখানে একটি মসজিদ তৈরি করছেন, তাঁর মসজিদের জন্য দশ রিয়েল চাঁদা দিলাম। আমাদের দেখাদেখি ইশরাত খালা পাঁচ রিয়েল এবং প্যাটেলজীকে বলতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঁচ রিয়েল দিতে বাধ্য হলেন।

ইয়াকুব তাঁর গ্যাস ভর্তি সিলিণ্ডার আমাদের ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন হাসিমুখে। আমি ভেবে দেখলাম, ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া তাঁর চিত্তের উদারতারই পরিচয় কিন্তু এভাবে ব্যবহার করাটা আমাদের জন্য উচিত নয়। সুতরাং তাঁর গ্যাসের দাম আমাদের অংশমত আমরা মিটিয়ে দিলাম। তিনি নিতে চাইছিলেন না কিন্তু আমরা আমাদের কর্তব্য করলাম। প্যাটেলজীকেও তাঁদের অংশ মিটিয়ে দিতে বললাম। এ কথা শুনে প্যাটেলজীর মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি প্রচুর কথা খরচ করতে রাজি আছেন কিন্তু রিয়েল খরচ করতে নন।

২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার। আজ শেষ রাতে ৪টা ১০ মিনিটে গিয়েও মসজিদুল হারাম এর অনেক বাইরে, ভারতীয় হজ অফিসের সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জামাতে ফজর পড়লাম। লোক সংখ্যা প্রতি পলকে বাড়ছে। নামায শেষে ফিরে এলাম। নাশতা। বাজার। খাওয়া। নিদ্রা। জোহরের নামায পড়তে যাবার সময় দুটো কোরআন শরীফ কিনে দিয়ে এলাম কাবা শরীফে। লক্ষ লক্ষ লোক চারদিকে বসে পড়ছেন। ভাল লাগে। কমবেশি সকল হাজিই, পুন্যলোভাতুর সকল মানুষই একাধিক কোরআন শরীফ কিনে 'ফি সাবিলিল্লাহয়' দিয়ে দেন। এই পুণ্যভূমিতে আসরের

জামাতে শির লুটিয়ে দিলাম। তারপর মুনাযাত করতে গিয়ে বুক ভেসে গেল। গতকাল আসরের পর এই অবস্থা হয়েছিল। অশ্রুর এই বর্ষণটুকু না হলে আমার মনে হয় আজ বোধহয় আল্লাহকে ঠিকমত ডাকতে পারিনি, সেই অনন্ত করুণাময় হয়ত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আছেন। তাঁর রহমতের স্পর্শ আমার অশ্রুতে পেলেই বুঝলাম তিনি হয়ত প্রসন্ন হয়েছেন, খুশি হয়েছেন। আল্লাহ প্রতিদিন এভাবেই যেন আপনাকে হৃদয় দিয়ে একান্ত নিবিড় ভাবে অনুভব করি। আপনাতেই আমার জীবন, আপনাতেই আমার মৃত্যু, আপনাতেই আমার আনন্দ এবং বেদনা, আপনাতেই আমার অহংকার এবং আমিত্ব সকল কিছুই সমর্পণ করলাম!

মগরিব। এশা। তওয়াফ। মনে হয় বহির্বিশ্ব থেকে যত লোক আসার ছিল সকলেই এসে গেছেন। বাকি যদি থাকে—এক আধজন। কাবা পরিপূর্ণ। বর্ষার ভরা নদীর মত কূল ছাপিয়ে উপছে পড়ছে। নামাযে জায়গা পাওয়া যায় না। প্রায় বায়তুল্লাহ থেকে বহুদূরে রাস্তার কোথাও বসে নামায আদায় করতে হয়।

হজ উপলক্ষে মিনায় গমনের জন্যে ছাড়পত্র দেবেন কি না তা জানার জন্য আজ মুয়াল্লিমের বাসায় গেলাম। জানলাম আগামীকাল দেবেন। সেখানেও বেশ লোকের ভিড়।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, বুধবার। একটা ছোট্ট শহরে, তিন থেকে চার লক্ষ লোক যেখানে বাস করে, হঠাৎ সেখানে পনের বিশ লক্ষ উপরি লোক এসে গেলে সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার কথা অথচ মক্কার প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন সুন্দর সুশৃংখল এবং শক্তিশালী যে কোথাও কোন অব্যবস্থা নেই, নেই কোন অপটু পরিচালনার অক্ষম চিহ্ন। রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা সব শহরেরই একটি প্রধান সমস্যা, বিশেষ করে মক্কার মত একটি আধুনিকতম আন্তর্জাতিক শহরে যেখানে সব কিছুই বিদেশ থেকে বাক্সে প্যাকেটে টিনে আমদানী হয় এবং প্রতিমুহূর্তে সেগুলি প্রধানতঃ ডাস্টবিনে রাস্তায় অথবা কোথাও না কোথাও নিক্ষিপ্ত হয়। পেপসী যা যে

কোন ফলের রসের কথাই ধরা যাক। প্রতি মিনিটে কেবল বায়তুল্লাহর আশেপাশে অন্ততঃ কয়েক সহস্র ছোট টিন খালি হচ্ছে এবং সেগুলি রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। এমনি করে কাপড়ের ঘড়ির ফলের তরিতরকারির বিভিন্ন দ্রব্যাদির হাজারও রকমের বাক্স প্রতিমুহূর্তে রাস্তায় জমা হচ্ছে। এ ছাড়া পনের বিশ লক্ষ বহিরাগত যাত্রীর খাবারের উচ্ছিষ্ট ঠোঙা ময়লা ও বাক্সগুলি এক ভয়াবহ আবর্জনার স্তূপ হয়ে উঠেছে প্রতিনিয়ত। অথচ এই ভিড়েও যে কোন রাস্তায় যে কোন সময় চোখ বুলিয়ে দেখুনঃ পরিচ্ছন্নতায় আপনি বিস্মিত হবেন। কোথাও এতটুকু নোংরা নেই, ময়লা নেই আবর্জনা নেই। সবটাই সব সময় ঝকঝক করছে—যেন একটু আগে, এই মুহূর্তে কেউ পরিস্কার করে গেল। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঘটেও তাই। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দু ঘণ্টা পর পর অন্যত্র চার ঘণ্টায় একবার দাল্লারা দল বেঁধে আসেন এবং ঝাঁট দিয়ে ময়লাগুলি মাঝে মাঝে জমা করে রাখেন। ঝাড়ুদারদের পিছন পিছন আসেন আর একদল, তাঁরা সেই জঞ্জালগুলি সংগ্রহ করে, চারদিকে ঘেরা ভ্যান গাড়ির মত চাকা লাগান ছোট ছোট গাড়িতে ফেলে দেন। দরকার মত সেই গাড়িগুলিকে টেনে টেনে নিয়ে যান। গাড়িগুলি বেশ মজবুত এবং রাস্তার পাশে পড়ে থাকে। জঞ্জালে ভর্তি হয়ে গেলে এদের মুখের ঢাকনা টেনে দেওয়া হয়, ফলে কোন রকম দুর্গন্ধ বাইরে আসতে পারে না। এই ধরণের ময়লা ভর্তি ছোট ছোট গাড়িগুলিকে টেনে একটি বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে দশ-বারটি করে জমা করা হয়। এভাবে দাল্লারা রাস্তা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে ময়লাগাড়িগুলিকে একত্র জমা করে চলে যান। পরে আসে ময়লা-পরিবহনের বিশাল ট্যাংক, সম্পূর্ণ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি এক সুবিশাল গাড়ি। গাড়িতে এমনই ব্যবস্থা রয়েছে যে ছোট ছোট ময়লা ভর্তি ভ্যান গাড়িগুলি একের পর এক অটোমেটিক উঠে যায় এবং ময়লাগুলি যন্ত্রের সাহায্যে নিষ্কাষিত হয়ে ট্যাংকের বিশাল গহবরে নেমে জমতে থাকে। সকলের দৃষ্টির অলক্ষ্যে সব কিছু অটোমেটিক হয়ে যায় এবং এমনই আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা

যে অতিনিকটে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিও কোন রকম দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারবেন না। ব্যবস্থাটি আমার খুবই ভাল লেগেছে।

সকালে নাস্তা খেয়ে ডাইরি লিখলাম। টুকিটাকি কাজ সেরে গোসল করলাম, তারপর জোহরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। ভীষণ ভিড়। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ! বাড়ি ফিরে আহার। নিদ্রা। আসর পড়লাম কাবায়। আসরের পর মগরিব পর্যন্ত সময়টুকু আমার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। এই সময়টুকুতে আমি আল্লাহর রহমত বেশি করে অনুভব করি, তাঁর অনন্ত অনুগ্রহের স্পর্শে আমার দেহমন উদ্বেলিত হয়। কোন অনন্তলোক থেকে এমন আবেগ আসে জানি না, ফল্গুধারা অকস্মাৎ মুক্তি পায় প্রবল বেগে। কোন কোন সময় ডুকরে কেঁদে উঠি। চারদিকে শত সহস্র লক্ষ মানুষের বিনীত ভিড়। একটু যদি নিরালা হত ভাল হত ! অনন্ততঃ আমার মন মাঝে মাঝে একটু নির্জনতার অন্বেষণে উন্মুখ হয়ে ওঠে। হয়ত এ অশ্রুতন্ময়তা, এ সমর্পণ আরো গভীর হতে পারত। তবুও আমি আমার মহান স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞ—এই ভিড়েও যে অশ্রু দিয়ে কেঁদে কেঁদে—হৃদয়কে মনকে আত্মাকে এমন করে একান্ত ভাবে ভরিয়ে ভাসিয়ে সম্পূর্ণ করে তোলা যায় তা আগে কোনদিন এমন একান্ত ভাবে উপলব্ধি করি নি।

মগরিব। এশা। তওয়াফ। তারপর গেলাম মুয়াল্লিমের বাড়িতে। মিনায় যাবার কার্ড এবং অন্যান্য বিবরণ পেলাম। মিনার মহাময়দান জুড়ে সংখ্যাহীন তাঁবু পড়েছে। পাঁচ নং রাস্তার উপর ছ নং তাঁবু নির্দিষ্ট হয়েছে আমাদের জন্য। শনিবার রাত বারটায় জিনিষপত্র নিয়ে মুয়াল্লিমের বাড়িতে উপস্থিত হতে হবে। ওখান থেকে শুরু হবে হজের জন্য মিনা অভিমুখে মহাযাত্রা !

যে মহান পবিত্র মুহূর্তটির জন্য আমরা এতদিন সাগ্রহে উন্মুখ, মহান সেই মুহূর্তটি প্রায় সমাগত। হৃদয়-মন উল্লাসে অধীর। আল্লাহ ! আপনি আমার জন্য, আমার স্ত্রী জন্য, হজে যোগদানকারী আমাদের সকলের জন্য এই মহাঅভিসারকে নির্বিঘ্ন করুন, পূর্ণ করুন, কবুল করুন। আমীন!

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, বৃহস্পতিবার। তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়লাম কাবা শরীফের অনেক বাইরে। রাত তিনটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে এসেও দেখি কাবার চত্বর, মসজিদ সব কিছু পরিপূর্ণ হয়ে উপচে পড়ছে। লোকারণ্য। সম্ভবতঃ রাত সাড়ে বারটা থেকে দেড়টা এই এক ঘণ্টা সময় মাত্র কাবা কিছুটা খালি থাকে। হজের মহামুহূর্তে, এই সময়টাতে বাহতুল্লাহয় এলে কোন রকমে বসার জায়গা পাওয়া যায় এই পর্যন্ত। নিখিল বিশ্বের তীর্থযাত্রীর ভিড়ে মসজিদুল হারাম-সাগরে এখন দুকূল ছাপান জোয়ার, উদ্বেলিত এবং উত্তাল কিন্তু ভীষণ নয়—সংযত। এ জোয়ারে বাঁধ ভাঙবে না, এ জোয়ার বহির্বিশ্বের নয়, একান্তই অন্তর্জগতের, উন্মাদনা যদি কিছু জেগে থাকে সে আত্মায়, দেহে নয় মনে, প্রাণের গোপন গহ্বরে। ফলে পনের থেকে বিশ লক্ষ লোক—বিশ্বের বিভিন্ন বর্ণের ভাষার গোত্রের দেশের—একটি মাত্র গৃহের চত্বরে একত্রিত হলেও, এই মহান কাবার সম্মুখে সকলেই নীরব। কোন গোলযোগ নেই, মারপিট নেই, দাঙ্গাফ্যাসাদ নেই, নেই কোন অসহিষ্ণু অভিযোগ। কাবাকে সম্মুখে রেখে সকলেই অসম্ভব রকম ভিড়ে, খোলা চত্বরে মরুর রৌদ্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টার পরম ধৈর্যের সঙ্গে বসে আছেন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগেঃ তা হলে কাবাই কি এতগুলি মানুষকে এমন ভাবে কুসুম কোমল আর বিনীত করে রেখেছে? এত শক্তি কাবার? এই কয়েকটুকরো পাথরে গাঁথা ছোট ঘরটির? আসলে এই পাথর, এই কাবার, এই বায়তুল্লাহর কোনই শক্তি নেই। বায়তুল্লাহ উপলক্ষ মাত্র —কাবাকে অতিক্রম করে আর এক মহাশক্তির কাছে সকলেই নতশির, সেই অদৃশ্য মহান শক্তির স্পর্শে সকলেই শৃঙ্খলিত, সকলেই নিবেদিত, সকলেই ধৈর্যবান, সকলেই কষ্টসহিষ্ণু এবং সকলেই আত্মসমর্পিত। সকলেই সকলের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে আছেন, একজনের অসুবিধা হলে দশ জনে এগিয়ে আসছেন, সকলেই সব কাজ করছেন আল্লাহর জন্য, তাঁর নির্দেশিত পথ অবলম্বনের জন্য, তাঁকে খুশি করার জন্য, সকলের সকল কাজই ফি সাবিলিল্লাহ। পৃথিবীর অন্য কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয়

আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এই ভাব এবং বোধ এমন একান্ত নিবিড় ভাবে পরিলক্ষিত হয় না।

মসজিদুল হারামে আসর। মগরিব। এশা। এশার পর প্রাণভরে তওয়াফ করলাম। বাসায় ফিরতে বেশ রাত হল। ফিরেই শুনি শনিবার নয়, তার বদলে আগামীকাল রাত বারটায় মুয়াল্লিমের বাড়িতে হাজির হতে হবে এবং ওখান থেকেই শুরু হবে হজ উপলক্ষে মিনার পথে মহাঅভিসার।

২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, শুক্রবার।

বায়তুল্লাহতে পড়লাম তাহাজ্জদ এবং ফজর। হজের আগে শেষ জুমআ আজ। ভিড়ে ভিড়ে একাকার, চারদিকেই জনসমুদ্র। রাস্তাঘাট ছয়লাপ। জীবনে এমন প্রচণ্ড ভিড় আমি কখনো দেখিনি আর এত কষ্ট করে জুমআর নামাযও পড়িনি কোনদিন। আমি গিয়েছি এগারটায় সুতরাং জায়গা পাওয়া স্বপ্ন। যাঁরা সকাল আটটা সাড়ে আটটায় এসেছিলেন দেখলাম তাঁরাও ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাঁটু দুমড়ে বসার মত এক ইঞ্চি জায়গা নেই কোথাও। কাবা ছাপিয়ে, রাস্তাঘাট ভর্তি হয়ে কাতার ক্রমান্বয়ে মক্কা শহরের ভিতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আজ সারা মক্কা জুড়েই জামাত হবে।

দুটি হেলিকপ্টার কাবা শরীফের উপর দিয়ে বার বার উড়ে যাচ্ছে, কিছু দূরে গিয়ে আবার ফিরে আসছে চক্কর দিয়ে, আবার এবং বার বার। শুনলাম সরকার নিযুক্ত এই হেলিকপ্টার দুটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তুলছে। কাবা, তার চার পাশ এবং সমগ্র মক্কা শহরের দৃশ্যাবলী বহুক্ষণ ঘুরে ঘুরে তারা ফিল্মে ধরে রাখল।

নামায শেষ হল পৌনে একটায়। নামায শেষ হতেই এসে হাজির হলাম মুয়াল্লিমের বাসায়। এখান থেকে পাকা খবর নিয়ে এলাম, হ্যাঁ কোন ভুল নেই— আজই হজ উপলক্ষে মিনায় যাত্রা করতে হবে রাত বারটায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম। আসরের পরই শুরু হল গোছগাছ। টুকিটাকি কেনাকাটা ছিল

সেরে নিলাম। মগরিবের পরে সবকিছু সম্পূর্ণ হয়ে গেল। যে মহাযাত্রার জন্য এত দূর পথ ছুটে আসা সেই শুভলগ্ন উপস্থিত। উত্তেজনায় আবেগে উল্লাসে ভয়ে এক রকম মিশ্র অনুভূতিতে দেহমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল বার বার। কথা বলছি, প্রয়োজনীয় কাজ করছি কিন্তু আমি নয়—আমার বদলে যেন অন্য কেউ এ কাজগুলি করছিল। আমার পা দুটিতে ভর দিয়ে যেন অন্য কেউ হাঁটছে। মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় বার বার চোখ দুটি ভিজে আসছিল। আমি আমার সকল আত্মা দিয়ে সকল চেতনা দিয়ে সকল সময় তাঁকেই স্মরণ করছিলাম।

ইতিমধ্যে মিসফালার মসজিদ থেকে এশার আজান ভেসে এল। ছুটে গিয়ে জামাতে নামায পড়ে নিলাম। ফিরে এসে পবিত্র যাত্রার জন্য সাবান মেখে অত্যন্ত ভাল ভাবে গোসল করে ফেললাম। এহরামের কাপড় পরে নিলাম তারপর। শ্বেত শুভ্র বসন, আত্মসমর্পণের অসামান্য সাধারণ লেবাস। আমার স্ত্রীও গোসল সেরে শ্বেত শুভ্র বসন পরিধান করে বেরিয়ে এলেন। তারপর দু রাকাত নামায পড়ে ঘরে বসেই এহরামের নিয়েত বাঁধলাম। হার্শায ইশরাত, গুজরাটি মহিলা—ওরাঁও ততক্ষণে নামায শেষ করে নিয়েত বেঁধেছেন। তারপর সদলবলে বিসমিল্লাহ বলে লাব্বায়েকের পথে অনন্তের পথে আত্ম-নিবেদনের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘড়িতে তখন রাত দশটা সাত মিনিট।

২০.

অবশেষে সেই চির বাঞ্ছিত মহাভিসার শুরু হয়েছে আমাদের। আমরা এখন মিসফালা থেকে মিনার সেই উজ্জ্বল পথে ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি। পবিত্র মক্কা নগরীর পথগুলি অতিক্রম করতে করতে আজ বড় বেশি করে রসুলুল্লাহর কথা মনে পড়ছিল। চতুর্দিক থেকে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এগিয়ে চলেছেন. মহাসাগরের বিপুল টানে অগনন ঝরণা যেন দশদিগন্ত হতে মহাউল্লাসে ছুটে আসছে, মহাকলরোল চারপাশে, লাব্বায়েক ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত—এই শব্দদীর্ণ উতরোল পথে চলতে চলতে আমার হৃদয়-মনে বার বার ভেসে উঠছিল বিদায় হজে রসুলুল্লাহর আলোকিত পবিত্র মুখটি, শুভ্র শ্বেত এহরাম পরিহিত আল্লাহর নবীর সেই বিশাল দীপ্ত চেহারাটি, লক্ষাধিক সাহাবার বিশাল কাফেলাসহ সেদিনও তিনি চলছিলেন মিনার পথে, লাব্বায়েক ধ্বনির বিপুল তরঙ্গে সেদিনও আলোড়িত হয়েছিল মরুর উতল হাওয়া।

সেই দিন. সেই পবিত্র দিন—

"আমি তো তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী রূপে এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী রূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে।" ৩৩ ঃ ৪৫-৪৬। রসুল করীম সম্পর্কে পবিত্রতম গ্রন্থ আল-কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা। প্রকৃতপক্ষে নবীজী এসেছিলেন নিখিল বিশ্বমানবের সৎপথের দিশারী হয়ে. তাঁদের জন্য আদর্শ শিক্ষক হয়ে। এতদিন তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়গুলি বিক্ষিপ্তভাবে নানান প্রসঙ্গে সাহাবীদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন—সাহাবীরা সংখ্যায় কখনও দু-জন, কখনও একজন, কখনও তিন-চার, কখনও বা একদলের একটা সমাবেশ—একটা জামাত। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাতের সম্মুখে এক সময় আদর্শগুলি তুলে ধরাই যথেষ্ট ছিল কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের পরিধি দূরবিস্তৃত হয়ে গেল অতি অল্প সময়ে। বিশেষ

করে অষ্টম নবম দশম হিজরিতে বিস্ময়কর রকম দ্রুততায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মহামন্ত্র ছড়িয়ে গেল আরবের বিভিন্ন গোত্রে, মরুর ধূলি ধূসর এলাকা ছাড়িয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল দূর সীমানায়।

অলৌকিক সেই ব্যাপ্তি, যেন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব কিংবা তারও অধিক—

তারেখ ইবনে আবদুল্লাহ হতবাক, মক্কার এক বাজার 'মাজাজে' দাঁড়িয়ে তিনি বিস্মিত, তাঁর প্রশ্ন-ব্যাকুল দৃষ্টিরা শ্রদ্ধায় নম্রনত, সম্ভ্রমে বিগলিত। তাঁর ভাষায়ঃ আমি দাঁড়িয়ে আছি মাজাজে। বাজারে তখন বেশ ভিড়। হঠাৎ নজরে পড়ল আশ্চর্য সুন্দর এক পুরুষ, সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল গৌরকান্তি, লম্বা পিরহান গায়ে ধীরে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সমগ্র অবয়বে অদ্ভুত একটা আলো যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেনঃ 'হে মানুষেরা! তোমরা বল, আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই! তা হলে সকলে নাজাত পাবে, সফলকাম হবে।' তিনি বলতে বলতে এগিয়ে যাচ্ছেন, ঠিক তাঁর পিছন পিছন ধাওয়া করে চলেছে আর একজন। সে কদর্য ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলছে. ভাইসব! তোমরা কেউ এই লোকটার কথা শুনো না, এ মস্ত বড় যাদুকর ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী। সে বলছে আর পাথর ছুড়ে মারছে। অথচ সেই প্রশান্ত মুখে কোন প্রতিবাদ নেই। জিজ্ঞেস করতে একজন বললেনঃ ইনি হাশেম বংশের সম্মানীয় মানুষ, নিজেকে আল্লাহর রসুল বলে ঘোষণা করেন আর দ্বিতীয় লোকটি তাঁর পিতৃব্য, নাম আবদুল ওজ্জা— আবু লাহাব।

অনেক বছর বিগত হল তারপর। অনেক ঝড় ঝাপটায় মরুর ধুলো-বালি ওলট-পালট হয়ে গেল প্রচুর। আমরা বনু সালাবা গোত্রের কিছু সংখ্যক মানুষ ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে খেজুর ক্রয়ের জন্য 'রাবযা' থেকে মদিনাভিমুখে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রীলোকও ছিল। মদিনার উপকণ্ঠে একস্থানে রাত্রি

যাপনের জন্য কাফেলা থামিয়ে রান্না-বান্নার আয়োজনে লিপ্ত হয়ে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল মূল্যবান লাল রঙের একটি দুর্লভ উট। হঠাৎ দেখি শুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক অভিজাত মানুষ এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালেন আমাদের তাঁবুর পাশে এবং অত্যন্ত হৃদয় স্পর্শী ভাষায় পরিচয়াদি জিজ্ঞেস করলেন। একসময় লাল উটের দিকে ইংগিত করে দাম জানতে চাইলেন। আমরা বললাম, এত মন খেজুর পেলে এটিকে বিক্রি করব। আশ্চর্য তিনি কোন রকম দ্বিরুক্তি না করে দামাদামীর ধারে কাছে না গিয়ে সেই মূল্যেই স্বীকার করে নিলেন এবং উটের নাসারজ্জু ধরে নগরের পথে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। তিনি চলে যেতে আমাদের খেয়াল হল যে আমরা কেউই লোকটিকে চিনি না। শেষ পর্যন্ত একটা ঠকবাজের পাল্লায় পড়ে এমন একটি দামী উট হারালাম বলে আমরা সকলে মিলে ভীষণ আক্ষেপ করছিলাম, এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁবু থেকে বাইরে এসে বললেন, তোমরা থাম ত বাপু। আল্লাহর কসম আমি জীবনে এমন সুদর্শন অভিজাত পুরুষ দেখিনি—এমন সম্ভ্রান্ত লোক কখনো প্রবঞ্চক হতে পারে না। তোমাদের টাকার জন্য আমি দায়ী রইলাম। তখনো আমাদের কথা আর বিলাপ শেষ হয়নি হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে বললেন, এই নিন আপনাদের খেজুর—লাল উটের দাম, আর উটের দামের সঙ্গে আপনাদের সকলের জন্য রাতের খানাও তোহফা স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন রসুলুল্লাহ। পরদিন আমরা মদিনায় প্রবেশ করলাম। মসজিদ নববীতে উপস্থিত হয়ে দেখি সেই অভিজাত মানুষটি মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকলকে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে লোক সকল! তোমরা দরিদ্র আর অভাবগ্রস্তদের দান কর, এ তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর। মনে রেখ, উপরের হাত (দাতার হাত) নিম্নের হাত (গ্রহীতার হাত অপেক্ষা উত্তম।

আমাদের দেখে জনৈক আনসার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইয়া রসুলুল্লাহ! এরা বনু সালাবার বংশধর। এদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের গোত্রের একজনকে ধরে হত্যা করেছিল সুতরাং এদের

একজনকে ধরে সেই হত্যার প্রতিশোধ নেবার হুকুম দিন।

এমন আকস্মিক অঘটনের জন্য সকলেই নির্বাক, কারো মুখে কোন কথা সরে না। সকলেই রুদ্ধশ্বাসে নবীজীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সেই আলোকিত পুরুষ হঠাৎ মুখ খুললেন, স্পষ্ট উচ্চারণে ঘোষণা করলেনঃ পিতার অপরাধে পুত্রের শাস্তি হতে পারে না।

তারেখ ইবনে আবদুল্লাহর প্রথম দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল রসুলুল্লাহর আশ্চর্য সহনশীল রূপ—যিনি অত্যাচারীত অথচ সত্য প্রচারে অটল। দ্বিতীয়বার তিনি দেখেছিলেন রসুল করীমের আর একরূপ—সবাই যখন প্রবঞ্চক তিনি তখন অবিশ্বাস্য রকম সত্যনিষ্ঠ। কোন ঠকবাজি প্রবঞ্চনা ছিল না তাঁর মধ্যে, তিনি সকলকে হতবাক করে কেবল উটের মূল্যই পাঠান নি—রাতের খাবারও উপঢৌকন স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তৃতীয়তঃ মসজিদ নববীর উপদেশ দান রত রসুলুল্লাহর আশ্চর্য কথাবার্তা আমূল হৃদয় স্পর্শ করেছিল। দীন দরিদ্রের জন্য এ ভাষায় কেউ তখন কথা বলত না মরুভূমিতে। শেষ পর্বে ন্যায় বিচারকের কণ্ঠে তারেখ ইবনে আবদুল্লাহ যেন নিশ্চিত মৃত্যুর জঠর থেকে নবজীবন লাভ করে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পক্ষে আর বিলম্ব করা সম্ভব ছিল না, কালেমা শাহাদাৎ কবুল করে তিনি আর এক জীবনে ফিরে এলেন। এই মহৎ জীবনের স্পর্শধন্য তারেখ এরপর প্রত্যাবর্তন করলেন আপন গোত্রে এবং অল্প সময়ের প্রচারে তাঁর একক প্রচেষ্টায় গোত্রের সকল আবিল প্রাণ সত্যালোকে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল, সর্বত্র ছড়িয়ে গেল সেই বিশাল জ্যোতিঃশিখা।

ইসলাম ছড়িয়ে গেল রসুল হত্যায় উদ্যত বনু হানিফার গোত্রেও।

মক্কা আর ইয়েমেনের মাঝখানে শস্য সম্পদে প্রাচুর্যময় ইয়ামামা, এই ইয়ামামায় বাস করত দুর্ধর্ষ বনু হানিফা। আরবের প্রতিটি গোত্র যখন একে একে ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছিল, বনু হানিফা তখন রসুলুল্লাহর সঙ্গে আমরণ যুদ্ধে লিপ্ত।

ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, এক যুদ্ধে এই গোত্রের প্রধান সর্দার সুমামা ইবনুল আদাল বন্দী হল মুসলমান সৈন্যদের হাতে ! সঙ্গে সঙ্গে তাকে আনা হল নবীজীর সম্মুখে, মসজিদ নববীর এক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিলেন রসুলুল্লাহ। ভাল করে তাকে খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলে এক সময় রসুল করীম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি বলতে চাও তুমি, কেমন ব্যবহার পেতে আশা কর এখন ? সর্দারের অবস্থা তখন রীতি মত সঙ্গীন, দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল ঃ আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন তা হলে প্রকৃত এক খুনীকে হত্যা করবেন, আর আমাকে যদি ক্ষমা করেন তা হলে একজন সত্যকার কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন, যদি মুক্তিপন নিতে চান বলুন কত টাকা নেবেন আমার গোত্রের লোকেরা তা শোধ করে দেবে। কথা শেষ করে সুমামা ইবনুল আদাল স্তব্ধ হয়ে গেল। সে জানত তার মত নিষ্ঠুর হত্যাকারীর জন্য মৃত্যু অনিবার্য। বহু মুসলমানকে সে সীমাহীন নির্মম অত্যাচারে জর্জরিত করে হত্যা করেছে। সুতরাং—

সব কথা শুনে নিরুত্তর থেকে মসজিদ ছেড়ে চলে গেলেন রসুলুল্লাহ। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও পরপর একই জিজ্ঞাসা এবং একই উত্তর। এই তিন দিন ধরে সুমামা সাহাবাদের পরম নিষ্ঠাভরে অজু করা, নামাযের জন্য অপেক্ষা এবং একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে নামায পড়া লক্ষ্য করল, লক্ষ্য করল কি সুদৃঢ় শৃঙ্খলার সঙ্গে এত বড় একটি দল পরিচালিত হচ্ছে। এই নিয়ম নিষ্ঠা, এই নিবিড় একাত্মতা সে তখন অন্য কোন ধর্মাবলম্বীর ভিতর দেখতে পায়নি। তৃতীয় দিন প্রশ্নের উত্তরে সুমামা যখন একই উত্তর দিল, রসুলুল্লাহ ক্ষণকালের জন্য একবার মুখটা তুললেন, তারপর পলকে দেখে নিলেন অসংখ্য মুসলমান হত্যাকারী সুমামা ইবনে আদলের ঘৃণ্য মুখটা, পিছনে সাহাবাদের উন্মুক্ত আন্দোলিত তরবারি। সেই নিবিড় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে রসুলুল্লাহ ঘোষণা করলেন ঃ আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম, যাও তুমি মুক্ত।

কিন্তু তখন আর কোথাও যাওয়া হয়ে উঠল না সুমামার—

নিকটবর্তী এক স্থান থেকে গোসল করে পাকসাফ হয়ে পবিত্র হস্ত মুবারক স্পর্শ করে উচ্চাবণ করল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ......

সুমামার প্রচেষ্টায় বনু হানিফা গোত্রের প্রতিটি সজীব ঠোঁটে উচ্চারিত হল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আকাশ-বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বার বাব উচ্চারিত হল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ— মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

জীবনের শত্রু হয়ে গেল আত্মার গৌরব। আত্মীয় হয়ে সে হয়ে গেল ইসলামের খাদেম।

ব্যক্তিগত চরিত্র এমনই পূর্ণাঙ্গ আর উন্নত স্তরে পৌঁছে ছিল যে জীবন কাঠির মত তা যখনই যাকে স্পর্শ করেছে তা নব চেতনায় জেগে উঠেছে। অষ্টম নবম দশম হিজরিতে এমনিভাবে রসূলুল্লাহর সঞ্জীবন স্পর্শে হাজারো ঘটনার মাধ্যমে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ইসলাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ইসলামের এই বিস্ময়কর ব্যাপ্তির কথা স্বয়ং আল্লাহই ঘোষণা করেছিলেন আল-কোরআনে ঃ

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীন বা ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করবে, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল।"

অনেকে মনে করেন যে এই সূরাটি বিদায় হজে আইয়ামে তাশরিকের দিন অবতীর্ণ হয়েছে কিন্তু অধিকাংশ তফসিরকার ও চিন্তাবিদদের মতানুযায়ী এই সূরাটির অবতরণ কাল হল বিদায় হজের পৌনে দুই বা দুই বছর পূর্বে, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে। একবার জ্ঞানীগুণী সাহাবাদের এক সমাবেশে হযরত উমর রা এই সূরাটির মর্মার্থ জিজ্ঞাসা করলে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন উত্তর আর মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা-ও এই জামাতে উপস্থিত ছিলেন কিন্তু নিতান্ত অল্প বয়স্ক হওয়ায় উত্তর দিতে সংকোচবোধ করছিলেন। অবশেষে খলিফার সস্নেহ উৎসাহে তিনি বলেন যে এই সূরাটি মৃত্যুর সঙ্গে

সম্পর্ক যুক্ত ; কেননা তসবীহ পাঠ এবং ক্ষমাপ্রার্থনায় মৃত্যুর পূর্বাভাস রয়েছে।

এই সূরা অবতীর্ণ হবার পর রসূলুল্লাহও উপলব্ধি করেছিলেন সূর্যাস্তে সন্ধ্যার আগমনের মত পৃথিবী হতে তাঁর মহাবিদায় আসন্ন হয়ে আসছে, যে কোন মুহূর্তে তিনি আপন প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। সুতরাং বেশি সংখ্যায় ক্ষমা প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবশিষ্ট পার্থিব কর্তব্যগুলি সম্পাদনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

অষ্টম নবম দশম হিজরিতে ইসলামের কল্পাতীত ব্যাপ্তি ও বিজয় অভিযানের পর এক বিশাল জনসমাবেশে ধর্মের মৌলবিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হল। এমন গণসমাবেশ চাই যে সমাবেশে সকল মহল্লা, সকল গোত্র, সকল বর্ণ, সকল এলাকার মানুষ উপস্থিত থাকবে, সকলের সম্মুখে রসূলুল্লাহ ব্যক্ত করবেন ইসলামের মৌলনীতি ও চিরন্তন আদর্শগুলি।

হিজরতের পর দশম হিজরি পর্যন্ত রসূলুল্লাহ একবারও পূর্ণাঙ্গ হজ করতে পারেন নি, যতবার চেষ্টা করেছেন মক্কার কুরেশরা তাঁকে সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করেছে, প্রতিবারই কোন না কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে রসূলুল্লাহকে কাবার জিয়ারতের সুযোগটুকু পর্যন্ত দেয়নি তারা। মক্কা বিজয়ের পর, নবম হিজরিতে হজ আদায় করা ফরজ হল, তখন অবশ্য হজ করার কোন বাধা ছিল না কিন্তু সে সময় পৌত্তলিক নরনারীগণ উলঙ্গ হয়ে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করত, সম্ভবতঃ এই দৃশ্য রসূলুল্লাহ নিজ চোখে দেখতে চাননি। তাই নবম হিজরিতে হযরত আবুবকরের নেতৃত্বে তিন শো মুসলমানের একটি দল হজব্রত সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে প্রেরণ করেন। তাঁদের বহির্গমনের কয়েক দিন পর হজ সংক্রান্ত একটি জরুরি আয়াত অবতীর্ণ হল, আল্লাহর সেই নির্দেশকে সর্বসমক্ষে ঘোষণার জন্য দ্রুতগামী উটের পিঠে রসূলুল্লাহ স হযরত আলি রা-কে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে। হজ

সমাধা হবার পর তিনি মিনার বিশাল প্রান্তরে উদাত্ত কণ্ঠে সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা করলেন ঃ

ক, এখন থেকে আর কোন পৌত্তলিক কাবায় প্রবেশ এবং হজ করতে পারবে না, তাদেব পক্ষে কাবায় প্রবেশাধিকার চিরকালের জন্য রহিত হযে গেল।

খ· এখন থেকে কোন নরনারী উলঙ্গ অবস্থায় এই পবিত্রগৃহ প্রদক্ষিণ করতে পারবে না।

সুতরাং যে অশালীন পরিবেশের জন্য রসূলুল্লাহ্‌র মনে কিছুটা দ্বিধা ছিল, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌ তা বিদূরিত করলেন—এখন আর হজে যেতে কোন অসুবিধাই রইল না। এই পরিপ্রেক্ষিতে দশম হিজরির শেষের দিকে সর্বজন সমক্ষে ঘোষণা করা হলঃ এবার রসূলুল্লাহ্‌ হজে যাবাব নিয়ত করেছেন সুতরাং যাঁরা সঙ্গী হয়ে সৌভাগ্যলাভ করতে চান—প্রস্তুত হোন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দিকে দিকে কল্পনাতীত সাড়া পড়ে গেল। নিস্তব্ধ দীঘিতে কোন ভারি বস্তু পড়লে যেমন উত্থিত তরঙ্গমালা বলয়ের আকারে কিনারা পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়, এই ঘোষণায় আরবের প্রতিটি মানুষের মন তেমনি আবেগে উল্লাসে আন্দোলিত ও আলোড়িত হয়ে উঠল। হেজাজের পথে প্রান্তরে আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ বয়ে গেল। এই সীমাহীন উৎসাহ উদ্দীপনার অন্তরালে অবশ্যই কয়েকটি কারণ ছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল মক্কা বিজয়ের পরে। মক্কার ঐতিহাসিক বিজয়ের পর এই প্রথম মুসলমানেরা সমবেতভাবে এই পবিত্র নগরীতে একত্রিত হবার সুযোগ পাচ্ছেন। নবম হিজরিতে হজ ফরজ হবার পর সকল মুসলমানই মনে মনে এই মহান কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন—রসূলুল্লাহ্‌র অহ্বানে সকলে যেন নব উদ্দমে গতিশীল হয়ে উঠলেন। এ ছাড়াও বহু গোত্রের বহু মানুষ তখনও পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্‌কে প্রত্যক্ষ করেন নি এই উপলক্ষে সেই পবিত্র দিদারের জন্যেও সকলেই উন্মুখ হয়েছিলেন। এই মানসিক প্রস্তুতির পটভূমিতে যখন হজের কথা ঘোষিত হল, চারদিকে সাজ সাজ রবে আরব

প্রান্তর মুখরিত হয়ে উঠল। অল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যাকুল যাত্রীদের আগমনে মদিনার ময়দান পরিপূর্ণ হয়ে গেল। সমবেত যাত্রীদল রসুলুল্লাহ্‌র আগমন প্রত্যাশায় গভীর আগ্রহের সঙ্গে উন্মুখ হয়ে রইলেন।

মিসফালা থেকে মিনার বালুময় ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে হতে আমার চোখে বার বার সেই মহাযাত্রার ছবি ভেসে উঠছিল, আমি যেন সকল কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। রসুলুল্লাহ্‌র এই বিদায় হজ ছিল আমাদের সকলের জন্য আদর্শ হজ। হজের যা কিছু করণীয়, যা কিছু শিক্ষার, যা কিছু ত্যাজ্য সব কিছুই আমরা বিদায় হজকে অনুসরণ করলে আনুপুঙ্খ পেয়ে যাই। আদর্শ শিক্ষকরূপে আদর্শ সঙ্গীরূপে—এই হজে তিনি সকল কিছুর উত্তম নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন। আমাদের পিপাসিত মনে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগেঃ কেমন ছিল তাঁর সেই যাত্রা? কত লোক সঙ্গী হয়েছিল তাঁর? কোন পথে অগ্রসর হয়ে ছিলেন তিনি? অবস্থান করে-ছিলেন কোথায় কোথায়? কেমন ভাবে সম্পন্ন করেছিলেন হজ? কোন ভাষণ দিয়েছিলেন আরাফাতেব ময়দানে? মিনায়? মুযদা-লেফায়? কোন আদর্শ তুলে ধরেছিলেন লক্ষাধিক সাহাবার সম্মুখে?

বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থের নানান অধ্যায়ের বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে সে ইতিবৃত্ত কিন্তু আমার মত অশিক্ষিত একজন মানুষের কাছে আক্ষেপের বিষয় ঃ বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এই হজের আনুপূর্বিক কোন বিবরণ একত্রে প্রকাশিত হয়নি। মরহুম আকরম খানের মোস্তাফা রচিত বা গোলাম মোস্তাফা রচিত বিশ্বনবীতে বিদায় হজের যে বিবরণ পাই তা একেবারেই আংশিক, কিছুটা তথ্য আছে মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনুদিত সিরাতুন নবীর দ্বিতীয় খণ্ডে। কোন যোগ্য মানুষ এই কাজটি সম্পন্ন করলে জ্ঞানপিপাসু মানুষের, সমগ্র জাতির বড় উপকার করবেন।

দশম হিজরি ছাব্বিশ জিলকদ শনিবার গোসল করলেন রসুলু-

ল্লাহ্। তারপর জামা কাপড় পরে মসজিদ নববীতে জোহরের নামায আদায় করলেন সকলের সঙ্গে। নামাযের পর হজের উদ্দেশ্যে মদিনা হতে আল কাসওয়া নাম্নী উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে শুরু করলেন সুদীর্ঘ যাত্রা।১ এই হজে তিনি তাঁর সকল সহধর্মিনীকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।২ মদিনা হতে যখনই তিনি বাইরে যেতেন, শাজারার পথ (বৃক্ষবহুল পথ) অনুসরণ করতেন।৩ আজও তিনি সেই পথেরই রাহী মুসাফির। অসংখ্য সাহাবীসহ বৃক্ষবহুল শাজারার পথ ধরে তিনি এগিয়ে চললেন পবিত্রভূমি মক্কার পথে।

আল কাসওয়ায় চড়ে রসূলুল্লাহ্ স চলেছেন ধীর স্থির, তাঁর সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে সহস্র সহস্র ভক্ত মানুষ, হজযাত্রী। প্রত্যক্ষদর্শী পুণ্যাত্মা সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ রা বলেনঃ আমি প্রান্তরে উপনীত হয়ে দেখলাম হযরতের অগ্রে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে যতদূরে দৃষ্টি যায় কেবল মানুষ আর মানুষ, উদ্বেলিত জনতা আর জনতা, সমগ্র প্রান্তর পরিপূর্ণ, একেবারে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। মুসলিম শরীফ। কাফেলা যত এগিয়ে গেছে লোক সংখ্যা বেড়েছে ততই। মহাসাগরে মিলিত হবার পথে নদী যেমন ক্রমান্বয়ে অসংখ্য উপনদী খাল বিলের ছুটন্ত পানিতে পরিপুষ্ট আর স্ফীত হতে থাকে, এই দীর্ঘ যাত্রার পথ-প্রান্তরে উভয় দিক থেকে ক্রমাগত বিভিন্ন গোত্র ও কবিলার মানুষের ব্যাকুল সম্মিলনে এই পবিত্র কাফেলার জন সংখ্যাও বিস্ময়করভাবে বেড়ে চলল। ক্রমবর্ধমান এই যাত্রীদলের সঙ্গে মক্কার মানুষেরা যোগদান করলে সংখ্যা গণনার বাইরে চলে গেল। নির্দিষ্টভাবে জনসংখ্যার হিসাব রাখার কোন ব্যবস্থা তখন না থাকলেও এই সংখ্যা ন্যূনাধিক দু লক্ষ বলে অনুমান করা হয়। মদিনা থেকে বহির্গমনের সময় লোক সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার, চলার পথে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় প্রায় দেড় লক্ষ, মক্কা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষেরা যোগ দেওয়ায় এই সংখ্যা দাঁড়িয়ে যায় আনুমানিক দুই লক্ষে।

মসজিদ নববী থেকে যাত্রা করে ছ মাইল দূরবর্তী যুলহুলাই-ফাতে পৌঁছে আসরের নামায পড়লেন রসূলুল্লাহ স। কিছু পরে

সন্ধ্যা নেমে এল। তিনি সকলকে সেখানেই রাত্রি যাপনের নির্দেশ দিলেন। ধীরে ধীরে গভীর হয়ে এল রাত, মাথার উপর সুনীল আকাশে অসংখ্য তারার ঝিকিমিকি, নিম্নে যুলহুলাইফার কল্যাণ-ময়ও মৃত্তিকায় লক্ষ হৃদয়ে আল্লাহ নামের বিজয় ঘোষণা। বহুকাল পরে মরুর বুকে যেন এক বেহেশতি আঞ্জাম।

দ্বিতীয় দিনের প্রত্যূষে রসূলুল্লাহ স আবার গোসল করলেন। উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা নিজ হাতে নবীজীর শরীরের সর্বত্র সুগন্ধি মাখিয়ে দিলেন। হুযুর স দু রাকাত নামায পড়লেন তারপর তাঁর প্রিয় উষ্ট্রী আল কাসওয়া প্রস্তুত হয়েই ছিল, তার পৃষ্ঠে আরোহণ করে এহরাম বাঁধলেন তিনি। এহরামের বস্ত্র পরিধান ও নিয়তের পর উচ্চস্বরে শুরু করলেন তালবিয়া পাঠঃ "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা লা-শারিকালাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নেয়মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লাকা লা-শারিকালাকা—"

"হে আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির হে আল্লাহ! আপনার কোন অংশী নেই। নিশ্চয়ই প্রশংসা ও নিয়ামত আপনারই। রাজত্ব এবং সার্বভৌমত্ব আপনারই। এতেও কোন অংশী নেই।"

কয়েক হাজার বছর পূর্বে খানায়ে কাবার ভিত্ত স্থাপনের পর সর্বশক্তিমান আল্লাহর নির্দেশ হযরত ইবরাহিম আ নিখিল বিশ্বের মানুষকে হজের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহিম আ-এর মাধ্যমে এই আহ্বান ছিল স্বয়ং আল্লাহর আহ্বান। সেই কালজয়ী আহ্বান যা স্থান কালপাত্রের সীমানা অতিক্রম করে আজও শাশ্বত হয়ে আছে তারই প্রতি আন্তরিক সাড়া প্রদান করে আল্লাহর রসূল বলে উঠলেনঃ আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন—আমি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজির হয়েছি। যে আদেশই আপনি করুন—আমি নির্দ্বিধায় তাই পালন করতে প্রস্তুত।

রসূলুল্লাহ স যখন তালবিয়া পাঠ করেন, অসংখ্য ভক্তের কণ্ঠে তার ধ্বনি ওঠে। প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবী বলেনঃ আল্লাহর রসূল যখন উচ্চরবে লাব্বাইকা বলতেন, লক্ষ কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি জাগত আর সেই প্রতিধ্বনিতে মাঠঘাট পথপ্রান্তর পাহাড় পর্বত যেন

আবেগে গুঞ্জরণ করে উঠত, চতুর্দিকেই ধ্বনিপ্রতিধ্বনিরা বিপুল তরঙ্গের মত ঢেউ খেলে আন্দোলিত হয়ে ফিরত।

যুলহুলাইফাতে এসে রসুলুল্লাহ স এহরাম বেঁধেছিলেন, সেই থেকে মদিনাবাসীদের জন্য এবং বিশ্বের যে কেউ এ পথে হজের উদ্দেশ্যে মক্কাভিমুখে গমন করবে তাদের সকলের জন্য এই স্থানটি, এই যুলহুলাইফা হল এহরাম বাঁধার স্থান, এ অতিক্রম করার পূর্বে সকলকে এহরাম বেঁধে নিতে হবে।

এহরাম পরিধানের পর সকলের লেবাস হয়ে গেল এক, দু খন্ড শ্বেত বস্ত্রই সকলের সম্বল। আজ আর কারো মধ্যে কোন পার্থক্য রইল না, সব ব্যবধান অবলুপ্ত হয়ে আমীর-ফকীর, ভিখারী-বাদশা, গোলাম-মনিব, ক্রীতদাস-কুরেশ, আনসার-মোহাজের, ইতর-ভদ্র, ধনী-দরিদ্র একাকার হয়ে গেল। এক অসামান্য সাম্যের রূপ ফুটে উঠল মরুপ্রান্তরে। সকলের হৃদয়ে আজ একই আশা, মুখে একই ভাষা। সকলেই বিভোর একই স্বপ্নে, একই ধ্যানে, একই বাসনায়। সকলেই চলেছেন একই লক্ষ্যে, একই মাকসাদ মঞ্জিলে। আজ কোথাও কোন পার্থক্য নেই, কোন ব্যবধান নেই, নেই কোন মতবিরোধ। ইসলামের একটি বড় শিক্ষা সাম্যবাদ, হজের একটি প্রধান শিক্ষাও তাই। এই মহাযাত্রায়, এই বিশাল কাফেলার প্রতিটি মানুষের মধ্যে সেই সাম্য যেন অবিস্মরণীয় ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়ে উঠল। লাব্বায়েকের আবেগ মধুর প্রাণ উজাড় করা গুঞ্জরণের ভিতর দিয়ে সকলেই এগিয়ে চল-লেন কাবার পথে।

রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে কুরবানীর পশু ছিল, যুলহুলাইফার পরই তিনি এদের গলায় রুমাল বেঁধে দিলেন।৫

যাত্রা পথেই অতিবাহিত হল কয়েকটি দিন। সকলেরই নগ্ন পদ, নগ্ন মস্তক। উপত্যকা-অধিত্যকা অতিক্রমণের সময় কখনো যাত্রীদল চড়াইয়ে উঠেছেন কখনো উৎরাইয়ে অবতরণ করছেন—ঠিক যেন একটি তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ছেন সকলে। আর প্রতিটি আরোহণ-অবরোহণে দু লক্ষ ভক্তের লাব্বায়েক ধ্বনিতে হেজাজের প্রান্তর আলোড়িত হয়ে উঠছে বার বার।

অষ্টম হিজরির মক্কা বিজয়ের সময় রসূল পাক যে সব স্থানে বিশ্রাম এবং রাত্রিবাসের জন্য অবস্থান করেছিলেন, মুসলমানেরা বরকত ও সমৃদ্ধির আশায় সে সমস্ত স্থানে এক একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন—আজ মহাহজে যাওয়ার পথে রসূলুল্লাহ স সেই নবনির্মিত মসজিদগুলিতে ক্রমান্বয়ে নামায আদায় করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

এক সময় রসূলুল্লাহ স লক্ষ্য করলেন যে কোন এক হজ যাত্রীর সঙ্গে কুরবানির উট রয়েছে অথচ লোকটি তার পিঠে আরোহণ না করে অসীম ধৈর্য ও কষ্ট স্বীকার করে হেঁটে চলেছে। দূর-দূরান্ত মরুপথ অতিক্রম করেই এসেছিলেন লোকটি। প্রকৃতপক্ষে এই কষ্ট স্বীকারের মূল কারণ হল সে সময় হজ যাত্রীরা অন্ধকার যুগের ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ মনে করত কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট পশুটি যেহেতু আল্লাহর নামে উৎসর্গীকৃত, তার পিঠে চড়া উচিত নয়। রসূলুল্লাহ সেই ধূলি ধূসর লোকটির দিকে তাকালেন, তার দূরবস্থায় মর্মাহত হলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন, আরোহণ কর। উত্তরে বিনীতভাবে লোকটি বলল, হুযুর এটি কুরবানির উট। দ্বিতীয়বার হুযুর আকরাম স বললেন, আরোহণ কর। এবারেও লোকটি উত্তর দিল, হুযুর এটি কুরবানির উট। ভাল কথায় এই অন্ধ বিশ্বাসের ঘোর কাটছে না দেখে তৃতীয়বারে হুযুর আকরাম স রীতিমত ধমক দিয়ে বললেন, এর পিঠে বস। বু· শ· হাদিস সংখ্যা ১৫৭৩-৭৪

ইসলাম অহেতুকভাবে ধর্মের নামে কষ্ট স্বীকারে মানুষকে প্ররোচিত করে না।

যে পথ দিয়ে রসূলুল্লাহ স হিজরত করেছিলেন আর যে পথ অতিক্রম করে মক্কা বিজয়ের সেনাবাহিনী অগ্রসর হয়েছিল, কোথাও কোথাও ভিন্ন হলেও অধিকাংশ স্থানে পথ দুটি ছিল একই। প্রকৃতপক্ষে মহাহজের পথটি ছিল হিজরতের পথ। এই পথ ধরে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে হযরত মোস্তফা স দু লক্ষের সুবিশাল কাফেলা নিয়ে মঞ্জিলে মাকসাদের অদূরবর্তী 'সরফ'-এ এসে উপস্থিত

হলেন। সে দিন ছিল জিলহজ মাসের তিন তারিখ, শনিবার। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছিল সুতরাং এখানেই তিনি কাফেলাসহ রাত্রি যাপন করলেন। যাঁদের সঙ্গে কুরবানীর পশু নেই তাঁদের তিনি উমরার নিয়েত করার নির্দেশ দিলেন।৬ পরদিন ভোরে সুবেহ সাদেকের সোনালি মুহূর্তে ফজরের নামায পড়ে গোসল করলেন রসুলুল্লাহ স। গোসলের৭ পর মহাযাত্রার শেষ পর্বটির প্রস্তুতির জন্য নির্দেশ দিলেন সকলকে। যাত্রীদলের মধ্যে আনন্দরোল পড়ে গেল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা পেঁাছে যাবেন মহাতীর্থ কাবায়। অধীর উল্লাসে তাঁরা কাঁপছিলেন। ঘন আবেগে ভোরের শিরিন আযানের মত তাঁদের কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল তালবিয়া। ধীরে ধীরে কাফেলা পবিত্র মক্কা নগরীর সীমানার মধ্যে এসে পড়ল। উচ্চ উপত্যকা সানিয়াতুল উলইয়ার কাদা৮ নামক স্থানের উপর দিয়ে মক্কা মুয়ায্যমায় প্রবেশ করলেন রসুলুল্লাহ স। আর এই পবিত্র দিনটি হল জিলহজ মাসের চার তারিখ, রবিবারের আলোকোজ্জ্বল এক আশ্চর্য সকাল। সুতরাং মদিনা মনোয়ারা হতে মক্কা মুয়ায্যম এই সুদীর্ঘ দু শো সত্তর মাইল মরু পথের যাত্রাটি সমাপ্ত হল ন দিনে।

মক্কার পথঘাট অতিক্রম করতে করতে আপন জন্মস্থানের সন্নিকটে এসে গেলেন রসুলুল্লাহ স, আত্মীয়-স্বজনের ঘরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হল, পরিচিত-জনদের দেখা গেল—এই ত সেই পথঘাট, গাছপালা পাহাড়ি উপত্যকা—কতদিন এখানে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন, সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে খেলা করেছেন মা আমিনার কোলে আনন্দ করেছেন—শত্রুরাও তাড়া করে ফিরেছে এই পথে আর এই পথের ধূলিতেই মিশে আছে তাঁর দেহের পবিত্র রক্তবিন্দুও। এই সেই পরিচিত পথ! এই সেই প্রিয় জন্মভূমি!! এর প্রতি ধূলিকনায় কত আনন্দ কত বেদনা, কত স্মৃতি কত সান্ত্বনা! স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে সম্ভবতঃ রসুলুল্লাহ স কিছুটা বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন, এক সাহাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! মক্কায় আপনি আপনার বাড়িতেই অবস্থান করবেন ত? কত দূর থেকে যেন বাস্তবের মাটিতে ফিরে এলেন আল্লাহর রসুল। বললেন, আকীল

(জবর দখলকারী) কি আর ঘরবাড়ির কিছু অবশিষ্ট রেখেছে?৯ উত্তর দিয়ে নবীজী আবার তন্ময় হয়ে গেলেন অতীত দিনের স্মৃতিতে। হঠাৎ ভোরের শিউলির মত তাজা শিশু কণ্ঠের একরাশ উচ্ছ্বাসে সচকিত হলেন রসূলুল্লাহ স। তাঁর আগমন সংবাদে আত্মহারা হাশেমি গোত্রের—যে বংশে তিনি জন্মেছিলেন—শিশুরা দলবন্ধ হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। সেই সুকোমল গৌরবর্ণ আরবী শিশুরা ছন্দবন্ধ হয়ে তালে তালে নাচছে। কি খুশি! কি খুশি!! ডানা খোলা প্রজাপতির অপরূপ রঙগুলি যেন উড়ে এসেছে তাদের চোখে মুখে! কণ্ঠে তাদের কোমল অনুনয়—একটু নামুন না ইয়া রসূলুল্লাহ।

জব্বুল কুবাসের পাদদেশে ঐ ত তাঁর জন্মগৃহটি। রসূলুল্লাহ স সত্যসত্যই নেমে পড়লেন উট থেকে। তাঁর গোপন হৃদয়ে আজ এক বহুবাঞ্ছিত প্রাপ্তির আন্দোলন। আল কাসওয়া থেকে নেমে তিনি শিশুদের মাঝে ক্ষণিক আর এক শিশু হয়ে গেলেন। কার মাথাটা ছুঁয়ে দিলেন, কার হাতটা ধরলেন সস্নেহে, আদর করে চুমু খেলেন কারও মুখে, কোলে নিলেন কয়েকজনকে—এক আকাশ ঝিকমিক তারার মাঝে বিশ্ব আলো করা পূর্ণিমা হয়ে দাঁড়ালেন কয়েক মুহূর্ত, স্মিত হাসলেন, তারপর কাকেও উটের সামনে কাকেও উটের পিছনে১০ তুলে নিয়ে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। জীবনে কোন দিন থেমে থাকেন নি তিনি, থেমে থাকা তাঁর কাজ নয়—শিশুদের কলরোল পিছনে ফেলে তিনি এগিয়ে চললেন বায়তুল্লার দিকে।

অনতিদূরেই খানায়ে কাবা—আল্লাহর গৃহ। সুতরাং বাঞ্ছিত ধন অচিরেই দৃষ্টি গোচর হল। নিখিল বিশ্বের এই পবিত্রতম গৃহটি দৃষ্টি পথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেগে ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি বলে উঠলেন, ইয়া আল্লাহ! এই গৃহকে আরো ইজ্জত দিন! আরো সম্মান দিন!!

কাবায় পেঁছেই তিনি প্রথমে অযু১১ করলেন। অযু সমাপ্ত হলে পুনরায় আল কাসওয়ার সওয়ার হলেন আর এ অবস্থাতেই

কাবা শরীফ তওয়াফ করলেন। বিদায় হজের বিস্ময়কর জনসমাবেশ ও ভিড়ের জন্যেই সম্ভবতঃ রসূলুল্লাহ্ উটের পিঠে চড়ে তওয়াফ করেছিলেন। প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য উটের উপর থেকে লাঠির সাহায্যে হাযরে আসোয়াদে ইশারায় চুমু খেয়েছিলেন তিনি!

আজকাল অনেক হজযাত্রী নিজ হাতে এবং মুখে হাযরে আসোয়াদে চুম্বন দেওয়াকে এমন অপরিহার্য মনে করেন যে এটি না হলে তাঁদের মতে হজ সম্পূর্ণ হয় না। আর এ জন্যে তাঁরা অসংখ্য হাজিকে লাথি মেরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে, কখনো কখনো রক্ত-পাত ঘটিয়ে আদিম পশুর মত হাযরে আসোয়াদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন। একটি মাত্র সুন্নত আদায় করতে গিয়ে আল্লাহর বহু আদেশ অবলীলায় লঙ্ঘন করে বহুগুন শক্ত কবিরাহ গোনাহর কলঙ্কিত বোঝা মাথায় করে হজ থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। আমরা যেন কখনো ভুলে না যাই বিদায় হজে রসূলুল্লাহ স লাঠির সাহায্যে ইশারায় এই পবিত্র কৃষ্ণ প্রস্তরে চুম্বন দান করেছিলেন। এবং প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সকলের উচিত ইশারায় চুম্বন দান করা। সহী বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস রা-র বর্ণনা এইঃ "বিদায় হজের সময় নবী স তাঁর উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে তওয়াফ করেছেন এবং লাঠির সাহায্যে হাযরে আসোয়াদে চুমু দিয়েছেন।" বু· শ,১৫০৩।

বিদায় হজের রসূলুল্লাহ স কেন যে উটের পিঠে চড়ে তওয়াফ করেছিলেন এখন তা বলা মুস্কিল, তবে মনে হয় উটের পিঠে থাকায় বিশাল দলটি পরিচালনায় তাঁর অধিকতর সুবিধে হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ এই হতে পারে, তওয়াফের সময় যে সব বেদায়াত এবং অন্যায় আচরণাদি অনুষ্ঠিত হত সেগুলি যাতে না হতে পারে সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখা সহজ হয়েছিল তাঁর। উলঙ্গ হয়ে তওয়াফের ঘৃণ্য প্রথাটির কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। একমাত্র অভিজাত কুরেশ ছাড়া বহিরাগত অন্য সকল নরনারী হেরেমের সীমানার মধ্যে এসে গাত্রাবরণ খুলে ফেলে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যেত। এই উলঙ্গ অবস্থায় তারা কুরেশদের কাছে কাপড়ের জন্য হাত পাতত। দয়া-পরবশ হয়ে কুরেশরা পছন্দমত দু-একজনকে কাপড় দিত আর অন্য

সকলে উলঙ্গ অবস্থায় কাবা শরীফ তওয়াফ করত।

তওয়াফ করতে করতে ভক্তিভরে আবৃত্তি করতঃ "আল ইওমা ইয়াদু বায়াদুহুম আওকুল্লোহু, অমা বাদা মেনহু ফালা উহেল্লাহু" —আজ তার (দেহের) কিছু অংশ পূর্ণ প্রকাশিত হবে, তার (দেহের) যে অংশ প্রকাশিত হবে আমি তা ভোগ করব না। এই জঘণ্য প্রথা সমূলে উৎখাতের জন্য অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ "ইয়া বানি আদামা খুজু জিনাতাকুম এনদা কুল্লি মসজিদ" (সূরা আরাফ)—হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেকে মসজিদে পরিচ্ছদ পরিধান করে এস। এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পর নবম হিজরিতে হযরত আলি রা-কে সর্বজন সমক্ষে ঘোষণার জন্যে পাঠিয়েছিলেন রসূলুল্লাহ। আর সঙ্গে সঙ্গে, প্রদীপ নিভে যাবার মত অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই প্রথা।

আর একটি কুপ্রথার দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখার জন্যেও হয়ত রসূলুল্লাহ উটের পিঠে চড়ে তওয়াফ করে থাকবেন। এটি এমন একটি জঘণ্য প্রথা যে এর দ্বারা সকলে হজের মূল লক্ষ্যকে ধ্বংস করে ফেলত। আমরা বার বার অবগত হয়েছি যে হজের মাধ্যমে আমরা একান্তভাবে একমাত্র আল্লাহকেই স্মরণ করি এবং পরিপূর্ণ রূপে তাঁতেই আত্মলীন হয়ে যাই। কিন্তু অন্ধকার যুগে আরব-বাসীরা পবিত্র কাবাগৃহের সম্মুখে একত্রিত হয়ে আল্লাহকে বিস্মৃত হয়ে আপন পিতা-পিতামহাদির কথা স্মরণে এবং সাড়ম্বর প্রচারে আত্মনিয়োগ করত, হজের পবিত্র সমাবেশে এই ছিল তাদের প্রধানতম কাজ। এই আত্মহননকারী প্রথার বিরুদ্ধে বজ্র নির্ঘোষ শ্রুত হলঃ "যখন তোমরা (হজের) অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করে নেবে, তখন আল্লাহকে এমন ভাবে স্মরণ করবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষকে স্মরণ করতে অথবা তদপেক্ষা গভীরভাবে"—২ঃ২০০। এরপর থেকে প্রতিটি তীর্থযাত্রী পূর্বপ্রথা পরিত্যাগ করে কি তওয়াফে, কি কাবার সম্মুখে, কি মিনায়, কি আরাফাতে, কি মুযদাফেলায়—সর্বত্রই গভীরভাবে একমাত্র আল্লাহতে আত্মমগ্ন হয়ে যান।

উষ্ট্রীর উপর থেকে তওয়াফ করার জন্য প্রথম তিন শাওতে (চক্র বা পরিক্রমায়) রসুলুল্লাহ স রমল (বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাব ভংঙ্গিতে দুই কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে বীরের মতন বুক ফুলিয়ে দ্রুততালে চলা) করেছিলেন কিনা তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না কিন্তু যতবারই তিনি হেঁটে তওয়াফ করেছেন প্রথম তিন চক্রে রমল করেছেন এবং এভাবে সকলকে প্রথম তিন চক্রে রমল করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এই রমলেরও একটি ইতিবৃত্ত আছে।

মদিনায় হিজরত করার পর সকল মুহাজির স্থানীয় আবহাওয়া সহ্য করতে না পারায় অল্প-বিস্তর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আর এই জ্বরজারি দীর্ঘদিন চলতে থাকে। এই অবস্থায় সকলেই বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। ষষ্ঠ হিজরীতে কুরেশদের প্রবল শত্রুতার মধ্যে রসুলুল্লাহ স হজের মানসে হুদাইবিয়া পর্যন্ত আগমন করেও হজ না করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। সপ্তম হিজরীতে চুক্তি মোতাবেক এই কাজা হজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে অগণন সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মোস্তফা স যখন কাবায় এলেন, পৌত্তলিক কুরেশরা কটাক্ষ করে বলতে শুরু করলঃ "এমন একদল লোক তোমাদের এখানে এসেছে, মদিনার জ্বর যাদের হীন ও দুর্বল করে দিয়েছে। (এ কথা শুনে) রসুলুল্লাহ স সকল সাহাবাকে প্রথম তিন শাওতে (কাবার চারদিকে একবার পরিক্রম করাকে এক শাওত বলে) রমল কবতে নির্দেশ দিলেন।" বু· শ· ১৪৯৮। রমল অর্থাৎ বীর যোদ্ধার মত বুক ফুলিয়ে দু কাঁধ হেলিয়ে দুলিয়ে দ্রুত চলার নির্দেশ দেওয়ার অর্থই হল এইভাবে চলতে দেখলে অসংখ্য যুদ্ধজয়ী মুসলিম বীরদের দৈহিক শক্তি, বীরত্ব ও সাহসিকতার নিদর্শন পেয়ে মুশরিক কুরেশদের কটাক্ষ ও কটূক্তি স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং তারাও মনে মনে এই অসমসাহসী বীরদের দাপটের কাছে শক্তিহীন, ভীত ও দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই থেকে তওয়াফে এই রমল প্রথা চালু হয়েছে।

এখানে বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে পরিপ্রেক্ষিতে রমল

করার প্রয়োজন হয়েছিল, পরবর্তিকালে তা সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের পর প্রায় সকল কুরেশই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, অন্ততঃ কোন মুসলমানকে কটাক্ষ করার মত একজন শক্তিমান পৌত্তলিকও আর অবশিষ্ট ছিল না। তবু, যেহেতু রসুল পাক স্বয়ং রমলের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তওয়াফের মধ্যে সে কারণে আজও রমল বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের একটি বিখ্যাত হাদিস স্মরণীয়ঃ "কোন এক হজের সময় উমর ইবনে খাত্তাব রা বলেন, এ রমল করাতেই বা আমাদের কি প্রয়োজন? হাঁ এর দ্বারা আমরা মুশ-রিকদের (বীরত্বব্যঞ্জক ভাবভঙ্গি) দেখিয়েছি। এখন, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, এটি এমন একটি বিষয় যা রসুলুল্লাহ স করেছিলেন। অতএব এটা পরিত্যাগ করা আমরা পছন্দ করি না।" বু· শ· ৫১০১।

তওয়াফ সমাপ্ত হলে মাকামে ইবরাহিমের সন্নিকটে গিয়ে কালাম পাক থেকে এই আয়াত শরীফ পাঠ করলেন রসুলুল্লাহ সঃ "অত্তাখেজু মেম মাকামে ইবরাহিমা মুসাল্লা"—মাকামে ইবরাহিমকে প্রার্থনার স্থান কর। সুরা বাকারাহ থেকে এই অংশটুকু পাঠ করে আল্লাহর নির্দেশ মত মাকামে ইবরাহিমকে সম্মুখে রেখে কেবলা মুখী হয়ে দু রাকাত নামায আদায় করলেন। সায়ীর জন্য এরপর তিনি গমন করলেন সাফা পর্বতের দিকে।১১২ সাফা পর্বতে উপস্থিত হয়েই তিনি পাঠ করলেন সুরা বাকারার এই অংশটুকুঃ "ইন্নাস সাফা অল মারঅতা মেন শায়ায়েরিল্লাহ"—নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত।

সাফা মারওয়া সম্পর্কিত এই আয়াতটি অবতীর্ণ হবার কারণটিও আমরা এই প্রসঙ্গে জেনে নিতে পারি। সাফা ও মারওয়া কাবা শরীফের নিকটবর্তী দুটি পাহাড়ের নাম, বর্তমানে যা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রসুলুল্লাহর পূর্বে পৌত্তলিকতা যখন প্রবল-ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তখন স্থানীয় অধিবাসীরা 'আসাফ' নামে এক বিরাট মূর্তিকে বসিয়েছিল সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে, আর মারওয়ার শীর্ষে স্থাপন করেছিল 'নায়লা'কে। কেবল স্থাপন করেই

তারা তাদের কর্তব্য শেষ করেনি, ভক্তিভরে আরাধনা ও তওয়াফ করত এই দুটিকে। পরবর্তীকালে রসুল পাকের অবিরাম প্রচেষ্টায় আরবের সর্বত্র ইসলামের জ্যোতি ছড়িয়ে পড়লে হজ মৌসুমে সকল তীর্থযাত্রীর মনে এই সংশয় জাগেঃ সাফা মারওয়ায় সায়ী করা হজের অঙ্গ, না কি জাহেলিয়াত যুগের মত সায়ী করে শেরেক করা হচ্ছে? এই প্রশ্ন ছাড়াও আরো একটি কারণ ছিল। উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা-র বিবরণ থেকে অবগত হচ্ছি (বুখারী শরীফের হাদিসঃ ১৫৩২) মদিনাবাসীরা অন্ধকার যুগে যে দেবতার আরাধনা করত তার নাম মানাত আর এরা সর্বোতভাবে অস্বীকার করত আসাফ ও নায়লাকে। ফলে মুসলমান হবার পরও সেই পূর্ব ঘৃণা ও সংস্কার বশতঃ প্রতিটি মদিনাবাসী সাফা মারওয়ায় সায়ী করাকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি ,তাঁদের মনে হত এখানে সায়ী করার অর্থ আসাফ ও নায়লার প্রাধান্যকে মেনে নেওয়া। কাবা শরীফ কেবলাহ নির্ধারিত হবার পর এই ভ্রান্ত ধারনাগুলির দ্রুত অপনোদনের প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং সাফা মারওয়া সম্পর্কে এই আয়াত অবতরনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঘোষণা করলেন যে সাফা মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত, আসাফ বা নায়লার কোন অধিকার, কোন প্রাধান্য নেই এখানে, আর এই দুই পর্বতের মধ্যে সায়ী করা হজেরই অপরিহার্য অঙ্গ, এর সঙ্গে অন্ধকার যুগের রীতিনীতির কোন সম্পর্ক নেই।

বিশাল কাফেলা সহ রসুলুল্লাহ স সাফা পর্বতের শীর্ষদেশে উপস্থিত। এই বরকতময় পর্বতশীর্ষ হতে কাবা শরীফ দৃষ্টিগোচর হতেই তাঁর চোখে মুখে এক অসাধারণ দীপ্তি ঝলকিত হয়ে উঠল। সর্বশক্তিমান আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে তিনি উল্লাসিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেনঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারিকালাহু, লাহুল মুলকো অলাহুল হামদো ইহ্ য়ী অ ইয়োমিতো অ হুয়া আলা কুল্লে শাইয়েন কাদির. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্ দাহু আনজাযা অয়াদাহু অ নাসারা আবদাহু অহাযামাল আহ্ যাবা অহ্দাহু"— আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, রাজত্ব ও

প্রশংসা তাঁরই। জীবন মৃত্যুর অধিকর্তা তিনি এবং তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান। এক আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর কথা পূর্ণ করেছেন, তাঁর দাসকে সাহায্য করেছেন। আর তিনিই সকল আক্রমণকারীর শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছেন। আবু দাউদ।

সাফা পর্বত হতে অবতরণ করে রসূলুল্লাহ স এবার অগ্রসর হলেন অপর প্রান্তে মারওয়ার দিকে। এই পবিত্র পর্বতশীর্ষে উপস্থিত হয়েও তিনি আবেগান্দোলিত কণ্ঠে দোয়া দরূদ পাঠ করলেন। এক সময় সাফা মারওয়ার মধ্যে সাতবার গমনাগমন শেষ হল, এভাবেই সায়ী সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

সকল রকম কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, ভ্রান্ত রীতিনীতির মূলে কুঠারঘাত হানাই ছিল রসূলুল্লাহর বিদায় হজের এক বিরল মৌলিক বৈশিষ্ট্য। জাহেলিয়াত যুগে তামাম আরববাসীরা হজ মওসুমে ওমরা করাকে গর্হিত কাজ বলে মনে করত, এ সময় ওমরা করা তাদের কাছে ছিল অবৈধ। এই অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে রসূলুল্লাহর জলদগম্ভীর কণ্ঠ বিঘোষিত হল। সাফা-মারওয়ার মধ্যে সায়ী সম্পূর্ণ করে তিনি ঘোষণা করলেন, সায়ীর সঙ্গে সঙ্গে ওমরার কর্তব্যসমূহ সম্পূর্ণ হল, সুতরাং যাদের সঙ্গে কুরবানির পশু নেই তারা এহরাম ভঙ্গ কর।

এই ঘোষণার পর অনেকে এহরাম খুলে ফেললেন, অনেকে আবার অতীতের অন্ধমোহ বশতঃ তখনও এহরাম ভঙ্গ করতে ইতস্ততঃ করছিলেন। তাঁদের এই দ্বিধার ভাব লক্ষ্য করে পাক জবানে আবার উচ্চারিত হল, আমার সঙ্গে কুরবানির পশু না থাকলে আমিও এহরাম ভঙ্গ করতাম। এ কথার পর, লজ্জানত শিরে দ্বিধাগ্রস্ত সাহাবীগণ এহরাম ভঙ্গ করলেন। এভাবে অতীতের আরো একটি অন্ধবিশ্বাস চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

হজের পুরো মওসুমে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকা ছিল আরবদের আর এক ভ্রান্ত নীতি। যেটি স্বাভাবিক এবং রীতিসম্মত—ধর্মের নামে তা বর্জন করে আত্মাকে অযথা পীড়ন করার শিক্ষা ইসলাম

দেয়নি কোন দিন। সুতরাং যাঁরা এহরাম খুলে ফেললেন তাদের মধ্যে "যার সঙ্গে তার স্ত্রী ছিল তার সাথে সহবাস করা এর পর বৈধ বলে জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার ও সাধারণ কাপড় চোপড় পরারও অনুমতি দিলেন।" বু· শ· ১৪৪৩।

এমন আদেশ আল্লাহর রসুলের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। অন্য ধর্মের ধর্মগুরুরা সাধারণতঃ এই মহান পবিত্র পরিবেশে এই ধরণের নির্দেশ দিতে কুণ্ঠিত হবেন কিন্তু আল্লাহর রসুল মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কথা স্মরণ করেছেন, তাঁদের উপর পীড়নী আদেশ না দিয়ে সহমর্মী হয়েছেন, অনায়াস সাধ্য রীতিনীতির মাধ্যমে ধর্মপালনকে মানুষের জন্য সহজতর করে দিয়েছেন। এই নির্দের্শের সঙ্গে তাঁর চিন্তার গভীর বাস্তবমুখীনতা আমাদের বিশেষরূপে বিস্মিত করে।

হজরত আলিকে কিছুদিন পূর্বে মানুষকে তালিম দেবার জন্যে ইয়েমনে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনিও এ সময় ইয়েমনীয় তীর্থ-যাত্রীদের কাফেলা নিয়ে কাবা শরীফে রসুলুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁর সঙ্গেও কুরবানির পশু ছিল সুতরাং রসুল পাকের সঙ্গে তিনিও এহরামের অবস্থাতেই থাকলেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি হাদিসের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মক্কা বিজয়ের পর রসুলুল্লাহ প্রথমে কাবা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করেন কেননা তখনও কাবার মধ্যে তিন শো ষাটটি মূর্তি বিরাজমান। মূর্তিগুলি অপসারিত হলে এবং দেওয়াল পরিষ্কার হলে তিনি ভিতরে গিয়ে প্রাণ ভরে তকবীর দেন। এ সময় তিনি কাবার মধ্যে নামায পড়েছিলেন কিনা সঠিক জানা যায় না। সালেম রা বর্ণিত একটি হাদিস থেকে যতটুকু অবগত হচ্ছি তাতে মনে হয় বিদায় হজে তিনি কাবা শরীফের অভ্যন্তরে নামায আদায় করেছিলেন। আমি সকলের অবগতির জন্য সম্পূর্ণ হাদিসের অনু-বাদটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম। "সালেম রা তাঁর পিতা (আবদুল্লাহ ইবনে উমর) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আবদু-ল্লাহ ইবনে উমর) বলেন রসুলুল্লাহ স স্বয়ং এবং উসামা ইবনে

যায়েদ বেলাল এবং উসমান ইবনে তালহা কাবা ঘরে প্রবেশ করলেন এবং দরজা বন্ধ করে দিলেন। পরে বেলালের সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ স কি ঘরের মধ্যে নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ তিনি নবী স ইয়ামানী স্তম্ভ দুটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন।'' বু· শ· ১৪৯৩।

দু তিন দিন মক্কায় কাটল সকলের। ন দিনের তাপদগ্ধ মরু যাত্রায় সকলেই ক্লান্ত ছিলেন ভীষণ। সম্মুখে মিনা ও আরাফাতের দিনগুলি আরো কষ্টের, কঠিন পরীক্ষার। সাহাবীরা নিজেদের কথা ভাবছিলেন না কেউ তেমন, সকলেই অসম্ভব ব্যগ্র ছিলেন রসূলুল্লাহর জন্য। তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল সকলেরই। অসংখ্য মানুষ আসছে তাঁর কাছে, নানান প্রশ্ন তাদের, তা ছাড়া এই বিশাল কাফেলার দায়িত্বও রয়েছে তাঁর উপর। সুতরাং তাঁর অবস্থান আহার ও নিদ্রার বিষয়ে সকলেই বিশেষ রূপে চিন্তা করছিলেন। মক্কায় অবস্থানের সময় একদিন কয়েকজন সাহাবা এলেন তাঁর কাছে। আরাফাত মরুতে অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে হুযুর আকরাম স যাতে অন্ততঃ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পেতে পারেন তার জন্যে অগ্রিম কিছু ব্যবস্থা করে রাখতে চান তাঁরা। এক সময় হুযুরের অনুমতির জন্যে তাঁরা বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! যদি অনুমতি করেন তা হলে আপনার জন্যে আরাফাতের ময়দানে একটা ভাল জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখি।

ইসলাম সাম্যের ধর্ম, শান্তির ধর্ম! হজের একটি বিশেষ অবদানই হল বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার মাঝে সাম্যের প্রতিষ্ঠা। এখানে ছোট বড়তে কোন ভেদ থাকে না, ধনী দরিদ্র অভিজাত অনভিজাত সকলেই মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। সাহাবাদের মুখে এমনতর যুক্তিহীন আবদার শুনে সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা রসূলুল্লাহ স শুধু এইটুকু বললেন, এ হতে পারে না। যে আগে আসবে সুবিধাজনক জায়গায় বসবে সেই।

ছোট্ট উত্তর, ব্যাপ্তিতে বিশাল। গবাক্ষ পথে তারা ঝিকমিক অসীম আকাশ পরিদর্শনের মত এই সংক্ষিপ্ত উত্তরের মাধ্যমে সাম্য-

বাদের অলৌকিক প্রতিষ্ঠা বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে।

সম্ভবতঃ জিলহজের সাত তারিখ বুধবারে তিনি সকলকে নিয়ে মিনায় চলে আসেন। আট তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবারের সম্পূর্ণ দিবসটি তাঁরা মিনার পবিত্র ধূলিময় প্রান্তরে অবস্থান করলেন। নয় জিলহজ শুক্রবার ফজরের নামায পড়লেন এখানে। নামাযের পর বিশাল কাফেলাসহ তিনি যাত্রা করলেন আরাফাতের উদ্দেশ্যে।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই কাবা শরীফের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল কুরেশদের উপর। এই সম্মানীয় গৃহটির ভারপ্রাপ্ত হওয়ায় সমগ্র আরবের উপর এই গোত্রের প্রভাব ছিল অপরিসীম। একে ত কুরেশ গোত্রটি নিজেদের অভিজাত মনে করত, তার উপর সমগ্র আরব কর্তৃক এভাবে সম্মানিত হওয়ায় তাদের এই আভিজাত্যবোধ শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে অহংকারের পর্যায়ে উঠে গেল। গোত্র কৌলীণ্যে ফুলে ফেঁপে নিজেদের এমনই স্বতন্ত্র ভাবতে শুরু করল যে অন্যান্য আরবদের সঙ্গে একত্রে ওঠাবসাকেও তারা নিজেদের জন্য মর্যাদাহানিকর ভাবতে শুরু করল। হজের উদ্দেশ্যে ধনীনির্ধন প্রভুগোলাম সকল আরববাসীই যখন আরাফাতে গমন করত, কুরেশরা তখন আরাফাতে না গিয়ে হেরেমের সীমানায় মুজদালেফায় অবস্থান করে বায়তুল্লাহয় ফিরে আসত। এ ভাবে 'ছোটলোকদের' সঙ্গে না মিশে, একত্রে অবস্থান না করে নিজেদের কৌলীণ্য ও আভিজাত্য বজায় রাখত। ইসলাম শুরু থেকেই এই সব ঘৃণ্য মানসিকতার মূলোৎপাটনে নেমেছিল, এ ক্ষেত্রেও এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হল সুস্পষ্টভাবে এই আয়াতঃ "ছুম্মা আফেদা মেন হারছো আফাদান নাস"—অন্যান্য লোক যেখানে (আরাফাতে) অবস্থান করে তোমরাও সেখানে গিয়ে অবস্থান কর, ২ঃ২০০। কালাম পাকের এই ঘোষণার সঙ্গে হুযুর আকরাম স-ও নির্দেশ দিলেনঃ 'তোমরা পবিত্র স্থান সমূহে অবস্থান কর, কেননা তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের উত্তরাধিকারী।' এই যুগান্তকারী ঘোষণার পর প্রতিটি কুরেশ রসূলুল্লাহ স-এর সঙ্গে বিনাদ্বিধায় নতমস্তকে ধনী-নির্ধন কালোসাদা সকল আরব অনারবদের সঙ্গে এক জামাতে মিলে

মিশে এক দেহ এক প্রাণ হয়ে আরাফাতের বিশাল প্রান্তরে উপস্থিত হলেন।

প্রান্তর লোকে লোকারণ্য। যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল মানুষ আর মানুষ, কল্লোলিত জনসমুদ্র। রসূলুল্লাহ স 'নমেরা' নামক এক স্থানে কম্বলের তাঁবুতে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করলেন। দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে জোহরের নামায না পড়েই তিনি তাঁবু হতে তশরিফ নিয়ে আল কাসওয়ায় সওয়ার হলেন। এরপর আল কাসওয়া ধীরে অতি ধীরে বিশাল জনসমুদ্র অতিক্রম করে এসে থামল জবলে রহমতের পাদদেশে। এখান থেকে, উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করেই রসূলুল্লাহ স একবার দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলেন বিপুল গণসমাবেশের দিকে। প্রান্তরের প্রতিটি মানুষ তখন অসীম শ্রদ্ধায় উৎকণ্ঠায় নতুনতর বাণীর প্রত্যাশায় নীরব নিশ্চল। হযরত মোস্তফা স একবার স্মরণ করলেন পরম প্রভু আল্লাহকে তারপর দরদভরা আকর্ষণীয় উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলেন তাঁর বিদায় হজের সেই চিব অম্লান বরণীয় ঐতিহাসিক ভাষণ, যার মধ্যে একাধারে সঞ্চিত আছে ইসলামের প্রধান রীতিনীতি এবং ব্যবহারিক বিধান।

রসূলুল্লাহর দেহমন আত্মা আজ যেন এক অলৌকিক শক্তিতে দীপ্তোজ্জ্বল। ভাষণ দানের জন্যে সর্বোতভাবে তিনি প্রস্তুত। আর তাঁর ভাষণ সকল সময়ই অসাধারণ। তাঁর বলার ভঙ্গিমায়, গভীর আন্তরিকতায়, আত্মার আকৃতিতে অতি সাধারণ কথাবার্তা অসাধারণ হয়ে উঠত সকলের উপলব্ধিতে। তাঁর বক্তৃতা মানুষের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত তার একটি সুন্দর বর্ণনা পাই আসমা বিনতে আবুবকর রা-র উক্তিতেঃ "একদিন রসূলুল্লাহ স বক্তৃতা দিতে উঠে কবরের আযাবের কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, এমন আযাবের মধ্যে মানুষকে অবশ্যই পড়তে হবে। তাঁর ওয়াজ শ্রবণ করে বক্তৃতার মধ্যেই সমবেত সকলে চিৎকার করে ক্রন্দন শুরু করলেন।" সীরাতুন নবী।

হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত আবু সয়ীদ খুদরী রা বলেন, "একদিন হুযুর স খুতবা দিলেন। খুতবার মধ্যেই বললেনঃ অজ্ঞাই

নাফসী বায়াদাহু—সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! এই পর্যন্ত বলে আবেগ ভরে রসুলুল্লাহ স সামনের দিকে একটু ঝুঁকলেন। দেখা গেল শ্রোতাদের মধ্যে সকলের মাথা সকলের অজান্তে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে এবং প্রতিটি মানুষ কাপড়ে মুখ ঢেকে অঝোরে ক্রন্দন করছেন।''

প্রায় অলৌকিক ছিল রসুলুল্লাহ স-এর বক্তৃতার প্রভাব। দু লক্ষ নির্বাক জনতার সম্মুখে সেই অসম্ভব প্রভাব বিস্তারী বাগ্মীতার প্রকাশ ঘটল আজ। জাহেলিয়াত যুগের সেই নিরক্ষর হিংস্র অন্ধকার সময়ে নানা রকম কুসংস্কার আর রীতিনীতি মানুষের মন মানসকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল। মহান আল্লাহর মহিমা ঘোষণার পর এই কুপ্রথা আর ভ্রান্ত সংস্কারগুলির মুলোচ্ছেদ করে সেই বিশাল জনতার সম্মুখে সর্বপ্রথম রসুলুল্লাহ স ঘোষণা করলেনঃ

''আল্লা কুল্লো শাইয়েম মেন আমরিল জাহেলিয়াতে তাহাতা কাদামি মাওজু''—শ্রবণ কর! জাহেলিয়াত যুগের সকল কুসংস্কার সমস্ত অন্ধ বিশ্বাস এবং অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত-মথিত হয়ে চিরকালের জন্য রহিত এবং বাতিল হয়ে গেল। মুসলিম, আবু দাউদ।

মানবসভ্যতার অগ্রগতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু হল শ্রেণীভেদ প্রথা। এই বিভেদ প্রথা রাজা আর প্রজার মাঝে তুলেছিল অহংকারের দুর্লঙ্ঘ প্রাচীর, শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গের মাঝে রচনা করেছিল বাধার বিন্ধ্যাচল। আদম সন্তানেরা ধনী-দরিদ্র, প্রভু-গোলাম, আশরাফ-আতরাবে বিভক্ত হয়ে ঘৃণা বিদ্বেষে এবং লাঞ্ছনায় পরস্পর পরস্পর থেকে বিছিন্ন হয়ে বহু দূরে সরে গিয়েছিল। পুরোহিত, পাদরি, এবং ধর্মযাজক ছাড়া ধর্মালোচনার কোন অধিকার ছিল না সাধারণ মানুষের। আর রাজা-বাদশারা ত সাক্ষাৎ ভগবানের প্রতিনিধি! আজ বিদায় হজের মহালগ্নে শ্রেণী ও জাতি ভেদের এই দৃঢ়মূল প্রাচীর হঠাৎ যেন ধ্বসে পড়ল! মানবিকতা বিকাশের পরিপন্থী এই সর্বনাশা অন্যায় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহ

জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেনঃ
"আইয়োহান নাছো আলা ইন্না রাব্বাকুম অহেদ অ ইন্না আবাকুম অহেদ আলা লা নাদলা লে আরাবি অলা আজামি অলা লজামি আলা আরাবি অলা এলা হামরা আলা আসঅদা অলা লা এস অদা আলা আহমারা এলা বেত তাকঅয়া"—হে লোকসকল! স্মরণ রেখ, তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের আদি পিতা এক (হযরত আদম)। সাবধান কোন অনারবের (যে আরবের অধিবাসী নয়) উপর কোন আরবের অধিকার নেই, তেমনি কোন আরবের উপর কোন অনারবের অধিকার নেই (অর্থাৎ বিশ্বের একদেশের উপর অন্যদেশের, এক জাতির উপর অন্য জাতির কোন অধিকার নেই, সকলেই সমান)। কোন কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্বেতাঙ্গের প্রভাব নেই আবার কোন শ্বেতাঙ্গের উপর কোন কৃষ্ণাঙ্গের প্রাধান্য নেই। একমাত্র আল্লাহ ভীতিই (বা মঙ্গলজনক কাজকর্মই) হল পরস্পরের ছোট-বড়র মাপকাঠি। মুসনাদে ইমাম আহমদ।

এরপর হুযুর আকরাম স এর কণ্ঠে পর পর শোনা গেল সেই অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘোষণা একটি মাত্র বাক্যে তিনি নিখিল বিশ্বের তাবৎ মুসলমানকে এক সূত্রে বেঁধে দিলেনঃ

"কুল্লো মুসলেমে আখুল মুসলেমে অ ইন নাল মুসলেমিনা এখোয়াতে"—প্রত্যেক মুসলমান প্রত্যেক মুসলমানের ভাই আর প্রতিটি মুসলমানকে নিয়ে এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। কেউ ছোট কেউ বড় নয়, কেউ আশরাফ কেউ আতরাব নয়, কেউ অভিজাত কেউ অনাভিজাত নয়—কলেমা উচ্চারণকারী প্রতিটি মানুষ মুসলমান আর প্রতিটি মুসলমান প্রতিটি মুসলমানের ভাই, আত্মার আত্মীয়, একে অপরে অবিচ্ছেদ্য। এই ভাবে বিদায় হজের সেই মহাময়দানে চিরদিনের জন্য নিখিল বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। হাকেম—মোস্তদরক। তারবী।

মানবিকতার অপমান ও লাঞ্ছনার যত রকম ঘৃণ্য প্রথা তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল, ক্রীতদাস প্রথা অবশ্যই তাদের অন্যতম। সারা জীবন ধরেই মানবমুক্তির অগ্রদূত রসুলুল্লাহ স এই জঘণ্য প্রথার

বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছেন। মৃত্যু শয্যায় তিনি এই বঞ্চিত মানুষদের কথা বিস্মৃত হন নি, তাঁর মুমূর্ষু কণ্ঠে শোনা গেলঃ 'তোমাদের ক্রীতদাস! সাবধান তোমাদের ক্রীতদাস! বিদায় হজের সুবিশাল গণসমাবেশে আজ তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ

"আরে কায়ু কুম আরে কায়ু কুম আতয়ে মুহুম মেম্মা তা কুলুনা অক সুহুম মেম্মা তালবাসুন"—তোমাদের ক্রীতদাস! তোমাদের ক্রীতদাস!! তোমরা যা খাবে তাদেরও তাই খেতে দেবে. তোমরা যা পরবে তাদেরও তাই পরতে দেবে। তাবকাত।

বললেনঃ আর তোমাদের দাসদাসী—নিঃসহায়-নিরাশ্রয় দাসদাসী! সাবধান এদের নির্যাতন করো না, এদের অন্তরে ব্যথা দিও না! শ্রেণী ভেদের বিলুপ্তি ও প্রভু গোলামের পার্থক্য বিদূরীত করে সাম্য প্রতিষ্ঠায় এই বাণী মন্ত্রের মত কাজ করল। ধীরে ধীরে আরব ভূখন্ড হতে ক্রীতদাস প্রথা চিরদিনের মত দূর হয়ে গেল।

নিরক্ষর বর্বর যুগের আর একটি বিশেষ কুপ্রথা ছিল পুরুষানুক্রমে শোণিত-প্রতিশোষ গ্রহণ। এক শো বছর পূর্বে হয়ত কোন গোত্রের কেউ দ্বিতীয় একটি গোত্রের কাউকে হত্যা করেছিল, এক শো বছর পরেও সকলে সেই হত্যার শোণিত-প্রতিশোধ গ্রহণে তৎপর থাকত—এভাবে এই দুটি গোত্রের মধ্যে শত শত বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন ভাবে জ্বলত প্রতিহিংসার দাবানল। ফলে সমাজে কোন মানুষের কোন সময়েই কোন রকম নিরাপত্তা ছিল না। এই ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা ও প্রতিশোধ স্পৃহার চিরঅবসান ঘটিয়ে রসুলুল্লাহ স ঘোষণা করলেনঃ

"অদে মাউল জাহেলিয়াতে মাও দুয়াত অইন্না আউঅলাদামে আদাউ মেন দেমাএনা দামো ইবনে রাবিয়াতা ইবনে হারেস"—অন্ধকার যুগের সকল শোণিত প্রতিশোধ বাতিল করা হল। আর সর্বপ্রথম আমি আমার বংশের রাবিয়া ইবনে হারেসের শোণিতের দাবী রহিত ঘোষণা করলাম। মুসলিম, আবু দাউদ।

এানে বিশেষ রূপে লক্ষণীয় বিষয় এই যে রসুলুল্লাহ স কেবল পরস্পর শোণিতের দাবী বাতিল ঘোষণাই করলেন না, নিজ

গোত্রের শোণিতের দাবী বর্জন করে, এক মহোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রাবিয়া ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালেব রসূলুল্লাহ স-এর চাচাত ভাই ছিলেন। রাবিয়ার ইয়াস নামক পুত্রকে, যিনি বনু সাদ গোত্রে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন, হোযাইল নামক এক ব্যক্তি খুন করে। এই হত্যার রক্তের দাবী কুরেশ বংশে চলে আসছিল যুগ যুগ ধরে, বিদায় হজের বিশাল জনসমাবেশে রসূল পাক নিজ বংশের এই দাবীকে বাতিল ঘোষণার মাধ্যমে সর্বপ্রথম আপন বাণীর সার্থকতা পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই ঘোষণায় সমগ্র আরব মরুতে শান্তি এবং নিরপত্তার এক পবিত্র বাতাবরণ সৃষ্টি হয়ে গেল।

জাজিরাতুল আরবে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল সুদের কারবার। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীর হাতে এই প্রথা এমনই নির্মম ও হৃদয়হীন হয়ে উঠেছিল যে প্রতিটি দরিদ্র মানুষের অস্তিমজ্জা পর্যন্ত বিকিয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন অর্থলোলুপ মানুষের শোষণ শাসনে জর্জরিত হয়ে তারা দাঁড়িয়েছিল প্রায় মৃত্যুর সীমানায়। মানবমুক্তির অগ্রদূত রসূলুল্লাহ স বিদায় হজের ঐতিহাসিক সমাবেশে এই সব প্রাণহীন নির্বাক মানুষদের মুখে জীবনের ভাষা দিলেন। দানববেশী উদ্ধত রাক্ষসদের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করে তিনি ঘোষণা করলেনঃ

"অ রে বাল জাহেলিয়াতে মাওজুওন অ আউয়ালো রেবা আদায়ু মেন রেবানা রেবা আব্বাসে ইবনে আবদুল মোত্তালেব"—বর্বর যুগের সকল সুদের দাবী বাতিল ঘোষণা করা হল। সর্বপ্রথম আমার গোত্রের আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের সকল সুদ আজ আমিই বাতিল করে দিলাম। বুখারী, মুসলিম।

'আপনি আচরি ধর্ম' অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার নীতি এখানেও অনুসরণ করলেন রসূলুল্লাহ স। হযরত স-এর চাচা হযরত আব্বাস রা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ব্যাপকভাবে সুদের কারবারে লিপ্ত ছিলেন এবং বহু মানুষের কাছে তাঁর সুদ পাওনা ছিল। রসূলুল্লাহ স সকলের নিকট প্রাপ্য সুদকে মাফ করে দিলেন। এই ঘোষণায় এবং দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সকলেই যে যার প্রাপ্য সুদকে বর্জন

করলেন, ফলে দীর্ঘদিনের এই অমানবিক ঘৃণ্য প্রথা আরবের মাটি থেকে চির বিদায় নিল।

সর্বাপেক্ষা অবহেলিত এবং অসহায় অবস্থায় ছিল আরবের মহিলা সমাজ। স্বাধীনতা ত দূরের কথা, তারা ছিল পুরুষ সমাজের অস্থাবর সম্পত্তির মত। কন্যাদের জীবিত কবর দেওয়া হত, জুয়ার আড্ডায় হরহামেশা বাজি ধরা হত স্ত্রীদের, হেরে গেলে স্ত্রী চলে যেত অন্যের দখলে। মাতৃজাতির এই সীমাহীন অবমাননা, এই চরম লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করে বিদায় হজেব ভাষণে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা দান করলেন রসূলুল্লাহ স। প্রথমেই বললেনঃ

"ফাত্তাকুল্লাহ ফিন নেসারে"—স্ত্রীজাতি সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কব। বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ।

পবে বললেনঃ"ইন্না লাকুম আলা নেসায়েকুম হাক্কা অলাহুন্না আলায়কুম হাক্কান"—স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তেমনি তোমাদের উপরে তাদের অধিকার রয়েছে। তাবরি, ইবনে হেশাম। তিনি আরো ঘোষণা করলেনঃ অতঃপর হে লোক সকল! নাবীদের সম্বন্ধে আমি তোমাদের সতর্ক করছি—তাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করার সময় আল্লাহর শাস্তি হতে নির্ভয় হয়ো না। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহর জামিনে তাদের গ্রহণ করেছ এবং তাঁরই আয়াতে (বাক্যে) নারীদের সঙ্গে তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরস্পর পরস্পরকে নারীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করবে। স্মরণ রেখ, এই অবলাদের তোমরাই বলদাতা, এই নিঃসহায়দের একমাত্র সহায় তোমরাই।

মাতৃজাতির মহামুক্তির এই পয়গাম সমগ্র নারীজাতিকে আপন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল। এই মহাঘোষণা থেকেই বিশ্বের নারী সমাজ আযাদীর অলৌকিক স্পর্শ পেল।

রসূলুল্লাহ স অতঃপর কয়েকটি মৌল নীতির ঘোষণা করলেন এই সমাবেশেঃ

"ইন্নাল্লাহা আয্যা অ জাল্লা কাদ আতা কুল্লাজি হাক্কেন হাক্কাহু ফালা অসিয়াতা লে অরেছে"—আল্লাহ প্রত্যেক অধিকারীকে

তার ন্যায্য অংশ নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অতএব কোন উত্তরাধিকারীর জন্য আর অসিয়তের প্রয়োজন নেই।

ব্যভিচার ছিল আরবের আর একটি জঘন্য পাপবৃত্তি। ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই সব পাপ প্রবৃত্তি বিশেষ রূপে হ্রাস পেয়েছিল। বিদায় হজে এই চরিত্রহীনতার বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হল রসুলুল্লাহ স-র কণ্ঠেঃ

"আল অলাদো লেলফেরাশে অ লেল আহেরেল হাজারো অ হেসাবহুম আলাল্লাহে"—সন্তান শয্যার অধিকারীর, ব্যভিচারীর জন্য আছে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি আর আল্লাহর কাছেই তাদের হিসাব নিকাশ।

সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে অনেকেই তৎকালীন আরবে আপন পিতা-মাতাকে অস্বীকার করে অভিজাত লোকদের নিজের পিতামাতা বলে ঘোষণা করত, অনেক পালিত সন্তানেরা দত্তক গ্রহীতাকে চিহ্নিত করত নিজেদের পিতামাতা হিসেবে। অনেক ক্রীতদাসদাসী আপন মনিবকে অস্বীকার করে নিজেকে অন্যের দাস বলে পরিচয় দিত। এসব মিথ্যা পরিচিতির ফল হত মারাত্মক। এই বিপর্যয়মুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহ স সরব হয়ে উঠলেনঃ "যে সন্তান তার পিতা ছাড়া অন্যের ঔরসের দাবী করে এবং যে ক্রীতদাস আপন মনিব ছাড়া অন্যের দাস বলে পরিচয় দেয়—তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।"

মাতৃজাতির স্বাধীনতাকে যেমন তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, সেই স্বাধীনতাকে উদ্দাম হতে না দিয়ে সংযত করে দিলেন সংগে সংগে। বললেনঃ

"আলা লা ইয়াহেল্লো লে এমরায়াতে আন তুতিয়া মেন মালে জাওজেহা শাইয়ান ইল্লা বে এজানিহি"—হুঁশিয়ার! স্বামীর ধনের কোন অংশ স্ত্রী তার অনুমতি না নিয়ে দান করতে পারবে না।

পাক জবানে আরো উচ্চারিত "ঋণ পরিশোধ করতে হবে। ধার করলে তা দিয়ে দিতে হবে। দানের প্রতিদান দেওয়া চাই। জামিনের জিম্মাদার হতে হবে।"

উটের উপর উপবিষ্ট ছিলেন রসূলুল্লাহ স। হযরত বেলাল রা-র হাতে উটের লাগাম। হযরত উসমান ইবনে যায়েদ রা পশ্চাতে দাঁড়িয়ে কাপড় ধরে ছায়া করেছিলেন। এই পরিবেশে রসূলুল্লাহ স এক একটি বাক্য উচ্চারণ করছিলেন, দূরে দূরে দণ্ডায়মান অসংখ্য নকীবের উদাত্ত কণ্ঠে হুযুর আকরাম স-এর ভাষণ সেই বিশাল প্রান্তরের প্রতিটি প্রান্তে মুহূর্তে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ছিল।

লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তি ছিল আরব বেদুইনদের অন্যতম পেশা। তথাপি হজ মৌসুমে চারটি সম্মানীয় মাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে এই সব তস্করবৃত্তির মানুষেরাও যথেষ্ট সংযমী হয়ে যেত, তারা নরহত্যা ও লুণ্ঠনবৃত্তি পরিত্যাগ করে চেষ্টা করত ভাল হয়ে চলার। আর চারটি মাসের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শন চলে আসছিল হযরত ইবরাহিম আ-এর আমল থেকে। কিন্তু হত্যা খুনজখম ও লুণ্ঠন যাদের রক্তে মিশেছিল তাদের অনেকের পক্ষে এই সুদীর্ঘ চারটি মাস চুপচাপ ভাল মানুষ হয়ে থাকা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে উঠত না। সুতরাং হত্যা ও লুণ্ঠনের নেশা মেটাতে তারা অনেক সময় ইচ্ছামত সম্মানীয় মাসগুলিকে আগিয়ে বা পিছিয়ে দিত। জিলহজ মাসে হজ কিন্তু লুণ্ঠন লালসায় উদগ্র সর্দারেরা ঘোষণা করত 'এবার হজ হবে সফর মাসে।' এভাবে সম্মানীয় মাসকে ইচ্ছামত দু মাস পিছিয়ে দিয়ে এই দু মাস তারা মনের সাধে লুণ্ঠন ও হত্যায় মগ্ন হয়ে যেত। এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মুহম্মদ মোস্তফা স, "সময়ের গতি আজ সেই বিন্দুতে এসে উপস্থিত, যে বিন্দু হতে আল্লাহ আকাশ পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।" অর্থাৎ আজকের এই পবিত্র দিন হতে সময়ের আর তারতম্য করা যাবে না, আজ হতে মাসের আগু-পিছু চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেল।

রক্তপিপাসু লুটেরাদের উদ্দাম লালসাকে আরো সংহত করে স্পষ্ট ভাষায় এই চারটি মাসকে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করলেনঃ "বার মাসে বছর, তার চার মাস সম্মানিত। তিন মাস পর পর যুক্ত—জিলকদ জিলহজ ও মহররম আর রজব মাস, যা জমাদিউস সানি ও শাবান এর মধ্যবর্তী।

বর্বর যুগে অনাচার ও অত্যাচারের যে সমস্ত দুর্নীতি প্রচলিত ছিল তাদের অন্যতম একটি হল একের অপরাধে অন্যকে অভিযুক্ত করা। কোন গোত্রের কোন একটি লোক অপরাধ করলে সেই অপরাধের দায়ভাগ সমগ্র গোত্রের উপর বর্তে যেত। অপরাধী ব্যক্তি আত্মগোপন করলে অথবা দূরদেশে পালিয়ে গেলেও তার বংশের লোকেরা রেহাই পেত না, যাকে পাওয়া যেত তাকেই হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হত। পিতার অপরাধে পুত্রের বা প্রতিবেশীর অপরাধে অন্য প্রতিবেশীর রক্তে মরুর ধূলি রঞ্জিত হয়ে উঠত হরহামেশাই। এই বর্বরোচিত অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সর্ব প্রথম মহান আল্লাহই মানবজাতিকে সতর্ক করে দিলেনঃ

"অলা তায়েবু অযেরাতোন বেযরা উখরা"—একের অপরাধের বোঝা অন্যে বহন করবে না। আল-কোরআন।

হুযুর আকরাম স আরো স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেনঃ "স্মরণ রেখ! অন্যায়ের জন্য একমাত্র অপরাধী ব্যক্তিই দায়ী, পিতার অপরাধে পুত্র কিংবা পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।" ইবনে মাযা, তিরমিযি।

ধর্মের ব্যাপারে কোন রকম বাড়াবাড়ি, জোরজবরদস্তি আল্লাহ পছন্দ করেন না। এই বাড়াবাড়ি থেকেই সকল রকম অকল্যাণ ও অশান্তির সৃষ্টি। মহান আল্লাহ "বাড়াবাড়িকারীদের পছন্দ করেন না"—সূরা বাকারাহ ২ঃ১৯০। "ধর্মের জন্যে কোন জোরজবরদস্তি নেই, নিশ্চয়ই সুপথ কুপথ থেকে পৃথক হয়ে গেছে"—ঐ, ২ঃ২৫৬। রসূলুল্লাহ স তাঁর দূরপাল্লার বিচক্ষণ দৃষ্টিক্ষেপে উপলব্ধি করলেন ধর্মবিষয়ক অসহিষ্ণুতার ফলেই অতীতে বহু সমৃদ্ধ জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ বিদায় হজের মহাময়দানে তিনি সকলকে সচকিত করে ঘোষণা করলেনঃ "হুঁশিয়ার! ধর্ম বিষয়ে বাড়াবাড়ি করো না। তোমাদের পূর্বে বহুজাতি সীমালঙ্ঘণ করে ধ্বংস হয়ে গেছে।" ইবনে মাযা, নাসাই।

অন্ধকার যুগে সমগ্র আরবের কোথাও কোন রকম কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ছিল না, ফলে আইন শৃঙ্খলায় দেখা দিয়েছিল চরমতম

অবনতি। আর এই অবনতির মূলে ছিল প্রতিটি গোত্র এবং মানুষের সীমাহীন অহংকার, প্রতিটি মানুষই অহংবোধে উম্মাতাল হয়ে অন্যের চেয়ে নিজেকে সর্ববিষয়ে শ্রেয়তর বলে মনে করত। এই মনোভাব ধ্বংস না হলে দেশে কোনদিন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা কেন্দ্রীয় শাসনের জন্য আনুগত্যের প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ স-এর বজ্রকণ্ঠে বিঘোষিত হল চিত্তআলোড়নকারী এই অশ্রুত নির্দেশঃ "যদি নাক-কাটা কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও তোমাদের নেতা করে দেওয়া হয় এবং সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসাবে তোমাদের পরিচালিত করে তা হলে সর্বোতভাবে তার অনুগত হয়ে থাকবে, তার নির্দেশ মান্য করে চলবে।" মুসলিম। সাম্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে মরুর ধূলিতে দৃঢ়মূল কেন্দ্রীয় শক্তি ও শাসনের উদ্ভব ঘটল। অবশ্য রসূলুল্লাহ স-এর উপস্থিতিতেই এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই সুগঠিত হয়ে উঠেছিল।

সমগ্র জাজিরাতুল আরবে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় ছড়িয়ে পড়েছিল ইসলাম। পৌত্তলিকতার ঘন তমিস্রায় দীপ্ত হয়ে উঠেছিল সত্যের উজ্জ্বল আলোক। সকল রকম শয়তানী প্রথা রীতিনীতি বিদূরীত হয়ে ইবরাহিমী মিল্লাতের পুনর্জাগরণ ঘটেছিল। শয়তানের নতজানু পরাজয় এবং ইসলামের উদার অভ্যুদয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোস্তফা স ঘোষণা করলেনঃ "হে লোক সকল! স্মরণ রেখ, শয়তান আর কখনো তোমাদের দেশে পূজা পাবে না। কিন্তু হুঁশিয়ার! অনেক বিষয়কে তোমরা তুচ্ছ বলে মনে করে থাক, অথচ শয়তান তারই মাধ্যমে অনেক সময় তোমাদের সর্বনাশ সাধ্য করে থাকে। এগুলি সম্পর্কে খুব সাবধান থাকবে।" ইবনে মাজা, তিরমিযি।

বিদায় হজের অভিভাষণ, প্রকৃতপক্ষে ইসলামের মৌল রীতিনীতিরই একটি তালিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এই ভাষণ নিরস কতকগুলি শব্দ সমষ্টি হতে বাধ্য অথচ প্রকাশ মাধুর্যে এবং নতুনতর আঙ্গিকে এই "নিছক রীতিনীতির" ভাষণটিও চির আধুনিক এবং ঐতিহাসিকের মর্যাদায় সম্মানিত হয়েছে। বলা যেতে

পারে এত অল্প কথায় এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ধর্মের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত স্পর্শ করার মত ভাষণ নিখিল বিশ্বের কোন ধর্মের কোন ভাষাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাবতে বিস্ময় বোধ করিঃ চোদ্দ শ বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর মানুষ কেমনভাবে বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারটির সন্ধান পেয়েছিলেন! প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি এই অভিভাষণে কী অপূর্ব দক্ষতাতেই না প্রযুক্ত হয়েছে!

জীবন, ধনসম্পদ এবং ইজ্জত—মানুষের এই তিনটি অধিকারের একটিও বর্বর যুগে নিরাপদ ছিল না। বারে বারে বর্বর আঘাত নেমে এসেছে এই তিনটি অধিকারের উপর। সুতরাং সুস্থ সমাজ ও ধর্মীয় জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য এই তিনটি বিষয়ের নিরাপত্তার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দিলেন রসূলুল্লাহ স। অথচ বক্তৃতার সূচনায় সরাসরি এই বিষয়গুলির উল্লেখ না করে সমস্যাটি উপস্থাপিত করলেন আশ্চর্য মনোবৈজ্ঞানিক আধুনিকতায়। গভীর অভিনিবেশে আমরা অভিভাষণটি অনুসরণ করতে পারি। সমবেত বিপুল জনতার উদ্দেশ্যে পাক জবান থেকে প্রথমে উচ্চারিত হল একটি জিজ্ঞাসাঃ

"তোমরা কি জান, আজকের এই দিনটি কোন দিন?"

এই জিজ্ঞাসার পরের অংশটির অনুবাদ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করলামঃ "সাহাবাগণ উত্তর করলেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই এ বিষয়ে অধিক অবগত। অতঃপর হুযুর স বেশ কিছু সময় নিশ্চুপ থাকলেন। সাহাবাগণ মনে মনে ভাবলেন হয়ত তিনি এই দিনটির অন্য কোন নাম রাখবেন। অনেকক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বললেন, আজ কি কুরবানির সেই পবিত্র দিন নয়? সাহাবারা বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়! এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কোন মাস? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল এ বিষয়ে ভাল জানেন। বেশ কিছু নীরবতার পর তিনি বললেন, এ কি সম্মানীয় যিলহজ মাস নয়? সমবেত কণ্ঠে সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়। আবার জিজ্ঞাসা করলেন এ কোন শহর? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ এবং

তাঁর রসূলই ভাল জানেন। এবারও বেশ কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকার পর বললেন, এ কি পবিত্র শহর নয়? সাহাবীরা উত্তর দিলেন, হাঁ নিশ্চয়। এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিশাল সমাবেশের প্রতিটি মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা হল যে আজকের এই দিন পবিত্র, এই মাস পবিত্র এবং এই শহর পবিত্র—যে ধারণা সুপ্রাচীন কাল থেকে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল''১৩—এবং বিরতি ও আশ্চর্য নীরবতার মাধ্যমে এই পবিত্রতার বোধ প্রতিটি মানুষের মনে গভীরতর ব্যাপ্তির সৃষ্টি করল। সকলে যখন সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলেন যে এই সম্মানীয় দিবসে এই নিষিদ্ধ মাসে এবং এই স্মরণীয় শহরে কোন প্রকার খুন জখম হত্যা যুদ্ধ বিগ্রহ বা রক্তপাত ঘটানো কোন পরিস্থিতিতেই সম্ভব নয় তখন জবান মুবারক থেকে উচ্চারিত হলঃ ''সুতরাং স্মরণ রেখ! তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধনসম্পদ ও মান-সম্মান পরস্পরের নিকট ততটুকু সম্মানীত, যেমন সম্মানীয় আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই পবিত্র শহর।'' ১৪ বুখারী, মুসলিম, তাবরী।

এরপর আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে রসূলুল্লাহ স বলে চললেনঃ ''স্মরণ রেখ, তোমাদের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে, তাঁর নিকট প্রতিটি কথার জবাবদিহি করতে হবে। সাবধান! আমার পর তোমরা যেন ধর্মভ্রষ্ট হয়ে যেও না, ধর্মচ্যুত হয়ে পরস্পরের রক্তপাতে লিপ্ত হয়ো না।'' বুখারী।

রক্তক্ষয় সম্পর্কে সকলকে বিশেষরূপে সতর্ক করে তিনি সকলের মনোযোগকে ধনসম্পদের নিরাপত্তার দিকে আকৃষ্ট করলেন। বললেনঃ

''ফা ইন্না দেমা আকুম অ আমঅলাকুম আলায়কুম হারাম কাহুরমাতে ইয়াওমাকুম হাজা ফি শাহারে কুম হাজা ফি বালাদে কুম হাজা ইলা ইয়াওমে তালকাওনা রাব্বাকুম''—''তোমাদের ধনসম্পদ অপরের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তেমনি সংরক্ষিত (হারাম বা নিষিদ্ধ), যেমন সংরক্ষিত (হারাম) আজকের এই দিন, এই মাস এবং এই কাবার প্রাঙ্গণ।'' বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ। অর্থাৎ এই সব

সম্মানীয় বিষয়গুলির পবিত্রতা ও মর্যাদা হানি করা যেমন তোমরা মনেপ্রাণে হারাম বলে বিশ্বাস কর তেমনি কোন মুসলমানের সম্পত্তি ও ধনসম্পদের ক্ষতিসাধন তোমাদের জন্য অবশ্যই হারাম বা পরিত্যাজ্য।

আবেগের সঙ্গে রসুলুল্লাহর কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়ে উঠল। বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে একের পর এক বেহেশতি সৌরভে ভরা গভীরতর কথাগুলি বলে চললেন। তাঁর নুরোজ্জ্বল চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক আশ্চর্য অলৌকিক শক্তি তাঁর পবিত্র দেহমনে ভর করেছে। বললেনঃ

"চারটি কথা, হাঁ-এই চারটি কথা বিশেষ রূপে স্মরণ রেখ। মহান আল্লাহর কোন অংশী (শেরেক) করো না, অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, চুরি করো না, এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে না।" মোসনাদ সলমা ইবনে কায়েস।

"হে লোকসকল! শ্রবণ কর। আমার পর আর কোন নবী নেই, তোমাদের পর আর কোন জাতি (কোন নবীর উম্মত) নেই। হুঁশিয়ার! আমি যা বলছি, মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। এ বছরের পর তোমরা হয়ত আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এলেম (বিদ্যা) উঠে যাবার পূর্বে তোমরা আমার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর।" কান্‌জুল ওম্মাল, মোস্তফা চরিত।

রসুলুল্লাহ স-এর ভাষণের এই অংশে এলেম (বিদ্যা) উঠে যাবার কথা আছে। বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন। তাঁরা ভাবতে থাকেনঃ আল্লাহর কালাম এবং রসুলের হাদীস তো আমাদের কাছে লিখিত ভাবে বর্তমান সুতরাং এলেম কি ভাবে উঠে যেতে পারে! হযরত ওমামা রা বলেনঃ বিষয়টি পরিষ্কার করে নেবার জন্যে ভাষণের পর আমরা এক বেদুইনকে একটি চাদর দিয়ে হযরতের কাছে জিজ্ঞাসা করে পাঠালাম যে এলেম উঠে যাবার তাৎপর্য কী? প্রশ্ন শুনে রসুলুল্লাহ স কিছুটা উচ্চ-কণ্ঠে বললেনঃ তোমরা কি জান না ইহুদি এবং খৃষ্টানদের নিকটেও এরূপ লিখিত 'ছহীফা' ছিল কিন্তু তাঁরা সেদিকে আদৌ কোন

ভ্রূক্ষেপ করেনি। সত্যকার যারা এলেমের অধিকারী তাদের তিরোধানই হল এলেমের তিরোধান বা বিদ্যা উঠে যাওয়া।

এরপর আবার রসূলুল্লাহ স মনোজ্ঞ ভাষায় মানুষকে চুরি না করতে এবং অত্যাচার হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিলেনঃ

"হে লোকসকল! শোন, গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করে নবজীবন লাভ কর। সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করো না! অত্যাচার করো না! অত্যাচার করো না! হুঁশিয়ার! কারও অসম্মতিতে তার সামান্যতম ধনও গ্রহণ করো না।" মোসনাদ রক্কাশী।

লক্ষণীয় বিষয়ঃ বিদায় হজের সুদীর্ঘ ভাষণে রসূলুল্লাহ স হত্যা চুরি অত্যাচার ব্যভিচার প্রভৃতি থেকে বিরত হবার কথা বার-বার বিভিন্ন ভাবে মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

পৃথিবীতে অসংখ্য নবী এসেছেন, তাঁদের অনেকের প্রতি গ্রন্থও অবতীর্ণ হয়েছে। কিছুদিন শান্তিতে অতিবাহিত হবার পর মানুষ সেই শিক্ষা হতে বিচ্যুত হয়ে আপন প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় বিপথ-গামী। এবং অবশেষে অনিবার্যভাবে তাদের প্রতি নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। আপন উম্মতেরা যাতে পূর্ববর্তীদের মত বিপর্যস্থ ও ধ্বংস না হয় তার জন্যে রসূলুল্লাহ স উচ্চারণ করলেন এই সাবধান বাণীঃ

"অ ইন্নি কাদ তারাকতো ফিকুম লান তাদেল্লু বায়াদাহু এনেয় তাছামতুম বেহি কেতাবুল্লাহ"—আমি তোমাদের নিকট একটি জিনিষ রেখে যাচ্ছি, যত দিন তোমরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না, তা হল আল্লাহর মহাগ্রন্থ কোরআন। বুখারী, মুসলিম।

বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে পুনরায় ঘোষণা করলেন; "আমি তোমাদের নিকট যা রেখে যাচ্ছি, দৃঢ়তার সঙ্গে তা অবলম্বন করে থাকলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কোরআন এবং তাঁর রসূলের আদর্শ (হাদিস)।" বুখারী, মুসলিম, সেহারা।

এই ঐতিহাসিক ভাষণের শেষ পর্বে আল্লাহর রসূল পুনরায় ইসলামের মৌলিক স্তম্ভগুলির প্রতি বিশেষ রূপে সমবেত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বললেনঃ "তোমরা তোমাদের প্রভুর উপাসনা করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযান মাসে রোজা রাখবে এবং আমি যে নির্দেশ দিই তা পালন করবে। এর দ্বারাই তোমরা তোমাদের প্রভুর বেহেশতে প্রবেশ করবে।" মসনদে আহমদ, মোসতাদরাকই হাকেম।

এই পর্যন্ত বলার পর রসূলুল্লাহ স ক্ষণকাল নীরব হয়ে গেলেন। সভাস্থলে নীরবতা নেমে এল। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে তিনি ঘোষণা করলেনঃ

"যারা আজ উপস্থিত আছ, অনুপস্থিতদের কাছে আমার এই পয়গাম পেঁাছে দিও। হয়ত উপস্থিতদের কিছু লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতদের কিছু লোক এরদ্বারা অধিকতর উপকৃত হবে।" বুখারী।

ভাষণের একেবারে শেষ পর্বে রসূলুল্লাহ স-এর মুখমণ্ডল এক অলৌকিক বেহেশতি আভায় যেন দীপ্ত হতে দীপ্ততর হয়ে উঠল। তাঁর কণ্ঠস্বরেও যেন এক অপার্থিব সুরলহরী মহান সংগীতের কল-গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছিল। বিশাল জনসমাবেশ মন্ত্রমুগ্ধ, নিঃস্পন্দ, নির্বাক। এমন সময় হুযুর আকরাম স অসম্ভব বিনীত ভাবে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে মুখ তুললেন। হঠাৎ সমগ্র আরাফাত প্রান্তর জুড়ে এক অদৃশ্যপূর্ব আশ্চর্য পরিবেশে ফুটে উঠল। সুদূর আকাশের সঙ্গে অন্তহীন জনতার প্রতিটি মানুষের অন্তরের পলকে কেমন যেন পুলকিত যোগাযোগ ঘটে গেল। সকলেই অবাক বিস্ময়ে ভীষণ ব্যাগ্রতায় রসূলুল্লাহ স-এর দিকে তাকিয়ে আছেন। এই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রসূলুল্লাহ স ধ্যান-মগ্ন কণ্ঠে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি কি আপনার বাণী পেঁাছে দিয়েছি? আমি কি আমার কর্তব্য সম্পাদন করতে পেরেছি?" মুহূর্তে বিপুল জনতার মধ্য হতে লক্ষ কণ্ঠে দলবদ্ধ ধ্বনি উঠল, নিশ্চয়, নিশ্চয়। উত্তর শ্রবণ করে অধিকতর উদ্দীপ্ত স্বরে মোস্তফা

স বললেনঃ আল্লাহ! শ্রবণ করুন, সাক্ষী থাকুন—এরা বলছে যে আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করেছি। হুযুর আকরাম স তবু যেন নিঃসংশয় নন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ হে লোকসকল! কিয়ামতের ময়দানে আমার সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে। সে প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তোমরা? সুবিস্তীর্ণ আরাফাতের পর্বত-প্রান্তর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে লক্ষ কণ্ঠে উত্তব এলঃ আমরা বলব আপনি আল্লাহর বাণী আমাদের নিকট পেঁাছে দিয়েছিলেন, আপন দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। উত্তর শ্রবণ করে পরিতৃপ্ত হলেন রসূলুল্লাহ স। তিনি তখন স্বপ্নাবিষ্টের মত বিভোর অবস্থায় আকাশের দিকে হস্ত প্রসারিত করে কৃতজ্ঞপ্লুত কণ্ঠে বললেনঃ প্রভু হে! শ্রবণ করুন। প্রভু হে! সাক্ষী থাকুন। "আল্লাহুম্মাশ হাদ্।" হে আমার আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। মুসলিম, আবু দাউদ।

রসূলুল্লাহ স-এর উপর নবুওতের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল এবং তা যে তিনি যথাযথ ভাবে পালন করেছেন, অভি-ভাষণের শেষে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এল তারই চূড়ান্ত ঘোষণাঃ

আল ইয়াওমো আকমালতো লাকুম দিনাকুম অ আতমামতো আলায়কুম নেয়মাতি আ রাদিতুল্লাকুমুল ইসলামা দিনা"—তোমাদের মঙ্গলের জন্য তোমাদের ধর্মকে আজ পূর্ণ পরিণত করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করে দিলাম আর ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। সূরা মায়দা, আয়াত সংখ্যা ৩।

এই স্মরণীয় দিবসটি ছিল দশম হিজরির ৯ যিলহজ শুক্রবার।

দীন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হল, ইসলাম আল্লাহর মনোনীত ধর্ম হিসেবে চূড়ান্ত স্বীকৃতি পেল। এর থেকে পরম সাফল্য আর কি হতে পারে? ভাব গম্ভীর কণ্ঠে রসূলুল্লাহ স আল্লাহর সেই বারতাকে লক্ষ লক্ষ উম্মতের সম্মুখে ঘোষণা করে দিলেন। পরম সাফল্যের এই সংবাদে সাহাবাদের উল্লসিত কলরোলে আরাফাত প্রান্তর

মুখরিত হয়ে উঠল। অথচ রসুলুল্লাহ স তখনো নির্বাক, এই অসামান্য সাফল্যে যেন তাঁর কোনই ভূমিকা নেই, আপন প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় এই অহংকার শূন্য মহামানব বার বার আভূমি নত হয়ে পড়ছিলেন। আর কি মহাবিস্ময়! আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে যে আসনটিতে বসে 'সর্বকালের সর্বযুগের সকল দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের মুক্তি ও কল্যাণের এই মহাসনদটি ঘোষণা করলেন, সেই আসনটির মূল্য তখন এক টাকার বেশি ছিল না।' সীরাতুন নবী।

অভিভাষণ সমাপ্ত হল। হুযুর স শেষবারের মত মমতা মাখা দৃষ্টিতে সেই বিশাল মুগ্ধ জনতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তাঁব মুখমণ্ডলে কেমন যেন এক বিষণ্নতার ছায়া নেমে এল। সেই বিষণ্ন কণ্ঠে উদ্বেলিত জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মত উচ্চারণ করলেনঃ আলবেদা! বিদায়, বন্ধুগণ বিদায়!! তাঁর বিষণ্ন কণ্ঠের আলবেদা ধ্বনি বাতাসে দোলা খেয়ে সমগ্র আরাফাত প্রান্তর-কে ব্যথাতুর করে তুলল। মহামিলন মেলা সমাপ্ত, চারদিকে এখন বিদায়ের করুণ রাগিণীর গুঞ্জরণ।

রসুলুল্লাহ স-এর জীবনে এইটিই শেষ হজ, সে জন্যে এই হজকে হজ্জাতুল বেদা বা বিদায় হজ বলা হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই হজকে হজ্জাতুল বালাগ এবং হজ্জাতুল ইসলাম প্রভৃতি নামেও অবিহিত করা হয়েছে।

আরাফাতের প্রান্তরে এক হজযাত্রীর মৃত্যু ঘটল। ঘটনাটি বুখারি শরিফে ইবনে আব্বাস রা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ "এক ব্যক্তি এহরাম অবস্থায় নবী স-এর সঙ্গে ছিল। তার উট তার ঘাড় ভেঙ্গে দিলে সে মৃত্যু বরণ করল।" তখন রসুলুল্লাহ স বললেনঃ "একে পানি ও কুল পাতা দিয়ে গোসল দাও, তার দুই কাপড়ে (এহরামের দুটি কাপড়) তাকে কাফন দাও। তার শরীরে কোন সুগন্ধি লাগিও না এবং তার মাথা ঢেকে দিও না। কেননা কিয়ামতের দিন তাকে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠান হবে।" বু. শ. ১৭১৮। আরা-ফাতে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটায় এই ব্যক্তির দাফন-কাফনের জন্য বিশেষ কিছু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা (দুই কাপড়, খালি

বিদায় হজের অভিভাষণ সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হুযুর আকরাম স সঙ্গে সঙ্গে হযরত বেলালকে আযান দেবার নির্দেশ দিলেন। হযরত বেলালের উদাত্ত কণ্ঠের আযান সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে অসাধারণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। রসূলুল্লাহ স-এর সঙ্গে সেই দু লক্ষ পুন্যবান হজযাত্রী আল্লাহর উদ্দেশ্যে গভীর আন্তরিকতায় সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। একই সঙ্গে সকলে আদায় করলেন জোহর এবং আসরের নামায। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আরাফাতের মসজিদ নোমেরায় একই সঙ্গে জোহর এবং আসরের নামায পড়া হয়। জোহরের নামায সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসরের একামত এবং নামায শুরু হয়ে যায়, মধ্যে সময়ের কোন ব্যবধান থাকে না। আরাফাতের মহাময়দানে সকল হাজিও তাই করেন।

নামায সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ স আবার আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। এই সেই উষ্ট্রী, যার পৃষ্ঠে চড়ে মোস্তফা স হিজরত করেছিলেন। অসম্ভব উদ্বেলিত ভিড় অতিক্রম করে হযরত স নোমেরায় তাঁর সেই কম্বলের তাঁবুর সন্নিকটে হাজির হলেন। ক্লান্তি এবং অবসাদে দেহ মন ভেঙে পড়ছিল, কিছুক্ষণ বিশ্রামের জরুরী প্রয়োজন। রসূলুল্লাহ স তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন, অবশ্য সেখানে বিশ্রামের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না তবুও কিছুক্ষণ বিশ্রাম জরুরী। কিন্তু কোথায় আরাম! কোথায় বিশ্রাম!! সেই প্রচণ্ড উত্তাপের মাঝে পবিত্র দুটি হাত উত্তোলিত করে মানুষের নবী মুহম্মদ স মানুষের জন্য আপন প্রভুর কাছে দীর্ঘ এবং গভীর মুনাযাতে ডুবে গেলেন। একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য অবস্থা। সাহাবীরা দেখলেন একটা নিশ্চল পাথর যেন বসে আছেন কেবলা-মুখী হয়ে। সে পাথর থেকে অবিরাম ঝরছে কেবল অশ্রুর নির্ঝর!

সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল মুনাযাতে। সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে তিনি সকলকে আরাফাত থেকে মুযদালেফার পথে চলার নির্দেশ দিলেন। উসামা ইবনে যায়েদকে উটের পশ্চাতে বসিয়ে নিলেন এবং স্বয়ং হাতে নিলেন উটের বল্গা। জনসমুদ্র একটা

বিপুল তরঙ্গের মত দুলে উঠে চলতে শুরু করল। ভীষণ চাঞ্চল্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন সকলে। রসুলুল্লাহ স-এর গতি দ্রুত ছিল।১৫ তাঁর সঙ্গে চলার জন্যে জনতার মধ্যে রীতি মত সোরগোল পড়ে গেল। এই সব আবেগচঞ্চল মানুষদের উদ্দেশ্যে ডান হাতের লাঠির সাহায্যে ইশারা করে হুযুর স বললেনঃ

"আইয়োহান নাছ আলায়কুম বেছ ছাকিনাত"—হে লোকসকল! শান্তির সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে। বু. শ. ১৫৫৭।

আল্লাহর রসুলের সঙ্গে চলার বাসনায় যাঁরা ক্রমাগত তাঁদের উটকে চাবুক মারছিলেন সেই সব মানুষের উদ্দেশ্যে পিছন ফিরে তিনি বললেনঃ "হে মানুষেরা!—নীরব ও শান্ত হয়ে চল! (উট-গুলোকে) দ্রুত হাঁকিয়ে (চাবুক মেরে) চলাতে কোন কল্যাণ নেই।" বু. শ. ১৫৫৭।

এই প্রচন্ড ভিড়ে এই বিশাল কাফেলার মহাচালক কত তুচ্ছ বিষয়ের প্রতিই না লক্ষ্য রেখেছিলেন! জীবজন্তুদের প্রতিও তাঁর মমতার দৃষ্টি সমানে পড়েছিল। ভেবে অবাক হয়ে যাই এই প্রচন্ড কর্মব্যাস্ততার মধ্যেও এই সব অবলা প্রাণীগুলিও তাঁর বহু ব্যাপ্ত মমতার দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি! আর এও ভেবে বিস্মিত হই সদাজাগ্রত সাহাবীগণ কি গভীর নিষ্ঠাভরে রসুলুল্লাহ স-এর প্রতিটি গতিবিধিই না লক্ষ্য করেছিলেন! মাত্র ছ মাস পূর্বে আমরা কে কি করেছি সকলে ভুলে যাই, অথচ দেড় হাজার বছর পূর্বে হুযুর আকরাম স কোথায় কি করেছিলেন, সাহাবীরা যেন ক্যামেরায় আলোকচিত্রের মত তা ধরে রেখেছেন। মুযদালেফার পথে এক স্থানে নবী স প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাটিও উসামা ইবনে যায়েদের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে আছেঃ "তিনি বলেছেন, আমি আরাফাতের ময়দান থেকে রসুলুল্লাহ স-এর (সওয়ারীর) পিছনে আরোহণ করেছিলাম। হুযুর স মুযদালিফা পৌছবার পূর্বেই বাম পার্শ্বের পাহাড়ি গুহার সন্নিকটে এলে তাঁর সওয়ারী উটটিকে বসালেন। এরপর তিনি (গুহার আড়ালে গিয়ে) প্রসাব করে এলে আমি তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি হালকা

অযু (সম্পূর্ণ অযু নয়—কেবল হাত মুখ ধৌত) করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসুল! আপনি কি নামায পড়বেন? তিনি বললেন, নামায সম্মুখে।'' বু. শ. ১৫৫৬।

এটিও একটি বিশেষ স্মরণীয় এবং উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, মুযদালেফার পথে মগরিবের সময় হয়ে গেলেও রসুলুল্লাহ স পথিমধ্যে মগরিবের নামায পড়লেন না। বিশাল কাফেলা নিয়ে তিনি যখন মুযদালেফায় উপস্থিত হলেন তখন এশার ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইবনে উমর রা বলেনঃ ''নবী স মুযদালেফায় মগরিব ও এশার নামায এক সঙ্গে পড়েছিলেন। প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক পৃথক ইকামত বলা হয়েছিল।'' বু. শ. ১৫৫৯। অবশ্যই মগরিবের নামায কাজা পড়েন নি। এবং সকল হাজি সাহেব এশার ওয়াক্তে এক সঙ্গে মগরিব এবং এশা আদায় করেন, মগরিবের নামায কাজা পড়তে হয় না।

মদিনা মনোওয়া থেকে বহির্গত হয়ে এই বিশাল কাফেলা সহ আরাফাতের এই বিশেষ দিনটির সফল সমাপ্তির জন্যে রসুলুল্লাহ স ক্রমাগত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছিলেন। মিনা থেকে আরাফাতে আগমন এবং প্রচন্ড উত্তাপের মাঝে বিদায় হজের দীর্ঘ ভাষণ প্রদান, পুনরায় আরাফাত হতে পাড়ি দিয়ে মুযদালেফায় উপস্থিত হওয়ায় শারীরিক দিক দিয়ে তিনি যতখানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, দু লক্ষ মানুষের নিয়ম মোতাবেক হজ সম্পাদন করানো এবং তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সদাসতর্ক দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে মানসিক দিক দিয়ে তিনি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন ততোধিক। মগরিব ও এশার নামায সমাপ্ত করেই তিনি এই অসম্ভব ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত দেহ নিয়ে শয্যায় গেলেন এবং প্রাত্যহিক অভ্যাস মত এই একটি রাতে তিনি তাহাজ্জদ নামাযের জন্য নিদ্রা থেকে উঠতে পারলেন না। মহাদ্দেসগণ বলেনঃ এই একটি মাত্র রাত্রে হুযুর আকরাম স তাহাজ্জদ নামায পড়েন নি। অবশ্য ভোরে শয্যা ত্যাগ করে তিনি সকলের সঙ্গে ফরজের নামাযে সামিল হলেন এবং তাঁর ইমামতিতে যথা সময়ে নামায সমাপ্ত হল। সীরাতুন নবী, দ্বিতীয় খণ্ড।

অন্ধকার যুগে অহংকার-স্ফীত কুরেশরা সূর্যোদয়ের পর মুযদালেফা থেকে যাত্রা করত। সূর্য পূর্ণভাবে উদিত হলে তার রক্তিম কিরণরাশি যখন পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার টিলাসমূহে এসে পড়ত তখন তারা উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করতঃ "হে সবীর পর্বত! রৌদ্রে আলোকিত হয়ে যাও।" এটি একটি অর্থহীন উচ্চারণ মাত্র। তাছাড়া সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করারও কোন ন্যায় সঙ্গত কারণ ছিল না। বরং মরুপথে যত ভোরে রওনা হওয়া যায় যাত্রীদের পক্ষে ততই উত্তম। ফজরের নামায সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে রসূল পাক বর্বর যুগের এই অন্ধপ্রথাকে ভঙ্গ করে সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার পথে রওনা হয়ে গেলেন। বু. শ. ১৫৭০।

কাফেলায় অনেক দুর্বল এবং রুগ্ন লোক ছিলেন। রসূলুল্লাহ স তাদের ধীরে সুস্থে চলার জন্যে ঊষাকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না বলে রাত্রেই মিনা যাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই নির্দেশদান তাঁর গভীর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ "নবী স আমাকেও (যিনি দুর্বল ছিলেন) রাতের বেলা মুযদালেফা থেকে পাঠিয়েছিলেন।" বু. শ. ১৫৬৩ উম্মুল মুমেনিন আয়েশা রা বলেনঃ "আমরা সকলেই মুযদালেফায় পৌঁছিলে সাওদা (রসূল-পত্নী) সব লোকের আগেই যাত্রার জন্যে নবী স-এর কাছে অনুমতি চাইলেন, যাতে সবার একযোগে যাত্রাকালের ভিড় এড়াতে পারেন। কেননা তিনি ছিলেন একজন মন্থরগতি সম্পন্ন (স্থূলদেহী) মহিলা। সুতরাং নবী স তাঁকেও অনুমতি দিলেন।" বু. শ. ১৫৬৭।

মুযদালেফা থেকে মিনায় রওনা হবার এই দিনটি ছিল শনিবার, ১০ যিলহজ।

আরাফাত থেকে মুযদালেফা পর্যন্ত উসামা ইবনে যায়েদ রা রসূলুল্লাহ স এর উটের পিছনে বসেছিলেন, মুযদালেফা থেকে মিনার পথে হুযূর আকরাম স ফজল ইবনে আব্বাসকেও সওয়ারির পিছনে বসিয়ে নিলেন। ফজল ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ "তাঁরা উভয়েই (উসামা এবং ফজল) বর্ণনা করেছেন, নবী স জুমরাতুল আকারায় (মিনায় বড় শয়তান) কাঁকর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া

পাঠ করছিলেন।" বু. শ. ১৪৪২ এবং ১৫৭২।

অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতে চতুষ্পার্শ্বের সকলকে সম্বোধন করে রসুলুল্লাহ স বললেন, "হজের নিয়মকানুন (মাসায়েল) জেনে নাও, হয়ত আমি এরপর আর হজ নাও করতে পারি।" এ বাণী ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ রসুলুল্লাহ স-কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, ধীর স্থির ভাবে হুযুর আকরাম স সকলের সকল রকম প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেনঃ "এক ব্যক্তি বলল, আমি জানতাম না তাই কুরবানির পশু যবেহ করার পূর্বেই মস্তক মুণ্ডন করেছি। (এখন কি করতে হবে?) তিনি বললেন, এখন যবেহ করে নাও, কোন ক্ষতি নেই। অপর এক ব্যক্তি এসে বলল, আমি জানতাম না তাই কাঁকর মারার আগেই কুরবানি করে ফেলেছি। তিনি জবাবে বললেন, এখন কাঁকর মারার কাজ সমাধা করে নাও।" বু. শ. ১৬১৭।

ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ "জুহাইনা গোত্রের একজন স্ত্রীলোক এসে নবী স কে বলল, আমার মা হজ আদায় করার মানত করে-ছিলেন। কিন্তু তিনি হজ আদায় না করেই মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ আদায় করতে পারি? নবী স বললেন, হাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি হজ আদায় করে দাও। এ ব্যাপারে কি মনে কর যদি তোমার মা ঋণগ্রস্তা হত তা হলে কি তুমি তা আদায় করতে না? আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সব চাইতে বেশি আদায় যোগ্য।" বু. শ. ১৭১৯।

এই ধরনের আরো কয়েকটি হাদিস রয়েছে, দীর্ঘ হবার ভয়ে উদ্ধৃতি থেকে বিরত হলাম। বদলি হজের যে রীতি প্রবর্তিত হয়েছে, অর্থাৎ আব্বা-আম্মা হজ না করে ইন্তেকাল করলে তাঁদের বদলে অন্যকে দিয়ে হজ আদায় করান, সম্ভবতঃ এই সকল হাদিসই তার সূত্রাগার।

আর একটি ক্ষুদ্র ঘটনার উল্লেখ করছি এ জন্যে যে এ থেকে উপলব্ধি করতে পারব সেই প্রচণ্ড কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে অবস্থান করেও রসুলুল্লাহ স-এর প্রখর দৃষ্টি কেমন ভাবে সকল দিকে

পরিব্যাপ্ত ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদিসটির প্রয়োজনীয় অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলামঃ

"ফজল নবী স এর সওয়ারিতে তাঁর পিছনে বসে ছিলেন। খাসআম গোত্রের এক স্ত্রীলোক এই সময় নবী স-এর নিকট এলে (অল্প বয়স্ক) ফজল তার দিকে দেখতে শুরু করল আর স্ত্রী-. লোকটিও তার দৃষ্টিপাত করতে থাকল। নবী স ফজলের মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন"...বু. শ. ১৭২১।

এভাবে ওয়াদিয়ে মুহাসসবের (উপত্যকা) সীমানা অতিক্রম করে রসূলুল্লাহ স এক সময় জুমরাতুল আকাবার নিকটবর্তী হলেন। কিছুটা পথ অবশিষ্ট থাকতেই হুযুর স কিশোর ফজল ইবনে আব্বাসকে বললেনঃ "কাঁকর খুঁজে দাও।" সাতটি কাঁকর তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলে তিনি কাবা শরীফকে বাঁয়ে এবং মিনাকে ডাইনে রেখে জুমরার সামনে দাঁড়ালেন এবং এ অবস্থাতেই সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন। বু. শ. ১৬২৬ এবং ১৬২৭।

বিদায় হজের ভাষণের সেই বিখ্যাত অংশটি যেখানে হুযুর স জনতাকে জিজ্ঞেস করছেন "তেমরা কি জান এটা কোন দিন, কোন মাস, কোন শহর" ইত্যাদি কোন স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিলেন বুখারি শরিফের একটি হাদিসে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাচ্ছি। এই স্মরণীয় অংশটুকু তিনি কাঁকর মারার সময় আল কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে মিনায় অবস্থিত জুমরার নিকটবর্তী স্থানে জনতার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। ১৬১৯ এবং ১৬২১ সংখ্যক হাদিস দ্রষ্টব্য।

বিদায় হজে জনসমাবেশ হয়েছিল অসাধারণ আর হুযুর স-এর ভাষণটিও ছিল দীর্ঘ। এই ভাষণটি কোন হাদিস গ্রন্থে একত্রে নেই, বুখারি মুসলিম আবু দাউদ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে। এই হাদিসগুলির বর্ণনাকারী হিসেবে যাঁদের নাম উল্লেখিত হয়েছে তাঁরা হলেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস রা, হযরত ইবনে উমর রা হযরত আবু উমামা রা, হযরত জাবের রা, হযরত আবু বাকারা রা প্রমুখ স্বনামধন্য সাহাবী। এঁদের ভাষাতেও বিভিন্নতা

রয়েছে, কেউ হাদিসের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন, কেউ করেছেন অন্যটির, কেউ বা সম্পূর্ণ হাদিসটির। এমন হওয়ার কারণঃ যাঁর যেটুকু স্মরণ আছে তিনি কেবল সেটুকুই বর্ণনা করেছেন। হাদিস এবং মোসনাদ গ্রন্থসমূহ গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে রসূলুল্লাহ স তাঁর জীবনের এই বৃহত্তম গণসমাবেশে ইসলামের মৌল নীতিগুলি বার বার বলেছেন। সম্ভবতঃ তিনি ভাষণ প্রদান করেছিলেন তিনবারঃ প্রথম ভাষণটি ছিল ৯ যিলহজ শুক্রবার আরাফাতের ময়দানে, দ্বিতীয় ভাষণটি প্রদান করেছিলেন ১০ যিলহজ শনিবার মিনাতে এবং তৃতীয় ভাষণটি প্রদত্ত হয়েছিল আইয়ামে তাশরিকের পুন্য দিনে—১১ বা ১২ যিলহজ তারিখে। জনসমাবেশ বিশাল থাকায় সকলের নিকট তাঁর বাণীগুলি পেঁছানোর জন্য একই বক্তব্য তিন জায়গায় রেখে-ছিলেন, ফলে স্বাভাবিক কারণেই বক্তব্যের ভাষা ও শব্দে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। কোথাও কোথাও দু-একটি কথা একেবারে নতুনও সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু ভাষণের মূল বক্তব্য সর্বত্র একই ছিল। সীরাতুন নবী।

কাঁকর নিক্ষেপ সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ স কুরবানির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কুরবানির কি কেবল একটি জায়গাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে? এ সম্পর্কে তাঁর নির্দেশ এলঃ "কুরবানির জন্য কেবল মিনাই নির্ধারিত নয়, বরং মিনা হতে মক্কা পর্যন্ত প্রতিটি গলিতেই কুরবানি করা চলবে।"

রসূলুল্লাহ স-এর সঙ্গে ছিল এক শো উট। পবিত্র হস্ত মুবারক দিয়ে বেশ কয়েকটি উট কুরবানি করে অবশিষ্টগুলি তিনি হযরত আলি রা-র হস্তে অর্পণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেনঃ কুরবানির গোশত বণ্টন করে দিও। বললেনঃ যারা চামড়া ছাড়াবে বা গোশত টুকরো করবে তাদের পারিশ্রমিক পৃথক ভাবে পরিশোধ করো।

নিরক্ষর যুগে কুরবানির প্রথার মধ্যেও নানান কুসংস্কার জমাট বেঁধে উঠেছিল। কুরবানির পশুকে তারা অহেতুক ভাবে অসম্ভব

রকম পবিত্র জ্ঞান করত। কুরবানির পশুর রক্তকে এমনই পূতপবিত্র মনে করত যে এই রক্ত নিয়ে তারা কাবা শরীফের দরজা এবং দেওয়ালে মাখিয়ে দিত। তাদের বিশ্বাস ছিল যে কুরবানির পুণ্য রক্ত আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার এইটাই হল শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এই কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারনাকে ধ্বংস করার জন্যে অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ

"আল্লাহর নিকট কুরবানির রক্ত ও গোশত পৌঁছোয় না, বরং পৌঁছোয় তোমাদের আন্তরিকতা এবং আল্লাহভীতি।" সূরা হজ্জ।

বর্তমানে আয়াতের অন্তর্নিহিত ভাব সম্পদে সুস্পষ্ট ভাবে উপলব্ধ হয় যে আমাদের ব্যবহারিক এবং ধর্মীয় জীবনের সকল কাজে কোন রকম আড়ম্বর ও বাহ্যিক দম্ভ আল্লাহ ভালবাসেন না, সকল কর্তব্যের মধ্যে যেটুকু আন্তরিকতা যেটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা থাকে কেবল সেটুকুই তাঁর কাছে গ্রহণীয়। বিদায় হজের পূর্বে, অবতীর্ণ হয়েছিল এই আয়াত, বিদায় হজের কুরবানির মধ্যে এই ভ্রান্ত প্রথার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না।

কুরবানি সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ স মস্তক মুণ্ডনের জন্য হযরত মামার ইবনে আবদুল্লাহ রা-কে ডাক দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি এহরাম খুলে ফেলেছিলেন। বিশ্বের সকল হাজি আজও কুরবানির পর এহরাম খুলে ফেলেন তারপর মস্তকমুণ্ডন করেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেনঃ "নবী স ও তাঁর সাহাবাদের একদল (এহরাম খুলে) মস্তক মুণ্ডন করে নিলেন।" বু. শ. ১৬১১।

মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারেও জাহেলিয়াত যুগে নানা রকম কুসংস্কার অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। এটা সত্য যে এহরাম অবস্থায় কয়েকটি দিবস মাত্র মস্তকের কেশ মুণ্ডন করা, এমন কি ইচ্ছাকৃত ভাবে শরীরের একটি লোম উৎপাটন করাও নিষিদ্ধ এবং তা করলে 'দম' বা কাফফারা দিতে হয়। কিন্তু কুরবানির পর এ ব্যাপারে কোন নিষেধ নেই। এই মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারটিতে অন্ধকার যুগেব মানুষেরা এমনই গুরুত্ব আরোপ করেছিল যে মাসের পর মাস তারা চুল কাটত না। দূরাদূরান্তের মানুষ সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম

করে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে সমবেত হত, ধূলাবালিতে তাদের মাথায় জট ধরে যেত, এমন কি উকুন ইত্যাদির মারাত্মক আক্রমণে অনেকেই পীড়িত ও দুর্বল হয়ে পড়ত, কখনো কখনো দৃষ্টিশক্তির উপরও এর প্রভাব পড়ত মারাত্মক রকম। এই কঠিন অবস্থাতেও কোন হজযাত্রীকে মস্তক মুণ্ডনের অনুমতি দেওয়া হত না। আল কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ শোনা গেলঃ "আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না।" ২ঃ২৮৬। ধর্মের ব্যাপারে আল্লাহর রসূলও সাধ্যাতীত কষ্ট বা পরিশ্রমের বিরোধী ছিলেন। মস্তক মুণ্ডনের ব্যাপারটিকে এই ভাবে দুঃসহ কর্মে পরিণত করার কোন অর্থই ছিল না। এই ভ্রান্ত প্রথার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে মস্তক মুণ্ডনের পর রসূলুল্লাহ স এই দোয়া করলেনঃ "হে আল্লাহ! মস্তক মুণ্ডনকারীদের ক্ষমা করে দিন।.... তিনবার (এই কথা) বলার পর বললেন, চুল কর্তনকারীদেরও (ক্ষমা করে দিন)।" বু. শ. ১৬০৯-১৬১০। এই দোয়ার মাধ্যমে কেশ কর্তনও যে একটি বিশেষ পুণ্যের কাজ এবং এতেও যে আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা পাওয়া যায় এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

মস্তক মুণ্ডনের পর রসূলুল্লাহ স তাঁর পবিত্র কেশ গুচ্ছের প্রধান অংশ স্নেহের উপহার স্বরূপ হযরত আবু তালহা এবং তাঁর স্ত্রী হযরত উম্মে সুলাইমকে দান করলেন। সমবেত ব্যাকুল সাহাবীদের মধ্যেও বিতরণ করলেন কিছু কিছু। কিন্তু ক্রমধাবমান সাহাবীরা সকলেই যখন সেই মুবারক কেশের কিছু পেতে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলেন, হুযুর স হযরত তালহাকে অবশিষ্ট কেশগুলির দু-একটি করে সকলের মধ্যে বিতরণের আদেশ দিলেন।

আজকের দিনটিও ছিল কর্মবহুল। লোকেরা একের পর এক নানা বিষয়ে মাসায়েল জেনে নিচ্ছিলেন। এভাবে সেই বিশেষ দিবসটিও সমাপ্ত হল। আনাস ইবনে মালেক রা বলেন যে এই দিন রসূল পাক "এশার নামায পড়ার পর কিছু সময়ের জন্য মুহাসসাবে (একটি উপত্যকা) নিদ্রা গিয়েছেন এবং পরে সওয়ারিতে আরোহণ

করে বায়তুল্লায় গিয়ে তওয়াফ করেছেন।” বু. শ. ১৬৪০।

এগার যিলহজ তিনি এলেন বায়তুল্লায়। এই সেই আল্লাহর ঘর! এর কোলে কোলে তাঁর কত দিনের কত রক্ত কত অশ্রু কত বেদনা! সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কি কঠিন সংগ্রামই না তাঁকে করতে হয়েছে। সকল অত্যাচার সকল পীড়ন লাঞ্ছনার কথা আজ তাঁর একে একে মনে পড়ছিল! সে দিন যারা ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আজ তারা কোথায়! সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বামে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেন রসূলুল্লাহ, সর্বত্রই ইসলামের পতাকা উড্ডীন হয়েছে, চতুর্দিকেই বিজয় সেনানীর দুর্জয় মিছিল, চতুষ্পার্শ্বেই আল্লাহ-প্রেমিক রসূলভক্ত মানুষের অবিরাম স্রোত। সীমাহীন সমুদ্রের অসীম জলকল্লোলের মত আকাশ বাতাস মুখরিত করে একটি মাত্র শব্দ-তরঙ্গ ভেসে যাচ্ছেঃ আল্লাহু আকবর। গভীর আবেগে রসূলুল্লাহ স উচ্চারণ করলেন, প্রভু আমার! তারপর ধীরে ধীরে তওয়াফের সীমারেখায় সমবেত হলেন।

এ সময় তাঁর পত্নী উম্মে সালমা রা স্বীয় শারীরিক অসুস্থতার কথা তাঁকে অবগত করালেনঃ “তিনি বললেন, তুমি সওয়ারিতে আরোহণ করে লোকদের পিছনে থেকে তওয়াফ কর।” বু শ. ১৫১২। তিনি তাই করলেন। সেই থেকে অসুস্থ বা বৃদ্ধ বা দুর্বল লোকদের জন্য সওয়ারিতে চড়ে তওয়াফের প্রথা চালু হয়েছে। যাঁরা হজে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই দেখেছেন পাল্কির মত একটি খাটিয়ায় চড়ে, যার উপরটি উন্মুক্ত (পাল্কির মত ঢাকা নয়), দুর্বল অসুস্থ এবং অক্ষম ব্যক্তিরা তওয়াফ করেন। সাধারণতঃ চারজন লোক এটি বহন করে, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে খাটিয়া সহ এই ধরনের বহণকারী কাবার নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকেন।

সকল রকম কুপ্রথা অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রান্ত সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে নিখিল বিশ্বমানবের মুক্তির জন্যে পৃথিবীতে এসেছিলেন রসূলুল্লাহ স। আর এও ভেবে আমরা বিস্ময়বোধ করি কত কুসংস্কারই না মানুষের মধ্যে প্রচলিত হয়েছিল জাহেলিয়াত যুগে! তওয়াফ করতে করতে রসূলুল্লাহ স লক্ষ্য করলেন যে একজন

তওয়াফকারীর দুটি হাত "ফিতে, রশি বা অনুরূপ কোন কিছু দিয়ে...বাঁধা আছে। নবী স নিজ হাতে তা কেটে দিলেন এবং বললেন, ওকে হাত ধরে নিয়ে যাও।" বু. শ. ১৫১৩। জাহেলিয়াত-যুগে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকির বের করত এবং এভাবে নিজেদের অমানুষিক কষ্ট দিয়ে ভাবত, এভাবেই আল্লাহর নৈকট্যলাভ সহজ হবে। অথচ এই অর্থহীন ও উদ্দেশ্যবিহীন কাজের মাধ্যমে কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যেতে পারে না। রসূলুল্লাহ স কেবল লোকটির হাতের বাঁধনই কাটলেন না, তিনি যেন কুসংস্কারের অন্ধ যবনিকা ছেদ করে বিশ্ব-মানবকে আল্লাহর পথে কল্যাণের পথে মঙ্গলের পথে মহামুক্তি দান করলেন।

তওয়াফ সমাপ্ত করে মাকামে ইবরাহিমে দু রাকাত নামায পড়লেন রসূলুল্লাহ। উম্মে সালমা রা-এর বর্ণনানুযায়ী অবগত হওয়া যায় যে এই নামাযে রসূলুল্লাহ স 'ওয়াত্তুরে ওয়া কিতাবিম মাসতুর' এই সূরাটি পাঠ করেছিলেন। বু. শ. ১৫১২।

নামায সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ স এলেন বহুবাঞ্ছিত পবিত্র যমযমের কিনারায়। সে সময় যমযম হতে পানি উত্তোলন করে হাজি-দের পান করানোর দায়িত্ব ছিল হযরত আবদুল মোত্তালের পরিবারের উপর। তাঁরা যথারীতি পানি উত্তোলন করে তীর্থযাত্রীদের পান করাচ্ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে হযরত আব্বাস রা-র কাছে "পানি চাইলেন। তখন আব্বাস ফজলকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ফজল! তোমার মায়ের কাছে গিয়ে রসূলুল্লাহ স-এর জন্য শরবত নিয়ে এস। রসূলুল্লাহ স বললেন, আমাকে পান করাও (অর্থাৎ শরবতের প্রয়োজন নেই, যমযমের পানি দাও)। উত্তরে আব্বাস বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সকলেই ত এর মধ্যে হাত দেয়। এর পরও তিনি (নবী স) বললেন, আমাকে পানি পান করাও। তারপর তিনি সেখান থেকেই পানি পান করলেন।" বু. শ. ১৫২৬।

সাম্যবাদের কি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠা! কেবল গালভরা দার্শনিক বাক্য-

জাল বিস্তার করলে সাম্য প্রতিষ্ঠা হয় না, এর জন্য চাই আন্তরিক আত্মিকতায় মাটিতে নেমে সকলের সঙ্গে এক কাতারে সামিল হওয়া। একথা কি করে বিস্মরিত হব যে বিশ্ববিজয়ী একজন মানুষ মসজিদ নববীর জন্যে নিজ কাঁধে পাথর বয়েছেন, খন্দক যুদ্ধে সহস্র শ্রমিকের সঙ্গে একজন শ্রমিক হয়ে রাতদিন মাটি কেটেছেন—তাঁর ধূলিধূসর দেহকে কর্মক্লান্ত সন্ধ্যায় অনেকেই চিনতে পারতেন না, সকলে যে পাত্রের মধ্যে হাত দেয় এবং মুখ লাগিয়ে পানি পান করে, সাম্যের মহাসম্রাট আজ সে পাত্র থেকেই পানি পান করলেন।

এই ঐতিহাসিক হাদিসের পরবর্তী অংশে রসূলুল্লাহ স-এর যে শ্রদ্ধেয় বিশ্বমানবিক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার সম্মুখে আমার চিত্ত শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে একাকার হয়ে যায়। ."যমযমের নিকটে এসে দেখলেন সকলেই পানি পান করানো ও পানি উত্তোলনের কর্মে ব্যাপৃত। এসব দেখে তিনি বললেন, তোমরা এসব কাজ করতে থাক। কেননা তোমরা সৎ ও পুণ্যের কাজ করছ। তারপর তিনি বললেন, মানুষের ভিড়ে তোমরা পর্যুদস্ত হয়ে পড়বে মনে না করলে (তিনি নিজের কাঁধের প্রতি ইশারা করে বললেন) আমি সওয়ারি হতে নেমে (পানি উত্তোলনের) দড়ি আমার কাঁধে নিতাম (অর্থাৎ পানি উত্তোলন করে সকলকে পান করাতাম। কিন্তু আমি এ কাজ করতে শুরু করলে উদ্বেলিত জনতার ভিড় বেড়ে যাবে এবং চাপে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে)।" বু. শ. ১৫২৬।

যমযমের পানি পান করার সময় রসূলুল্লাহ স কেবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন।

তওয়াফ সমাপ্তির পর হুযুর আকরাম স মিনায় প্রত্যাবর্তন করে জোহরের নামায আদায় করেন। দু-একটি হাদিসে মক্কাতেই জোহরের নামায আদায়ের কথা আছে কিন্তু মিনাতে নামায আদায়ের হাদিসগুলিই অধিকতর বিশুদ্ধ মনে হয়। (আল্লাহ ভাল জানেন)

যিলহজের বার তারিখে মিনাতে একটি ভাষণ দানের কথা আছে সীরাতুন নবীতে, এ প্রসঙ্গে লেখকদ্বয় আবু দাউদের কথা উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য এই ভাষণটিও পূর্বোক্ত ভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ।

অবশেষে এই মহাহজের বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এল। তিন দিবস ব্যাপী কঙ্কর নিক্ষেপ সমাপ্ত হয়ে গেল এক সময়। দিনটি ছিল যিলহজ মাসের তের তারিখ, মঙ্গলবার। রসূলুল্লাহ স মিনা প্রান্তর থেকে বিদায় নিয়ে বিশাল কাফেলাসহ অগ্রসর হলেন সম্মুখের দিকে। মক্কা শরীফে প্রবেশ প্রস্থানের সময় হুযুর স সাধারণতঃ মুহাসসবে (উপত্যকায়) রাত্রি যাপন করতে ভাল-বাসতেন। আজও, এই বিদায় ক্ষণে, তিনি মুহাসসবে রাত্রি যাপনের বাসনা প্রকাশ করলেন। কিছু বিশ্রাম ও নিদ্রার পর শেষ রাতের দিকে চলে এলেন পবিত্র কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে। পরম ভক্তি ভরে তওয়াফে বেদা বা বিদায় তওয়াফ আদায় করলেন তারপর। তাঁর জীবনে এই শেষবারের মত কাবা প্রাঙ্গণে উপস্থিতি এবং এইই শেষ তওয়াফ। হজ সমাপ্ত করে মক্কা শরীফ ছেড়ে চলে যাবার সময় আজও সকল হাজিকে এই বিদায় তওয়াফ করতে হয়।

বিদায় তওয়াফ সমাপ্ত হলে অশ্রু সিক্ত নয়নে রসূলুল্লাহ স মানবের কল্যাণের জন্য মুনাযাতে লিপ্ত রইলেন দীর্ঘক্ষণ। ইতি-মধ্যে ফজরের সময় হয়ে এসেছিল। হযরত বেলাল রা আযান দিলেন। আল্লাহর ঘরের সম্মুখে উম্মতের বিশাল কাফেলাকে নিয়ে শেষ বারের মত নামায পড়লেন আল্লাহর রসূল। আসন্ন বিদায়-লগ্নে এক অব্যক্ত বেদনায় সকলের দেহমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই বিষণ্ণতা যেন মূর্ত হয়ে উঠল রসূলুল্লাহ স-এর কণ্ঠে। সকলকে উদ্দেশ্য করে শেষবারের মত হাত নেড়ে বললেনঃ আলবেদা! বিদায়।

পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কাফেলাগুলি স্ব স্ব গৃহাভিমুখে রওনা হয়ে গেল তারপর। মোহাজের আনসারদের সঙ্গে নিয়ে রসূলুল্লাহ স-ও অগ্রসর হলেন মদিনা মনোয়ারার পথে।

পথিমধ্যে পড়ল জাহফা। জাহফা থেকে তিন মাইল দূরে খুম। এই খুমে ছিল একটি ক্ষুদ্র গাদির বা জলাশয়। খুমে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র গাদিরের (জলাশয়ের) জন্য স্থানটিকে গাদিরে খুমও বলে। এই গাদিরে খুমের কিনারায় রসূলুল্লাহ স সকলকে সমবেত করে

একটি সংক্ষিপ্ত হৃদয়স্পর্শী ভাষণে পুনরায় স্মরণ করালেনঃ

হে লোকসকল! আমিও একজন মানুষ। হতে পারে যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর নির্দেশ সহ ফেরেশতা এসে উপস্থিত হবে এবং আমাকে তা স্বীকার করতেই হবে। আমি তোমাদের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ রেখে যাচ্ছি, তার প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহর কোরআন। আল্লাহর কিতাব হেদায়ত ও নূরে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থকে দৃঢ়তার সঙ্গে অবলম্বন করবে। আর অপরটি হচ্ছে আমার নির্দেশ। এদের সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো।" সীরাতুন নবী।

ভাষণ সমাপ্ত হলে দূর দুর্গম মরু পথে আবার চলা শুরু হল। দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন। অবশেষে মদিনা নিকটবর্তী হল। মদিনায় প্রবেশের পূর্বে সাধারণতঃ যুলহুলাইফাতে রাত্রি যাপন করতেন রসূলুল্লাহ স। আজও তাই করলেন। পরদিন প্রত্যূষে পুনরায় পথে নামলেন সকলে। সফরের শেষ মঞ্জিল আগত। সকালের সোনালি কিরণে পথঘাট পর্বত প্রান্তর আলোকিত। প্রবাসী কাফেলা ব্যাকুল আগ্রহে ঘরে ফেরার জন্য উম্মুখ। আল্লাহর রসূলও চলেছেন সকলের সঙ্গে। অবশেষে গাছগাছালি ভেদ করে শির নোয়ানো খুর্মা গাছের অন্তরাল হতে মদিনার ঘরবাড়ি দৃষ্টিগোচর হল। প্রিয়তম মদিনার গাছপালা ঘরবাড়ী পরিচিত পথ দৃষ্টিপথে পড়া মাত্রই সকলের দেহমন সীমাহীন আবেগে আন্দোলিত হয়ে উঠল। উল্লাসে আনন্দে কৃতজ্ঞতায় যেন আর এক মানুষ হয়ে উঠলেন রসূলুল্লাহ স। দূর সফরের সফল সমাপ্তির পর মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে নিরাপদে আপন আবাসে ফিরিয়ে এনেছেন। সকলে যখন প্রিয় পরিজনদের সঙ্গে মিলনের জন্য উম্মুখ, মুহম্মদ মোস্তফা স-এর কণ্ঠে তখন আপন প্রভুর প্রতি সজল কৃতজ্ঞতার গুঞ্জরণ! ভাব বিহ্বল কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেনঃ "আল্লাহ হু আকবর"..."আল্লাহ মহান। আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি এক। তাঁর কোন অংশী নেই। সকল সার্বভৌমত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল কিছুর উপর

ক্ষমতাবান। আমরা প্রার্থনা রত অবস্থায় তওবা করে প্রত্যাবর্তন করছি। প্রভুর প্রশংসাবলী উচ্চারণ করে তাঁরই উদ্দেশ্যে সিদজায় শির লুটিয়ে দিয়েছি। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, সকল হানাদার শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছেন।" বুখারি, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী।

বিদায় হজ সমাপ্ত হল। মসজিদ নববীতে দুরাকাত নামায পড়ে যে যার বাড়িতে চলে গেলেন।

রসূলুল্লাহ স-এর সঙ্গে এই গুনাহগার, পৃথিবীর সবচেয়ে অপবিত্র এই আত্মা, ধূলিপথে ঘুরে ঘুরে সেই মহান হজের সেই পবিত্রতম হজ মুবারকের এতটুকু রেশ যেন পেয়ে গেল! কি সৌভাগ্য আমার! আমি ধন্য হলাম!!

হজের মধ্যে ঘটে যাওয়া আরো কিছু ঘটনার বিবরণ না দিলে অধ্যায়টি যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কয়েকটি বিশেষ ঘটনা এবং হাদিস এখানে পরপর আমরা উদ্ধৃত করলামঃ

ক. এক শ্রেণীর মানুষ কোন রকম পাথেয় সঙ্গে না নিয়েই স্বদেশ ভূমি থেকে হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। প্রশ্ন করা হলে তারা বলতঃ আমরা পরিপূর্ণ রূপে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল, তিনিই আমাদের সকল কিছুর ব্যবস্থা করবেন। তাদের এই গালভরা গর্বিত কথাগুলি শ্রবণ করে আর কেউ কিছু বলত না। কিন্তু প্রবাসে বহির্গত হয়েই এই সব বাকচতুর মানুষদের আল্লাহ নির্ভরতা হয়ে যেত অবলুপ্ত। পথে প্রান্তরে জীবিকা নির্বাহের জন্য তারা কেবল সঙ্গী সাথীদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ত না ভিক্ষা করতে শুরু কবত শেষ পর্যন্ত। এই ভ্রান্ত মানসিকতা দূর করার জন্যে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ "অ তাজাও অদু ফাইন্না যাইরা যাদেত্ তাকওয়া"—তোমরা পাথেয় নিয়ে বার হও, অবশ্য আল্লাহভীতি (আত্মসংযমই) সর্বোত্তম পাথেয়। সূরা বাকারাহ।

খ. ধর্মপালনের নামে আরববাসীরা নানারকম কষ্টসাধ্য নিয়ম-নীতির প্রচলন করেছিল, অবশ্য এই সকল শ্রমসাধ্য রীতিনীতিগুলি

তাঁরা নিজেরাই আবিষ্কার করে নিজেদের উপর কঠোরভাবে প্রয়োগ করত। যেমন হজব্রত পালনের একটি কঠোর পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল তারা, এই পদ্ধতিকে বলা হত 'হজ্জে মুসমেত'। এই পদ্ধতিতে যিনি হজ আদায় করতেন, হজের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি একটি কথাও বলতেন না, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি নির্বাক ভাবে সম্পন্ন করতেন। বুখারি শরিফে এই ধরনের হজের বর্ণনা আছে। অথচ এই পদ্ধতি পরিপূর্ণ রূপে ইসলামী চিন্তাধারার পরিপন্থী। অবশ্য পরবর্তীকালে এই প্রথা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়।

গ. উলঙ্গ হয়ে কাবা শরীফ তওয়াফের বিবরণ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করেছি। এখানে আমরা বুখারি শরিফ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক হাদিস উদ্ধৃত করলাম, বর্তমান হাদিস থেকে বিষয়টি অধিকতর সুস্পষ্ট হবে। হিশাম ইবনে উরওয়া রা বলেন ঃ

"কুরেশরা এবং তাদের ঔরসে সন্তান-সন্ততি ব্যতীত সব লোকেরাই জাহেলি যুগে উলঙ্গ হয়ে (খানা কাবা) তওয়াফ করত আর হুমুস বা কুরেশরা পুণ্য মনে করে লোকদের কাপড় দান করত। তাদের পুরুষরা পুরুষদের কাপড় দিত আর মেয়েরা মেয়েদের কাপড় দিত। এ কাপড়ে তারা তওয়াফ করত। কুরেশগণ যাদের কাপড় প্রদান করত না তারা উলঙ্গ হয়েই তওয়াফ করত।" বু. শ. ১৫৫২।

ঘ. মিনায় অবস্থানকালে একটি ছোট্ট কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। একজন সাহাবী রসুলুল্লাহ স-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ "কোন প্রকার জিহাদ আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয়? উত্তরে রসুলুল্লাহ স বললেন, অত্যাচারী রাজার মুখের উপর সত্য কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া।"

এই হাদিসের বিশাল ব্যাপ্তি এবং ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

ঙ. দুজন সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তি সাদকার মাল থেকে কিছু পাবার জন্যে হুযুর আকরাম স-এর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বার বার প্রার্থনায় তাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন ঃ অবস্থাপন্ন বা সুস্থ কর্মক্ষম ব্যক্তির এ মালে কোন অধিকার নেই। এ অবস্থায় তোমরা তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে আমি দিতে সম্মত আছি।

সম্ভবতঃ কুরবানির চামড়া ইত্যাদির ব্যাপারে এ ঘটনা ঘটে থাকবে, অন্য কোন ব্যাপারেও হতে পারে।

চ. আরো একটি স্মরণীয় হাদিসঃ

"চারটি বিষয় আমি রসুলুল্লাহ স-এর নিকট থেকে শুনেছি . বিষয়গুলি আমাকে চমৎকৃত করেছে এবং খুবই ভাল লেগেছেঃ ১, স্বামী বা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ হারাম) ব্যক্তি ছাড়া কোন স্ত্রীলোক দুদিনের রাস্তা সফর করবে না ২. কেউ ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আযহা এই দু দিন রোজা রাখবে না ৩, আসর ও ফজরের পর কেউ কোন নামায আদায় করবে না, আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং ৪, মসজিদে হারাম (মক্কা), আমার মসজিদ (মসজিদ নববী, মদিনা) এবং মসজিদে আকসা (জেরুজালেম) এই তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন মসজিদের জন্য সফরের প্রস্তুতি নেবে না। বু. শ. উমরা অধ্যায়, ১৭২৯।

ছ. নদীতে যখন স্রোত থাকে না তখনই শ্যাওলা আর আবর্জনায় তা ভরে ওঠে। অন্ধকার যুগে যখন ধর্ম সত্যবিচ্যুত আর প্রাণহীন হয়েছিল তখনই নানান কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসে মানুষের চলার পথ হয়ে উঠেছিল দুর্গম, ধর্মপালনের পদ্ধতি প্রকরণও হয়ে উঠে-ছিল উদ্ভট। বিদায় হজে রসুলুল্লাহ স দেখলেন এক বৃদ্ধ তার দুই পুত্রের উপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে হেঁটে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, লোকটির কি হয়েছে? লোকেরা জানাল, সে হেঁটে হেঁটে (কাবা পর্যন্ত) যাবার মানত করেছে। একথা শ্রবণ করে খুবই বেদনাহত হলেন রসুলুল্লাহ স, আজও এমন ভ্রান্ত সংস্কার প্রচলিত আছে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হলেন। তারপর নির্দেশ দিলেনঃ লোকটি সওয়ারিতে উঠে যাক। (সে জেনে রাখুক) "আল্লাহ এই লোকটির নিজেকে কষ্ট দেবার মুখাপেক্ষী নন"—"ইন্নাল্লাহা য়ান নায়্‌জিবে হাজা নফসাহু।" বু. শ. ১৭৩০।

কৃতজ্ঞতাঃ বিদায় হজ অধ্যায়টি লেখার সময় আমি বিশেষ ভাবে নির্ভর করেছি বিশুদ্ধ বুখারি শরীফের 'কিতাবুল মানাসিক'

এবং 'কিতাবুল উমরা' অধ্যায় দুটির উপর। ঢাকার আধুনিক প্রকাশনী থেকে সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ বুখারি শরিফের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা এর দ্বিতীয় খণ্ডে বর্তমান অধ্যায় দুটির সন্ধান পাবেন। আমি বহু উদ্ধৃতিতে সঠিক হাদিস সংখ্যা (যথা বু. শ. ১৬০৩ অর্থাৎ বুখারি শরিফ, দ্বিতীয় খণ্ড, হাদিস সংখ্যা ১৬০৩) উল্লেখ করেছি। এরপরই উল্লেখ করতে হয় জনাব মাওলানা মুহিউদ্দীন খান অনূদিত আল্লামা শিবলি নোমানীর সীরাতুন নবী, দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থটির। মাওলানা আকরাম খানেব 'মোস্তফা চরিত' গ্রন্থটিও আমার বিশেষ উপকাবে এসেছে। অন্যান্য গ্রন্থেব কথা যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে।

বিদায় হজের সূচি-সংক্ষেপঃ

২৫ জিলকদঃ মদিনা মনোয়ারা থেকে জোহরের নামাযের পর হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু, যুলহুলাইফাব মসজিদে সাজরায় আসরের নামায পাঠ

২৬ জিলকদঃ যুলহুলাইফাতে মগরিব এবং রাত্রের অবস্থান, ফজরের পর যাত্রা শুরু এহরাম বাঁধা, কুরবানীব পশুর গলায় রুমাল বেঁধে চিহ্নিত করা

৩ জিলহজঃ মক্কার উপকণ্ঠ সরফ এ পৌঁছান, রাত্রি যাপন, প্রভাতে গোসল

৪ জিলহজঃ রবিবার ভোরে মক্কা মোয়াজ্জমে প্রবেশ, হাশেমি গোত্রের শিশুদের প্রতি আদর, কাবায় প্রবেশ, অযু, তওয়াফ

৭ জিলহজঃ সম্ভবতঃ এই তারিখে কাফেলাসহ মিনায় গমন

৮ জিলহজঃ মিনায় অবস্থান

৯ জিলহজঃ ফজর পর্যন্ত মিনায় অবস্থান, নামাযের পর আরাফাত গমন, ভাষণ দান হজ ব্রত পালন, জোহর-আসর একত্রে পড়া এবং বিকেলে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে মুযদালেফার পথে যাত্রা

১০ জিলহজঃ এশার সময় মুযদালেফায় উপস্থিতি এবং একসঙ্গে মাশয়ারুল হারামের পাদদেশে মগরিব ও এশার নামায পাঠ ; নিদ্রা, ফজরের নামায এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা, জুমরাতুল আকাবায় কাঁকর মারা, ভাষণ দান, কুরবানী করা, মস্তক মুণ্ডন

১১ জিলহজঃ বায়তুল্লাহতে আগমন এবং ফরজ তওয়াফ, মিনায় প্রত্যাবর্তন এবং জোহরের নামায

১২ জিলহজ মিনায় অবস্থান

১৩ জিলহজ কাবাশরীফে আগমন, বিদায় তওয়াফ ফজরের নামায, মদিনার পথে যাত্রা,

মদিনা থেকে আসার সময় ৯ দিন সময় লেগেছিল, ফেরার পথেও যদি ৯ দিন সময় ধরা যায় তা হলে কাফেলাসহ রসুলুল্লাহ মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ২২ জিলহজে আর ফেরার পথে যদি একদিন সময় কম লেগে থাকে তাহলে প্রত্যাবর্তনের তারিখ ২১ জিলহজ। সুতরাং একথা বলা যায় যে ২৫ জিলকদে যাত্রা করে মহাহজ সম্পূর্ণ করে হুযুর আকরাম স মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ২১ বা ২২ জিলহজ তারিখে। এই পবিত্র যাত্রার সর্ব মোট সময় লেগেছিল ৩ বা ৪ দিন কম এক মাস।

প্রয়োজনীয় টীকাঃ

১. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ নবী স এবং তাঁর সাহাবাগণ তেল মেখে, চিরুণী করে, লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করার পর মদিনা থেকে রওনা হলেন।

২. আয়েশা রা বলেনঃ বিদায় হজের বছরে আমরা হজের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে যাত্রা করলাম। বুখারী শরীফ।

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর বলেনঃ রসুলুল্লাহ স মদিনা থেকে বহির্গমনকালে শাজারার পথ দিয়ে বের হতেন। বুখারী শরীফ।

৪. আকীক উপত্যকার যুলহুলাইফার খুয়াররাস নামক স্থানে অবস্থান কালে নবী স স্বপ্ন দেখলেন। তাঁকে বলা হল, আপনি এখন কল্যাণময় কঙ্করমুক্ত ভূমিতে অবস্থান করছেন।. .জায়গাটি হল উপত্যকার মধ্যস্থলে অবস্থিত মসজিদের নিম্ন দিকে—রাস্তা ও অবতরণকারীদের মধ্যস্থলে। বুখারী শরীফ।

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ অতঃপর প্রত্যুষে যুলহুলাইফা থেকে সওয়ারিতে আরোহণ করে বায়দা নামক স্থানে উপস্থিত হলে তিনি ও তাঁর সাহাবাগণ তালবিয়া পাঠ করলেন এবং নিজেদের কুরবানির পশুর গলায় কেলাদা বা কুরবানির পশুর চিহ্ন রুমাল বেঁধে দিলেন। বুখারী শরীফ।

৬. নাফে রা বলেনঃ ইবনে উমর হেরেমের নিকটবর্তী হলে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দিতেন, যি-তুয়া উপত্যকায় রাত কাটাতেন। সকালে সেখানে ফজরের নামায আদায় করে গোসল করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহর নবী এরূপই করতেন। বুখারী শরীফ।

৭. ইবনে উমর রা বলেনঃ রসূলুল্লাহ স সানিয়াতুল উলইয়া (উচ্চভূমি) দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন ও সানিয়াতুল সুফলা (নিম্নভূমি) দিয়ে মক্কা থেকে বের হতেন। বুখারী শরীফ।

৮. আয়েশা রা হতে বর্ণিত। আমরা হজের মাসে. . রসূলুল্লাহর সঙ্গে যাত্রা করলাম এবং সারাফে গিয়ে যাত্রায় বিরত হলাম। নবী স তাঁর সাহাবাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যার কুরবানীর পশু নেই, সে উমরা করতে চাইলে উমরা আদায় করবে। বুখারী শরীফ। ১৪৫৭

৯. উসামা ইবনে যায়েদ রা বলেনঃ তিনি নবী স-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! মক্কায় আপনি নিজ বাড়ির কোথায় অবস্থান করবেন? তিনি উত্তর দিলেন, আকীল (সে রসূলুল্লাহর ঘর দখল করে রেখেছিল) কি আসবাবপত্র ও ঘরবাড়ির কিছু অবশিষ্ট রেখেছে? বুখারী শরীফ। ১৫৮৪। (এটি মক্কা বিজয়ের সময়ের ঘটনা।)

১০. ইবনে আব্বাস রা বলেনঃ নবী স মক্কায় আগমন করলে

বনি আবদুল মুত্তালিবের (হাশেম গোত্র) কয়েকজন বালক তাঁকে স্বাগত জানাল। তিনি তাদের একজনকে সামনে আর একজনকে নিজ সওয়ারির পিছনে উঠিয়ে নিলেন। বুখারী শরীফ। ১৬৬৯

১১. আয়েশা রা বলেনঃ নবী স মক্কায় পৌঁছেই যে কাজটি করলেন তা হল তিনি অযু করলেন, তারপর তওয়াফ করলেন কিন্তু এটি উমরায় পরিণত হল না (কেননা তাঁর সঙ্গে কুরবাণীর পশু ছিল)। বু. শ. ১৫০৯

১২. আমার ইবনে দীনার রা বলেনঃ আমি ইবনে উমরকে বলতে শুনেছি নবী মক্কায় আগমন করে সাত বার বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলেন এবং মাকামে ইবরাহিমের পিছনে দাঁড়িয়ে দু রাকাত নামায পড়লেন। (সায়ী করার জন্য) সাফা পাহাড়ের দিকে গমন করলেন। বু. শ. ১৫১৯।

১৩. হজের এই মাসসমূহে যে সর্বপ্রকার যুদ্ধবিগ্রহ হত্যা লুণ্ঠন অপবিত্র জ্ঞান করা হত তার প্রমাণ ধর্মবিশ্বাস ছাড়াও প্রাচীন ইতিহাস, কাব্যগ্রন্থসমূহের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এমনকি রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও আরবদের এই দৃঢ়মূল বিশ্বাসের প্রমাণ রয়েছেঃ সিরিয়া ফেলিস্তিন আক্রমণ করতে চেয়েছিল রোমকগণ, ৫৪১ খৃষ্টাব্দে কিন্তু প্রবল প্রতিআক্রমণের আশঙ্কাও ছিল আরবদের পক্ষ থেকে। এসব ব্যাপার নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনার সময় রোমক সেনাপতি উত্তর দেনঃ এ সময় আরবদের পক্ষ হতে ভয়ের কোন কারণ নেই। কেননা অতি সত্তর সেই মাস আসছে যে মাস সমূহকে আরবরা খুব সম্মান করে, এ সময় তারা ধর্মের কাজে আত্মনিয়োগ করে—অস্ত্রধারণ করে না। সীরাতুন নবী, ২য় খন্ড, পৃ ১৪৯।

১৪. সম্পূর্ণ হাদিসের অনুবাদ এইঃ আবু বাকরা রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিদায় হজে কুরবানির দিন নবী স আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এটি কোন দিন? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। তখন নবী স কিছু সময় নিশ্চুপ থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করে বসলাম তিনি হয়তো এর

নাম পাল্টিয়ে নতুন নাম রাখবেন। তিনি বললেন, এটা কি কুরবানির দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ মাস কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি কিছু সময় চুপ করে থাকলেন, এমন কি আমরা ধারণা করে নিলাম, তিনি হয়তো এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি যিলহজ মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ-এটি যিলহজ মাস। এরপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন শহর? আমরা সবাই বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই সর্বাধিক অবগত। তখন তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থাকলেন, এমন কি তা দেখে আমরা ধারণা করে নিলাম যে, তিনি এর নাম পাল্টিয়ে নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি মহাসম্মানিত শহর নয়? আমরা সবাই বললাম, হ্যাঁ এটি মহাসম্মানিত শহর। তখন তিনি বললেন, তোমাদের রক্ত ও সম্পদ তোমাদের এই শহরে, এই মাসে, এই দিনের মতই ততদিন পর্যন্ত মহান ও মর্যাদা সম্পন্ন যতদিন না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করবে।” বু. শ. ১৬২১, এই সঙ্গে ১৬১৯ এবং ১৬২২ সংখ্যক হাদিস ও দ্রষ্টব্য।

১৫. হিশাম ইবনে উরওয়া রা বলেনঃ “আমি উসামার কাছে বসে ছিলাম। এমন সময় হুজ্জাতুল বেদা বিদায় হজে আরাফাত থেকে মুযদালেফাতে ফেরার পথে রসূলুল্লাহ স-এর চলার গতি কেমন ছিল সে সম্পর্কে উসামাকে জিজ্ঞেস করা হল। জবাবে তিনি বললেন, তিনি (নবী স) দ্রুত গতিতে চলতেন। আর যখন তিনি কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপনীত হতেন দ্রুততর গতিতে চলতেন।” বু. শ. ১৫৫৩।

১৬. যোহরী রা বলেনঃ “মিনার মসজিদের নিকটবর্তী জামারায় নবী স যখন কাঁকর নিক্ষেপ করতেন, সাতটি পাথরের টুকরো মারতেন। প্রতিটি পাথর খন্ড নিক্ষেপের সময় তকবীর বলতেন। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে দোয়া করতেন। তিনি সেখানে দীর্ঘক্ষণ

অবস্থান করতেন। তারপর জামারায়ে সানিয়া বা দ্বিতীয় জামারাতে গিয়েও সাতটি কাঁকর মারতেন এবং প্রতিটি কাঁকর নিক্ষেপের সময় তকবীর বলতেন। তারপর সেখান থেকে বাঁ দিকে উপত্যকা সংলগ্ন স্থানে অবতরণ করতেন এবং দু হাত তুলে কেবলামুখী হয়ে অবস্থান ও দোয়া করতেন। সব শেষে আকাবার নিকটবর্তী জামারায় যেতেন এবং সেখানেও সাতটি কাঁকর মেরে রোমি করতেন। প্রতিটি কাঁকর মারার মুহূর্তে তকবীর বলতেন। তারপর সেখানে অপেক্ষা না করে প্রত্যাবর্তন করতেন।" বু. শ. ১৬৩১।

২১.

আমরা সদলবলে লাব্বায়েকের পথে, আত্মনিবেদনের পথে বেরিয়ে পড়লাম। ঘড়িতে তখন রাত দশটা সাত। সংগে বেডিং পত্তর, খাবার-দাবার আর টুকিটাকি কিছু অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ ছিল। হাশমি ইশরাত আবার তাঁর সব কিছু সংগে এনেছেন। সে রীতিমত একটা মুটের ব্যাপার। কিন্তু আজকের এই দিনে এখানে দাঁড়িয়ে কুলির চিন্তা বৃথা। অন্ততঃ মুয়াল্লিমের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে একটা ট্যাক্সি হলে ভাল হত। পথের মাঝে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বুঝলাম নিতান্ত নির্বোধ না হলে আজকের দিনে এই বস্তুটির চিন্তা করে না। শেষ পর্যন্ত হাঁটতেই শুরু করলাম। হাঁটতে হাঁটতে বার বার মনে পড়ছিল বিদায় হজের কথা। এই হজে রসুলুল্লাহ এবং সাহাবীগণ যে অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তা যেন ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। আর হৃদয়মন দিয়ে আগুনজ্বলা ধূপের মত সেই সীমাহীন যন্ত্রণার অনেকখানি উপলব্ধি করছিলাম। আমরা ত এই মাত্র ত্রিতল গৃহের শান্ত শীতল পরিবেশ থেকে পথে নেমেছি আর রসুলুল্লাহ? ন দিনের তাপদগ্ধ মরুযাত্রা, মাথার উপর দু লক্ষ যাত্রীর কঠিন দায়িত্ব সব কিছু বয়ে নিয়ে চলেছিলেন মিনার পথে। এসব কথা মনে হতেই কোথায় থেকে এক দুরন্ত শক্তি ছুটে এল রক্তের কণায় আর তাতেই মান-অভিমান ছিটকে সরে গেল, আমি কুলি হলাম। মাথায় মোট, কাঁধে মোট, পিঠে মোট—আমি অবলীলায় এক মহাসম্রাটের মত পথ হাঁটতে শুরু করলাম। এই মোট বওয়া আজ আমার কাছে কত গৌরবের! কত সম্মানের!! সেই 'আমি-কুলি'র মধ্যে হঠাৎ এক অসাধারণ অভিজাত্যবোধ ফিরে এল। দুর্বার উল্লসিত কণ্ঠে পথের অবিরাম জনস্রোতের দিকে ফিরে আমার বলতে ইচ্ছে হলঃ তোমরা দেখ আমাকে, কি মহান কর্তব্যের বোঝা নিয়ে এই আমি সম্মানিত মিনার যাত্রী। হঠাৎ দেখি আমার মধ্যে সঞ্চিত

হওয়া উচ্ছ্বাসের সেই প্রবলাবেগ এক অলৌকিক রন্ধ্র পথে ঝটিকার মত বার হয়ে গেল আর ভিতরের স্ফীত চিন্তারা অকস্মাৎ জমাট বেঁধে দলবদ্ধ হয়ে গেল। জলীয় বাষ্প নিষ্ক্রমণের পর যেমন স্টীম ইনজিনের পিস্টনে বিপুল শক্তির ধাক্কা লাগে, উচ্ছ্বাস নির্গমনের পর আমার মধ্যেও তেমনি এক অনন্ত শক্তির কল্যাণময় স্পর্শ লাভ করলাম। মনে হল, আমি ত লাব্বায়েকের পথের যাত্রী, এ পথের লক্ষ্য আত্মসমর্পন—আত্মপ্রদর্শন নয়। সুতরাং আমার ক্রিয়াকর্ম মানুষের বাহবা আকর্ষণ করবে কেন, কোন প্রয়োজন নেই বাহাদুরি পাবার। এসব ভাবনার উঁকিঝুঁকিতে হঠাৎ আমি যেন আল্লাহর কাছে খুব ছোট হয়ে গেলাম। এই আত্মোন্মাদনা নিয়ে আমি ত তাঁর পবিত্র দরবারে হাজির হতে পারি না! আস্তাগ ফেরুল্লাহ পড়লাম কয়েকবার। তারপর সেই কল্যাণময় সদাজাগ্রত শক্তিতে আত্মসমর্পন করে বিনীত ভাবে পথ হেঁটে চললাম, পূর্বাপেক্ষা অনেক সহজভাবে অনেক সাবলীল ভংগিতে। হঠাৎ আমার মধ্যে এত সব চিন্তাভাবনার যে উদ্বেলিত তরঙ্গমালা আন্দোলিত হয়ে গেল, আমার সাথীরা তার সন্ধান পেলেন না।

কাবা শরীফের পাশে মুয়াল্লিমের বাড়িতে হাজির হলাম সাড়ে দশটায়। এখান থেকেই বাসে করে মিনায় যাবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এসে শুনলাম রাত বারোটার আগে তাঁর কোন বাস আসবে না। অথচ বিশাল রাস্তা জুড়ে অসংখ্য বাস প্রতি মুহূর্তে ছুটো-ছুটি করছে, সে সব বাসে ওঠার অধিকার নেই আমাদের। এযেন অনন্ত মহাসাগরের উপর থেকেও পিপাসার পানি থেকে বঞ্চিত হওয়া। সুতরাং নিরুপায় আমরা মক্কা হোটেলের বারান্দায় মালপত্র নামিয়ে একটু হালকা হলাম। আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশবাতকে ওখানে বসিয়ে রেখে আমি চলে গেলাম জমজম থেকে পানি আনতে। একটা সুন্দর প্লাস্টিকের জার সংগ্রহ করে এনেছিলাম বোম্বে থেকে, নিয়েত করেছিলাম এতে করেই জমজমের পানি বয়ে নিয়ে যাব দেশে। সেই জারটি এখন কাজে এল। শুনলাম মিনায় পানির রীতিমত আকাল। খাওয়ার পানি, অযুর পানি সব কিছু মিনাতে গরমিল—

নানান জনের নানান কথা কানে এল পরপর। সুতরাং পানির ব্যাপারে একটু সতর্ক হতে হয় বৈকি!

সাফা-মারওয়ার উল্টো দিকেই মিনায় যাবার বিশাল সুড়ঙ্গ পথ। পাশাপাশি দুটি সুড়ঙ্গ।—একটি যাবার, অন্যটি আসার। পাহাড়ের তলদেশে দিয়ে এই অর্ধবৃত্তাকার ব্যয়বহুল এবং বিলাসবহুল সুড়ঙ্গ পথগুলি তৈরি হয়েছে। উচ্চতায় আনুমানিক পনের থেকে আঠার হাত আর চওড়া পঁচিশ-ত্রিশ হাত। মাঝখান দিয়ে গাড়ি যাবার ব্যবস্থা, কিনারায় ফুটপাথ দিয়ে মানুষের। অসংখ্য আলো আর বাতাস চলাচলের আধুনিকতম বিজ্ঞানের আশ্চর্য প্রয়োগ অবাক হয়ে দেখার মত। সমগ্র সুড়ঙ্গটাই তাপ নিয়ন্ত্রিত। কাবা শরীফ থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে মিনায়। সুতরাং পথ হারাবার কোন ভয় নেই। লক্ষ লক্ষ যাত্রী এ পথেই আজ মিনায় চলেছেন হেঁটে। সকলেই আল্লাহর পথের পথিক। সকলেই হজ যাত্রী! সেই প্রেম দিওয়ানাদের অপার্থিব মিছিল যিনি স্বচক্ষে না দেখেছেন ভাষায় তাঁকে কিছুতেই সঠিক চিত্রটি বোঝান যাবে না।

জমজমের পানি নিয়ে ফিরে আসতেই এক বিশেষ দ্রষ্টব্যের প্রতি আমার স্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমাদের সম্মুখেই কাবা শরীফ। মাঝে একটি রাস্তা, রাস্তার পাশেই এই অভিজাত মক্কা হোটেল। দেখলাম আমাদের ঠিক পিছনেই এক অসামান্যা আরব সুন্দরী বসে বসে কাবা শরীফের দিকে মুখ করে সিগারেট টানছেন। তাঁর চোখে মুখে আধুনিকতম মেকআপ। সংগে আছেন একজন পুরুষ। কথা বলছেন আরবীতেই। এ'রা কি হজ করতে এসেছেন? আল্লাহ জানেন! স্ত্রীকে বললাম, ওদিকে আর নাই বা তাকালেন, নিজের কথা ভাবুন। মৃদু হেসে তিনি বললেন, ঠিক ঠিক। ইয়া নাফছি! ইয়া নাফছি!!

রাত গভীর হয়ে আসছে ক্রমে। অসংখ্য বাস যাচ্ছে আসছে। যাত্রীদের হৈ-হুল্লোড় চেঁচামেচিতে পথ ঘাট উতরোল। অথচ আমাদের মুয়াল্লিমের বাসের দেখা নেই। দারুণ উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ বুকে নিয়ে বসে আছি, হঠাৎ দেখি যাত্রীদলে হট্টোগোল পড়ে

গেছে। রাত তখন সাড়ে বারটা। ভীষণ ব্যস্ত সকলে। একটি বাস এসে থেমেছে। যাট জন যেতে পারেন। অথচ এক সঙ্গে ছশো জন হুমড়ি খেয়ে পড়লেন সেই বাসটাতে। সুতরাং আমাদের মত যাত্রী-দের পক্ষে মোটঘাট নিয়ে এ রকম বাসে ওঠার চেষ্টা করা বাতুলতার চরম। মক্কা হোটেলের নিরাপদ বারান্দায় তাই আমরা বসেই থাকলাম চুপচাপ। কয়েকটা বাস ছেড়ে গেল পরপর। একই রকম ব্যস্ততা, একই রকম হৈ চৈ চলতেই থাকল। যাত্রীরা যে অধৈর্য হয়েছিলেন এমন নয়, বহু প্রতীক্ষিত এক অজানা জগতে প্রবেশের জন্য সকলে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। এক মিনিট বিলম্বও তাঁদের কাছে দুঃসহ হয়ে উঠছিল। দেখলাম আমার স্ত্রীও ব্যস্ত হয়ে উঠছেন। বললেন, আমাদের এভাবে বসে থাকা ঠিক হচ্ছে না। জিনিষপত্তর উঠিয়ে নিন,একটাতে উঠে পড়ি। কিছুটা আকুলতা আমার ভিতরেও এসেছিল কিন্তু আমি ইতস্ততঃ করছিলাম হাশমি ইশরাতের জন্যে। যখন দেখলাম স্ত্রীর কথায় তিনিও একটা ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন, আমার মধ্যে আর দ্বিধা থাকল না। সব গুছিয়ে নিয়ে পরবর্তী বাসের জন্যে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। যথা নিয়মে বাস এল, তেমনি করে সকলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। আমি দ্বিধার মধ্যে আছি হঠাৎ দেখি মুয়াল্লিমের লোকজনের সহায়তায় আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত বাসে উঠে গেলেন সুতরাং মরি বাঁচি আমাকে এ বাসে উঠতেই হবে। জিনিষপত্তরগুলো কোন রকমে ভিতরে ঠেলে দিলাম। ইতিমধ্যে ড্রাইভার বাস স্টার্ট দিয়ে দিল। আমিও বাক্সের মত আর এক বাক্স হয়ে কোন রকমে গলে ভিতরে ঠাঁই পেলাম।

ভিতরে এসে জিনিষপত্তর গোনাগাঁথা করার সময় ধরা পড়ল প্লাস্টিকের জারটি নেই। বোম্বে থেকে বহু কষ্টে বয়ে আনা এই দুধ-সাদা জারটি জমজমের পানি ভরা অবস্থায় পড়ে আছে মক্কা হোটেলের জনবহুল বারান্দায়। অন্য সময় হলে অবশ্যই দুঃখ পেতাম কিন্তু আজ এই মুহূর্তে কোন বেদনাবোধ নেই। যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই দূর পথ ছুটে এসেছি সেই পরম বাঞ্ছিত মুহূর্ত

সমাগত। মেহেরবান আল্লাহ! প্রভু আমার!! আমাদের প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দিন।

ধীরে ধীরে কাবার পবিত্র প্রাঙ্গন ছেড়ে বাস তখন সামনের দিকে চলতে শুরু করেছে।

রাতের মক্কা শহর দেখার মত সৌভাগ্য আমার হয় নি। যেদিন এই পবিত্র শহরে প্রবেশ করেছিলাম সেদিন দেখেছিলাম কিছুটা আব আজ প্রত্যক্ষ করছি আংশিক। যেদিন প্রথম এসেছিলাম সেদিন ছিল মনের মধ্যে এক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের পুলক—সব কিছু গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল বারবার। আজো ত অজানা রাজ্যে প্রবেশের শিহরণে বার বার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে দেহমন বার বার ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সব কিছু। আধুনিকতম শহরের আলোকিত পথঘাট পার হয়ে আমাদের যানটি অতি দ্রুত চলেছে মিনার পথে। দোকানপাট বন্ধ কিন্তু তীর্থযাত্রীদের অবিরাম স্রোতে পথঘাট মুখরিত। লক্ষ লক্ষ মানুষের বিরামহীন আনাগোনা অথচ যানজট নেই, জ্যাম নেই। বালুর সাম্রাজ্যে ফ্লাই ওভারের পর ফ্লাই ওভার ; শত সহস্র কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত এ সকল রাস্তার উপযোগিতা ও উপকারিতা আজ নতুন করে উপলব্ধি করলাম। নির্জন পথে এই মিনা ভ্রমণের সময় একদিন যেটাকে বাহুল্য এবং অপব্যয়ের চূড়ান্ত মনে হয়েছিল, আজ ত বিশুদ্ধ আলো-হাওয়ার মত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

মিনার এলাকায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদলে কোলাহল পড়ে গেল—মিনা! মিনা!! জানালার পাশে বসে আকাশ দেখার মত বাসের জানালা থেকে গলা বাড়িয়ে পরম বিস্ময় ও পবিত্রতায় আমি আলোকিত মিনা দেখছিলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল আলোর মালা গলায় পরা এক বিশাল পাহাড়। অসংখ্য যাত্রী আশ্রয় নিয়েছেন ওখানে। নিচে বালুতে তাঁবুর পর তাঁবু, হাজারে হাজার, সম্ভবতঃ লক্ষাধিক। এ তাঁবুর মিছিলের যেন শেষ নেই। ফ্লাই ওভারের পর ফ্লাই ওভার, তাঁবুর পর তাঁবু, পাহাড়ের পর পাহাড়, অতিক্রম করে আমাদের যানটি চলেছে ত চলেছে। তাঁবুর ভিতরে আলো, বাইরে আলো, সর্বত্রই আলোর দলবদ্ধ সমাবেশ। এই সব আলোর

রশ্মিগুলি চকাত চকাত করে আমাদের দৃষ্টিতে পড়েই সরে যাচ্ছিল। আমি বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে এসব পিছুহটা আলো দেখছিলাম। মিনা আজ আলোয় আলোময়। কি জানি কেন হঠাৎ আমার মনে হল এ ত পার্থিব আলো নয়, এসব যেন ঈমানের নূর. প্রতি তাঁবুতেই রয়েছে অসংখ্য ঈমানদার মানুষ, ঈমানের তাজাল্লিতে সারা মিনা আজ অলৌকিক আলোয় ঝলকিত হয়ে উঠেছে।

মিনার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ঘোরাঘুরি করে অবশেষে আমাদের বাসটি এক ফ্লাই ওভারের মাঝখানে এসে থেমে গেল। আমরা এসে গেছি, বললেন মুয়াল্লিমের লোকটি। যাত্রীদের আর তর সইছিল না, তাঁরা হুড়মুড় করে নামতে শুরু করলেন। বাস্তব জীবনে বহুবার. প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি, কিছু মানুষ এমন থাকেন যাঁরা অর্থহীন ভাবে সদাব্যস্ত। এই লক্ষ্যহীন অতিব্যস্ততাই যেন তাঁদের একটি বড় কাজ। মহাহজে আমরা এই মানুষগুলির সম্মুখীন হচ্ছি প্রায় প্রতিমুহূর্তে। এঁদের নামা শেষ হলে বিসমিল্লাহ বলে আমরা সীট ছেড়ে উঠে পড়লাম। মোটঘাট সামলে নিয়ে আমাদের নামা তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ দেখি তাঁরা চিৎকার শুরু করেছেনঃ কই কোন দিকে যেতে হবে চল। এবং বলতে বলতে তাঁরা দ্রুত চলতে শুরু করলেন।

অনেকের সঙ্গে এত বোঁচকা-বুঁচকি ছিল না, হাশমি ইশরাতের মত বৃদ্ধা মহিলাও ছিলেন না কারো সঙ্গে—সুতরাং আমরা একটু পিছিয়ে পড়লাম! হাশমি ইশরাতকে সঙ্গে দিয়ে বোধহয় আল্লাহ আমাদের একটু পরীক্ষা করতেই চেয়েছিলেন। মিনার পবিত্র মাটিতে পা রেখে আমরা সংগীদের অনুসরণ করে যত দ্রুত সম্ভব পথ চলা শুরু করলাম। কিন্তু আমরা কিছুতেই দ্রুত চলতে পারছিলাম না। কত কথা মনে পড়ছিল, কত কথা ভিড় করে আসছিল একে একে। এই ত সেই পবিত্র ধূলি কণা যেখানে লক্ষ লক্ষ সাহাবীর পদচিহ্ন রয়েছে। এই ত সেই পরম পবিত্র বালুকণা, রসুলুল্লাহ স-এর পদচিহ্ন বুকে ধরার গৌরবে যারা আজো জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে ঝিক মিক করে হেসে ওঠে। তৌহিদের

উচ্চারণে, জিকিরের গুঞ্জরণে এই পবিত্র প্রান্তর সেদিন উতরোল হয়ে উঠেছিল। হযরত আদম আ থেকে ইবরাহিম আ হযরত ইসমাইল আ রসূলুল্লাহ স থেকে আজ পর্যন্ত কত নবী কত খলিফা কত আউলিয়া কত মোমিন মুসলমানের পদধূলিতে এই মাটি গৌরবান্বিত! এ সব কথা গভীর ভাবে মনে হলেই যে কোন মানুষ এই পবিত্র প্রান্তরে দ্রুত পদচারণা করতে পারবেন না, তাঁর চলাচল আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে, তাঁর চলার ছন্দে ধীরতা আসবেই, বিনয়ে-সম্ভ্রমে সে পদচারণা আপনা থেকেই কোমল বিনীত হয়ে পড়বে।

আমার মত পাপীর পাও দেখলাম এক সময় স্থির হয়ে আসছে, আমি আর কিছুতেই জোরে হাঁটতে পারছি না। আল কাসওয়ায় আরোহণ করে আমার সামনে যেন রসূলুল্লাহ স রয়েছেন, অসংখ্য সাহাবীর মধ্যে আমি যেন তাঁকে অনুসরণ করছি। এই অবস্থা ক্ষণিক কিন্তু কি বিপুল প্রশান্তি যে পেলাম! মনে হল বিশ্ব-নিখিলের সমগ্র ধনরাশি, অতুল বৈভব এই অনন্ত প্রশান্তির কাছে কিছুই নয়। এই প্রাপ্তিটুকুর জন্যে সকল কিছু অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, অবহেলায় বিসর্জন দেওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম অন্তর্জগতের ধর্ম, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান এ ধর্মে কখনো প্রবল হয়ে ওঠে নি। দু-একটি অনুষ্ঠান যা আছে তাও আড়ম্বর বহুল নয়। সর্বাবস্থায় সকল রকম জাঁক-জমক পরিত্যাজ্য। ঈমান-যা ইসলামের কেন্দ্রীয় শক্তি—তা ত একেবারেই অন্তর্জগতের বিষয়, পরম প্রাপ্তি আল্লাহতে আত্মসমর্পণ সেও ত একান্ত ভাবেই গভীর ধ্যানলোকের কথা। পরিশুদ্ধির পথে ধর্মাদর্শের পথে ইসলাম তাই গভীরতর ভাবে অন্তর্জগৎকেই প্রাধান্য দিয়েছে, কখনই আড়ম্বরকে নয়। আমাদের চারপাশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে আজ একান্ত ভাবে আড়ম্বরটাই প্রধান হয়ে উঠেছে, অন্তরকে উপেক্ষা করে তাঁরা অনুষ্ঠান এবং লোক প্রিয় জাঁকজমকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠছেন। এতে ধর্ম বাঁচে না। সীমাহীন নীলের বিস্তারে যত রঙই ছড়ান থাক, অন্তর্দেশের দিগন্ত

রেখা ভেদ করে চতুর্দশী না উঠলে মোহনমায়ায় আকাশ রঞ্জিত হবে কি করে?

এত সব কথা চিন্তা করার অবকাশ সম্ভবতঃ আমার সহযাত্রীদের ছিল না। বাসে ওঠা থেকে তাঁরা সেই যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মিনায় অবতরণ এবং এই পথচলা সব কিছুতেই সেই ব্যস্ততা অতি ব্যস্ত ভাবে ফুটে উঠেছে। ফ্লাই ওভার দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে নিচেয় নেমে এ-তাঁবু সে তাঁবুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক সময় একটা বাঁক ঘুরে আমরা আমাদের অগ্রগামী সেই ব্যস্ত যাত্রীদের জটলাটি হারিয়ে ফেললাম। তাঁরা কোন দিকে কোথায় গেলেন তার কোন সন্ধানই পেলাম না। ইতিমধ্যে আমরা প্রায় এক কিলোমিটারের অধিক পথ সেই মোটঘাট মাথায় নিয়ে অতিক্রম করে এসেছি। সেগুলি আর কিছুতেই বহন করতে পারছিলাম না। ঘাড় কাঁপছিল, হাতের ব্যাগটিও রীতিমত ভারি—এখন ব্যথায় টন টন করছে, পিঠে যে বোঝাটি রয়েছে সেটিও কম নয়। সেই অবস্থায় আরো কিছুক্ষণ এগলি সেগলি খুঁজে শেষে এমন বেসামাল অবস্থায় পৌঁছালাম যে মনে হল এখুনই টলে পড়ে যাব। আমি আর কারও কোন কথা না শুনে প্রথমে হাতের ব্যাগটি মাটিতে বসিয়ে দিলাম, তারপর সেই হাত দিয়ে কাঁধের ব্যাগটি ধরতে গিয়ে দেখি হাত বাঁকছে না। এক-জনকে অনুরোধ করতে তিনি মাথা এবং পিঠ থেকে সব কিছু নামিয়ে দিলেন। হালকা হয়ে ঘাড়টা উপরের দিকে তুলতে গিয়ে ব্যথায় ককিয়ে উঠলাম। ঘাড়ের অবস্থা বড় করুণ হয়ে উঠেছে। পিঠ সমেত সারা মেরুদণ্ড একেবারে সোজা হয়ে গেছে। বুঝলাম হাত তুলতে এবং ডাইনে বায়ে ঘাড় ঘুরাতে এখনো বেশ কিছু সময় এমনি যেতে দিতে হবে।

রাত তখন দেড়টা। হাইওয়েতে গাড়ি ঘোড়ার গতিময় প্রতিযোগিতা থাকলেও তাঁবুর এলাকাগুলি একেবারেই নীরব। স্ত্রী হাশমি ইশরাত এবং গুজরাটি মহিলাদের এক স্থানে বসিয়ে আমি এবং প্যাটেলজি দুই দিক দিয়ে তাঁবুর অন্বেষণে বেরুলাম। মুয়াল্লিমের দেওয়া একটা করে কার্ড ছিল আমাদের কাছে। ঐটুকু

যা ভরসা। মিনা আরাফাত এবং মক্কার ঠিকানা তাতে লেখা ছিল আরবীতে। এপথ সেপথ ঘুরে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে ফিরে এসে দেখি প্যাটেলজিও ফিরে এসেছেন। তিনি বহু আগেই ফিবে এসে হাসি মসকরা শুরু করেছেন দলের মহিলাদের ভিতর বসে, আশ্চর্য একেবারে নির্বিঘ্ন তাঁর মুখ! সকলে আমার সফল প্রত্যাবর্তণের জন্যে উন্মুখ অথচ আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম! শুনে প্যাটেলজি লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন, যেন এখুনি দিবগ্বিজয় করে ফিরে আসবেন। একটু বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় বেরিয়ে পড়লাম আমিও।

কাছেই ছিল একদল সেনাবাহিনীর লোক। কার্ড দেখে সন্ধান দিতে তারাও ব্যর্থ হলেন। নাইট গার্ড যাঁরা, তাঁরাও সঠিক হদিস দিতে পারলেন না। পথচারীদের কথা ত বাহুল্য! সকলেই বলছেন, এখানেই। একেবারেই কাছে কোথাও। আপনি খুঁজে নিন। রাত তখন পৌনে তিনটে। ক্লান্তিতে, অবসন্নতায় নিদ্রায় সারা দেহ ভেঙে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। কোন রকমে দেহটাকে ধরে রেখে তাঁবুতে তাঁবুতে ঢু দিতে শুরু করলাম। এই ত তিন চারটি রাস্তা, সব মিলিয়ে তাঁবুর সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট। কত সময় লাগবে আর। যত সময় লাগুক, প্রতিটি তাঁবু অন্বেষণ করা ছাড়া আর উপায় নেই। গোটা কয়েক তাঁবু খোঁজার পরই আবদুর রাজ্জাক মহবুব সিদ্দিকী অ আওলাদ অর্থাৎ আমাদের মুয়াল্লিমের বাঞ্ছিত তাঁবুটি পেয়ে গেলাম। তাঁবুটি সত্যই কাছে, একেবারে মাত্র দু'শ গজের মধ্যে। অথচ এতক্ষণ আমরা গোলক ধাঁধায় পড়েছিলাম। কেবলই ঘুরছিলাম, কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিলাম। সত্যবিচ্যুত মানুষ এমনই করেই মোহের অন্ধকারে ঘুরে মরে। এমনি করেই অহেতুক কষ্ট পায়। আর এমনি করেই একদিন ভয়ঙ্কর পরিণতিতে শেষ হয়ে যায়!

জীবনে যতগুলি কষ্ট ও পরিশ্রমের মুহূর্তের কথা মনে পড়ে আজকের রাতটি তাদের অন্যতম একটি হয়ে থাকল। অথচ এমনি হওয়া উচিত ছিল না। পরে শুনেছি মুয়াল্লিমের সঙ্গে বাস-

ওয়ালাদের চুক্তি ছিল সব যাত্রীকে একেবারে তাঁবুতে এনে নামিয়ে দেওয়ার। অন্য বাসগুলি অন্যান্য যাত্রীদের একেবারে তাঁবুতেই নামিয়ে দিয়েছে। কেবল আমাদের বাসওয়ালাটি তার ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে এত দূরে নামিয়ে দিয়ে অহেতুক ভাবে আমাদের পিঠে এই নিদারুণ কষ্টের বোঝাটি চাপিয়ে দিলে। মোটঘাট সঙ্গীসকল নিয়ে যখন তাঁবুতে পৌঁছলাম তখন সাড়ে তিনটে।

ছয় এবং সাত নম্বর তাঁবু একই সঙ্গে টাঙানো হয়েছে। আঠার আঠার ছত্রিশজন লোক থাকবে এখানে। ইতিমধ্যে অনেকেই তাঁদের জায়গা করে নিয়েছেন। এক জায়গায় চাদর পাততে গিয়ে দেখলাম বালুর মধ্যে অসংখ্য পাথর ছড়ান। বালুতে শোয়া যায় কিন্তু পাথর মেশান বালুতে শোয়া অসম্ভব। স্ত্রী ততক্ষণে পাথর বাছতে শুরু করেছেন, আমিও তাঁর সংগে যোগ দিলাম। মরুর বালুতে এই সব বিচিত্র ধরনের পাথরগুলি কি করে এল সেও এক বিস্ময়ের ব্যাপার। পাথরগুলি খুঁটে বেছে মাথার দিকে একত্রিত করলাম। স্ত্রী তত-ক্ষণে বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দশ মিনিটের কম সময়ে আমাদের তাঁবুর সংসার পাতা হয়ে গেল। লোকজন একে একে আসছেন। হৈ হুল্লোড় বাড়ছে। আমরা কোন কথা না বাড়িয়ে অযু সেরে নামাজে বসে গেলাম। প্রথমে আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম, তারপর তাহাজ্জদে নিমগ্ন হয়ে গেলাম। তাহাজ্জদ শেষে স্ত্রী শুয়ে পড়লেন। আমি বসে থাকলাম তসবিহ নিয়ে। আর কতটুকু রাতই বা আছে! অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। দেখতে দেখতে সে রাতটুকুও শেষ হয়ে গেল এক সময়। তাঁবুতে তাঁবুতে ফজরের আযান ধ্বনিত হল। সারা মরু জুড়ে সে এক অনন্ত প্রাণ-স্পন্দনের বিপুল জাগরণ!

ফজর পড়ে শোওয়ার সময় নামাযের জন্যে স্ত্রীকে জাগিয়ে দিলাম। প্রকৃতপক্ষে তখন আর আমার বসে থাকার মত অবস্থা ছিল না। মূল ছিন্ন বৃক্ষ মত, প্রভুর নাম মুখে নিয়ে আমিও একদিকে পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নীরব হয়ে গেলাম।

শনিবার, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২। ৮ আশ্বিন ১৩৮৯। ৭ জিলহজ ১৪০২।

শুক্রবার দিনগত শেষ রাতে আমরা মিনায় এসেছি। আজ শনিবার। গত রাত একেবারে নির্ঘুম কেটেছে। ফজরের নামায পড়ে ঘুমে ক্লান্তিতে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম দুপুরের আগে আজ আর ঘুম ভাঙবে না। কিন্তু এত বিচিত্র যাত্রীর আনাগোনা, এত বিচিত্র কণ্ঠ, এত বিচিত্র ভাষা এবং মানুষের এত বিচিত্র অভ্যাস যে ঘণ্টাখানেক অচৈতন্য থাকার পর যখন আমার দেহে আবার চেতনারা ফিরে এল, তখন আমি সকলের দাবী অভিযোগ কণ্ঠ ভাষা স্বরক্ষেপের বিচিত্র ভংগিকে পৃথক ভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম। ফলে অল্প কিছু পরে আমাকে রক্তচক্ষু মেলে উঠে বসতেই হল। এই পরিবেশে এই মুহূর্তে যে ঘুমুবার চেষ্টা করা বৃথা তা স্ত্রীকে দেখেও বুঝলাম। আঁচল চোখে চেপে তিনিও অহেতুক পড়ে আছেন। আমাকে বসতে দেখে তিনি বললেন, বলা ঠিক নয় দ্বিধা-সঙ্কোচের সংগে মৃদু কণ্ঠে কথাটাকে তিনি আমার কানে কানে কোন রকমে পৌঁছে দিলেন, ধারে কাছে কোথাও চা পাওয়া যায় না।

সারা দিন খাওয়া না হোক কোন কথা নেই কিন্তু সকালে এক কাপ চা যে তাঁর কত প্রিয় তা আমি জানতাম। সেই ধৈর্যের প্রতি-মূর্তিকে ঈষৎ হেসে বললাম, তাওয়াক কাল তো আলাল্লাহ—নিশ্চয়ই আল্লাহ একটা ব্যবস্থা করে দেবেন।

কাবায় যাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মক্কার বিভিন্ন প্রান্তে বা উপ-নগরীতে বিছিয়ে ছিলেন, মিনার ময়দানে তাঁরা সকলেই একত্রিত হয়েছেন। সুতরাং অসম্ভব ভিড়। আমাদের মুয়াল্লিমের তাঁবু-গুলি পড়েছে প্রায় দশ-পনের একরের বিশাল এলাকা জুড়ে। ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য তাঁবুতে এখানে আমরা আছি প্রায় পাঁচ হাজার তীর্থযাত্রী। এঁদের সকলের প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া অযু নামায গোসল রান্না খাওয়া নিদ্রা বিশ্রাম সে এক এলাহি ব্যাপার। আমরা গোসল রান্নাকে একেবারে তালিকা থেকে কেটে দিলাম.

আহার-নিদ্রাও প্রায় সেই অবস্থায় থাকল, রইল কেবল অযু আর নামায। অযুর জন্যে পানি সঞ্চয় করে রাখলাম কিছুটা। মিনায় পানির কিছু অনটন রয়েছে ঠিকই কিন্তু মক্কায় বসে যে আকালের কথা শুনেছিলাম তা ঠিক নয়। প্রয়োজনীয় পানি পেতে কোন অসুবিধে নেই। সৌদি সরকারের আপ্রাণ প্রয়াসও লক্ষ্য করলাম সর্বত্র। আমার বিশ্বাস আর কয়েক বছরের মধ্যে মরুভূমিতে আকস্মিকভাবে পানির এই বিপুল চাহিদার অসুবিধাকে বর্তমান সরকার কাটিয়ে উঠবেন।

শনিবাব জোহর থেকেই হজেব পবিত্র মুহূর্ত শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেক হাজিকে এখানে এই মিনার মৃত্তিকায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হয়। এ হিসেবে আজ জোহর আসর মগরিব এশা এবং আগামিকাল ফজরের নামায পড়ে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতে হবে। সে মতই নির্দেশ-নামা তৈরি হয়ে আছে।

আজকের রাতটা আমরা মিনায় কাটাব। সকালে উঠেই রওনা হব আরাফাতের উদ্দেশ্যে। আরাফাতে যাবার পূর্ব প্রস্তুতির জন্যে আজকের এ রাতকে বলা হয় আরাফাতের রাত। বড় ফজিলতের রাত, বড় বরকতপূর্ণ এ রাত। আজকের এই পবিত্র রাতটি হল দোওয়া কবুলের রাত। মহান আল্লাহর কাছে আত্মবিলীন করে আজ যা চাওয়া যায় তা পাওয়া যায়, তা কবুল হয়। অনেকে মনে করেন মিনায় অবস্থান রত হজযাত্রীদের জন্যে আজকের এই রাতটি এক সহস্র রাত্রের অধিক পবিত্র লায়লাতুল কদর অপেক্ষাও পবিত্রতর। অনেকের জীবনে এই রাতটি আর দ্বিতীয়বার আসবে না। সুতরাং সকল তীর্থযাত্রীর উচিত আজকের এই মাহাত্মপূর্ণ রাতটিতে এবাদাতের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে নিমগ্ন হয়ে থাকা। আল্লাহ তৌফিক দিলে ইনশা আল্লাহ আমরাও এই রাতটির কিছু অংশ নামাযের মধ্যে কাটিয়ে দেব।

হজ কি কেবল অর্থ সম্পদের উপর নির্ভর করে? যার সম্বল নেই সে কি হজ করতে পারে না? ডুকরি মায়ীকে দেখে নানান

রকম প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় করে আসছে।

আমাদের ছত্রিশ জনের তাঁবুতে রাজস্থানের জয়পুর থেকে এসেছেন দশ-বারজনের একটি কাফেলা। এই দলের মধ্যে আছেন এক বহু সম্মানিত মহিলা 'ডুকরি মায়ী'। অকাল বৈধব্যে প্রপীড়িত এই আধা বয়সী মহিলার আপনার জন বলতে বিশাল পৃথিবীতে কেউ নেই। বাড়িতে বাড়িতে দাসীবৃত্তি করে দিন চলে। তিনি নিয়ত করলেন হজে যাবেন। শুরু হল পঙ্গুর সাগর পার হবার অতন্দ্র সাধনা। ছাইয়ের স্তুপ থেকে দিনরাত কয়লা কুড়িয়ে কুড়িয়ে সঞ্চিত হল কিছু টাকা। সেই সামান্য মূলধন সম্বল করে শুরু করলেন গুলের ব্যবসা। নিকটস্থ বাজার থেকে গুলের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিজেই ক্রয় করে নিজেই গুল তৈরি করেন। নিজেই বাড়িতে বাড়িতে বিক্রি করেন। এই ভাবে কয়েক বছর ধরে চলল তাঁর দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা। কোন সৎ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টাকেই আল্লাহ বিফল করেন না। অবশেষে হজে আসার মত মূলধন তাঁর সঞ্চিত হয়ে গেল। জয়পুরের এই দলটির সঙ্গে এই পবিত্র মাটিতে তিনি এসেও গেলেন। মিনাতে পোঁছেও তিনি বসে নেই। চরকির মত ঘুরছেন চারদিকে। কারও চা আনছেন, কারও রুটি বয়ে দিচ্ছেন আবার ওয়াক্ত মত সকলের শেষ কাতারে নামাযেও সামিল হচ্ছেন। নামায শেষ করেই আবার ছুটছেন—কারও কমলা-আঙুর আনছেন, কারও বা অযুর পানি। এক সময় আমার কাছে অযাচিত ভাবে এসে বললেন, বলুন কি আনব আপনার জন্যে? প্রাণের ভিতর থেকে এমন একটা আলো মুখের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে যে সেদিকে তাকিয়ে এই স্বজনহীন মহিলাকে আপন না করে উপায় থাকে না। দেখলাম এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে তিনি সকলের আপনজন হয়ে উঠেছেন। অনেক সময় মনে হয়েছে এই মহান মহিলার কাছে আমরা অতি তুচ্ছ, অতি নগন্য। এঁর ঘর্মাক্ত আল্লাহ-প্রেম আর আমাদের সৌখিন মজদুরী এ দু-এর মধ্যে লক্ষ যোজন ব্যবধান।

ডুকরি মায়ীর দৃষ্টান্ত সামনে পেয়েও আমরা আর কতদিন পাথেয় অনটনের দোহাই দিয়ে পবিত্র হজ যাত্রাকে বিলম্বিত করব?

ধীরে ধীরে কোলাহল মুখর মিনার বুকে রাত্রি নেমে এল। অন্ধকারের বুকে বিজলী আলোর ফোয়ারা ঢেউ খেলে যাচ্ছে। চারদিকে ভীষণ ব্যস্ততা, ভীষণ কর্মচাঞ্চল্য। বহিরাগত মানুষের ভিড়ে মিনা আজ ভরপুর। অনেকেই সান্ধ্য ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন রাস্তায়, অথচ ঐতিহাসিক মিনার অলি-গলির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে কোন আন্তরিক কৌতূহল নেই তাঁদের চোখে, কেউ কেউ রাত্রের আহার সংগ্রহের জন্যে রাস্তার উভয় পার্শ্বে সদ্য গজিয়ে ওঠা দোকানের সামনে ব্যস্ততার সঙ্গে রীতিমত ভিড় জমিয়েছেন, অনেকে আবার তাঁবুর নির্দিষ্ট এলাকায় স্টোভ জ্বালিয়ে রান্না-খাওয়া পর্বের জন্যে প্রায় সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছেন। কিন্তু এত সব ব্যস্ততা চাঞ্চল্য কলরব অল্প সময়ের মধ্যে স্তিমিত হয়ে এল। ইতিমধ্যে তাঁবুতে তাঁবুতে এশার আযান হয়ে গেল। যাঁরা নামাযে দাঁড়াবার তাঁরা নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন প্রায় সংগে সংগেই কিন্তু কিছু কিছু মানুষকে দেখলাম আযান হবার পরও নিরুদ্বেগ চিত্তে গল্প গুজবে মত্ত রয়েছেন। এই মিনার পবিত্র মৃত্তিকাতে হাজির হয়েও তাঁদের মধ্যে নামাযের জন্যে কোন ব্যাকুলতা নেই। ব্যাপারটি আমার কাছে খুবই মর্মান্তিক মনে হল। জানি না এঁরা আদৌ নামায পড়বেন কিনা। একমাত্র এহরামের শুভ্র বসন অঙ্গে ধারণ করা ছাড়া হজের আর কোন হাবভাব আচরণ এঁদের ব্যবহারে ফুটে উঠছে না। রাত দশটার কাছাকাছি দেখলাম প্রায় সকলেই খাওয়া দাওয়া পর্ব সমাপ্ত করে শয্যা গ্রহণ করেছেন। নিম্নচাপ জনিত মৃদু মেঘের আনাগোনা যেমন প্রবলতর আগাম বর্ষণের সংবাদ ঘোষণা করে, অনেকের নাসিকায় ইতিমধ্যে মৃদু শব্দের গুঞ্জরণ আগামী গাঢ়তর সুখ নিদ্রার আভাস দিচ্ছে। অন্যান্য দিন তবু সাড়ে দশ এগারটা পর্যন্ত অনেকেই জেগে থাকেন অথচ আজ এই এবাদতের রাতে সকলেই যেন কোন এক কুহক মন্ত্রে আবিষ্ট হয়ে ঘুমের ঘোরে ঢুলে পড়লেন। আমাদের এই ছয় এবং সাত নম্বর তাঁবুর ছত্রিশ জন তীর্থ যাত্রীর কলরব অতি অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্যভাবে নিশ্চুপ হয়ে গেল, দু-একজন যাঁরা জেগে রইলেন লক্ষ্য

করলাম তাঁরাও শায়িত অবস্থায় সাংসারিক গল্প গুজবে মাতোয়ারা। অন্যান্য তাঁবুর অবস্থা জানিনা কেননা সেই মুহূর্তে তাঁবু থেকে বাইরে বেরুনোর মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তবুও পাথর চাপা নীরবতা থেকে উপলব্ধি করলাম অন্যত্র অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য ইতরবিশেষ নেই। সম্পূর্ণ ব্যাপারটিতে আমি নিদারুণ ভাবে মর্মাহত হলাম। আমরা এতগুলি পুণ্যযাত্রী মানুষ কি কেবল নিশ্চিন্ত নিদ্রার জন্যেই মিনার ঐতিহাসিক প্রান্তরে সমবেত হয়েছি! অন্যকোন কর্তব্য নেই আমাদের! অথচ এই পবিত্র প্রান্তরে একটি জীর্ণ কম্বলের তাঁবুতে প্রায় সারা রাত এবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিয়েছিলেন রসূলুল্লাহ স। এই নামাযে দাঁড়াচ্ছেন, এই তেলায়ত করছেন, এইমাত্র দুটি হাত আল্লাহর দববারে তুলে ধবে ব্যাকুল কান্নায় ভেঙে পড়ছেন। মুনাযাত শেষ করে আবার নামাযে মশগুল, আবার সিজদায় লুটিয়ে পড়ছেন, আবার । এতবড় আদর্শ মহান দৃষ্টান্ত রূপে সম্মুখে পেয়েও তাঁরই উম্মতের দল আমরা এই দোয়া কবুলের পবিত্রতম মুহূর্তে বিবেকহীন পশুর মত ঘুমে অঘোর! ব্যাপারটি খুবই বেদনার, লজ্জার এবং পরিতাপের। এই রাতটি যে অন্য রাত থেকে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল এই বোধটি হয়ত নেই অনেকের। তাই কাবার সকল শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাকে আমি বিশেষরূপে অনুরোধ করবঃ হজের প্রাথমিক ধারণাগুলি নিয়ে যেন সকলে হজে যান। এর জন্যে খুব বেশি অর্থ, পরিশ্রম এবং ব্যয়েব প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হল জ্ঞান সংগ্রহের জন্যে আন্তরিক ইচ্ছার। সমগ্র হজের মধ্যে কাবা শরীফের প্রথম দর্শনের মুহূর্ত, সায়ী সমাপ্ত করে মারোয়ায় মুনাজাত, আরাফাতের রাত, আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের সময় (হজের সময়), মুযদালেফার রাত এবং ফরজ তওয়াফের মুহূর্তগুলি প্রত্যেক হাজির এক অসাধারণ বরকতময় মুহূর্ত। এই অমূল্য মুহূর্তগুলি যেন বৃথায় না যায়!

যারা গল্প গুজব করছিলেন তাঁরাও অল্প সময়ের মধ্যে নীরব হয়ে গেলেন। তাঁবুর মধ্যে জেগে রইলাম কেবল আমরা দুই হতভাগা —আমি এবং আমার স্ত্রী। কখনো নামায, কখনো তসবিহ পাঠ,

কখনো মুনাযাত, কখনো বিগলিত অশ্রুপাত—আল্লাহর জিকিরের মধ্য দিয়ে রাত এগিয়ে চলল। ক্রন্দনের মধ্যে এক সময়ে আমার এমনই অবস্থা হল যে আমি পারিপার্শ্বিকতার কথা বিস্মৃত হয়ে উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠলাম। দেখলাম আমাদের তাঁবুর দু-একজনের ঘুম ভেঙে গেছে সেই চিৎকারে! তাঁরা ঘাড় উঁচু করে দেখছেন এবং সম্ভবত নিদ্রার বিঘ্ন ঘটায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। পাশের তাঁবুতে দু এক জনের ঘুম ভেঙে গেছে বোধহয়, সেখানে মৃদু গুঞ্জনের আভাস উঠেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কার কি অসুবিধা হয়েছে তার থেকে বড় কথা আমি নিজে সম্বিত ফিরে পেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ লজ্জার সঙ্গে অসম্ভব মর্মবেদনা অনুভব করলাম। মনে হলঃ আমার এই কান্নাকাটি লোক দেখান হয়ে যাচ্ছে, যা একেবারেই নিষিদ্ধ হারাম। আল্লাহর কাছে সজল আত্মসমর্পন হবে একেবারে নিঃশব্দে। নীরবে মোম গলে পড়ার মত শব্দহীন অশ্রুর ফোটায় বুকের বসন সিক্ত হওয়া চাই, সশব্দ আত্মপ্রচারে আল্লাহ বহু দূরে সরে যান! এসব কথা মনে হতেই আমার চিৎকার থেমে গেল আমি সীমাহীন লজ্জা আর অনুতাপের সঙ্গে আত্মস্থ হয়ে গেলাম। কিন্তু তাতে ক্রন্দনের বেগ কমল না, ভিতরটা যেন বন্যার আবেগে এক দুরন্ত আকুলতায় ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। বুঝলাম আমি সব চেয়ে বড় পাপী! এত পাপ না করলে এত কান্না আসবে কেন? সারা জীবন ধরে প্রতি পদক্ষেপে কেবল পাপই করেছি। উঠতে পাপ বসতে পাপ, চলতে পাপ বলতে পাপ, খেতে পাপ শুতে পাপ—কেবল পাপ পাপ আর পাপ। প্রতিটি পাপের কথা স্মরণ করছি আর অঝোরে কাঁদছি। দেখলামঃ আমার স্ত্রীও ব্যাকুল ভাবে কাঁদছেন। আল্লাহর কাছে দুটি হাত তুলে আকুল হয়ে কাঁদছেন। আমার মনে হয় সে সময় যদি কেউ একটু লক্ষ্য করতেন তিনি কিছুতেই আমাদের উন্মাদ ছাড়া স্বাভাবিক ভাবতে পারতেন না। হয়ত এমনি হয়!

রাত এখন গভীর। সুদীর্ঘ সময় আমরা দুজনে এভাবে এতিমের মত কান্নাকাটি করে কাটিয়ে দিলাম। এই গভীর রাতে

মিনার পবিত্র আকাশকে দেখার ভারি ইচ্ছা হল। কোন সে অতীতে, কতদিন রসূলুল্লাহ ত এই আকাশতলে দাঁড়িয়ে তারা ঝিকমিক ঘন নীলে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীকে বলতে তিনিও বাইরে বেরুবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। আসলে কান্নাকাটি করে আমাদের দেহমন ভীষণ উদাস হয়ে গিয়েছিল—বাইরের আলো হাওয়ায় একটু দাঁড়াতে পারলেই যেন ভাল হয়। তাঁবুর বাইরে পা দিতেই এক ঝলক শীতল হাওয়া আমাদের সর্বাঙ্গে মধুর স্পর্শ বুলিয়ে দিলে আর তাতেই যেন আমরা এক উজ্জ্বল সজীবতা ফিরে পেলাম। ঝির ঝিরে শীতল হাওয়া বইছে ক্রমাগত। বুঝলাম দিনের উত্তপ্ত মরু ভাঁপ ছেড়ে এখন শীতল হয়েছে। নির্জন রাস্তায় পা দিতেই মনে হল এক আকাশ তারার আলোয় ঘন অন্ধকার কেমন যেন ধূসর হয়ে উঠেছে। রাত যেন একটা স্বচ্ছ উত্তরীয় গায় দিয়ে ধ্যান-মগ্ন। আকাশে নবমীর একলা চাঁদ জেগে জেগে অনেক আগে ঘুমিয়ে গেছে। দু চোখ ভরে চেয়ে দেখলাম মিনার আকাশে উজ্জ্বল তারারা খুশিতে উদ্বেল হয়ে জেগে আছে, এই বাঞ্ছিত দিনের জন্যই এতকাল তারা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। মনে হল ঘন নীলাকাশও অনেক নিচু হয়ে মিনার মাটিতে ঝুঁকে পড়েছে। সে আকাশে হুরপরীদের উঁকি ঝুঁকি! ফেরেশতাদের উঁকি ঝুঁকি!! মিনার বালুর উপর দিয়ে ধূসর বাতাসেরা নম্র ডানায় ভর দিয়ে ধীরে অতি ধীরে উড়ে যাচ্ছে। এমন পবিত্র পরিবেশে তারাদের সংগে সমানে জেগে আছেন তসবিহ হাতে কিছু মানুষ! ফেরেশতাদের ডেকে হয়তো আল্লাহ গর্বভরে বলছেনঃ দেখো ফেরেশতারা, দেখো তোমরা—মিনার বুকে আমার বান্দারা আমার এবাদাতে ধ্যানস্থ। দেখো তোমরা আর সেই মহাদিনের জন্য সাক্ষী থাক।

মিনা এখন মশগুল। মিনা এখন গম্ভীর। জিকিরে এবাদাতে মিনা এখন উদ্বেল।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যেই সকলে জেগে উঠবেন। তাঁবুতে ফিরতে ফিরতে মৃদু কণ্ঠে স্ত্রী আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেনঃ কাল এবং পরশু এ দুটি দিন ত রীতিমত

পরিশ্রমের। সুতরাং ঘণ্টাখানেক হলেও একটু ঘুমিয়ে নিন।

আমার মনের কথাগুলিই যেন তিনি স্থির কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন। কোন দ্বিমত ছিল না আমার। সুতরাং তাঁবুতে এসেই শুয়ে পড়লাম।

কিন্তু কতক্ষণই বা! একটু পরেই জাগরণ, সারা মিনা জেগে উঠবে তখন। শুরু হবে আমাদের বহুবাঞ্ছিত মহাভিসারের অন্তিম পর্ব—হজ্জ উপলক্ষে আরাফাত যাত্রা। ঘুমে দু চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে পরম প্রভুর দরবারে নিবেদন করলামঃ আল্লাহ আপনি আমাদের তৌফিক দিন! আমাদের সহায় হোন! এই দীন দাসের মহাভিসার কবুল করুন! আমাদের সকলের হজকে বরকতময় করুন!!

হঠাৎ হাওয়ায় নারকেল পাতারা যেমন তির তির করে নাচে, ঘুম ভাঙতেই তেমনি এক অলৌকিক আনন্দের আন্দোলনে আমার সারা দেহটা কেঁপে দুলে নেচে উঠল। অসংখ্য সরু দীর্ঘ নারকেল পাতার মত সারা দেহটাই কম্পমান। দেহের অণুতে পরমাণুতে বিপুল আনন্দের সাড়া। আজ ত সেই বহু প্রতীক্ষিত মহাদিন। মহা আরাফাতের উদ্দেশ্যে পবিত্র যাত্রা শুরু হবে একটু পরেই। কত যুগ ধরে যেন এই আবেগান্দোলিত মহান সকালটির জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে বসে আছি!

রাত সাড়ে তিনটের ঘুম ভাঙল আমার। তাঁবুতে তাঁবুতে তখন জাগরণ চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ জেগে উঠেছেন, জেগে উঠে তিনি ডাকছেন তাঁর সঙ্গীকে, সঙ্গী আবার তাঁর দোস্তকে, দোস্ত আবার ডেকে তুলছেন তাঁর মিত্রকে। মিনায় সকলেই মিত্র, সকলেই সকলের দোস্ত। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে বিশাল মিনা জুড়ে নব জাগরণের উৎসব শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ফজরের আযান হয়ে গেছে, নামাযের পর্বও শেষ হয়েছে। এখন যাত্রার প্রস্তুতিতে সকলেই অধিক ব্যস্ত মনোযোগী।

মুয়াল্লিমের লোকজন আমাদের বার বার অনুরোধ করছিলেনঃ অতি প্রয়োজনীয় দু-একটি জিনিষ ছাড়া কোন কিছু সঙ্গে নেবেন

না, নেবার প্রয়োজন নেই। সব কিছু গোছগাছ করে তাঁবুর ভিতর রেখে দিন। ইনশাআল্লাহ, ফিরে এসে আপনাদের জিনিষ ঠিক ঠিক দেখতে পাবেন।

একথা শুনে দেহমনের সমুদয় বিস্ময় এক সাথে লাফ দিয়ে চোখে উঠে এল। সেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে আমরা পরস্পর একে অপরের দিকে তাকাতে শুরু করলাম, বলে কি! পাগল নয়তো? এত টাকার দামী জিনিষপত্র রক্ষকবিহীন অবস্থায় এই খোলা মাঠে ফেলে যাব? প্রকৃতপক্ষে রাতদিন চোরডাকাত আর অসৎ চরিত্রহীন-দের সঙ্গে বাস করে করে আমাদের নৈতিক অবস্থা এমন পর্যায়ে নেমেছে, বিশ্বাস বলে যেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। যৌবন পর্যন্ত আমরা দেখেছি, পিতলের ঘড়া লোটা থালাবাসন ইত্যকার যত দামী জিনিষপত্র বাইরের রোয়াকে পড়ে থাকত সারা রাত, এখন সব কিছু গুনে গেঁথে ভিতরে আনছি, একটা খিলের বদলে তিনটে খিল এঁটেও স্বস্তি পাচ্ছি না। অন্তঃহীন দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে কেটে যাচ্ছে সারা রাত। সেই মেরুদণ্ডহীন ভারতীয়েরা, আমরা ক'জন, মিনার পবিত্র বালুতে বসে হঠাৎ যেন দারুণ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম। সবাইকে বলতে শুনলাম, তাওয়াক কালতো আলাল্লাহ। নাইজেরিয়াণ, ইরাণী, তুর্কী, মিশরী সকলেই যখন সব কিছু ফেলে ছুটতে পারছে, আমরাই বা অপারগ হব কেন? শেষ পর্যন্ত সব কিছু ফেলে রেখে মাহযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে সকলের সঙ্গে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। ফুলের সঙ্গলাভে মাটির ঢিলের সুরভিত হবার এক অসাধারণ সৌরভে দেহমন ভরে গেল। লক্ষ লক্ষ ঈমানদার মানুষের সঙ্গ লাভ করে আমার মত জঘন্য পাপীও কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেল। একটি নিটোল প্রত্যয়দৃঢ় বিশ্বাসের উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালাম। রসুলুল্লাহ স-এর উক্তি ঝলকিত হয়ে উঠল চোখের সামনে। দারুল ইসলামের এলাকায় কুরেশ-বেদুইনদের সমবেত লুটপাট খুনজখম ও রাহাজানির পরিপ্রেক্ষিতে তটস্থ মদিনাবাসীদের উদ্দেশ্যে এই বরাভয় বাণী উচ্চারণ করলেন আল্লাহর রসুলঃ "অচিরেই এমন দিন আসবে যখন সান্‌সানআ হতে একজন

মহিলা উটের পিঠে সওয়ার হয়ে একাকিনী ভ্রমণ করবে, তার মনে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ভয় থাকবে না।" বুখারী শরীফঃ প্রথম খণ্ড।

সেই ভীতিশূন্য শঙ্কাশূন্য পবিত্র ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমার এবং লক্ষ লক্ষ হজযাত্রীর কোটি কোটি রিয়েলের মূল্যবান সম্পদ মিনার বালুতে স্তূপাকার হয়ে পড়ে রইল, কেউ ছুঁয়েও দেখবে না। সমগ্র সৌদি আরবে এখন চুরি হয় না, সৌদি আরবে এখন চোর নেই। আকস্মিক ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি ঝাঁকানি খেয়ে নড়ে ওঠার মত কখনো সখনো যে চুরি হয় না তা নয়, হলে তাকে দুর্ঘটনা বলেই ধরা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চৌর্য বৃত্তিতে লিপ্ত শয়তানটির হাত কাটা হয়। এমনি ভাবে প্রতিটি লালসার লাশকে অঙ্কুরেই বালির গভীরে চাপা দিয়ে আমূল ধ্বংস করা হয়।

এই দেশের সঙ্গে আমাদের মহান ভারতবর্ষ? ঠিক যেন আলো ঝলমল পূর্ণিমার পাশে পূর্ণগ্রাস নষ্ট চাঁদ। হায়রে!

মক্কা মুয়াজ্জম থেকে মিনায় আসার পথে যে দুর্বিসহ অপেক্ষার মধ্যে পড়েছিলাম, আরাফাত যাবার পবিত্র মুহূর্তেও ঠিক সেই বিপাকে পড়লাম। তাঁবু থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে আমরা কেবল দাঁড়িয়ে থাকলাম। অন্যান্য তাঁবু থেকে যাত্রীদের নিয়ে অসংখ্য বাস অবিরাম চলেছে আরাফাতের পথে অথচ আমাদের মুয়াল্লিমের বাসের দেখা নেই। প্রতিমুহূর্তে এক অজানা পরিবেশে পদক্ষেপের জন্যে আমাদের ভিতর এক অদ্ভুত যন্ত্রণা দেখা দিল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দুর্লভ যন্ত্রণায় অস্থির হতে থাকলাম।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই যানটি এল। ঘড়িতে তখন আটটা। প্রথমদিকের একাধিক বাস অতি ব্যস্তবাগীশদের জন্যে ছেড়ে দিয়ে সম্ভবতঃ চতুর্থ বাসটিতে উঠলাম আমরা, উঠলাম নয় অতিকষ্টে কিছু রূঢ় লাঞ্ছনার বিনিময়ে স্থানলাভ করলাম। একটি করে বাস আসে আর অপেক্ষামান বিশাল জনতার সকলেই ব্যাকুলভাবে তাতে স্থানলাভের জন্য উদ্দাম হয়ে ওঠেন। আর আমরা ছিটকে সরে দূরে চলে যাই। প্রকৃতপক্ষে এমন একটা মহাযাত্রার শুরুতেই এমন

নিরুপায় অশোভন আচরণে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না চতুর্থ বাসটি আসতেই মুয়াল্লিমের লোকজন আমার স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতকে সেই বাসে তুলে দিলেন। দেখলাম রীতিমত আধা বদরের সংগ্রাম করে তাঁদের উঠতে হল। বাতিকগ্রস্ত হাশমি ইশরাতের একটা বিরাট বোঁচকা ছিল আমার স্ত্রীর হাতে, তাঁর মূল্যবান সামগ্রীগুলি তিনি কিছুতেই মিনায় ছেড়ে যেতে রাজি নন, অসম্ভব ভীড়ে সেই বোঁচকাটির দাঁড়দড়া ছিঁড়ে গিয়ে জিনিষপত্রগুলি ছিটকে ছড়িয়ে চারদিকে একাকার হয়ে গেল। কিছু পড়ল বাসের ভিতর, কিছু বাইরে রাস্তায়। বাইরের গুলি সংগ্রহ করে তুলে আনার কোন প্রশ্নই ছিল না, সুতরাং সেগুলি চিরদিনের মত আওতার বাইরে চলে গেল।

বাসটির ভিতরে উঠতে গিয়ে একটা অসম্ভব রকমের ভয়ানক চোখ রাঙানি খেলাম। ঠিক যেমন চোরকে ধরে মানুষ শাসায়, আমাকে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নামিয়ে তেমনি বীভৎস লালচোখে তাকিয়ে গলার শিরা ফুলিয়ে ততোধিক জোরে চিৎকার করে মুয়াল্লিমের লোকটি বলল, উজবুক—জান না, ভিতরটা শুধু আওরতদের!

ইয়া আল্লাহ! না জানি আরো কত লাঞ্ছনা বাকি আছে! আমি ভয়ে আড়ষ্ট এবং তটস্থ হয়ে একদিকে সরে গেলাম। আমার আর কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু এভাবে ত আর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না। যেমন করে হোক এ বাসেই উঠতে হবে। হঠাৎ দেখি অনেকেই বাসের উপরে ছাদে উঠতে শুরু করেছেন। কিন্তু আমি ত সংসারের একেবারে অপদার্থ মানুষ, কোন কাজই আমাকে দিয়ে ঠিক মত হল না। বোকার মত নিশ্চুপ হয়ে করুণ চোখে উপরের দিকে তাকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম অসহায় ভাবে। কার করুণা হল জানি না, দেখলাম কে একজন একটা সিঁড়ি লাগিয়ে বলছেন, হাজি সাহেব—উঠে যান, শিগগীর। অকস্মাৎ এই উপকার প্রাপ্তির জন্যে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি হঠাৎ কঠোর কণ্ঠে তিনিও ধমক লাগালেন, জলদি। অর্থাৎ এই মুহূর্তে

ছাড় তোমার ঐ সব বোকা বোকা হাবভাব, অর্থহীন ভাবনা চিন্তা, উঠে পড় বাসের মাথায়, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়াও!

ভেবে অবাক হই আমার মত লোকেরা কোনদিন পায়ের তলায় বাস্তবের মাটি পেল না। সম্ভবতঃ আর পাবেও না কোনদিন।

বাসের উপর উঠে আমি একেবারে সামনের দিকে এসে বসে পড়লাম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখলাম মৌচাকে মৌমাছির উপর মৌমাছি বসে থাকার মত অবস্থা হয়েছে বাসটির। ড্রাইভার এবং বিশেষভাবে মুয়াল্লিমের লোকজন যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে আব একবিন্দু পানিও ভিতরে গলবে না, বাসটি ছাড়ল তখন, ঠিক আটটায়।

পানা পুকুরে ডুব দেওয়ার আগে দুহাত দিয়ে পানা সরানোর মত সমুদয় গ্লানিকর চিন্তা ভাবনাকে দূরে সরিয়ে বিসমিল্লাহ বলে মহাযাত্রার শুভলগ্নে ঠিকঠাক হয়ে বসে পড়লাম। তারপর বিনম্র হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে আমি আমার দৃষ্টিকে সম্মুখের পথে ছড়িয়ে দিলাম।

স্টার্ট নিয়ে দুলে নড়ে উঠতেই এক সুমধুর গুঞ্জরণ ছড়িয়ে গেল সারা বাসটিতে। কিসের গুঞ্জরণ? কেন এই গুঞ্জরণ?

বিদায় হজের বিস্ময়কর উদাহরণ আমাদের সম্মুখে। বুখারী শরীফের সেই বিখ্যাত হাদিসে দেখতে পাচ্ছিঃ আরাফাতের পথে যেতে যেতে মুহম্মদ ইবনে আবুবকর সাকাফী রা আনাস ইবনে মালেক রা-কে জিজ্ঞেস করছেন, বিদায় হজে আপনারা রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে আরাফাতে যেতে যেতে কি কি করেছিলেন? উত্তরে মুহম্মদ ইবনে আবুবকর রা বললেন, আমাদের মধ্যে তালবিয়া পাঠকারীরা তালবিয়া পাঠ করছিলেন, আবার তকবীর উচ্চারণকারীরা তকবীর উচ্চাবণ করছিলেন। তিনি (রসুলুল্লাহ স) কোনটাই নিষেধ করেননি।

এ গুঞ্জরণ সেই তালবিয়া পাঠের মধুর গুঞ্জরণ। কয়েক মুহূর্ত পূর্বে যে সব ব্যতিব্যস্ত মানুষেরা ঠেলাঠেলি এমন কি মমতাহীন নির্দয়ের মত মারাত্মক ঘুষি পর্যন্ত চালিয়ে বাসে উঠেছেন, সামান্য

ক্ষণের ব্যবধানে তাঁদের মধ্যে এসেছে আশ্চর্য পরিবর্তন। শুকনো পাতা ঝরিয়ে শাখায় শাখায় নতুন কিশলয়ে নব জীবনের গরিমা ফিরে আসার মত প্রতিটি মানুষের ভাবনায় এখন অনেক ঐশ্বর্য। সকলেই এখন মহাহজের জন্য আরাফাতের যাত্রী, সকলেই এখন তালবিয়া পাঠে তন্ময়। কঠিন লোহপিণ্ড গলে কখনো কখনো ছাঁচে যেমন ফুলদানীতে রূপান্তরিত হয়, টিন-লোহা-কাঠে তৈরি সমগ্র বাসটিই এখন ভেঙেচুরে পুষ্প স্তবকে নবজন্মলাভ করেছে। সেই স্তবক থেকে এখন ক্রমাগত সৌরভ উঠছে, আত্মসমর্পণের সৌবভ। দীর্ঘ বিস্তৃত পথের চারপাশে সেই সৌরভ ছড়াতে ছড়াতে আমাদের যানটি স্থির লক্ষ্যের দিকে দৃঢ় গতিতে এগিয়ে চলল।

মিনার সম্মানিত এলাকা ছাড়িয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এক বিস্তীর্ণ বালুময় প্রান্তরে এসে পড়ল আমাদের বাসটি। ক্রমাগত পাহাড় অতিক্রম করে করে চলতে চলতে এক সময় দেখতে পেলাম আমরা এক বিশাল পাহাড়ের কোল ঘেঁষে চলেছি। দূরে আর একটি পাহাড়। সেই পাহাড়টি অতিক্রম করে শতধারায় জনস্রোত নেমে আসছে। যে দিকে তাকাই, চোখে পড়ে দলবন্ধ মানুষের ব্যাকুল পদক্ষেপ, কাতারবন্দী চলমান লাইন, উড়ন্ত বালির ধূসর ঝাপটা, সেই বালি থিতিয়ে এলে চোখে পড়ে উটের সারি, রোল্স রয়েসের লম্বা দৌড়। প্রান্তরের পর প্রান্তর যত অতিক্রম করছি, যাত্রীব জটিলতা চোখে পড়ছে তত, লাইনবন্দী স্রোতের ঢল নামছে তত, শতধারে ভেঙে পড়ছে তীর্থযাত্রীদের উদ্বেল আকুলতা। ক্রমেই মানুষের ঘনত্ব বাড়ছে।

বাসের ছাদের সম্মুখে, আমার ঠিক পাশটাতে বসেছিলেন এক বৃদ্ধ। বালু মাড়িয়ে, প্রান্তর উজিয়ে, পাহাড় ডিঙিয়ে যত বেশি সংখ্যক মানুষকে তিনি ছুটে আসতে দেখেন, সেদিকে হাত বাড়িয়ে ততই বলতে থাকেন, ইয়া আল্লাহ! কিয়া তেরি কুদরত!! ইয়া আল্লাহ ! কিয়া তেরি কুদরত!!

মানুষের সংখ্যা ও সার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, বার বার ততই তিনি কথাগুলি পুনরুক্তি করতে থাকেন। প্রথম দিকে আমি কিছুটা

বিরক্ত হয়েছিলাম, কেননা সেই মুহূর্তে আমি যে জগতে ছিলাম এই চিৎকারে সেই স্বপ্নিল জগতকে হারিয়ে ফেললাম। আট-দশবার এমনতর কথা উচ্চারিত হবার পর আমি আগ্রহ ভরে বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করলাম তিনি কারো কোন বাহবা উৎসাহ সমর্থন পাবার তোয়াক্কা না করে আপন ভুবনে আন্তরিকতায় ডুবে আছেন! বাসটি হু হু শব্দে ছুটে চলেছে। হঠাৎ শুনি স্থিরলক্ষ্যে ধাবমান বিপুল জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, ইয়া আল্লাহ! এ ত আপনারই রাজ্য। এত মানুষ কোথা থেকে এসেছেন আর কোথায় যাবেন সে আপনি জানেন। বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠ ধরে এল তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। তারপর এক সময় হাত বাড়িয়ে বললেন, কিয়ামতের দিন আমরা এই সব কিছুর সাক্ষী দেব। ক্রন্দনের বিপুল বেগ সংবরণ করে তাঁর আকুতিকম্পিত পবিত্র কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, ইয়া আল্লাহ! আপনি কত মহান আর আমরা কত তুচ্ছ। তবু আপনি সাক্ষী থাকুন আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে চলেছি। আমাদের সব কিছু আপনার সেবায় নিবেদিত। ব্যাকুল ক্রন্দনের বেগ উদ্দাম হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ায় তাঁর কণ্ঠ থেকে আর কিছুই শোনা গেল না। ঘন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণের মত মাথানীচু করে অঝোরে তিনি কেঁদেই চললেন। সে দিকে তাকিয়ে সম্মানে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। সকলের অগোচরে, সকল চোখের আড়ালে কোন বনে পারিজাত ফোটে কজন তা সন্ধান রাখেন?

মিনা থেকে আরাফাত, কতটুকু পথ, কোন ক্রমেই আধ ঘণ্টার বেশি সময় লাগা উচিত নয়। ভিড় আর জ্যাম এড়াবার জন্যে অনেকটা ঘুরপথ ধরলেন ড্রাইভার। শেষ পর্যন্ত সুদীর্ঘ দু'ঘণ্টা সময় ব্যয় করে দশটার কাছাকাছি সময় আমরা আরাফাতের মহা-ময়দানে এসে হাজির হলাম। আরাফাত আজ তাঁবুতে তাঁবুতে সয়লাব। যেদিকে তাকান যায় শুধু তাঁবু আর তাঁবু, নানান আকারের,নানান বর্ণের। আমাদের গাড়িটি মসজিদ নোমারার দিক দিয়ে আরাফাতের প্রান্তরে প্রবেশ করল। এখান থেকে অসম্ভব

রকম জনবহুল রাস্তার উপর দিয়ে প্রচন্ড রকম ভিড় অতিক্রম করে এগিয়ে চলল জবলে রহমতের দিকে। প্রকৃতপক্ষে এই পাহাড়টির নাম আরাফা আর এই আরাফার সংলগ্ন প্রান্তরটির নামই আরাফাত। বাসের ছাদে ঠাঁই পাওয়ায় কোন কিছু দেখতে আমার এতটুকু অসুবিধা হচ্ছিল না। উপর থেকে চারপাশের দৃশ্যগুলি দু'চোখ ভরে উপভোগ করছিলাম। মুহূর্তে কত সব পবিত্র দৃশ্য পার হয়ে যাবে এই ভয়ে পলক ফেলতেও আমার ভয় হচ্ছিল। কপালে হাত ঠেকিয়ে মরুর ভয়ংকব সূর্যের রাগী রশ্মিগুলিকে আড়াল কবে কপাল কুঁচকে দূর পাল্লার চাহনি মেলে আমি তাকিয়েই ছিলাম। মসজিদ নোমারার দিক থেকে জবলে রহমতের নিকটবর্তী হলে আমাদের বাসটির আর নড়ার মত অবস্থা ছিল না। সর্বত্রই ভিড ছিল অসম্ভব, জবলে রহমতের আশপাশটায় সে ভিড় সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল। এই মুহূর্তে পাহাড়টি আমাদের বাস থেকে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরত্বে রয়েছে, অথচ পাহাড়টির চূড়ায় নবনির্মিত সুউচ্চ স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ছে না। এই পবিত্র পাহাড়টির উপর নিচে চারপাশ ঘিরে কেবল মানুষ আর মানুষ, মানুষের উপর মানুষ, উদ্বেলিত ভিড়—সামান্য একটু মাটি একটি পাথরও চোখে পড়ছে না, আর কেবল সাদা এহরাম আর কালো মাথা। জবলে রহমত আজ হৃদয় উদ্বেলিত মানুষের একটি স্তূপে পরিণত হয়েছে। বহু যুগের ক্রন্দন-তপস্যার ফলে গন্দম ভক্ষণের অশোভন পাপ থেকে এই পাহাড়েই মুক্তিলাভ করেন হযরত আদম তাঁর উপর শতধারায় নেমে আসে আল্লাহর রহমত, মা হাওয়ার সঙ্গে তিনি পুনর্মিলিত হন এখানেই। সেই থেকে সকল মানুষের বিশ্বাসঃ এই রহমতের পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পিত হতে পারলেই মেহেরবান আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়, রহমত পাওয়া যায়। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই পাহাড়ের চতুর্দিকের কোথাও আর একটি মাছি বসারও জায়গা নেই অথচ দশ দিকের দূর দূরান্ত থেকে দিওয়ানার দল অবিরাম বেগে উন্মাদের মত ছুটে আসছেন এই পাহাড়কে লক্ষ্য করেই। কী সেই প্রাণের সুগভীর উন্মাদনা! কী সেই সমর্পনের

ব্যাকুল পিপাসা!! দুধের বিরামহীন মন্থনে যেমন ভেসে ওঠে ননী—দুধের সার, সেই আবেগ মথিত লক্ষ কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয়ে ভেসে উঠছে হজের সার বাণীঃ লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক।...

আজ—এই পবিত্র দিনে, বিপুল বিশ্বের সংখ্যাহীন তীর্থযাত্রী, আরাফাত ময়দানের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বহুদূর থেকে জবলে রহমতকে কেবল একপলক চোখের দেখা পর্যন্ত দেখতে পান না অথচ কি সৌভাগ্য আমাদের আমরা প্রায় এই পুণ্যময় পর্বতের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম। প্রতিটি মানুষের চলাফেরা এবং তাঁদের ছায়াকে পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অনেক সময় কেটে গেল এখানে। বাস এক ইঞ্চি করে এগিয়ে আবার থেমে যায়। আবাব এগোয় আবার থামে। সেই থমকে যাওয়া জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়িগুলি মাথায় বিচিত্র ধরণের আলোর ঢেউ তুলে অনবরত শব্দ করে চলেছে। এই নিবেদিত প্রান্তরে এই কর্কশ শব্দটা না থাকলেই ভাল হত। তবু এই শব্দ এই অশোভন কর্কশতা কারো মনে কোন বিরূপতার সৃষ্টি করতে পারছে না। অন্তহীন সমুদ্রে এক ফোটা দূষিত পদার্থ যেমন মুহূর্তে তার অপবিত্রতা হারিয়ে অনন্ত জলরাশির সঙ্গে এক হয়ে যায়, লাব্বায়েকের কল্লোলধ্বনিতে এই বাড়তি খুচরো শব্দগুলি তেমনি হারিয়ে মুহূর্তে কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। পাশ থেকে শব্দ উঠছে লাব্বায়েক, সম্মুখ থেকে লাব্বায়েক, পশ্চাতের বিপুল জনতা থেকে লাব্বায়েক, আরাফাতের মৃত্তিকা ভেদ করে শব্দ উঠছে লাব্বায়েক, আকাশে বাতাসে দোল খেয়ে ফিরছে লাব্বায়েক—আকুতিকম্পিত হৃদয় উৎসারিত এই লাব্বায়েকের সুমধুর গুঞ্জরণ, বিশাল বিশ্ব এবং অসীম আকাশ ছাপিয়ে যেন সুদূর জান্নাতলোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সেই পবিত্র গুঞ্জরণধ্বনির মহান পরিবেশের মধ্যে আমাদের যানটি ক্রমেই তলিয়ে যেতে থাকল।

“আরাফার দিন ছাড়া এমন কোন দিন নেই”—সমবেত সাহাবী-দের শব্দভুক চাহনিগুলি আরাফাতের দিনের মাহাত্মবর্ণনারত রসুলুল্লাহ স-এর মুখের দিকে শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হল, “যেদিন

আল্লাহ্ আপন দাসদের দোজখ থেকে সর্বাধিক মুক্তি দিয়ে থাকেন।" রসূলুল্লাহ স-এর কণ্ঠস্বর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠলঃ "আল্লাহ্ সেদিন (আরাফাতের দিন) তাদের অতি নিকটবর্তী হন আর গর্বের সঙ্গে ফেরেশতাদের বলেন, এরা কি চায় বল? মুসলিম শরীফ। অর্থাৎ আজ আরাফাতের পুণ্য মৃত্তিকায় সমবেত হওয়া মানুষেরা যা আমার কাছে প্রার্থনা করবে আমি তা কবুল করব।

এই ত সেই দিন! আর আজ আমরা আরাফাতের সেই পবিত্র মৃত্তিকায় উপস্থিত!!

আবেগে ভয়ে ভরসায় আমি বার বার কেঁপে কেঁপে উঠছি। মহান আল্লাহর কথা, তাঁর প্রতিশ্রুতি আর রহমতের কথা স্মরণ করে আমি প্রতিমুহূর্তে যেন আর এক অলৌকিক জগতের স্বর্ণদ্বার অতিক্রম করে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি।

এদিকে ড্রাইভার আমাদের ষাট-সত্তর জনের কাফেলাকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলল। দু'ঘণ্টার মত সে আরাফাতের মহাময়দানে পাক খেল। সম্ভবতঃ সে তাঁবুর পথ ভুল করেছে। জবলে রহমত থেকে মসজিদ নোমারার কাছে ফিরে এল আবার, আবার জবলে রহমতের দিক থেকে ঘুরে যখন পুনরায় মসজিদ নোমারার নিকটবর্তী হল তখন আর তার নড়াচড়ার উপায় ছিল না। জোহরের ওয়াক্ত হয়ে এসেছে, মাথার উপর মরুর সূর্য প্রচণ্ডভাবে ক্রোধ প্রকাশে অধীর, একটু পরেই মসজিদ নোমারা থেকে বহুবাঞ্ছিত খুৎবাপাঠ শুরু হবে, চতুর্দিক থেকে হু হু শব্দে তীর্থযাত্রীগণ ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, চরম মুহূর্ত উপস্থিত। নামাযের জন্য রাস্তার উপরেই কাতার দাঁড়িয়ে গেছে, সে কাতার নেমে গেছে পাশের বালুময় মরুতে, যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল সারিবন্দী মানুষের একটি লম্বা রেখা চোখে পড়ে, তার ওপাশে কি আছে আর দেখা যায় না। সুতরাং বাসের উপর থেকে আমাদের নামতে হয় এবার! নামাযে শরীক হবার জন্যে আমাদের সামান্যতম আয়োজন পেতে বসতে যাচ্ছি, একজন এসে বললেনঃ হাজি সাহেব, একটু দূরেই আমাদের তাঁবু।

রাস্তার উপর এইভাবে বসে নামায পড়ে আনন্দ পাবেন না—চলে আসুন আমার সঙ্গে।

সুতরাং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দু পাশে সরিয়ে বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় নিয়ে সেই সহৃদয় আগন্তুকের অনুসরণে ছুটতে শুরু করলাম। হাশমি ইশরাত আর আমার স্ত্রী আসছিলেন পিছন পিছন। আল্লাহর কি ইচ্ছা জানি না—মক্কা থেকে মিনায় এসে গভীর রাত্রে রীতিমত দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছিলাম, আজ মিনা থেকে আরাফাতে এসে মরুর প্রচণ্ড সূর্যের ভিতর পড়লাম এই সীমাহীন শ্রম আর কঠিন ধৈর্যের মধ্যে। চোখ ফেটে পানি আসতে চাইছিল। যে শ্রম আমাদের পাওনা নয়, ড্রাইভারের ভুলে সেই শ্রমের ঝোড়ো হাওয়ায় আমরা বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। হাঁটু পর্যন্ত ধুলোবালিতে একাকার, ধূলিধূসরিত দেহ না হলেও এই মুহূর্তে অযু করে হাত-পায়ের মালিন্য দূর করতে পারলে ভাল হত। অন্ততঃ অস্বস্তি দূর হত, মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতাম অনেকখানি। আরাফাতের পবিত্র ভূমিতে অবস্থানই যদি হজ হয় এই ত আমরা সেই পুণ্য প্রান্তরেই অবস্থান করছি। তা হলে কি এই ধুলোবালি মেখে এমনতর অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় আমি দাঁড়াব আমার মহান প্রভুর সম্মুখে? কি মনে করবেন তিনি? ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন? আমি কি পরিপূর্ণরূপে তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হব? আমার মত দূরদেশী তীর্থযাত্রীদের উপায়ই বা কি?

মনে পড়ল রসূলুল্লাহ স-এর যুগের কথা। আজ আরাফাতের বুকের চারপাশেই পাকা সড়ক হয়েছে কিন্তু সে যুগে তা ছিল না। তখন সাহাবীরা আসতেন বহু দূর দেশ থেকে, বালির পর বালির সমুদ্র অতিক্রম করে। উটের পায়ে পায়ে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যেত আরাফাতের প্রান্তর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত,. মানুষকে মনে হত ধুলির একটি স্তূপ। মাথায় জট ধরে যেত, দৃষ্টিশক্তির উপর প্রভাব পড়ত কখনো কখনো। আমার অবস্থা ত এতখানি সঙ্গীন নয়। তা হলে? চিন্তায় ভাবনায় বিষণ্ণতায় যখন আমি ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ যেন আমি আমার ঠিক সম্মুখে অতি নিকট থেকে

শুনতে পেলাম রসূলুল্লাহর মধুর কণ্ঠস্বর। ধূলিধূসর সাহাবীদের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূলুল্লাহ স বললেনঃ

"আরাফাতের দিনে আল্লাহ নিকটতম আসমানে আসেন। ফেরেশতাদের নিকট গর্বভরে হাজিদের সম্পর্কে বলেনঃ দেখ আমার দাসেরা দূরদূরান্তর হতে ধূলাবালি গায়ে এলোমেলো কেশে ফরিয়াদ করতে করতে আমার নিকট এসেছে। তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাদের সব কিছু মাফ করে দিলাম।" বর্ণনা হযরত জাবের রাঃ, মেশকাত শরীফ।

আর কি চাই! পলকে পুলকে আমার দেহ-মন ভরে গেল। বিমল চন্দ্রালোক কৃষ্ণপক্ষের ঘনঅন্ধকারকে যেমন ধুনুরীর মত ছিন্নভিন্ন করে দূরে সরায়, আমার মানসিক মালিন্য হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে তেমনি ছিটকে সরে বিলীন হয়ে গেল। ধূলিমলিন এহরামের কাপড় আর শারীরিক মালিন্য নিয়ে আমার মধ্যে আর কোন অস্বস্তির ভাব রইল না। ধূলিমাখা শ্রমকাতর দেহটাই যে আল্লাহ বেশি ভালবাসেন! এই পথচলা, পথের এই অনিবার্য মালিন্য, এই শ্রম, এই কষ্টস্বীকার এ ত আল্লাহর জন্যই। এক সময় মনে হল আরাফাতের এই পবিত্র ধূলি আরো কিছু তুলে নিয়ে আমি আমার অঙ্গে মেখে নিই। হায়! আমার সারা অঙ্গটাই কেন ধূলিধূসরিত হল না।

মোটঘাট মাথায় নিয়ে আমরা ক্রমাগত অগ্রসর হচ্ছিলাম। এত পরিশ্রমের মধ্যেও এক অপরিসীম শান্তি বিরাজ করছিল দেহে মনে আত্মায়। এক সময় বাতাসে কথা বলার মত কাতর গলায় বললামঃ প্রভু আমার! আপনার আহবানে সাড়া দিয়ে এই বোঝা মাথায় নিয়ে আমরা আরাফাতের পবিত্র ধূলিতে পা রেখেছি। আমরা ত আছি আপনার দৃষ্টির সম্মুখেই! জানি প্রভু, পৃথিবীর সব চেয়ে জঘণ্যতম পাপী মানুষটি আমি কিন্তু এই মুহূর্তে আমার চেয়ে ধন্য আর কে আছে।

পথ চলতে চলতে শুনতে পেলাম মসজিদ নোমারায় খুৎবা শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং পথিপার্শ্বে এক ভিন দেশী কাফেলার তাঁবুর

মধ্যে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করলাম আমরা। সামনেই পানির ফোয়ারা ছুটছে, স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতের অযুর পানি এনে দিলাম কিছু তারপর নিজে সেই পানির কিনারায় বসে অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে অযু করলাম। আমাদের আশ্রয়দাতারা কোন দেশের মানুষ তা জানি না কিন্তু সম্পদে তাঁরা ধনবান। সাগ্রহে আমাদের জন্যে বসার এবং নামাযের জায়গা করে দিলেন। সেখানে বসে বসে বেতার মারফত মসজিদ নোমারার খুৎবা শুনলাম সকলে। প্রথমেই খুৎবা দিলেন সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ তারপর ইমাম সাহেব। আজকের এই মহাদিনের বিশেষ খুৎবাটি পাঠ করার জন্যে কাবা শরীফের প্রধান ইমাম চলে আসেন মসজিদ নোমারায়। আমরা বসে বসে খুৎবা শুনছি, তাঁবুর অন্য প্রান্তে তখন রীতিমত খানা তৈরী শুরু হয়েছে। বিরাট চুলো জ্বলছে কয়েকটা, ততোধিক বিশাল দেগে রান্না হচ্ছে গোশত. অসম্ভব সুন্দর একটি সুগন্ধে তাঁবুর সারা এলাকাটি মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে। গন্ধে উপলব্ধি করলাম এই মূল্যবান রান্নাটি শেষ পর্যায়ে এসে গেছে। অর্থাৎ পরিবেশনের জন্য সব কিছু প্রায় প্রস্তুত।

এদিকে খুৎবা পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আরাফাতের বিশাল প্রান্তরে দাঁড়িয়ে গেলাম জোহরের কাতারে। ধীরে ধীরে নামায শেষ হয়ে এল এক সময়। মুনাযাত তখনও শেষ হয়নি, দেখি বিরাট শেনিতে করে শুরুয়া সহ গোশত পরিবেশিত হচ্ছে। তাঁবুর মেহমানেরা এখুনি খাওয়া শুরু করবেন। মিনায় আসা পর্যন্ত আমাদের খাওয়া-দাওয়া প্রায় উঠেই গিয়েছিল, তিন দিন কেটেছে প্রায় না খেয়েই,বুবুক্ষুর মত হয়েছিলাম আমি। একবার ইচ্ছে হল সকলের সঙ্গে খাবার পংক্তিতে বসে যাই, ও'রা ত আর তাড়িয়ে দেবেন না আমাকে। আর কি আশ্চর্য যখন আমি লালসার শীকার হতে যাচ্ছি সেই চরম মুহূর্তে চকিতে রসুলুল্লাহর ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠল আমার সামনেঃ

পরম আদরের দুলালী কন্যা ফতেমার কাছে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে এসে দাঁড়ালেন রসুলুল্লাহ স যেন ভিখিরীর মত কাতর কণ্ঠে ভিক্ষে

চাইলেন, কিছু খাবার হবে মা তোমার কাছে। চাবুকের আঘাতে চকিতে ঘুরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন মা ফতেমা, কেন আব্বা—রাতে খান নি কিছু? ততোধিক কুণ্ঠিত স্বরে রসূলুল্লাহ বললেন, একজন অতিথি এসেছে, আমার বাড়িতে কিছু নেই—তাই এলাম তোমার কাছে। শিশু হাসান-হোসেনের জন্যে কিছু দুধ ছিল, সেই দুধটুকু আব্বার হাতে তুলে দিলেন মা ফতেমা। সারা দিনরাতের উপোষী রসূলুল্লাহ স-এর মুখ একজন বালকের মত খুশিতে ভরে উঠল। তারপর আনন্দিত চিত্তে সেই দুধটুকু অতিথির হাতে তুলে দিয়ে তবে তৃপ্তি পেলেন।

হযরত আবুতালহা রা ছুটে এলেন বাড়িতে, উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বিবিকে বললেনঃ ওগো আল্লাহর রসূল এতক্ষণ আছেন কি নেই। কতদিন উপোষ করে আছেন আল্লাহ জানেন, কথা বলতে পারছেন না। মসজিদ নববীর মাটিতে এপাশ ওপাশ গড়াতে গড়াতে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করছেন আর কাতরাচ্ছেন। ওগো কী খাবার আছে বাড়িতে এখুনি দাও—

কী গহীন বেদনার ইতিহাস মর্মরিত হয়ে উঠেছিল সেদিন মদিনার আবহাওয়ায়! ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুমুখী মানুষটির মুখে কোন কথা নেই! কোন লালসা নেই! কোন আক্ষেপ নেই! সেই মহান রসূলের উম্মত না আমি! আরাফাতের এই পবিত্র প্রান্তরে এসে এখনো জন্তু-জানোয়ারের মত ক্ষুধার তাড়নাই প্রবল হয়ে উঠল আমার মধ্যে! সত্য সত্যই আমি কি তবে বিবেকহীন পশুতে পরিণত হলাম! আমার কি হবে ইয়া আল্লাহ!

মসজিদ নববীতে এশার নামায শেষ করে এইমাত্র আপনার জীর্ণ কুটিরে ফিরে এলেন রসূলুল্লাহ স। উম্মুল মুমেনিনগণ হাজির হলেন খিদমতে। দস্তরখানাশূন্য বিছানা দেখে রসূলুল্লাহ স উপলব্ধি করলেন, বাড়িতে খাবার মত কিছুই নেই। এতগুলি লোকের জন্য একটি খেজুরও অবশিষ্ট নেই। একটু নীরব থেকে একগ্লাস পানি চেয়ে খেলেন। তারপর জবান মুবারক থেকে পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে উচ্চারিত হলঃ আলহামদো লিল্লাহ। দেখাদেখি

উম্মুল মুমেনিনেরাও ক্ষুধাতুর পেটে এক গ্লাস করে পানি খেলেন তারপর পরম তৃপ্তির সঙ্গে উচ্চারণ করলেনঃ আলহামদো লিল্লাহ। যে যার কুটিরে গেলেন, আলো নিভিয়ে গভীর নামাযে মগ্ন হয়ে গেলেন তারপর।

একটি মাত্র কথাই ধ্বনিত হল তাঁদের কণ্ঠেঃ ইয়া আল্লাহ! আমরা সুখে আপনার দুখে আপনার—সকল সময় আমরা আপনাতেই সমর্পিত! সেই ক্ষুধাক্লিষ্ট জান্নাতি মুখগুলির উপর দিয়ে রাতের কালো আঁধার এক বেহেশতি সৌরভে আন্দোলিত হয়ে মদিনার গাছগাছালির উপর দিয়ে বয়ে গেল অবিরাম!

আর আমরা?

চোখ ছাপিয়ে পানি বেরিয়ে এল। মোটঘাট মাথায় নিয়ে বিদেশী কাফেলাদের সুস্বাদু খাদ্যের সৌরভে আমোদিত তাঁবু পরিত্যাগ করে আবার পথে নামলাম। সকলের অলক্ষ্যে চোখ মুছে বললাম, প্রভু! আমার লালসাকে আপনি ক্ষমা করুন। ক্ষণিক ভ্রান্তির জন্যে আপনার দরবারে মাফি প্রার্থী।

২৩.

জাহান্নামের আগুনে বসে জান্নাতি হাসি হেসেছিলেন হযরত ইবরাহিম আ। সেই হাসি আমরা পাব কোথায়? তবুও মধ্যাহ্ন মরুর জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে হাঁটিতে হাঁটিতে আমরা ক্রমাগত এক অব্যক্ত আনন্দের জগতে প্রবেশ করছিলাম। শীতের রোদে চুল শুকানো আরামের মত এই ফুটন্ত রোদ আমার সারা শরীরে বিছিয়ে জড়িয়ে এক অপার্থিব শিহরণ জাগিয়ে দিল। পিছন ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকালাম। দেখলাম ফোস্কা পড়া তপ্ত-তামাটে পথে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে এক দুর্লভ স্বপ্নের জগতে প্রবেশের আনন্দে তাঁর চোখ-মুখ অন্যরকম হয়ে গেছে। প্রায় মিনিট পনের হাঁটার পর আমরা আমাদের বাঞ্ছিত তাঁবু খুঁজে পেলাম।

বিশাল এলাকা জুড়ে মুয়াল্লিমের তাঁবু পড়েছে, ভিতরে রান্না-বান্নার বিপুল আয়োজন। তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করে সবে জিনিষপত্র নামিয়েছি, এক ভদ্রলোক বিরাট আকারের কমলা দিয়ে গেলেন একটি করে। প্রথমে নিতে চাইনি, দ্বিধাগ্রস্ত মনে ইতস্ততঃ করছি দেখে বললেন, এটা হুকুমতের তরফ থেকে সুতরাং আপত্তি চলে না. ইচ্ছে করলে আরো নিতে পারেন। এই একটি দিন, এই আরাফাতের দিনে, মধ্যাহ্নকালীন আহারটি সৌদি সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক হাজিকে প্রেমের বন্ধন আর প্রীতির উপহার স্বরূপ বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক মুয়াল্লিমের অধীনে যত তীর্থযাত্রী আছেন সেই হিসাব অনুযায়ী সৌদি সরকার মুয়াল্লিমকে টাকা পরিশোধ করে দেন আর সেই টাকায় মুয়াল্লিম তাঁর অধীনস্থ হাজি সাহেবদের খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

কমলার পরে পরেই পেলাম কলিজা ঠান্ডা করা বরফ-শীতল পানি—যা মরুতে অমৃত। কিছু পরেই গরম গরম বিরিয়ানি পরিবেশন করলেন মুয়াল্লিমের লোকেরা। একে ত এই পবিত্র

মৃত্তিকায় আমাদের মত নিকৃষ্ট পাপীদের পা রাখার সৌভাগ্য হয়েছে, একান্ত নিরাপদে আল্লাহ পৌঁছে দিয়েছেন এই রহমতের বৃষ্টি ঝরা ভূখণ্ডে, তারপর একের পর এক এই দুর্লভ নিয়ামত—আমার চোখ ভিজে আসছিল বার বার। সবার অলক্ষে চোখ মুছে ফেলছিলাম আর গভীর আন্তরিকতায় প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করছিলাম আল্লাহর কথাঃ প্রভু! আমার মত ঘৃণ্য পাপীর প্রতিও আপনার এত করুণা! এত দয়া! এত রহমত! প্রতি মুহূর্তে এই বিপুল প্রাপ্তির সম্মুখে আমি ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, তাঁর সেই পবিত্র দরবারে মহান আল্লাহর এই অনন্ত রহমতের সম্মুখে কলঙ্কিত মুখ নিয়ে আমি কেমন করে দাঁড়াব! তাঁর ঘৃণাভরা দৃষ্টি পাওয়ার মত যোগ্যতাও ত নেই আমার.!

খাওয়া-দাওয়ার পর্ব শেষ হতে বেশ সময় লাগল। খাওয়ার পর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ছুটলেন কেউ কেউ, আলস্য ভরে অনেকেই গড়িয়ে নিলেন তাঁবুর মধ্যে। তারপর এক সময় আসরের নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন সকলে। আরাফাতে, রসুলের আদর্শ অনুযায়ী, জোহর এবং আসর এক সঙ্গে পড়া উচিত। জোহর পড়েই তাঁবুর অন্বেষণে আমাদের পথে নামতে হয়েছিল বলে আসর পড়া হয়নি, সুতরাং আমাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু তাঁবুতে অধিকাংশ হাজিকেই দেখলাম আসরের কাতারে দাঁড়াতে। বুঝলাম, এঁরা জোহরের সঙ্গে আসর পড়েন নি। কেন পড়েন নি আমি জানি না, এমন হওয়া নিশ্চিতভাবে উচিত হয়নি। এ নিয়ে পরে কোন হাজি সাহেবকে আর কিছু জিজ্ঞেসও করিনি।

এক সময় আসরের নামায শেষ হয়ে গেল। তারপর শুরু হল বিশেষ মুনাযাত। আমাদের তাঁবুতে লোক সংখ্যা আড়াই শো-র মত। বিশেষ মুনাযাতে, স্ত্রী-পুরুষ আমরা সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। ভিড় ছিল যথেষ্ট, সকলেই এগিয়ে যেতে চান। এক সময় দেখলাম এই অধম প্রায় সকলের পিছনে পড়ে গেছে। সবার পিছনে সবার নিচে সেখানেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমি মুনাযাতে যোগ দিলাম। ভিড়ের ভিতর যেতে আমার মন সায় দিল না। মহিলারা

দলবদ্ধ হয়ে একদিকে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমাদের সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত তুলেছেন।

মুনাযাত শুরু হল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করছিলেন সম্ভবতঃ মধ্যভারতের এক উর্দুভাষী মাওলানা সাহেব। প্রকৃত পক্ষে তিনি টাইটেল উত্তীর্ণ মওলানা কি না জানি না, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি কি তাও আমাদের জানা নেই, কিন্তু তিনি যেই হোন মুনাযাতে তাঁর একাগ্রতা, তাঁর আন্তরিকতা, তাঁর হৃদয়ার্তি আমার ত বটেই, মনে হয় আমাদের সকলের হৃদয় গভীর ভাবে স্পর্শ করে গেল। পৌষের সকালে তৃণের ডগায় যেমন পতনোন্মুখ শিশিরের টোপ জমে থাকে আমাদের চোখের কোণে অশ্রুর ফোটাগুলি তেমনি টলমল করছিল। মুনাযাতের সামান্যতম আবেদনে তা ঝরতে শুরু করল।

আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় আর করুণ হয়ে আসছিল। সতেজ সবুজ লল বেড়ে ওঠা লাউ ডগাকে কেটে দিলে তার পাতাগুলি যেমন ম্রিয়মান আর ম্লান হয়ে যায়, যন্ত্রণা হতাশা আর অনুশোচনার তীরে বিদ্ধ হয়ে আমি একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলাম। মুনাযাতে হাত তুলব কি, আমার জীর্ণ হাত দুটি অনবরত কাঁপছিল। আত্মগ্লানির তীব্র দাহে আমি ঠিক মত হাত তুলতে পারছিলাম না। বার বার মনে হচ্ছিলঃ আমার মত জঘণ্য পাপী এই মহাময়দানে আর একজনও নেই। মনে পড়ল, জীবনের একটা মূল্যবান অংশে আমি আমার আব্বা আম্মার খিদমত করিনি।

গরীবের সংসারে জন্ম আমার। উচ্চতর পঠন পাঠনের জন্য সোলেমানপুরের নিভৃত কুটির ছেড়ে বহু সময় আমাকে বিদেশে কাটাতে হয়েছে। অন্য ভাইদের হাওলায় ফেলে গেছি বৃদ্ধ আব্বা-আম্মাকে। একদিনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। বিদেশ থেকে বাড়িতে ফিরেছি অনেকদিন পর। আব্বার তখন প্যারালেসিস। কোমর থেকে উর্ধ্বাংশ একেবারে অবশ, বাকরুদ্ধ। একই ঘরে শুয়েছি—তক্তবোসের উপরে আমি, নিচে আব্বা। যথারীতি আলো নিভিয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে হঠাৎ দেখি তক্তবোস নড়ছে। ঘুম ভেঙে গেল, বুঝলাম আব্বার কিছু প্রয়োজন হয়েছে,

তিনি পা দিয়ে তক্তবোস নাড়িয়ে আমাকে ডাকছেন। কিন্তু আমি না উঠে এক রকম তন্দ্রার ঘোরে চুপচাপ পড়ে রইলাম। কিছুক্ষণ করুণ কাতরানির পর এক সময় আব্বা নীরব হয়ে গেলেন, তার আগেই আমি পশুর মত ঘুমের অঘোরে তলিয়ে গেলাম। হায় ঘুমটাই সেদিন আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছিল! একটি বারের জন্যেও আমি অসুস্থ আব্বার কথা ভাবলাম না। কত ভাল হত যদি সে রাতে উঠে আমি আমার উত্থানরহিত আব্বার প্রয়োজনটি মিটিয়ে দিতাম!

আম্মার সঙ্গে ব্যবহারটি ত অনেক সময় শালিনতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে যে কেন মাঝে মাঝে আমি রূঢ় হয়ে যেতাম তা আজো ভেবে পাই না। এ সব অন্যায় আচরণের আত্মগ্লানিতে আল-কোরআনের উৎসর্গ পত্রে তাই আমি হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লিখেছিলামঃ "মা গো! আমি নামায পড়তুম না বলে তুমি দারুণ আঘাত পেতে আর আমাকে বকতে। আমি নিষ্ঠুরের মত, আমার অপরাধকে হালকা করার চেষ্টায়, তোমার চিন্তায় আদ্দিকালের সংস্কার দেখতে পেয়ে পাল্টা আঘাত হানতাম—হয়তো সারা পৃথিবীতে এতবড় নিরাপদ আঘাত হানার জায়গা ছিল না বলেই। এখন বুঝতে পারছি কি অন্যায় আমি করেছি। মা! জান্নাতলোক থেকে তোমার এ অধম সন্তানের প্রতি দোওয়া করো। সেই আগের মত চোখের পানি মুছিয়ে একটি বার কি বুকে ধরতে পার না! আমি যে একেবারে কাঙাল। মা গো!"

এ আমার বিনয় নয়—বুকের ব্যথা, ব্যথার অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি!

একদিন রসুলুল্লাহ স সমবেত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেনঃ আমি কি তোমাদের জানিয়ে দেব পৃথিবীর প্রধান চারটি পাপ কি কি? কিছু বিরতি দিয়ে বললেনঃ প্রথম বড় পাপটি হল আল্লাহর শেরেক করা অর্থাৎ অন্য কোন কিছুকে আল্লাহর সমান জ্ঞান করা। আর একটি বড় পাপ হল পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, হত্যা চুরি ব্যাভিচার হল আরো একটি বড় পাপের অন্তর্গত এবং শেষ বড় পাপটি হল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

সুতরাং চারটি গুরুতর পাপের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি আমি করেছি. যথাসময় আমি আমার আব্বা-আম্মার খিদমতে হাজির হইনি, হতে পারি নি। এমন কি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সেই কঠিনতম মুহূর্তটিতেও আমি তাঁদের সম্মুখে হাজির ছিলাম না, বিদেশে বসেই তাঁদের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি পর পর।

সুতরাং আমার মত অধম সন্তান আর কে আছে? এই বিশাল সমাবেশে আমার মত মহাপাতকই বা আর দ্বিতীয় কই?

মুনাযাতে হাত তুলতে গিয়ে আমার মনে হল, এতগুলি পবিত্র হাতের সঙ্গে যদি আমার এই কালো হাত দুটি আল্লাহর দরবারে উত্থিত হয় তা হলে তিনি রুষ্ট হবেন এবং আমার জন্যে হয়তো সকলের মুনাযাত ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সবার শেষে মুনাযাতে দাঁড়িয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে হলঃ সবচেয়ে দুষ্টু যে ছেলেটি তাকেও ত এক সময় ধুলো বালি থেকে তুলে এনে ধুয়ে মুছে মা কোলে নেয়, তা হলে? প্রভু আমার! আমি কি আপনার ভালবাসা পাব না? আপনার রহমত থেকে বঞ্চিত হব? এমন ভাবনায় হঠাৎ হৃদয়ে মনে এক অপরিসীম শক্তি সঞ্চারিত হল। অনুতাপের অশ্রু ঝরেই পড়ছিল, সেই অশ্রুতে সিক্ত কম্পমান হাত দুটি এক সময় মহান প্রভুর পবিত্র দরবারে উত্তোলিত করে দাঁড়ালাম। আমার মুখ দিয়ে তখন কোন শব্দই বেরুচ্ছিল না। আদিম আকুতিতে কান্নায় ভেঙে পড়ে আমি নীরবে বললামঃ প্রভু! জানি আমি পাপি, আমি মহাপাতক, আমি ব্যাভিচারী, আমি জেনাকারী, আমি মিথ্যাবাদী, আমি পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝগড়ায় উদ্ধত, পৃথিবীর পথে যে দিকে পা ফেলেছি অন্যায়ের পথে চলেছি, যে কথা বলেছি পাপের কথা বলেছি, যে কথা শুনেছি পাপের কথা শুনেছি, যে কাজ করেছি তা করা উচিত হয়নি, আমি কখনো কোন সময় সঠিক ভাবে আপনার আদেশ পালন করিনি, আপনার নির্দেশিত পথে চলিনি, যে পথে চলা বারণ সে পথেই চলতে আমার পা দুটি আগ্রহ প্রকাশ করেছে, যা দেখা নিষেধ তা-ই দেখতে আমার চোখ দুটি বারবার লালসাতুর হয়ে উঠেছে।

এই সব অব্যক্ত পাপের কথা মনে করছি আর কান্নার ঢেউ সমুদ্রের বিপুল উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত দেহের তটরেখায় আছড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, দেহের প্রতিটি রক্ত-বিন্দু থেকে কান্নারা অবিরাম ছুটে আসছে আর আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁদছি। বহুক্ষণ ব্যাকুল অশ্রুপাতের পর আবার যেন নীরবে কথা বলার শক্তি অর্জন করলামঃ প্রভু গো! আমার পাপের শেষ নেই, শেষ নেই। সারা জীবন শুধু পাপই করেছি, বার বার করেছি। ক্ষমা চাওয়ার আর মুখ নেই। কিন্তু প্রভু! এই সুদূর পথ অতিক্রম করে আমি এসেছি আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আপনার মেহমান হয়ে। এই পবিত্র জমাতে আমি আপনার মেহমান। জানি আমি অপরাধী, কিন্তু প্রভু আজ আপনি এতগুলি সম্মানিত মেহমানের ভিতর থেকে আপনার এই দীন দাসকে তাড়িয়ে দেবেন কি করে? একজনের বাড়িতে একটা কুকুর গেলে সে আব কিছু দিক না দিক উচ্ছিষ্ট একটা কাঁটাও ফেলে দেয়, আমি কি আপনার রহমতের মহাসমুদ্রের সামান্যতম একবিন্দু করুণাও পাব না? আপনি মহাসম্রাট, আপনি বাদশাহের বাদশাহ। আজ এই পুণ্য সমাবেশ থেকে আপনে যদি আমাকে লাঞ্ছিত করে তাড়িয়ে দেন, সে ত আপনার রহমতের খেলাফ হয়ে যাবে প্রভু! আজ আপনার রহমতের ভাণ্ডারটি সকলের জন্য উন্মুক্ত, অশেষ করুণার অপার সমুদ্রে আজ যে কেউ অবগাহন করতে পারে, অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হয়ে আজ সকলের জন্য আপনার রহমত ঝরে পড়ছে। যত বড় পাপীই হই, আমি জানি আজ আপনি কিছুতেই আমাকে লাঞ্ছিত করে ফিরিয়ে দিতে পারেন না, আজ আমি কিছুতেই নিরাশ হব না। কাল কিয়ামতের দিনে, দূরতম প্রান্তে সকলের শেষ কাতারে দাঁড়িয়ে এই নরাধম এই দুরাচার এই জঘণ্য পাপাচারী আমি আপনার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকব। আমি আর কিছুই চাইনা প্রভু, শুধু আপনার দিদার! আপনার রহমতের রশি ধরে আমি দাঁড়িয়ে থাকব, যত পীড়নই চলুক আমি কিছুতেই সে রশি ছাড়ব না, কেউ আমাকে ছাড়াতেও পারবে না। প্রভু গো! আমি

বেহেশত চাই না, বেহেশতি খাদ্য চাই না, হুর চাই না—খাদ্য আর হুরের লোভ কেন দেখান প্রভু? ওগুলিকে তুচ্ছজ্ঞান করি। যেখানে আপনি আছেন সেখানে হুর আর আরামপ্রদ খাদ্যবস্তু? প্রভু গো! ভাবতেও লজ্জায় মরে যাই, ঘৃণা হয়। এই অধম পাপী, আপনার দীনতম দাস কিছুই চায় না প্রভু, শুধু আপনার দিদার, আপনার দিদার! কেবল একটি বারের জন্য পরিপূর্ণরূপে আপনার আলোকিত দর্শন। এই দীন দাস এই অধম আমি দূরতম প্রান্তে দাঁড়িয়ে কেবল একটি বারের জন্য দুচোখ ভরে শুধু আপনাকে দেখব আর দেখব। আপনার অসীম ব্যাপ্ত অনন্ত বিশাল জ্যোতি-পুঞ্জের মাঝে আমি হারিয়ে যাব, আমি ধন্য হব। আর আমার কিছু চাওয়ার নেই প্রভু আর আমার কিছু চাওয়ার নেই।

প্রথম থেকেই আমি শব্দ করে কোন কথা উচ্চারণ করতে পারি নি, এরপর সুদীর্ঘকাল মনে মনেও আর একটি কথা বলার শক্তি থাকল না, এক দুবার উদ্দাম অনুশোচনায় আমাব ভিতরটা মুচড়ে দুমড়ে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেল। অবিরাম অশ্রুর প্লাবনে চতুর্দিক অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পবিত্র মহা আরাফাতের লক্ষ লক্ষ মানুষের জমায়েতে আমি ছাড়া যে আর কেউ আছেন একথা একটি বারও মনে হয়নি। প্রকৃতপক্ষে কিছু সময় সম্ভবত আমার কোন বাহ্যিক চেতনাই ছিল না। ধীরে ধীরে যখন চেতনা সঞ্চারিত হল, শুনতে পেলাম চারদিকেই কান্নার রোল পড়ে গেছে। সকলেই কাঁদছেন, উন্মাদের মত কাঁদছেন, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কাঁদছেন। আমি তখনো চোখ চেয়ে তাকাতে পারি নি, শুনলাম যে মাওলানা সাহেব মুনাযাত করাচ্ছেন তিনি বলছেনঃ ইয়া আল্লাহ! আমাদের সব দোষ সব পাপ সব ত্রুটি লোক চক্ষুর আড়াল করে নিজ হাতে ঢেকে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে নিজের মেহমান করে যেমন অত্যন্ত আদবের সঙ্গে এই পবিত্র ভূমিতে এনেছেন, কাল কিয়ামতের ময়দানে এমনি করে সকল দোষত্রুটি সকল পাপকে সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখে আমাদের ইজ্জত দান করবেন। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই যেন আপন আপন হৃদয়ে হঠাৎ প্রবল ভাবে

আল্লাহর রহমত অনুভব করলেন এবং একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। যিনি সেই বালুময় আরাফাত প্রান্তরে এই দলবদ্ধ 'পাগল কান্না' শোনেন নি এবং উপলব্ধি করেন নি, শব্দশিল্প দিয়ে তাকে কোনদিনই এই মর্মবিদারক কাতরানিকে বোঝান যাবে না।

ক্রন্দনাকুল এই আত্মসমর্পণ সম্ভবত আল্লাহ গ্রহণ করেন। আল্লাহ ভালবাসেন এই বিগলিত সম্পূর্ণ সমর্পণ। হাদিস শরীফে দেখতে পাচ্ছি আরাফাতের পবিত্র দিনে মহান আল্লাহ ক্রন্দন রত এবং অনুশোচনায় বিদগ্ধ এই মানুষের আহবানে সাড়া দিয়ে একেবারে তাঁদের নিকটবর্তী হন এবং আপন সৃষ্টিকর্তার প্রেমে বিভোর, আনুগত্য বিনম্র ধুলি ধুসর এই বান্দাদের দেখিয়ে গর্বভরে ফেরেশতাদের বলেনঃ তোমরা সাক্ষী থাক আমি এদের ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতাগণ বলেনঃ হে আল্লাহ! অমুককে ত বড় পাপী বলা হয় আর অমুক পুরুষ আর স্ত্রীলোককেও। রহমতে পরিপূর্ণ আল্লাহ খুশিতে বলে ওঠেনঃ হ্যাঁ আমি তাদেরও মাফ করে দিলাম।

মক্কা শরীফে বা মিনায় অনেক হাজি সাহেবকে দেখে মাঝে মাঝে শ্রদ্ধা হারাবার উপক্রম হয়েছিল। তাঁদের চালচলন ব্যবহার আচার ভাল লাগেনি। কিন্তু আরাফাতের মহাময়দানে তাঁরা কি অদ্ভুত ভাবেই না পাল্টে গেলেন। কেউ মোম, কেউ লোহা কিন্তু আগুনের পাশে থাকলে সকলেই গলে যায়। আরাফাতের পরিস্থিতি আর পরিবেশ কঠিন দিলকেও সুকোমল করে ঈমানের সুরভিতে ভরে দিল। হজের এটাই বোধহয় সবচেয়ে বড় লাভ।

সুদীর্ঘ সময় কেটে গেল মুনাযাতে। মুনাযাতে যে এত আনন্দ পাওয়া যায়, অন্তর্ভেদী এক নির্মল আলোকে যে চিত্ত এমন ভাবে প্রশান্ত হয়ে ওঠে তা আগে কোনদিন সঠিক ভাবে উপলব্ধি করিনি। স্ত্রীর দিকে তাকালাম, মনে হল তিনি যেন অন্য জগতের কেউ। অজানা সেই বিপুল জগতের মহান আলোকিত স্পর্শ আমি তাঁর চোখে মুখে অনুভব করলাম। সারা অঙ্গসহ তাঁর ঠোঁট দুটি তখনো কাঁপছিল। কোন পুলকের শিহরণ তাঁর অঙ্গে? তিনি ধীরে ধীরে

কাছে এসে দাঁড়ালেন এক সময়।

আমাদের তাঁবুর মুনাযাত শেষ হয়ে গেলেও, ঠিক পাশের তাঁবুতে শুরু হয়েছিল তখন, আমরা ধীরে ধীরে পা ফেলে সেই জামাতের মুনাযাতে সামিল হয়ে গেলাম।

এখানে মুনাযাতের আর এক অন্তরঙ্গ স্বরূপের সঙ্গে পরিচিত হলাম। যিনি মুনাযাত পরিচালনা করছিলেন তাঁর চোখ দুটি বন্ধ, হাত দুটি উত্তোলিত, স্তব্ধ আঁখি পল্লব ছাপিয়ে অবিরল অশ্রু ঝরছে। সিক্ত কণ্ঠে তিনি বলে চলেছেন, লাব্বায়েক আল্লাহ হুম্মা লাব্বায়েক! প্রভু গো! আপনার পবিত্র দরবারে আমি হাজির। সব দোষ সব ত্রুটি সব পাপ সঙ্গে নিয়ে আপনার রহমতের আঙিনায় গোলাম হাজির। এখন আপনি রাখতে হয় রাখুন, মারতে হয় মারুন, কাটতে হয় কাটুন—এ গোলাম আপনাতেই আত্মসমর্পিত। আবার বন্যার প্রবাহ মুক্তি পেল আমার চোখে। লোকটি যেন আমার কথাগুলোই আমার কণ্ঠ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে উচ্চারণ করছেন। সকলে মিলে এতিমের মত কান্নাকাটিতে তাঁবুর বিশাল এলাকা ব্যথাতুর হয়ে উঠল। সেই ব্যথায় বিষণ্ণ হয়ে মরুর উদাস বাতাস ধীর স্থির প্রবাহে ধু ধু দিগন্তের দিকে প্রবাহিত হয়ে গেল। কিছু পরে উতল হাওয়ার ব্যথাহত একটি মোচড় খাওয়া ঘূর্ণি গায়ে লাগতেই আমার সমগ্র চিত্ত কেমন যেন এক অনন্তের পরশে একেবারে বিহ্বল হয়ে গেল। সেই বিষণ্ণ ঘূর্ণি বায়ুকে উদ্দেশ্য করে আমি ফিসফিস করে বললাম, হে প্রবহমান উদাস সমীর! তোমার বুকে কেন এত ব্যথার গুঞ্জরণ? কত কাল ধরে কার অন্বেষণে এই আরাফাতের ময়দানে তুমি এমন করে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ? কার বিরহে তোমার বুকে এমনতর হু হু শব্দ উঠছে? তুমি কি একদিন রসুলুল্লাহর পবিত্র দেহের স্পর্শ পেয়েছিলে? একদিন সেই কদম মুবারক চুম্বন করে কি ধন্য হয়েছিলে? আজো কি সেই পবিত্র দেহের স্পর্শ পাবার জন্যে তুমি এই আরাফাতের প্রান্তরে কাঙালের মত ঘুরে বেড়াচ্ছ? দিনরাত সেই চেহারা মুবারকের অন্বেষণ করছ? সেই বিরহ কি তোমার বুকে হু হু শব্দে বেজে

উঠেছে? তা হলে হে মহান সমীরণ! তুমি সাবধানে বয়ে যাও আমাকে স্পর্শ করো না, এ অপবিত্র দেহ স্পর্শ করলে তুমিও অপবিত্র হয়ে যাবে। শুধু অনুরোধ, দু দণ্ড থমকে দাঁড়াও মরুর এই ধূলির উপর, তোমার অশরীরী দেহ আমি এক পলক দেখি, আমার এই কালো হাত দুটি দিয়ে একবার স্পর্শ করে ধন্য হই, তারপর তুমি বয়ে যাও অনন্তের পথে।

এ সব ভাবনা চিন্তার পর অন্তর্জগতে যে কি বিপুল ভাঙচুর ঘটে গেল! বহু সময় ধরে আমি আর কথা বলতে পারি নি, নির্বাক হয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম। আমার চোখে ভেসে উঠেছিল বিদায় হজের সেই বিশাল কাফেলা, যার সম্মুখভাগে আল কাসোয়ার পৃষ্ঠে স্বয়ং রসুলুল্লাহ স। মুযদালিফায় যাওয়ার পথে তিনি শ্রদ্ধাবনত সঙ্গীদের বলছেনঃ ইয়া আইয়োহান নাস সাকিনোন সাকিনোন, হে লোক সকল! শান্তির সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে।

একটি প্লেন আর দুটি হেলিক্যাপটার সারা আরাফাত ঘুবে ঘুরে ডকুমেণ্টারি ফিল্ম তুলেছিল, বিকেলের দিকে তাদের আব দেখতে পেলাম না।

তাঁবুতে তাঁবুতে মুনাযাত শেষ হয়ে গিয়েছিল। সকলেই বসে বসে যে যার মত বিশ্রাম করছিলেন। এক ফাঁকে মুয়াল্লিমের লোকজন এসে আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন। মুয়াল্লিমের অধীনে যত হজ যাত্রী ছিলেন, আমরা সকলেই তাঁদের নির্দেশ মত একটি ফাঁকা জায়গায় সমবেত হলাম। শুনলাম আমাদের সকলকে নিয়ে মুয়াল্লিম মুনাযাত করবেন। এ ঘোষণায় আমরা খুবই উৎসাহ বোধ করলাম। বেশ কিছু সময় অপেক্ষার পর মুয়াল্লিম এলেন এবং মুনাযাত শুরু করলেন। কিন্তু তা আদৌ হৃদয়গ্রাহী হল না। প্রথমতঃ তাঁর ভাষা আরবী এবং সে মুনাযাতের মর্ম উপলব্ধি করার মত লোক সম্ভবত আমাদের দলে একজনও ছিলেন না। তা ছাড়া, আল্লাহ মাফ করুন, তাঁর প্রার্থনার ভংগিটিও প্রাণস্পর্শী নয়। সব বিদেশী ফুলকে যে চিনতেই হবে এমন কোন কথা নেই, সৌরভে

দিল ভরে উঠলে আমাদের হাত দুটি সেই নাম-না-জানা পুষ্পের পাপড়ি স্পর্শের জন্যে আপনিই এগিয়ে যায়। মুয়াল্লিমের মুনাযাতে প্রাণ মাতান এই সুবাসটির সন্ধান আমরা পাইনি। তার উপর মুনাযাতটি ছিল অত্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী। দেখলাম অনেকেই মুনাযাত ছেড়ে চলে গেলেন। এক ভদ্রমহিলা টলে পড়ে গিয়ে বেহুশ হলেন। ইতিপূর্বে তাঁবুতে সুদীর্ঘ মুনাযাতে সামিল হয়েছিলেন সকলে তারপর মুয়াল্লিমের এই অতিদীর্ঘ মুনাযাত নিয়মরক্ষার মত হয়ে দাঁড়াল অনেকের কাছে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্য আমরা মুনাযাতে সামিল ছিলাম।

মুনাযাত শেষ হতে আরাফাতের প্রকৃতির বিশাল পট পরিবর্তনে আমি বিমুগ্ধ হয়ে গেলাম। বৈকাল কখন সন্ধ্যার কূলে এসে রঙিন হয়ে উঠেছে বুঝতে পারিনি। এখন দূরে পাহাড়ে রঙ ছড়িয়ে অস্তমান সূর্য দিগন্ত রেখা স্পর্শ করেছে।

আরাফাতের মহাময়দানে হাজি সাহেবদের পবিত্র সমাবেশ প্রত্যক্ষ করে আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের কালো মুখগুলি আজ যেন খুশির উল্লাসে রঙিন হয়ে উঠেছে। এই আনন্দিত মুহূর্তে প্রকৃতিতে উল্লাসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। সমগ্র আরাফাতই এই মুহূর্তে যেন এক আশ্চর্য আভায় জ্যোতির্ময়। মরুর ধূসর বালুতে যে এমন মায়াময় রূপের খেলা চলে তা এই প্রথম এমন আন্তরিকভাবে প্রত্যক্ষ করলাম।

এক সময় দিন শেষ হল। সূর্যকে আর দেখা গেল না। প্রতি দিনের মত আজো যথা নিয়মে সূর্য উঠেছে, মধ্যাহ্নে মরুর মাটিকে তাতিয়েছে, এখন অস্ত গিয়েছে। কোন বৈচিত্র্য নেই অথচ দিনটি এক মহাদিন, গুরুত্বে এবং মাহাত্মে। সমবেত হওয়া অনেক তীর্থ-যাত্রীই বুঝতে পারলেন না যে তিনি আজ হাজি হয়ে গেলেন, আলহাজ্ হলেন। আরাফাতের পবিত্র মাটিতে, কুদুম এলাকায় (প্রায় সমগ্র আরাফাতই এই কুদুম এলাকার অন্তর্গত) পা রাখলেই, কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই, মানুষ হাজি হয়ে যান।

ক্রমেই অন্ধকার নেমে আসছিল। আসন্ন সন্ধ্যার সেই ম্লান

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমি আসমান জমিনের মালিকের সম্মুখে শ্রদ্ধায় নত হয়ে গেলাম। সারা দিনই আমি চোখে পানি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। সারাক্ষণ ভয়, সারাক্ষণ সংশয়। ফিস ফিস করে, আত্মার সঙ্গে যেমন মানুষ কথা বলে, বললাম, প্রভু! আপনার এই দীনদাসের হজ কি আপনি কবুল করেছেন? জানি প্রভু, আমি সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এত পাপে কলঙ্কিত যার দেহ, এমন লালসায় ক্ষত-বিক্ষত যার অন্তর, তার হজ কখন কবুল হতে পারে না। সফল ভাবে এ কাজ আমি কোনদিনও করতে পারব না। আপনি ত জানেন সকলে সব কাজ করতে পারে না, আমিও পারলাম না। কিন্তু প্রভু আমি নাফরমান নই। আপনার আহ্বানে দূরে থাকি নি, সাড়া দিয়ে এই পবিত্র প্রান্তরে ছুটে এসেছি। আমার সব ক্লান্তি, সব অপরাধ, সব অপারগতাকে আপনি মাফ করুন। আমি অক্ষম কিন্তু একান্ত ভাবে আপনাতেই সমর্পিত!

হু হু করে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। আমি ক্রমান্বয়ে সেই অন্ধকারের গভীরে একা হয়ে যাচ্ছিলাম। ইতিমধ্যে মগরিবের আযান হয়ে গেল চারদিকে, দেখলাম তিন-চতুর্থাংশ হাজি সাহেব জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আজকের দিনে এই সময় এই আরাফাতে কেন এঁরা মগরিবের নামায পড়ছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। রসুলুল্লাহ স-কে অনুসরণ করলে আজকের দিনে মগরিবের নামায মুযদালিফায় গিয়ে এশার সঙ্গে একত্রে পড়া উচিত। যা হোক আমরা নামাযে সামিল না হয়ে যানবাহনের অন্বেষণ শুরু করলাম। শুনলাম রাত দশটার আগে মুয়াল্লিমের গাড়ি আসবে না, বারটাও হয়ে যেতে পারে। এই সুদীর্ঘ সময় এখানে বসে আমরা কি করব? আজকের রাতটা ফজিলত এবং রহমতের দিক দিয়ে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ রাতটাই কাটাতে হবে মুযদালিফার 'মাস আরুল হারাম' এর পার্শ্ববর্তী খোলা প্রান্তরে। গভীর রাতে সম্পূর্ণ একটা অচেনা জায়গায় গিয়ে অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে, তা ছাড়া নামাযের জন্যে একেবারেই সময় পাওয়া যাবে না। সুতরাং কি করা যায়?

কজনে বসে বসে এসব কথা ভাবছি হঠাৎ কিছু শব্দে আকৃষ্ট হয়ে আমি ফিরে তাকালাম। দেখলাম আমাদের মুয়াল্লিম যাঁদের নিকট থেকে তাঁবু ভাড়া নিয়েছিলেন, মক্কাবাসী সেই ব্যবসায়ীর লোকজন তাঁবুগুলি সম্পূর্ণ খুলে ফেলেছেন, খুঁটিখাম্বা যেগুলি ছিল এখন সেগুলি তুলছেন। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমগ্র আরাফাত জুড়ে যে কয়েক লক্ষ তাঁবু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, কখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ছিটে ফোটা দু-একটা যা পড়ে আছে এদিক-ওদিক তা আর নজর কাড়ে না। সকালে কি বিপুল সজ্জায় সেজেছিল আরাফাত, সন্ধ্যায় তা রিক্ত। এই জমজমাট, এই শূন্য। এই আছে, এই নেই।

এমনিই হয়।

এমনি হঠাৎ যাত্রার জন্য প্রত্যেক মানুষও যেন প্রস্তুত থাকে। ডাক এলেই যেন প্রসন্ন চিত্তে যাত্রা শুরু করা যায়। তাঁবুর মত আমাদের আকাঙখার দড়িদড়াগুলি জীবনে নানান সংযোগের সংগে যেন আলগাভাবে বাঁধা থাকে. লালসার স্তম্ভগুলি দৃঢ়মূল হলেই সর্বনাশ!

পাঁচ জনের একটি দল ঠিক হয়ে গেল। জিনিষপত্র নিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। তিন ঘণ্টা আগে যেতে পারলেই এই মূল্যবান দীর্ঘ সময়টুকু নামাযে ব্যয় করতে পারব। তা ছাড়া সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে ধাতস্থ হতেও একটু সময় লাগবে। সব কিছু ভেবে চিন্তে মুয়াল্লিমের বাসের আশা ত্যাগ করে 'খসুসী' (প্রাইভেট) গাড়ির অন্বেষণে সকলে মিলে রাস্তার উপরে চলে এলাম। কিছু রিয়েল হয়ত বেশি খরচ হবে কিন্তু তার জন্যে এখানে বসে থাকা চলে না। এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে এই পুণ্যভূমিতে এলাম কেন তা হলে? সে কি কেবল কিছু পয়সা বাঁচানর জন্যই?

আল্লাহর কি অসীম রহমত, এই প্রচণ্ড ভিড়ে সকলেই যখন গাড়ির অন্বেষণে ভীষণ ব্যস্ত, রাস্তায় উঠেই আকস্মিকভাবে আমরা একটি প্রাইভেট কার পেয়ে গেলাম। পেয়ে গেলাম নয়, আল্লাহ

মিলিয়ে দিলেন। গাড়ির ড্রাইভার ছিপছিপে এক সৌদি যুবক। মাথা পিছু পনের রিয়েল করে নিয়ে তিনি আমাদের দলটিকে মুযদালিফায় পৌঁছে দিতে সম্মত হলেন। দ্বিতীয় কোন কথা না বাড়িয়ে বিসমিল্লাহ বলে উঠে বসলাম আমরা। পথে আরো দু'-জনকে তুললেন তিনি তারপর আরাফাতের উপর দিয়ে তাঁর বিলাস-বহুল গাড়িকে ছুটিয়ে দিলেন মুযদালিফার পথে।

বিপুল জনস্রোত ভেঙে যেতে যেতে অবাক চোখে চারপাশটা ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম। বিয়োগ ব্যথায় মন ককিয়ে উঠল, হে পুণ্যভূমি মহান আরাফাত! তুমি যেমন ছিলে তেমনি আছ। কেবল আমি এসে এই চলে যাচ্ছি। হায়! কিছু দেখা হল না ভাল করে, কিছুই চেনা হল না। কেবল অস্পষ্ট কিছু স্মৃতিই হয়ে রইলো! কিছু পুণ্য স্মৃতিই আমার বুকে জমা রইল কেবল। তোমার বিশাল বক্ষেই ত রসুলুল্লাহর পদধ্বনি সঞ্চিত আছে, সাহাবীদের পবিত্র পদচিহ্ন! হায়, কিছুই শোনা হল না আমার। সেই মহান কণ্ঠস্বরের এতটুকু রেশও যদি পেতাম! সুদূর ভারতবর্ষের দূরতম প্রান্তের এক নিভৃত পল্লীর কুটির থেকে এসেছি সেই জীর্ণ কুটিরেই ফিরে যাচ্ছি আবার। হয়ত আর কোনদিন তোমার পবিত্র প্রান্তরে আসার সৌভাগ্য হবে না। বুকে বড় ব্যথা!

আমার দেহমন আসন্ন স্তব্ধ রাত্রির মত নীরব এবং উদাস হয়ে গিয়েছিল। চোখ মোছার জন্যে আমি জানালার দিকে মুখ ফেরালাম।

আরাফাতের সংখ্যাহীন জনতা পথে ভেঙে পড়েছেন, সবাই এখন মুযদালিফার দিকে ধাবমান। আমরা যত এগুচ্ছি, গাড়ি-ঘোড়া মানুষের চাপ তত বাড়ছে। মাঝে মাঝে গাড়ি থেমেও যাচ্ছে। কিন্তু কারো মুখে কোন বিরক্তি নেই, কোন উত্তেজনা, অন্যায় ভাবে পাশকাটিয়ে এগিয়ে যাবার উত্তেজিত প্রবণতা নেই—সকলেই চলেছেন শান্তির সঙ্গে, সংযত ভাবে। মনে পড়েঃ এ পথেই যাবার সময় ব্যস্তবাগীশ যাত্রীদের সাবধান করে জবান মুবারক থেকে

উচ্চারিত হয়েছিলঃ হে লোক সকল! শান্তির সঙ্গে, শান্তির সঙ্গে!

দেখলাম বিশ্ব মুসলিম সে কথাটি আজো স্মরণ রেখেছেন।

একটি জায়গায় গিয়ে আমাদের গাড়িটি আর কিছুতেই চলতে চাইছিল না। ভীষণ জাম। যাঁরা হেঁটে যাবার তাঁরা হেঁটে চলেছেন। একদিকে সমতল ক্ষেত আর এক দিকে উঁচু পাহাড়। পাহাড়টি দেখেই হঠাৎ আমার মনে হল এ কি সেই পাহাড়—মুযদালিফায় যাবার পথে আল কাসোয়া থেকে নেমে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে যে পাহাড়ী গুহায় গিয়েছিলেন রসুলুল্লাহ ? সেদিন পবিত্র কদম মুবারকের স্পর্শে ধন্য হয়েছিল যে পাহাড়—একি সেই?

লক্ষাধিক সাহাবাদের নিয়ে মুযদালিফার পথে চলেছেন রসুলুল্লাহ স। আরাফাতের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এখন সকলের লক্ষ্য সম্মুখের দিকে। বিদায় হজের সেই ঐতিহাসিক মহান দিনটিতে যিনি ছায়ার মত রসুলুল্লাহ স-এর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী সেই তরুণ সাহাবী উসামা ইবনে যায়েদ রা বলেনঃ "মুযদালিফায় পৌঁছানোর পূর্বেই (পথিমধ্যে) বাম পার্শ্বের (এক) পাহাড়ী গুহার (সন্নিকটে এলে) রসুলুল্লাহ স তাঁর সওয়ারী উট (আল কাসোয়াকে) বসালেন। এরপর তিনি (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পাহাড়ীগুহায় প্রবেশ করে) প্রসাব করলেন। আমি (তাঁর হাতে) পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি হালকা অযু করলেন (কেবল হাত-মুখ ধুলেন, সম্পূর্ণ অযু করলেন না)।" ...বুখারী শরীফ, ২ খন্ড, ১৫৫৬।

অনেক সাহাবীর সম্মুখে সংঘটিত হওয়া এই ঘটনাটিতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়া মানুষের একটি সহজাত ক্রিয়া। চলার পথে প্রয়োজন মুহূর্তে সওয়ারী থামিয়ে রসুলুল্লাহ স এই ক্রিয়াটি সম্পন্ন করেছেন। এটা কোন সুন্নত নয়, এটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা মাত্র। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনাটি সেই সোনালি যুগের আশ্চর্য মানুষদের কাছে কি অদ্ভুত ভাবেই না প্রতিভাত হয়েছে। কালাম পাকে মহান আল্লাহ নিখিল মানব সমাজকে বার বার রসুলুল্লাহ স-কে

অনুসরণ করার কথা বলেছেন। সে যুগে রসুলপ্রেমে শ্রদ্ধাবিগলিত সাহাবীরা কী গভীর ভাবেই না রসুলুল্লাহকে তাঁদের জীবনের আদর্শ করেছিলেন! খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, জাগরণ-নিদ্রা, কর্ম-বিশ্রাম ,স্বপ্ন-সাধনা সকল কিছুতেই তাঁরা রসুলুল্লাহ স-কে অনুসরণ করতেন। এক দর্জির বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়ে রসুলুল্লাহ স লাউয়ের টুকরা খেলেন (রসুল পাক লাউ ভালবাসতেন), সেই দেখাদেখি অনেকেই লাউ খেতে শুরু করলেন, এর আগে এ'রা কোনদিন এভাবে লাউয়ের তরকারী খাওয়া পছন্দ করতেন না। বিদায় হজ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে এই পাহাড়ী গুহায় গেলেন রসুলুল্লাহ স, পরবর্তীকালে রসুলের চরণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ অনেক সাহাবীকে এখানে এসে থামতে দেখেছি এবং কেবল মাত্র রসুলুলল্লাহ স-কে মনেপ্রাণে অনুসরণ করার জন্যে দেখছি তাঁরাও ঐ গুহায় প্রবেশ করেছেন, কিছু পরে বাইরে এসে অযু করে আবার আপন গন্তব্যে ধাবিত হয়েছেন। এমনই একজন রসুলঅন্ত প্রাণ সাহাবী হলেন আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা। নাফে রা বলেনঃ "যে পাহাড়ী গুহাতে রসুলুল্লাহ স গিয়েছিলেন সেখানে তিনি (আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা) যেতেন। সেখানে প্রবেশ করে প্রস্রাব পায়খানার প্রয়োজন সমাপ্ত করে অযু করতেন।".. বুখারী শরীফ, ২ খণ্ড, ১৫৫৫।

জীবনে মরণে এ'রা এভাবেই রসুলুল্লাহ স-কে ভালবেসেছেন, অনুসরণ করে গেছেন। প্রয়োজনের মুহূর্তে এ'রা জীবন ত জীবন, জীবনের থেকে অনেক বড় জিনিষ আল্লাহর জন্য, রসুলের জন্য অকাতরে ত্যাগ করেছেন। এই অনুসরণ, এই অসাধ্য সাধন, এই রসুলপ্রেম—এর কোন তুলনা নেই।

সেই পবিত্র পাহাড় পিছনে ফেলে, সেই প্রচণ্ড ভিড় অতিক্রম করে, সেই অস্বাভাবিক যান-জটের অতলে তলিয়ে যেতে যেতে অবশেষে রাত বারটার কাছাকাছি আমরা মুযদালিফার নির্দিষ্ট গন্তব্যে এসে উপস্থিত হলাম। মাত্র পনের মিনিটের পথ অতিক্রম করতে আমাদের সময় লাগল সাড়ে তিন ঘণ্টা। এ ধরনের জামের সঙ্গে

কলকাতাবাসীদের প্রতি মুহূর্তের পরিচয় রয়েছে কিন্তু সমগ্র সৌদি আরবের মানুষ সারা বছরে এই একটি মাত্র দিনে আকস্মিক ভাবে ভয়ঙ্কর এই আতঙ্কের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকেনঃ কি করা যায়? ফলশ্রুতিঃ নতুন পথের সন্ধান। দেখলাম, পাশ দিয়ে আরো কয়েকটি অর্ধসমাপ্ত ন্যাশনাল হাই ওয়ে আরাফাত থেকে দৌড় শুরু করেছে মুযদালিফার দিকে, সমাপ্ত হলে আশা করা যায় যানজটের জটিল গ্রন্থিগুলি আপনা থেকেই আলগা হয়ে খুলে যাবে।

সময়ের সঙ্গে কখনো কখনো মানুষের অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। চলমান সময়ের তেমন এক আবেগঘন মুহূর্তে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে বাজি ধরে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। কালাম পাকের ইংগিত অনুযায়ী মাশ-আরুল হারাম-এ অবস্থান করতে পারলে ভাল হত, অন্ততঃপক্ষে তার সংলগ্ন প্রান্তরকেও বেছে নিতে হয় কিন্তু জিনিষপত্র সহ রাস্তায় নেমে নিজেই হতভম্ভ হয়ে গেলামঃ কোথায় মাশ-আরুল হারাম? কাকে জিজ্ঞেস করব? কে দেবে সেই পবিত্র পাহাড়ের সন্ধান? অন্ততঃ মুযদালিফার কোন বালুময় প্রান্তরে উন্মুক্ত আকাশ তলে আজকের এই রাতটুকু কাটান উচিত। সেই মহৎ বাসনাটুকু বুকের গোপনে লালন করতে করতে ডান দিকে ফিরে সৈনিকদের সুরক্ষিত সুদীর্ঘ জনবিরল এলাকা দেখে বুঝলাম এ দিকে প্রবেশ নিষেধ। প্রবেশ পথের দুধারে দুজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক বন্দুক উঁচিয়ে ক্রমাগত সে নির্দেশের কুচকাওয়াজ করছে। সুতরাং চোখের চোট খাওয়া ম্রিয়মান দৃষ্টি অনায়াসে বাঁ দিকে ঘুরে ঢালু পথ বেয়ে নিচে নেমে গেল। বালুময় বিস্তীর্ণ নিম্নভূমিতে দলবদ্ধ মানুষের গড়াগড়ি দেখে বুঝলাম অতিরিক্ত আর একটি মাত্র মানুষের সাড়ে তিন হাত স্থান মিললেও মিলতে পরে কিন্তু দুজন স্ত্রীলোক সহ যে ওখানে জায়গা খোঁজার চেষ্টা করে সে আজকের দিনের সবচেয়ে বড় আহাম্মক। শেষ পর্যন্ত আমরা যেখানে নেমেছিলাম সেই রাস্তার উপরেই পাটি বিছিয়ে বসে পড়লাম। সামান্য বিলম্ব হলে এই দুর্লভ জায়গাটুকুও আর পেতাম না। ' যখন নেমেছিলাম তখন এলাকাটা বেশ ফাঁকা ছিল,

এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে সেটিও ভরাটের মুখে।

রাত সোয়া বারটা, মগরিব এশা বাকি। ও'দের বসিয়ে রেখে পানির পাত্র নিয়ে উঠতে যাচ্ছি, সামনের অতিকায় ট্রাঙ্কারেব দিকে ইশারায় স্ত্রী আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ব্যস্ততায় লক্ষ্য করিনি, এখন দেখলাম সেটা পানির গাড়ি, দুষ্প্রাপ্য এই মরুতে হাজি সাহেবদের মধ্যে অঢেল পানি বিতরণের জন্যে সৌদি সবকারের অকৃপণ ব্যবস্থা। দ্রুত গিয়ে পানির পাত্র পেতে দিলাম, পলকে ভর্তি হয়ে ছাপিয়ে গেল। চলকে কিছুটা হাতে পড়তেই বরফ-শীতল অনুভূতি সারা দেহে ছড়িয়ে গেল, আর সেই শীতল অনুভূতি আলোর ছায়া তাড়ানোর মত সারা দেহ থেকে ক্লান্তি-গুলোকে টেনে তাড়িয়ে বার করে দিল। সমগ্র শরীর স্খালন করা নয়, তৃপ্তি সহকারে পান করা নয় কেবল সামান্য একটু শীতল ছোঁয়া, মরুর দাবদাহ নিভে গেল তাতেই। কখনো কখনো সামান্য পরশ আমাদের জীবনকে ওলট-পালট করে দেয়, একমাত্র অনু-ভূতিরাই অনায়াসে গভীরে প্রবেশ করে।

পানি নিয়ে ফিরে আকস্মিক ভাবে এক অবাঞ্ছিত অশোভন পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে বিপর্যস্থ হয়ে গেলাম। আমাদের সংগী প্যাটেলজী রাস্তার উপরে তাঁদের বিছানা পেতে নিয়েছেন, সেখানে তাঁদের রাতের সংসারও পাতা হয়ে গেছে। পাশেই স্ত্রী আমাদের বিছানা প্রস্তুত করছিলেন, এক অদ্ভুত প্রকৃতির দীর্ঘ-দেহী মিশকালো নাইজেরিয়ান আগে থেকেই ঠিক তার কিনারায় বিছানা পেতে শুয়ে ছিলেন। স্ত্রীকে বিছানা পাততে দেখে পা রাখার জায়গার অসুবিধা হবে ভেবে তিনি তাঁর চরণ যুগলকে আরো বাঁকিয়ে লম্বা করে ছড়িয়ে একেবারে আমাদের বিছানার অর্ধেকের বেশি জায়গা জবর দখল করে নিলেন। অহেতুক বাকবিতণ্ডার ভিতর না গিয়ে অন্যত্র বিছানা প্রস্তুত করার জন্যে স্ত্রী উঠতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ সেই বিছানার কিনারায় এসে দাঁড়ালেন প্যাটেলজী। নাইজেরিয়ানটি ততক্ষণে উঠে বসে বিছানার অর্ধেকটা তুলে দিয়েছেন, সবটাই তুলে ফেলে দিতেন কিন্তু ততক্ষণে প্যাটেলজী

তার উপরে বসে পড়েছেন। নিজেদের দুর্বোধ্য ভাষায় উত্তেজিত-ভাবে কি সব বলতে বলতে নাইজেরিয়ান ভদ্রলোকটিও উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর ভঙ্গী দেখে মনে হল তিনি পুরো বিছানাই তুলে দেবেন কিন্তু ততক্ষণে সম্পূর্ণ বিছানার উপর প্যাটেলজী ততোধিক গম্ভীর উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ ভংগিতে হাত পা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন। সব দেখেশুনে নিরুপায় নাইজেরিয়ান তার বিছানায় কাত হয়ে আহত পশুর মত গর্জাতে লাগলেন, প্যাটেলজী নিঃশব্দে ফুলতে রইলেন বিষমুখ সরীসৃপের মত। আর আমরা হতবাক হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ স্ত্রী দীর্ঘ সময় আর একটি বাক্যও উচ্চারণ করতে পারেন নি।

যাঁদের জন্যে প্যাটেলজী এত কান্ড করলেন বাহবা আদায়ের জন্য অবশেষে তিনি হাসতে হাসতে সেই আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। আমার ভিতরটা তখন ঘৃণায় যন্ত্রণায় অনুশোচনায় তছনছ হয়ে যাচ্ছিল। এই পবিত্র পরিবেশে এহরাম পরিহিত অবস্থায় আমার চোখের সামনে এমন একটা কদাকার কান্ড ঘটে গেল অথচ কিছুই করতে পারলাম না আমি। হজের লেবাস এখনো আমাদের অংগে, ইতিমধ্যেই আমরা হজকে নোংরা করতে শুরু করেছি। আমার অশ্রুসিক্ত চেতনায় রসুলুল্লাহ স-এর কণ্ঠস্বর সংগীতের মত মধুর সুরে বেজে উঠলঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ সমাপন করল এবং হজ সম্পাদন কালে কোন প্রকার অশ্লীল কথা ও কাজ (ঝগড়া ইত্যাদি) কিংবা গোনাহর কাজে লিপ্ত হল না, সে সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশুর মত হয়ে (হজ থেকে) প্রত্যাবর্তন করল।" বুখারী শরীফ, ১৪২২।

হায় আমি এ কি করলাম! মাঝ পথে আমাদের হজ সম্ভবতঃ অশোভন ভাবে কলঙ্কিত হয়ে গেল। প্যাটেলজীর হাসির জবাবে আমাদের চোখ দিয়ে ঝলক ঝলক ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। এক কাতরানো ব্যথা বুকে চেপে সেই গভীর রাতে বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা মগরিবের নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। মগরিব শেষ করে এশা, এশার পর তাহাজ্জদ। পাশাপাশি আমরা দুজন নামাযে মশগুল, উপরে

তারাভরা বিস্তীর্ণ নীরব আসমান, নিচে মুযদালিফার বালুময় পাহাড়ি অঞ্চল। প্রাথমিক কোলাহলগুলিও এখন স্তিমিত। সারা দিন মরুর প্রচন্ড রোদ গায়ের উপর দিয়ে গেছে, তাঁবুতে অবস্থানের সময়ও তার ভয়ংকর রোষ থেকে রক্ষা পাইনি, গাড়িতে গাড়িতে কাটল প্রায় দিবসের প্রধান অংশ, আগের রাতটিও কেটেছে প্রায় নির্ঘুম অবস্থায়, ধুলোবালি ক্লান্তি সব মিলিয়ে শরীর ভেঙে পড়ছিল, নামাযের মধ্যে যতখানি তন্ময় হবার কথা হতে পারছিলাম না, হঠাৎ শুনি স্ত্রী কাঁদছেন. পাশে বসে নামাযে গভীর রত অবস্থায় অঝোরে কাঁদছেন। তাঁর চোখ থেকে ডালিমের সফেদ দানার মত টোপ টোপ অশ্রু ঝরে পড়ছে, প্রতি ফোঁটা যেন কাতর গলায় উচ্চারণ করছেঃ ইয়া আল্লাহ! আমার কি হবে! ইয়া আল্লাহ! আমার কি হবে!

আমি জানতাম সর্ব বিষয়ে তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি অগ্রগামী, খাওয়া পরা ওঠা বসা সকল বিষয়ে তিনি অধিকতর সংযমী। হৃদয় বিগলিত তাঁর এই ক্রন্দন-ধ্বনি আমার আত্মায় অকস্মাৎ তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করল, সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যস্থ বহির্মুখী আত্মা অন্তর্মুখী হয়ে ক্রমাগত গভীর ও একাত্ম হয়ে গেল। সৎ সঙ্গ মানুষের চরিত্রকে, চিন্তা ভাবনাকে আমূল পাল্টে দেয়।

আমার চোখে আবার অশ্রু দেখা দিল, আমি পুনরায় এবাদাতের আস্বাদ সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে পারলাম, আমি জীবন ফিরে পেলাম। এতক্ষণ ধরে নামাযের যে নিয়ম মাফিক ওঠা বসা, কষ্টকর রুকু সিজদা করছিলাম, এখন তা অন্তরঙ্গ আনন্দের সামিল হয়ে উঠল। গভীর রাতের নিস্তরঙ্গ স্রোতধারায় আমাদের এই আনন্দাশ্রুটুকু মিশে একাকার হয়ে গেল।

রাত কত? জানা নেই। নামায সমাপ্ত করে মুযদালিফার সেই নির্জন পথে আমরা এক সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত তুললাম। বুকে ভয় এবং ভরসা, দু'চোখে যেন রসুলুল্লাহ স-এর পবিত্র পিরহান। নিদ্রিত ছিলেন রসুলুল্লাহ স, অতি ভোরে মুযদালিফার ভূমি-শয্যা থেকে তিনি উঠে বসলেন। তাঁর চেহারা মুবারকে মুচকি

হাসির আভাস ছিল। হযরত আবূবকর ও হযরত উমর রা তা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "হুযূর! আমাদের পিতামাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক! এ ত এমন একটি সময় যখন আপনি কখনও হাসেন না। আল্লাহ সর্বদা আপনাকে খোশ রাখুন, আজ (এ সময়) কেন আপনি হাসলেন?" মেশকাত শরীফ, আরাফাতে অবস্থান অধ্যায়।

এই হাদিসের প্রথমাংশ উদ্ধৃত না করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে নাঃ "আরাফার দিন বিকেলে রসূলুল্লাহ স আপন উম্মত (হাজি)-দের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তব দেওয়া হলঃ অন্যের প্রতি অত্যাচার ব্যতীত আমি সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিলাম। অবশ্য অত্যাচারিতের পক্ষ থেকে আমি অত্যাচারীকে ধরব। হুযূর বললেনঃ "ইয়া আল্লাহ! আপনি চাইলে অত্যাচারিতকে বেহেশত দিতে পারেন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু সেদিন বিকেলে এর কোন উত্তর দেওয়া হল না।" রাবী বলেনঃ "অতঃপর হুযূর যখন (মুযদালিফায় অবস্থানের সময়) ভোরে উঠলেন এবং সেই দোওয়া প্রার্থনা করলেন তখন তিনি যা চেয়েছিলেন, তাঁকে তা দেওয়া হল।" রাবি বলেনঃ তখন রসূলুল্লাহ স মুচকি হাসেন। হযরত আবূবকর এবং হযরত উমর এর জিজ্ঞাসার উত্তরে রসূলুল্লাহ স বলেনঃ "আল্লাহর শত্রু ইবলিশ যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ আমার দোওয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মত (হাজিদের সব রকম পাপ) মাফ করে দিয়েছেন, মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে মারতে বলতে শুরু করলঃ 'হায় আমার পোড়া কপাল, হায় আমার বদনছিব!' তার (ইবলিশের) এই অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ।" মেশকাত শরীফঃ ইবনে মাজা এবং বায়হাকী।

সুতরাং মুযদালিফা হল সেই পুণ্যভূমি, যেখানে কাতর দুটি হাত উঠালে মহান আল্লাহ মানুষের পূর্বাপর ছোট-বড় সকল রকম পাপ মাফ করে দেন। সুতরাং সমগ্র হজ অনুষ্ঠানের মধ্যে মুযদালিফায় অবস্থান রত রাতটি গুরুত্বে মহোত্তম এবং দোয়া কবুলের শ্রেষ্ঠতম স্থান। সেই বরকতময় পবিত্র প্রান্তরে নির্জন

নিশীথে বসে বসে দুজনে কেবলই কাঁদছিলাম। কেঁদে কেঁদে অশ্রুতে ভিজিয়ে আমরা আমাদের সারা জীবনের ছোট-বড় পাপের জন্য, হজের সকল রকম ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য পরম প্রভুর কাছে মাফ চেয়ে নিলাম। বললামঃ জমিন এবং আসমানের হে মহান সম্রাট! জীবন এবং মৃত্যুর হে মহান অধিকর্তা! আমাদের ক্লান্তি, আমাদের ত্রুটি, আমাদের সকল অসম্পূর্ণতাকে মাফ করে এই দীন দাসের হজকে কবুল করুন! জীবনের আর কটা দিনই বা বাকি—এই দিনগুলিতেও আমরা যেন পরিপূর্ণ রূপে আপনার নির্দেশিত পথেই চলতে পারি। বলিষ্ঠ ঈমানে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করুন, আপনার পূর্ণ নূরের মধ্যে আমাদের আকৃষ্ট করুন, আমরা ত সকল অবস্থাতে আপনাতেই আত্ম-সমর্পিত!

সেই নির্জন নিশীথ, শান্ত শীতল হাওয়া আর এতিমের মত বিরামহীন কান্নাকাটি—রাত একেবারে শেষ যামে পেঁাছে গেল।। মুনাযাত শেষ হয়ে গিয়েছিল, চোখ মুছে ডান পাশের বিশাল পাহাড়ি প্রান্তরের দিকে তাকালাম, মাথার উপরে নক্ষত্রে মীনা করা নীল আসমানের দিকে তাকালাম—আর কি আশ্চর্য চার পাশ থেকে এক মধুর স্পর্শ ছুটে এসে আমাদের সারা দেহ মনে এক অপার্থিব অনুভূতি ছড়িয়ে দিয়ে গেল। আমরা, পাপে-কলঙ্কে ভরা এই মাটির মানুষ, হঠাৎ করে যেন অন্য জগতের এক অনাবিল স্পর্শ লাভ করলাম। অকস্মাৎ পাওয়া এক আকাশ আনন্দে আমরা বিহ্বল হয়ে পড়লাম, আনন্দের ঢেউয়ে উথাল-পাতাল বুকটা ফেটে যাবে বুঝি!

ভোরের শিশির পাতার মত মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে এলঃ লাব্বায়েক, আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক! প্রভু আমার—এই ত আমি। আপনার সম্মুখে গোলাম নত শির!

নামায থেকে ফারাগত হয়ে সেই রাতে আমরা কাঁকর খুঁজতে বেরুলাম। অবস্থান থেকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাস্তার পাশেই একটা খাড়াই পাহাড়ের ঢালু পদদেশে নেমে গেলাম। দেখলাম চার পাশে আরো কিছু মানুষ টর্চের আলোয় কাঁকর সংগ্রহ করছেন। কে যেন আমাদেরও বলে দিয়েছিলেন মুযদালিফা থেকে

কাঁকর কুড়িয়ে নিতে, হজ সংক্রান্ত একটি বইতেও এই পবিত্র ভূমি থেকে কাঁকর সংগ্রহের কথা পড়েছিলাম। কিন্তু কাঁকর সংগ্রহ করতে গিয়ে মনমত কাঁকর পেলাম না—হয় বড় পেলাম নয় ছোট। প্রত্যেক হাজি সাহেবকে উনপঞ্চাশ বা সত্তরটি করে কাঁকর সংগ্রহ করতে হয়। প্রতি বছর একটি নির্দিষ্ট এলাকা থেকে যদি কয়েক লক্ষ হাজি সাহেব এই বিপুল সংখ্যক কাঁকর সংগ্রহ করেন—একেবারে দুর্লভ না হলেও সংগ্রহটা নিতান্ত সহজলভ্যও থাকে না।

কিন্তু কেবল মাত্র মুযদালিফা থেকে যে কাঁকর সংগ্রহ করতে হবে এই তথ্যটি আমি কোন প্রামান্য গ্রন্থে পাইনি। বরং মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধ হাদিসে অবগত হচ্ছি বিদায় হজে রসুলুল্লাহ স মুযদালিফা থেকে মিনার অন্তর্গত মুহাচ্ছিরে গিয়ে নিজের জন্য ফজল ইবনে আব্বাসকে কাঁকর সংগ্রহ করে দিতে বললেন এবং সমবেত সকলকে এই স্থান থেকে কাঁকর খুঁজে নিতে নির্দেশ দিলেন। বুখারী শরীফেও ঠিক একই ধরনের হাদিসের উল্লেখ আছে। সৌদি সরকারের ফতোয়া ও দাওয়াত বিভাগ থেকে প্রতি বছর সংক্ষিপ্তাকারে হজের প্রধান নিয়ম কানুন এবং বিধি-নিষেধ সম্পর্কে আরবী ভাষায় একটি মূল পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, পরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত ও মুদ্রিত হয়ে হজের সময় হাজি সাহেবদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। এই ধরনের বাংলা ভাষায় পুস্তকটি জনাব ইয়াকুব আদম সংগ্রহ করে আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন। এই পুস্তিকাতেও দেখতে পাচ্ছি মিনা থেকে সকলকে কাঁকর সংগ্রহের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার মনে হয়ঃ কেবল মাত্র মুযদালিফা থেকে কাঁকর সংগ্রহ করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সম্ভবতঃ এই মনোভাব সঠিকও নয়! রসুলুল্লাহকে অনুসরণ করতে হলে অবশ্যই আমাদের মিনার মুহাচ্ছির অঞ্চল থেকে কাঁকর সংগ্রহ করা উচিত।

রাতের তখন আর বেশি বাকি ছিল না, কাঁকর সংগ্রহ করে ফিরে এসে আমি ইতস্ততঃ করছি, স্ত্রী বললেন, অল্প সময়ের জন্য হলেও একটু ঘুমিয়ে নিন। জেগে উঠেই এক অসম্ভব কাজের মধ্যে

ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কথাটি এত সত্য যে এ বিষয়ে কারো কোন দ্বিমত নেই। সমগ্র হজ অনুষ্ঠানের মধ্যে আরাফাতের পরের দিনটি অসম্ভব কষ্টসাধ্য দিন। প্রথমতঃ এই দিন প্রত্যূষে সকল হাজি সাহেবকে মুযদালিফার মরুময় প্রান্তর থেকে সুদীর্ঘ পথ ভেঙে মিনায় পৌঁছাতে হয়, দ্বিতীয়তঃ তাঁবুতে অল্প বিশ্রামের পর যেতে হয় অবস্থান অনুযায়ী তিন-চার কিলোমিটার পথ হেঁটে জুমরাতুল আকাবা বা বড় শয়তানে কাঁকর মারতে। এই কাঁকর মারার ব্যাপারটি শুনেছি এক ভীষণ প্রাণান্তকর ব্যাপার। প্রায় বিশ-ত্রিশ লক্ষ মানুষ একটি মাত্র রাস্তার উপর ধাবিত হন, প্রাণপন শক্তিতে সম্মুখের দিকে ছুটে চলেন, ধাক্কাধাক্কিতে দুর্বলেরা পিছনে পড়েন, অধিকতর দুর্বলেরা শুনেছি কখনো কখনো পদতলে পিষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যান, কেউ কেউ জুমরাতুল আকাবার সন্নিকটে পৌঁছে প্রাণ ভরে কাঁকর মারেন, আবার শত চেষ্টা করেও অনেকেই তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পাবেন না, শুনেছি অর্ধেকের উপর মানুষ চপ্পল খুইয়ে খালি পায়ে সেই ভীষণ রোদে ফুটন্ত রাস্তা মাড়িয়ে মাড়িয়ে আধমরা হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসেন। তাঁবুতে পৌঁছে অল্প একটু বিশ্রাম নেন, কেউ বা সঙ্গে সঙ্গে আরো দু-তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে চলে আসেন কুরবানীব নির্দিষ্ট এলাকায়। তাবপর পছন্দমত দুম্বা খাসি বকরী ভেঁড়া গরু বা উট কিনে কুরবানী দেওয়া। এই কুববানীর ব্যাপারটিও শুনেছি আদৌ কোন আরামপ্রদ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এই সব কাজগুলির একটিরও অভিজ্ঞতা আমার নেই। বিগত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত এই কর্তব্যগুলির দুরূহতা সম্পর্কে শুনে শুনে মনের মধ্যে প্রায় আতঙ্ক জন্মে গিয়েছিল। স্ত্রীর কথা শুনে উপলব্ধি করলাম তাঁর মধ্যেও সেই বিভীষিকার কিছুটা সঞ্চারিত হয়েছে। শেষ রাতে উন্মুক্ত আকাশতলে পাশাপাশি শয্যা গ্রহণ করতে করতে বললাম, আল্লাহ রাজি থাকলে সব কাজই সহজসাধ্য হয়ে যাবে। সুতরাং অনর্থক ভেবে লাভ কি।

বিছানায় শরীর এলিয়ে দেবার আগেই বোধহয় ঘুমে ঢুলে পড়েছিলাম। কিন্তু সে আর কতক্ষণ, বিনা এলার্মে পাখিদের ঘুম

ভাঙার মত ঠিক সাড়ে তিনটেয় ঘুম ভেঙে গেল আমার। মুযদালিফার আকাশে শেষ রাতের তারারা তখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ভীষণভাবে, কেমন নীলচে জ্যোতির্ময় সেই আলোর বিচ্ছুরণ, এক অঢেল পবিত্রতা যেন জড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। নিচে অসংখ্য আলোর মালা পরে আছে মরু ময়দান, পাহাড়ের উপরেও অসংখ্য তাঁবুতে আলোর ঝিলিমিলি—আকাশের তারার মতই মনোরম। পাশে একদল আলকাতরা-কালো নাইজেরিয়ান অযু করে নামাযের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আমিও অযু সেরে স্ত্রীকে ডেকে তুলে দিলাম। ক দিন ধরে নীরবে হাসি মুখে ক্রমাগত মারাত্মক পরিশ্রম করছেন তিনি, সম্ভবতঃ এমন পরিশ্রম জীবনে কমই করেছেন, দেখলাম অসম্ভব ক্লান্তি নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। উঠে বসে আড়ষ্টতা ভেঙে পানির পাত্রটা হাতে নিয়ে হঠাৎ কানের গোড়ায় মুখ এনে অত্যন্ত লজ্জাতুর কণ্ঠে শুধালেন, কি করা যায়? প্রকৃতির ক্ষুদ্র ডাকে সাড়া দিতে কোথায় যাবেন তিনি? চারপাশটা ভাল করে দেখে নিয়ে দূরে পাহাড়ের একটা ঢালু জায়গা দেখিয়ে বললাম, আপাততঃ ঐ জায়গাটায় যাওয়া যেতে পারে। তিনি পানির জায়গা হাতে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন। দেখলাম আশপাশের অনেকগুলো চোখ হঠাৎ তাঁর হাতের পানির জায়গা সহ তাঁকে তুমুলভাবে অনুসরণ করছে। ওপাশ থেকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে আছে প্রহরারত সৈনিকগুলো। ঢালু জায়গায় গিয়ে বসতেই এই বেহায়া চোখগুলি একসঙ্গে উন্দাম হয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে এল। কিছুপরে তাকিয়ে দেখি দৃষ্টিগুলি তখন মারাত্মক ভাবে লালসাতুর। এই তাকান মুখগুলির মধ্যে হঠাৎ যেন আমি সুদূর অতীতের সেই মুখগুলির প্রতিচ্ছবি ঝলসে ভেসে উঠতে দেখলাম।

রসূলুল্লাহ স-এর হাতের বলগা আন্দোলিত হবার জন্যে প্রস্তুত, উঠে দাঁড়িয়েছে প্রিয় উষ্ট্রী আল কাসওয়া। দূরে কুরেশদের অতি প্রিয় সবির পর্বত অন্ধকারে অতিকায় মনে হয়। পূর্ব সংস্কারের বশে শৃঙ্গগুলি আলোকিত হবার অপেক্ষায় সাহাবীরা ব্যস্তভাবে তাকিয়েছিলেন সেদিকে। পর্বতশীর্ষে সূর্যালোক এসে

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা প্রার্থনার সুরে গেয়ে উঠবেনঃ হে সবির পর্বত! আলোকময় হয়ে যাও। তারপর তাঁরা অগ্রসর হবেন মিনার পথে। কিন্তু অকস্মাৎ ভোরের সেই আধা অন্ধকারে রসুলুল্লাহ স-এর প্রতিবাদী এক উজ্জ্বল কণ্ঠস্বর ভেসে এলঃ পর্বত আলোকিত হওয়ার সঙ্গে হজের কোন সম্পর্ক নেই। আলোকিত হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে আল্লাহর উপর। তা ছাড়া সূর্য উঠে গেলে পথ হাঁটতে কষ্ট হবে সুতরাং অন্ধকার যুগের সব অন্ধ বিশ্বাস পায়ে দলে আমরা সূর্যোদয়ের পূর্বেই মুযদালিফা ত্যাগ করব।

সাহাবীরা মাথা নাড়লেন ঘন আবেগে, ঠিক ঠিক। পর্বতে সূর্য কিরণ পড়ুক বা না-পড়ুক তাতে হজের কি আসে যায়। ঐতিহাসিক বিদায় হজের লক্ষাধিক সাহাবীরা আত্মার সঙ্গে কথা বলে দেখলেন, এই কয়দিনের ফেলে আসা দুর্লভ অতীত সকলের বোধে এবং চিন্তায় আশ্চর্য গরিমা দান করেছে। হাতুড়ির ঘায়ে তপ্ত লাল লোহার উপর থেকে তৎপর দৌড়ে ছিটকে সরে যাওয়া খাদের মত সকলের অন্ধবিশ্বাস থেকে বহুতর অন্ধকার ঝরে গেছে।

মহানায়কের হাতের বলগা চলার ইশারায় আন্দোলিত হতে যাবে এমন সময় খাসআম গোত্রের এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন আল কাসওয়ার সামনে। তাঁর বেশবাসের ভাঁজে ভাঁজে চকচকে লোভ ছিল আর কণ্ঠে ছিল এক জরুরী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ব্যাকুলতা। অকস্মাৎ তিনি এতগুলি মহৎ মানুষের সামনে উন্মুক্ত হয়ে দাঁড়ালেন।

সওয়ারী প্রস্তুত, আল কাসওয়া দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে রসুলুল্লাহ স, সামনে রয়েছেন উসামা ইবনে যায়েদ আর পিছনে বসিয়ে নিয়েছেন ফজল ইবনে আব্বাসকে। রসুলুল্লাহ স-এর অত্যন্ত স্নেহের পাত্র এই ফজল ইবনে আব্বাস। কচি লাউয়ের ডগার মত উঠতি যৌবনের ল ল করা সতেজ শরীর, প্রতি অঙ্গে এক উন্মাদ যৌবন যেন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। খাসআম গোত্রের এই মহিলা হঠাৎ আল কাসওয়ার সামনে দাঁড়িয়ে ফজল ইবনে আব্বাসের দিকে তাকালেন, তাকিয়েই শিউরে উঠে হতচকিত হলেন, তাঁর দৃষ্টি সেখানেই আটকে গেল, তিনি তাঁর প্রশ্ন ভুলে গেলেন, বার বার

ফজল ইবনে আব্বাসকে দেখছিলেন এবং দেখতেই থাকলেন। সদ্য কৈশোর অতিক্রম করা অসম্ভব সুন্দর ফজল ইবনে আব্বাসও সম্ভবতঃ পরিবেশ পরিস্থিতির কথা ভুলে গেলেন. তিনিও সমানভাবে তাকিয়ে থাকলেন মহিলাটির দিকে। এভাবে সেই পবিত্র পরিবেশে অসংখ্য মহৎ মানুষের সম্মুখে অকস্মাৎ এই দুই জন ভয়ংকর ভাবে উন্মুক্ত হয়ে গেলেন।

খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। অনেকের চোখেই কৌতুহল জেগে উঠল, আবার অনেকে ভাবছেন, মাথার উপর এত বড় আকাশ— আমাদের কি করার আছে। সকলেই কিন্তু ভয়ংকর একটা পরিণতির জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁরা ব্যগ্রভাবে সেই পবিত্র পিরহানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। অপেক্ষাকৃত দুর্বল ঈমানের মানুষেরা একটা মারাত্মক তুলকালাম কান্ড দেখার জন্যে রক্তে অন্যরকম উত্তেজনা অনুভব করছিলেন।

কিন্তু কিছুই ঘটল না, কিছুই করলেন না রসুলুল্লাহ স। তিনি কেবল ধীরে ধীরে ফিরে তাকালেন ফজল ইবনে আব্বাসের দিকে। তারপর তাঁর পরিচর্যারত পবিত্র দুই হাত দিয়ে ফজলের মাথাটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিলেন। বুখারী শরীফ।

আর তাতেই লজ্জা ফিরে পেলেন সেই মহিলা, তিনি তাঁর আবরু ফিরে পেলেন। আবরু ফিরে পেল সাহাবীদের উলঙ্গ ভাবনা-গুলিও। সেই লক্ষাধিক সাহাবীদের হঠাৎ মনে হল কেবল ফজল ইবনে আব্বাসের মুখটি ঘুরে যায় নি, তাঁদের সকলের মুখ ঘুরে গেছে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে।

ঘুরিয়ে দিয়েছেন রসুলুল্লাহ স।

পানির পাত্র হাতে স্ত্রী উঠে এলেন, দেখলাম তখনো সেই লালসাতুর মুখগুলি সমানে তাঁকে অনুসরণ করছে।

হায়! আমাদের মধ্যে আজ এই মুখগুলিকে আলোর দিকে ঘুরিয়ে দেবার মানুষের বড় অভাব!

২৪.

সূর্য ওঠার আগেই মোট-ঘাট মাথায় নিয়ে আবার পথে নামলাম আমরা। মুযদালিফার পর্ব শেষ। সম্মুখের প্রসারিত পথে চলতে চলতে প্রভাতের স্পষ্ট আলোকে পিছনের বিশাল পাহাড়ি প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললামঃ বিদায় মুযদালিফা! বিদায় মাশআরুল হারাম!! হে পবিত্র প্রান্তর বিদায়, তোমাদের সকলের নিকট থেকে বিদায়!!!

এখন আমরা মিনার পথের যাত্রী। একটি পর্বের সমাপ্তি হতে না হতেই আর একটি পর্বের শুরু। মুযদালিফার নিশি যাপন শেষ হতে না হতেই সম্মুখে সুস্পষ্ট ভাবে খুলে গেল মিনার কর্মমুখর দিনের বিশদ সূচীপত্র। প্রকৃতপক্ষে আজকের এই ভীষণ কর্মব্যস্ত দিবসের কর্তব্যকর্মের তাড়নায় ভিতর ভিতর অস্থির হয়ে উঠছিলাম, এই ভীষণ দিনটি কিভাবে কাটবে আল্লাহই জানেন। আপাততঃ এই মুহূর্তে আমাদের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে যে কোন প্রকারে যে কোন একটি যানে উঠে বসা। আজকের ডাইরিতে লিখেছিলামঃ "তারপর শুরু হল যে কোন যানবাহন ধরার প্রাণান্তকর চেষ্টা। হতে পারে, সম্পূর্ণ হজের জন্য আমরা কখনো এমন অবিরাম আন্তরিক চেষ্টা করি নি।" আমি এবং আমার স্ত্রী কেবল দুজনে হলে কোন কথা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে আছেন সস্ত্রীক প্যাটেলজী এবং বৃদ্ধা হাশমি ইশরাত। সুতরাং এই পবিত্র ভূমি থেকে মিনা পর্যন্ত হেঁটে যাবার কল্পনা বাতুলতা মাত্র। বহুক্ষণ চেষ্টা ও সময় অপচয় করে যখন নিরুপায় ব্যর্থ দৃষ্টিতে পিছন ফিরে তাকালাম সকলেই এমন কি হাশমি ইশরাত পর্যন্ত সমস্বরে বলে উঠলেনঃ কিছু চিন্তা করবেন না হাজি সাহেব, পা চালান, আল্লাহ চাহে ত মিনায় পৌঁছে যাব। ষাট বছরের বৃদ্ধার কণ্ঠে ষোল বছরের উৎসাহ! অবাক হয়ে গেলাম। এই পবিত্র ভূমিখণ্ডে পা রাখার পর সকলের দেহমনে সম্ভবতঃ এমন অসম্ভব পরিবর্তন ঘটে যায়।

বেডিং পত্তর মাথায় নিয়ে সত্য সত্যই চলতে শুরু করলাম আমরা। যানবাহনের আশা মন থেকে একেবারেই ত্যাগ করে দিয়েছিলাম। অসংখ্য গাড়ি যাতায়াত করছে কিন্তু সেগুলি যে কোথায় থেকে এমন ভর্তি হয়ে আসছে তার হদিস আমাদের জানা ছিল না। তা ছাড়া দেখলাম সকলেই আল্লাহর দেওয়া পদযুগলের উপর ভরসা করে হেঁটে চলেছেন, আমরাও হাঁটছি। হাঁটছি আর দু-একটা গাড়ি দেখে দেখে হাত তুলছি। অবচেতন মনে সম্ভবতঃ তখনো একটা ক্ষীণ আশা বেঁচে আছে, এভাবে যদি কোন গাড়িকে থামান যায় এবং আমরা তাতে ঠাঁই পাই। মিনিট দশেক হাঁটার পর অবশেষে সত্য সত্যই 'জীয়ন কাঠি' পাওয়ার মত একটা আধা বাস টাইপের মিনি পেয়ে গেলাম। মহিলারা ভিতরে ঠাঁই পেলেন, আমরা পেলাম ছাদে। আল্লাহর এই সীমাহীন রহমত আর অশেষ করুণার কাছে মাথা আপনা থেকেই হেঁট হয়ে আসছিল। আজকের এই অসম্ভব ভিড়ে, বানডাকা দুর্নিবার স্রোতের মুখে খড়কুটোর মত ভাসতে ভাসতে হঠাৎ এই নিরাপদ আশ্রয়! ছাদে উঠতে উঠতে অনুভব করলাম আমার ভিতরটা সিক্ত হয়ে উঠেছে। ছাদে বসে শান্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি নীরবে উচ্চারণ করলামঃ আসমান-জমীনের হে মহান সম্রাট! কোন ভাষায় আমি আপনার এই অনন্ত ভালবাসার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এরপর আর কোন কথা বলা গেল না, সম্ভবতঃ বলা যায়ও না। প্রতিমুহূর্তে মহান আল্লাহ যে ভাবে তাঁর অনন্ত রহমতের মধ্যে আমাদের আপ্লুত রেখেছেন, যেভাবে প্রতি নিঃশ্বাসে আমাদের জীবনদান করছেন—ভাষায় তার এককণা কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না। সিজদায় লুটিয়ে, অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে, অনুভবের মধ্য দিয়ে হয়ত কিছুটা উপলব্ধি করা যায় মাত্র।

পথের দু পাশে পাহাড়ের পর পাহাড় অতিক্রম করেই চলছিলাম আমরা। মরুভূমির মাঝে এক অতিশয় সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় দেখলাম কয়েকজন বেদুইনের ঘরবাড়ি, ছোট ছোট তাঁবুর আকৃতি। শুনলাম এরাই সৌদি আরবের আদিম অধিবাসী। পর্বতের নির্জন

চূড়াই এদের সবচেয়ে বেশি পছন্দ। লু হাওয়ায় মরু ওলট-পালট হয়ে যাবে, সিমুমের ঝাপটায় অন্ধকার হয়ে যাবে সব কিছু—আর তারা সম্রাটের মত পর্বত-শীর্ষের সিংহাসনে বসে প্রত্যক্ষ করবে এসব। হাওয়ার চেয়েও স্বাধীন, আগুনের চেয়েও প্রখর এই বেদুইনেরা কোন বিষয়ে কারো কোন তোয়াক্কা করে না। সরকারের পক্ষ থেকে নিচে নামার লোভনীয় শর্ত দেওয়া হয়েছে, কোথাও কোথাও সমতলে নামিয়েও আনা হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পর সব কিছু অবলীলায় ত্যাগ করে এরা আবার উঠে গেছে পর্বতশীর্ষে। অবশ্য সংখ্যায় এরা নগণ্য। দেখলাম, অত উপরে, পাহাড়ের শেষ মাথায় ছাগল বকরি চরে চরে ঘাস খাচ্ছে, দু-একটি বাচ্চাও নির্বিকার চিত্তে বসে খেলা করছে অথচ সমতলবাসী আমরা নিচে থেকে এক পলক এসব দেখেই কাঁপতে শুরু করলাম। বহুক্ষণ পর্যন্ত দৃশ্যটা মনের মধ্যে ঘুর পাক খেতে থাকল। মিনায় পৌঁছেও মনে হলঃ বকরীগুলো এতক্ষণ নিচে পড়ে শেষ হয়েছে অথবা সেই বাচ্চাটা গড়িয়ে পাথরে পাথরে টক্কর খেয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছুই হয় না, এভাবেই এরা বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকে, বড় হয়।

এক ঘণ্টারও কম সময়ে মিনায় পৌঁছে গেলাম আমরা। কিন্তু ড্রাইভারের রসিকতা থেকে রেহাই পেলাম না। তাঁকে যত থামতে বলি, তত হাসতে থাকেন তিনি এবং এভাবে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে গিয়ে তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর যানকে থামালেন। পুরো রিয়েল মিটিয়ে নেমে এলাম সকলে এবং বোঁচকা-বুঁচকি মাথায় নিয়ে এই কঠিন এক কিলোমিটার উজান পথ ভেঙে যখন তাঁবুতে হাজির হলাম, ঘড়িতে ঠিক সাতটা। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই পরিপাটি করে তাঁবুর শয্যা প্রস্তুত করে ফেললেন স্ত্রী, কোন কথা না বলে গা এলিয়ে দিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এক আকাশ আরাম যেন ঝাঁপিয়ে এল। দেহ শিথিল হয়ে চোখ বন্ধ হবার উপক্রম। মনে মনে বললামঃ যে-আমি এখনি ইবলিশকে তাড়াতে যাব, শয়তানকে কাঁকর মারতে যাব, সেই আমি এই মুহূর্তে শয়তানী

কুহতে আবিষ্ট হয়ে পড়ছি। তওবা তওবা, লা হাওলা অলা কুওয়তা ইল্লা বিল্লাহ......

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলাম এবং কালবিলম্ব না করে সাতটি কাঁকর নিয়ে জুমরাতুল আকাবার পথ ধরলাম। স্ত্রী এবং হাশমী ইশারাত এখন শয়তান মারতে যাবেন না, বিশ্রামের পর সময় ও সুযোগ মত যাত্রা করবেন। তাঁদের মধ্যে আরো কিছু মহিলা এবং এক বৃদ্ধ হাজি সাহেব তাঁদের সঙ্গী হতে চাইছেন। কিন্তু আমার পক্ষে আর অপেক্ষা করা চলে না। বিলম্ব যত হবে ভিড় বাড়বে তত, প্রচণ্ড রকম দুর্ভোগের মধ্যে পড়ে যাব তা হলে। ফেরার পর আবার কুরবানীর ব্যাপারটিও রয়েছে। এবং এই ব্যাপারটিতে মেয়েদের যাবার কোন প্রয়োজন নেই।

একটি মাত্র রাস্তার দিকে আজ সকলের লক্ষ্য স্থির, সকলেই ধাবমান সেই দিকে। রাস্তাটি প্রাচীন এবং সুদীর্ঘ। মক্কা মোয়াজ্জম থেকে বেরিয়ে মুহাচ্ছাব হয়ে মসজিদুল খায়েফের পাশ দিয়ে মিনা অতিক্রম করে মুযদালিফা পার হয়ে একেবারে আরাফাতে গিয়ে মিশেছে। মসজিদুল খায়েফের পাশে মুহাচ্ছাব এলাকাতেই পরপর অবস্থান করছে তিনটি জুমরা বা জামরা। জুমরা শব্দের অর্থ কাঁকর বা প্রস্তর খণ্ড। তিনটি জুমরায় হাজি সাহেবগণ কাঁকর নিক্ষেপ করেন বলেই সম্ভবতঃ এমন নামকরণ হয়েছে। মক্কা শরীফের দিক থেকে মিনায় আসার পথে প্রথমেই পড়ে জুমরাতুল আকাবা বা বড় শয়তান—একে জুমরাতুল কুবরা বলেও উল্লেখ করা হয়েছে হাদিস শরীফে, এর এক শো পনের মিটার দূরে আছে জুমরাতুল উসতা বা মেজ শয়তান এবং এখান থেকে দেড় শো মিটার দূরে জুমরাতুল উলা বা ছোট শয়তানের অবস্থান। যে তিন জায়গায় তিনটি জুমরা আছে, কথিত আছে এই স্থানগুলিতে ইবলিশ শয়তান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে হযরত ইবরাহীম আ-কে পুত্র-কুরবানী থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আল্লাহর আদেশ পালন থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে চায় কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ-প্রেমিক ইবরাহিম আ আপনার নফস সমূহকে দমন করে শয়তানের সমূহ কুমন্ত্রণা ও

প্রলোভনকে হেলায় পরাজিত করেন এবং জুমরার স্থানগুলিতে তাকে সাতটি করে প্রস্তর খন্ড নিক্ষিপ্ত করে বিতাড়িত করেন।

প্রকৃতপক্ষে জুমরায় কাঁকর মারার উদ্দেশ্য কি—এই মূল প্রশ্ন সামনে রেখে আমরা নবী-পরিবারে শয়তানী চক্রান্তের শেষ ইতিবৃত্তটুকু জেনে নিতে চেষ্টা করব। হযরত ইবরাহীম আ-এর নিকট থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে শয়তান গেল কিশোর বালক ইসমাইলের কাছে। তাঁকে তাঁর পিতা নির্জন পাহাড়ের পাদদেশে নিয়ে গিয়ে জবেহ করবেন একথা ভীষণ আতঙ্কিত স্বরে বুঝিয়ে দিল সে। কিন্তু ইসমাইল ত হযরত ইবরাহীমের সন্তান। ভীত হওয়া দূরের কথা, খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর। উল্লসিত কণ্ঠে তিনি বললেন, আমি কুরবানী হলে মহান পরোয়ারদিগার খুশি হবেন, কি সৌভাগ্য আমার! এ সংবাদ তুমি আগে দাওনি কেন? উল্টো ব্যাপার দেখে শয়তান খুবই নিরাশ হল, তবুও সে হাল ছাড়ল না। তার শেষ আশ্রয় মা হাজেরা। গেল সেখানে। গিয়ে সব কথা বিশদ-ভাবে বর্ণনা করল তাঁর কাছে। ধীর স্থির ভাবে প্রতিটি কথা শুনলেন মা হাজেরা তারপর তাঁর ক্ষুধাক্লিষ্ট মুখে যেন পূর্ণিমার চাঁদ খেলা করে গেল। অসম্ভব স্থির কণ্ঠে তিনি বললেন, আল্লাহর হুকুমে আমি নির্বাসন গ্রহণ করেছি, এত দুঃখকষ্ট সহ্য করছি তাঁকে খুশি করার জন্য, তাঁর হুকুম হলে পুত্রকে নিশ্চিতভাবে কুরবানী দেব। এর চেয়ে আনন্দের আর কি আছে। শয়তান ভালভাবে উপলব্ধি করল মা হাজেরার গলায় তার জন্য এতটুকু প্রশ্রয় নেই। অবশেষে সে মুহ্যমান আর লাঞ্ছিত হয়ে স্থান ত্যাগ করল।

শয়তানের বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম আ-এর এই জিহাদকে স্মরণ করেই কাঁকর মারতে হয় জুমরাতে। তিনি মেরেছিলেন সাতটি করে, হাজি সাহেবদেরও মারতে হয় সমসংখ্যক। ধর্মীয় আদেশ পালন করা অবশ্যই কাঁকর মারার মুখ্য উদ্দেশ্য কিন্তু এছাড়া গৌন বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাস্তব জীবনে দেখা যায় মানুষের মনেই শয়তান প্রথম বাসা বাঁধে, সেখানে কোনক্রমে ঠাঁই পেয়ে গেলে তারপর সব কিছুতে অংশ নেওয়া তার পক্ষে সহজ হয়ে

যায়। মূল কাহিনীতে দেখতে পাচ্ছি মা হাজেরার সুকোমল অন্তরে শয়তান এতটুকু রেখাপাত করতে পারেনি, বালক ইসমাইলের কিশোর মনেও তার ঠাঁই হল না আর হযরত ইবরাহীম আ-এর অন্তরের ত্রিসীমানার কাছে ত সে ঘেঁষতেই পারেনি। সুতরাং কাঁকর মারার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মহান খলিলুল্লাহ হযরত ইবরাহীম আ-এর স্মৃতি স্মরণ করব, তেমনি এ কাঁকর মারব আমার অন্তরের শয়তানকে। মেরে তাকে লাঞ্ছিত করে বহিষ্কার করে দেব। কাঁকর মারতে মারতে আমি ইতিহাস স্মরণ করেছি, স্মরণ করেছি পিতা-পুত্রের মহান আত্মত্যাগকে আর বিনীত ভাবে আল্লাহর কাছে নিবেদন করেছিঃ প্রভু! আমার পঞ্চ রিপুতে শয়তান যেন আর কোন দিন তার দখল না বসায়। আমার কর্ম হোক অহংকার শূন্য, আমার ব্যবহার হোক বিনত, শয়তানী কুহক মুক্ত হোক আমার হৃদয়! আত্মা হোক ভোরের হাওয়ার মত শান্ত এবং পবিত্র! পবিত্র জুমরায় এই আমি কাঁকর নিক্ষেপ করলাম—বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার। আমার জীবন আমার মৃত্যু, আমাব নামায আমার রোজা, আমার কুরবানী, আমার উৎসর্গ, নিখিল বিশ্বেব হে মহান প্রতিপালক! সে ত কেবল আপনার জন্যই!

যেমন অস্বাভাবিক ভিড়ের বর্ণনা শুনেছিলাম তেমন ভিড় ছিল না, বিসমিল্লাহ বলে আমি ত সব কাজ সহজ ভাবেই সম্পন্ন করতে পারলাম। শুনলামঃ একটু আগে এলাম বলেই সব কাজ এমন অনায়াসে করা সম্ভব হল আর ঘণ্টাখানেক পর থেকে এখানে ভিড়ের গর্জন এবং বিভীষিকা শুরু হবে।

জুমরা কি, দেখতে কেমন এ নিয়ে আমার মনে কৌতূহলের অন্ত ছিল না। দেখলামঃ জুমরা একটি পাথরের সরু স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাথরের স্তম্ভ কখনো শয়তান হতে পারে না, এটি কেবল প্রতীক চিহ্ন। রাজপথের কিনারায় যেমন প্রতি কিলো-মিটার দূরত্বে একটি পাথর বসান থাকে, সেই পাথরটি কখনই এক কিলোমিটার নয় বরং দূরত্ব জ্ঞাপক—পাথরের সরু স্তম্ভটিও তাই। লক্ষ্য করলাম মানুষ উন্মাদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে সেই প্রতীক

স্তম্ভে পাথর মারছে, যেন এটিই সাক্ষাৎ শয়তান। কেউ কেউ আবার এমনই ক্রোধান্ধ হয়ে উঠছেন যে কাঁকর মেরে রাগ মিটছে না বলে দেহ ও মনের উত্তাপ ঝরাবার জন্যে তাঁরা পায়ের চপ্পল খুলে অনায়াসে কামান দাগার মত গোলা ছুঁড়ছেন। জুমরার তলদেশে কাঁকরের স্তূপের উপর বেশ কিছু চপ্পলও জমা হয়ে আছে দেখেছি। বলাই বাহুল্য রমী করা অর্থাৎ কাঁকর মারার মূল উদ্দেশ্য এতে সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে এবং অন্তরের শয়তানকে তাড়াতে এসে তাঁরা নিজেরাই সম্পূর্ণ রূপে শয়তান কবলিত হয়ে পড়েন।

কোথায় দাঁড়িয়ে কেমন ভাবে কাঁকর মারব জুমরায়? একটি সহি হাদিসের উল্লেখ করিঃ "তিনি জুমরাতুল কুবরার (আকাবা) নিকট এলেন এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দিককে বামে আর মিনার দিককে ডাইনে রেখে তার উপর (জুমরার উপর) সাতটি কাঁকর মারলেন, প্রত্যেক কাঁকরের সাথে বললেন আল্লাহু আকবার (বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার)।" বর্ণনায়ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা, মিশকাত শরীফ, কাঁকর মারা অধ্যায়, ২৫০৪।

এখানে আর একটি বিষয়কে আমরা পরিষ্কার করে নিতে চাইঃ রসূলুল্লাহ স ঃ কোন্ দিন কখন কোন জুমরায় কাঁকর নিক্ষেপ করেছিলেন? অর্থাৎ কাঁকর মারার উত্তম সময় কোনটি। মিশকাত শরীফ থেকে আরো একটি সহি হাদিসের উদ্ধৃতি দিইঃ "'ঈদের দিনে (রসূলুল্লাহ স) জুমরায় (জুমরাতুল আকাবায়) কাঁকর মেরেছেন সকাল বেলা আর এর পর (পরের দিনগুলিতে) মেরেছেন সূর্য ঢলে যাওয়ার পর।" বর্ণনায় হযরত জাবের রা, ২৫০৩।

এই হাদিস থেকে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারছি যে প্রথম দিনে কেবল জুমরাতুল আকাবাতে কাঁকর মারতে হবে মধ্যাহ্নের পূর্বে আর পরের দিনগুলিতে তিন জুমরাতেই মারতে হবে মধ্যাহ্নের পরে। অবশ্য যদি কোন বিপত্তি বা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় তা হলে অন্য কথা।

কাঁকর মেরে ফেরার পথে দেখলাম মানুষের একটা অস্বাভাবিক

ভিড় ঢেউয়ের আকারে আন্দোলিত হতে হতে জুমরার দিকে এগিয়ে আসছে। সম্মুখের থেকে পিছনের ঢেউগুলি অধিকতর বিপুল, ভীষণতর উত্তাল। মাঝে মাঝে সেই প্রচণ্ড ভিড়ের পথ করে দেবার জন্যে আমি পার্শ্বের রেলিং সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। নিশ্চিত জানতাম এই গর্জনমুখর তরঙ্গমালার সম্মুখে পড়লে আমার আর কোন চিহ্ন থাকবে না। বলা যেতে পারে সামান্য কিছু পূর্বে এসে আমি রক্ষা পেয়েছি, আল্লাহ আমায় রক্ষা করেছেন!

কিছুদূর এগিয়ে এসে এই তরঙ্গ সংকুল উত্তাল সমুদ্রের মাঝে আর এক ঘূর্ণিঝড় প্রত্যক্ষ করলাম। প্রায় দশ-পনের হাজার ইরানী তীর্থযাত্রী এই দুর্গম পথের অনেকটা অংশ জুড়ে কলকাতার 'জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ' ধরনের মিছিল করে গগনবিদারী শব্দে মিনার মরু ও আকাশকে প্রকম্পিত করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। সাধারণতঃ কোথাও একটু কিছু গোলযোগের সূত্রপাত হলেই আমি সে পথ এড়িয়ে চলি। খুমাইনীর ব্যাপার নিয়ে তখন ইরানের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলকালাম কাণ্ড চলছিল। ১৯৭৯-তে কাবায় ঘটে যাওয়া মারাত্মক ঘটনার কথা তখনো কেউ ভুলতে পারেনি। তার মাঝে ইরানীদের এই ধরনের কাণ্ড! আজ জুমরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপের দিন এবং যতক্ষণ না তা নিক্ষেপিত হচ্ছে ততক্ষণ তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠ থেকে অন্য কোন কথা নয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি নামার মত কেবল নির্গত হতে থাকবে তালবিয়ার অমৃতধারা কিন্তু ইরানীদের কণ্ঠে কোথায় সেই বিনীত সক্রন্দন উচ্চারণঃ লাব্বায়েক, আল্লাহহুম্মা লাব্বায়েক,...রসূলুল্লাহ স-এর নির্দেশকে অমান্য করে তারা মিনার পবিত্র ধূলিকণায় রাজনীতি আমদানী করছেন মনে হয়। ঠিক আমার পাশেই যে ইরানী চলছেন, কান পেতে শুনলাম তিনি বলছেনঃ আত্ তাহাতো, আত্ তাহাতো। একজন মূলবক্তা 'আমাদের দাবী' উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মিছিলের সকলে যেমন সমস্বরে 'মানতে হবে মানতে হবে' বলে চিৎকার করে ওঠেন ঠিক তেমনি বহুদূর থেকে একব্যক্তি ইরানী অথবা আরবীতে কিছু বক্তব্য রাখছেন আর মিছিলের সকলে একস্বরে উচ্চারণ

করছেনঃ 'আত্‌তাহাতো, আত্‌তাহাতো।' তাঁদের এই বলায় একটি ছন্দ ও সুর ছিল। সেদিন বহুক্ষণ শব্দটা আমার মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে বেড়াল,কখনো মনে হয় এই বুঝি শব্দটার মূল চেহারা আমার সামনে ফুটে উঠেছে কিন্তু না পরক্ষণে আবার তা কুয়াশার ভিতর মিলিয়ে যাচ্ছে। অবশেষে মেঘের ভিতর থেকে লুকোচুরি খেলতে খেলতে এক সময় চাঁদ সুস্পষ্ট রূপে ধরা দিলঃ আত্‌ তাহাতো আত্‌ তাহাতো নয়, শব্দটা হল আশ্‌শাহাদো আশ্‌শাহাদো —আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি। সেদিন তাঁরা কিসের সাক্ষী দিচ্ছিলেন তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাইনি, কিন্তু মহাহজ নিয়ে তাঁদের এই রাজনীতি করাকে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণাই করেছিলাম। পরে শুনেছি, হজে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষ একত্রিত হন, এই বিশাল সমাবেশে ইরানের বিপ্লবী সরকারের মৌলিক বক্তব্যগুলি নিখিল বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়াই হল এর উদ্দেশ্য। একদিন পবিত্র কাবা প্রাচীরের পাদদেশে, বাবে আবদুল আজীজের পাশে ইরানীদের সমবেত হতে দেখেছিলাম কিন্তু এদের এই রাজনৈতিক তৎপরতার দিকে কেউ এতটুকু নজর দিয়েছেন বলে আমার মনে হয়নি।

মিনায় আর একটি দেশের নীরব পরিচ্ছন্ন প্রচারের দিকে আমি একান্ত আন্তরিকভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তাঁদের প্রতি আমার সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জেগেছিল। হোক না পৃথিবীর দরিদ্রতম রাষ্ট্র বাংলাদেশ (সত্যই কি তাই?), তবুও তাঁদের কর্মতৎপরতায় এমনই আপ্লুত হয়ে পড়েছিলাম যে বায়তুল্লায় ফিরে আমি এই রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় হজ অফিসে গিয়ে মুবারকবাদ জানিয়ে এসেছিলাম। মিনার যে এলাকায় আমরা অবস্থান করছিলাম তার চারপাশে দেখি বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে। একদিন বিকেলে ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর থেকে লক্ষ্য করলাম মিনার বেশ কিছুটা এলাকা জুড়ে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা সগর্বে উড্ডীন। জুমরায় যাতায়াতের পথেও লক্ষ্য করেছি এ'রা পতাকা উড়াতে উড়াতে সেই অসম্ভব ভিড়ের মধ্যেও নিজেদের চিহ্নিত করে পথ হাঁটছেন। এটা কম কথা

নয়। এতে এক সঙ্গে কাজ হয়েছে দুটিঃ জাতীয় পতাকার জন্যে স্বদেশের নাম ছড়িয়ে গেছে বিশ্ব মহলে এবং খোঁজ নিয়ে দেখেছি অন্যান্য দেশের বোধসম্পন্ন মানুষেরা এটাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, সবচেয়ে বড় কথা এ জন্যে কোন বাংলাদেশীকে ইরানীদের মত 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' করতে হয়নি। আর দ্বিতীয় বড় সুবিধা হয়েছে এই যে, কোন লোক হারিয়ে গেলে দূর থেকে স্বদেশের পতাকার নিশানা ধরে পুনর্মিলিত হতে পেরেছেন অনতিবিলম্বে। যেখানে ভারতীয়দের পথ হারিয়ে তাঁবুতে ফেরার জন্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাগলের মত অলিগলি ঘুরতে দেখেছি, পথহারান অন্যান্য রাষ্ট্রের তীর্থযাত্রীরাও মিনার গোলক ধাঁধায় ঘুরেছেন অনবরত, বাংলাদেশীরা সেখানে মাত্র পাঁচ মিনিটে তাঁবুতে ফিরেছেন। আমি আবার স্বীকার করব ১৯৮২-র হজ মরশুমে বাংলাদেশ সরকার যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, পৃথিবীর তাবৎ রাষ্ট্রের কাছে তা অনুকরণীয় হয়ে রইল।

ধূলি ধূসর দেহ, স্নানহীন রুক্ষ শরীর, বিরামহীন শ্রমের অসম্ভব ক্লান্তি, এর উপর বারুদ হয়ে ওঠা আকাশ আর মিনার তামাটে বিস্তার—সব মিলিয়ে একটা ভয়ংকর অস্বস্তিকর অবস্থা। নিতান্ত আল্লাহ মেহেরবান না হলে আমার মত একজন দুর্বল মানুষের পক্ষে এসব কোন কিছু সম্পন্ন করা আদৌ সম্ভব হত না। সেই মধ্যাহ্ন মরুর আগুন মাথায় নিয়ে এবং সেই বারুদের উপর পা ফেলে রমি করে যখন তাঁবুতে ফিরলাম, ঠিক বারটা। দশ মিনিটের মত বিশ্রাম, বিশ্রাম ঠিক নয়—স্ত্রী-ই বসিয়ে রাখলেন এই দশ মিনিট, বসিয়ে রমি করার পুরো ইতিবৃত্তটা শুনলেন। ইতিমধ্যে একটি গরুতে সাতটা ভাগীও ঠিক হয়ে গেল। তারপর আর অপেক্ষা না করে সঙ্গীদের নিয়ে সদলে কুরবানী গা-র উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

সেই বারুদ, সেই আগুন বিছান পথ। পথটিও কম দীর্ঘ নয়; প্রায় তিন কিলোমিটার। মনের মধ্যে ডুবুরী নামিয়ে উপলব্ধি করলাম অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমি এই কঠিন পথ পরিক্রমা করছি। স্ফুটমান কুসুমকলির ভিতর থেকে সৌরভ ও সৌন্দর্য

নির্গমনের উঁকিঝুঁকির মত অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে এক প্রবল আনন্দের উদ্বেলিত তরঙ্গ নিরন্তর প্রকাশের ব্যাকুলতায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। সেই আনন্দ কখনো দুকূল প্লাবি উচ্ছ্বাসে উদ্বেল, কখনো বা ভোরের সমুদ্রের মত প্রশান্ত—তৃপ্তিতে গভীর, পূর্ণতায় পর্যাপ্ত। এই আনন্দের উৎস কি? অগ্নিক্ষরা এই দুঃসহ মরুর মধ্যে এই প্রশান্তির উৎস কোথায়? মনের বিশাল উপবন তছনছ করে উত্তর খুঁজে বেড়ালামঃ কেউ যদি স্ফীত অর্থের বিনিময়ে এই পথে নামিয়ে দিত তা হলে কি আমি এ পথ হাঁটতাম? এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ দিওয়ানার মত ছুটে চলেছে সে কার জন্যে? কোন মহা আকর্ষণ এমন ভাবে উন্মনা করেছে তাদের? পূর্ব দিগন্তে সূর্য ওঠার মত এক পরম সত্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মনঃ আজ আমি চলেছি কুরবানী দিতে (কুরবান এই আরবী শব্দের অর্থ উৎসর্গ), নিজেকে সেই পরম সত্যে কুরবান করতে, নিবেদন করতে—এই কুরবানী এই উৎসর্গ এই নিবেদনের মাধ্যমে ত আল্লাহর নৈকট্য চাই, তাঁর ভালবাসা চাই, তাঁর প্রসন্নতা চাই। সুতরাং আমার এই পথ হাঁটা এও কুরবানীর অংশ আত্মনিবেদনের অংশ, তাঁর নৈকট্য-লাভের প্রাথমিক প্রয়াস। এ পথ তাই আজ কুসুমাস্তীর্ণ, জান্নাতি সুখাবেশে মনে এমন আন্দোলন, মরুর দাবদাহ তাই গাত্রচর্ম স্পর্শ করেই নিভে যাচ্ছে বার বার, উল্লাসে দেহমন উত্তাল। এ যাত্রা নিছক পথ হাঁটা নয়—প্রভুর সান্নিধ্যলাভের জন্যে অনন্ত অভিসার।

প্রাচীর ঘেরা কুরবানীর সুবিশাল এলাকায় হাজির হয়ে আমি পবিত্র সেই ঐতিহাসিক স্থানটি প্রত্যক্ষ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলাম। কোথায় সেই পুণ্য মৃত্তিকা যেখানে প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাইলকে শায়িত করে তাঁর কণ্ঠে মুবারকে খঞ্জ চালাতে উদ্যত হয়েছিলেন হযরত ইবরাহিম আ? কুরবানীর সেই পবিত্র স্থানটি কোথায়? পথ হাঁটি, প্রশ্নে জিজ্ঞাসায় মন উথাল-পাতাল। সংগীদের জিজ্ঞেস করি, তাঁরা অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এই প্রখর রৌদ্রে মস্তিষ্ক ঠিক আছে কিনা এমনতর প্রশ্নও হয়ত কারো মনে উঁকি দিয়ে থাকবে। অবশেষে একজন সংগী উদাস

ভংগীতে উত্তর দিলেনঃ কে জানে কোথায়, তবে এই মিনাতেই হবে—এলাকাটা ত কম নয়। আমি এঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম, এঁদের প্রশ্ন করে যে বিব্রত করেছি তা ভালভাবে উপলব্ধি করলাম। প্রথম কুরবানীর পবিত্র স্থানটি প্রত্যক্ষ করার চেয়ে হৃষ্টপুষ্ট একটি গরু বা উট ক্রয় করার দিকে এঁরা এই মুহূর্তে অনেক বেশি মনোযোগী।

ইতিহাস সাক্ষী দিচ্ছে সবির পর্বতের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে সেই স্থানটি অবস্থিত। সবির পর্বত ত মুযদালিফায়, অবশ্য এই পর্বত থেকেই মিনার এলাকা শুরু। তবে কি এই পর্বত মুযদালিফা থেকে জুমরাতুল আকাবা পর্যন্ত বিস্তৃত? হতে পারে। কেননা পরে মক্কা শরীফে এসে শুনেছি এই ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি জুমরাগুলি থেকে বেশি দূরে নয় এবং সেখানেও এক বিশাল কুরবানীর গাহ্ গড়ে উঠেছে। মিনার চারদিকেই কুরবানী দেবার ঢালাও ব্যবস্থা রয়েছে আর আমরা কুরবানী দিয়েছিলাম জুমরা থেকে বহুদূরে, জুমরার বিপরীত দিকের প্রাচীর বেষ্টিত এক প্রান্তরে। সুতরাং এই ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানটি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। হজ্জ মৌসুমের প্রচণ্ডতা কমে এলে এক নিরিবিলি সময় এসে প্রাণ ভরে এই সকল দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে যাব ভেবেছিলাম কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

কুরবানীর জায়গায় এসে অবাক হয়ে গেলাম। এতখানি দুর্লভ বিস্ময় যে অমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে তা জানা ছিল না। নির্দিষ্ট এলাকায় প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম কয়েক হাজার পশু জবাই হয়ে পড়ে আছে, অধিকাংশ আবার একটির উপর একটি। এই সব কুরবানী করা দুম্বা বকরী তল করে মাড়িয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে অনেকটা দূরে। যেতে যেতে দেখলাম মিনা আজ রক্তস্রোতে সত্যই 'মিনা' (প্রবাহিত) হয়ে উঠেছে। যাঁরা কুরবানী দিয়েছেন, কেউ কেউ দু-একটা রান ছাড়িয়ে কেটে নিয়ে গেছেন, কেউ বা সিনাহ্ থেকে নিয়েছেন কিছুটা গোশত, বাদ বাকি সবটাই পড়ে আছে। অসংখ্য খাসি উট দুম্বা গরু মেষ একেবারেই অক্ষত, কুরবানীর চিহ্ন

ছাড়া তাদের অঙ্গে আর কোন ক্ষত নেই। আগে এই সব লক্ষ লক্ষ কুরবানীর পশুকে মরুভূমির মৃত্তিকায় চাপা দেওয়া হত, মাঝে কিছুদিন অতি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুত শক্তির সাহায্যে পুড়িয়ে ছাই করা হয়েছে, বর্তমানে শুনেছি বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক পদ্ধতিতে চামড়া গোশত সবটুকু কাজে লাগান হচ্ছে, টন টন গোশত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে টিনজাত হচ্ছে এবং সৌদি সরকার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সময় সময় সেগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন দরিদ্র মুসলিম দেশগুলিতে প্রেরণ করছেন।

পাথরের উপর পা রেখে হাঁটা যায় কিন্তু মরা পশুর উপর পদ-চারণা সে এক ভয়ংকর ব্যাপার। চামড়ার উপর পা দিয়ে বহুবার পিছলে পড়তে পড়তে টাল সামলে এবং বার কয়েক আছাড় খেয়ে হাত-পায়ে রক্ত মাখামাখি হয়ে অবশেষে আমি কুরবানীর এলাকা পার হয়ে মুক্ত মাটিতে পা রাখলাম। সম্মুখে ভীষণ জটলা, হাজার হাজার গরু ভেড়া দুম্বা বকরী কেনা বেচা হচ্ছে। সে এক এলাহি কাণ্ড! চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কত? সীমা সংখ্যা নেই। কারা নিয়ে আসছেন, কোত্থেকে আমদানি হচ্ছে কিছুই বোঝার উপায় নেই কিন্তু প্রয়োজন এবং আমদানির মধ্যে একটি সমতা বজায় থাকছে সকল সময়। সমগ্র সৌদি আরবে খনিজ সম্পদের পর পশু পালন তাই আজও লাভজনক ব্যবসা।

সেই ভীষণ জটলার সামনে অসংখ্য ক্রেতা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দামদস্তুর মিটে গেলেই কুরবানী দেবার লোক প্রস্তুত হয়ে এগিয়ে আসবেন। এ'রা কষাই, কুরবানীর দিনগুলিতে কুরবানীও করেন। কালো মিশমিশে, সম্ভবতঃ হাবশী অথবা নাইজেরিয়ান। যে মানুষগুলিকে আমি দেখলাম, তাদের দেখে আদৌ মনে শ্রদ্ধা জাগে না। রক্ত মাখামাখি দেহ, অযু আছে বলেও মনে হল না, তা ছাড়া এ'রা কুরবানীর নিয়েত জানেন বলে আমার ঘুনাক্ষরেও মনে হয়নি। সব চেয়ে আপত্তি উঠতে পারে এ'দের কুরবানী দেবার পদ্ধতিতে। দামদস্তুর মিটে গেলে কুরবানীর পশুটি এই লোকগুলির হাওলায় চলে যায়, তারা কান ধরে হিড়হিড় করে

টানতে টানতে এনে কখনো ফাঁকা জমিনে, অধিকাংশ সময় কুরবানী দেওয়া পশুর উপরেই ফেলে দেয় এবং মুহূর্তকাল অপেক্ষা করে গলায় ছুরি চালাতে শুরু করে। জবাই শেষ হল কি না হল, কুরবানীর পশু ছেড়ে দিয়ে তারা পারিশ্রমিকের জন্য হাত বাড়ায়। মর্মান্তিক ভাবে লক্ষ্য করলাম একটি বকরী সম্পূর্ণ জবেহ হয়নি, সেই অবস্থায় তাকে ফেলে দিয়ে দুজন কষাই পারিশ্রমিকের জন্য ছুটে এসে মালিককে পাকড়াও করেছে এবং নির্মমভাবে দর কষাকষি করছে। এদিকে আধজবাই হওয়া বকরীটি তার রক্তাক্ত ঘাড় তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। এ এক রকম পাশবিকতা, এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। তা ছাড়া এই লোকগুলি কুরবানীর সময় নিয়েত ত দূরের কথা 'বিসমিল্লাহে আল্লাহহু আকবর' এই কথাগুলিও উচ্চারণ করে বলে আমার মনে হয়নি। অবশ্যই সত্যমিথ্যা আল্লাহই ভাল জানেন। ইসলামের সম্প্রসারণ এবং হজের নানাবিধ উন্নতি কল্পে সৌদি সরকার প্রাণপাত করছেন, কুরবানীর ত্রুটি বিচ্যুতি নিরসনের ব্যাপারেও তাঁদের আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

আমি নিজে বকরী কিনলাম দুটি, আকারে মধ্যম নয়-ছোটই বলতে হবে, দাম পড়ল ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় দু হাজার টাকা। একটি স্ত্রীর জন্য অন্যটি আমার। এ দুটিকে আমরা 'দম' হিসেবে কুরবানী করব। হজের মধ্যে কখনো জ্ঞাতভাবে কখনো অজ্ঞাত অবস্থায় নানান দোষ ত্রুটি ঘটে যায়। সেই দোষ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হিসেবে এই 'দম' কুরবানী। কুরবানী দেবার রকম সকম দেখে কষাইদের জিম্মায় ছেড়ে দিতে মন চাইল না, ঠিক করলাম আমি নিজ হাতেই কুরবানী দেব। সেই মত বকরীওয়ালা ছেলেটির সাহায্যে পশু দুটিকে একেবারে মুক্ত জমিনে নিয়ে এসে দাঁড়ালাম। সাত ভাগে যে গরুটি দেবার কথা হল, ভিড়ের মধ্যে গিয়ে তা কেনা এবং জবেহ করার ভার সঙ্গী এক মৌলভী সাহেবের উপর ছেড়ে দিলাম, বার বার অনুরোধ করলাম তিনি যেন নিজ হাতেই কুরবানী করেন।

কুরবানীর পশু হাতে নিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে চার পাশটা ফিরে তাকালাম, দেখলাম অসংখ্য কৌতূহলী চোখ আমার দিকে তাকিয়ে

আছে। এ'রা সকলেই কুরবানী দিতে এসেছেন কিন্তু কেউ নিজ হাতে কুরবানী করেননি। আমার মত এক হাজিকে মাঝ ময়দানে দেখে তাই এ'রা অনেকেই কিঞ্চিত কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন, কিছু মানুষ হয়ত শ্রদ্ধার চোখেও তাকিয়ে আছেন। কিন্তু এ'দের দৃষ্টিপাত কৌতুক বা শ্রদ্ধায় আমার কি এসে যায়। আল্লাহর আদেশ পালনের জন্যই আমি এই পুণ্যভূমিতে হাজির হয়েছি। বকরী দুটির দিকে সস্নেহে তাকালাম, গায় পিঠে গলায় হাত বুলিয়ে দিলাম কয়েকবার, আর কি আশ্চর্য সেই বধ্যভূমিতে আশ্চর্য দুটি মায়া ভরা হরিণ-চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল তারা। মুহূর্তে মমতায়-ভালবাসায় এই অবোধ পশু দুটির কাছে বাঁধা পড়ে গেলাম আমি। এক পলক তাকিয়ে থেকে তাদের কানে কানে যেন কথা কইলামঃ এখুনি মহান প্রভুর নামে কুরবানী করব তোমাদের, বল রাজি? অবোধ পশু দুটি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, যেমন পিতার জিজ্ঞাসায় সম্মতি জানিয়েছিলেন ইসমাইলঃ "হে আমার পিতা! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।" ৩৭ঃ১০২। ধীরে ধীরে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তাদের সাথে নিয়ে মাত্র কয়েক হাত দূরে একেবারে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। কুরবানীর পশুকে এভাবেই সঙ্গে আনা দরকার। পশুর প্রতি পুত্রাধিক স্নেহ থাকা প্রয়োজন। ইসমাইলকে বধ্যভূমিতে আনতে হযরত ইবরাহিমের হৃদয় ভালবাসায় মমতায় টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছিল। গ্রাম-গঞ্জে, কলকাতার পথঘাটে হাট-বাজার থেকে কুরবানীর পশু ক্রয় করে যেভাবে নির্মম প্রহার ও অত্যাচারের মাধ্যমে গৃহে আনা হয় তাতে মমতার এতটুকু চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ পাওয়া প্রয়োজন।

আমি নিজ হাতে কুরবানী করব এটা বুঝতে পেরে কিনারা থেকে এক হাজি সাহেব নেমে এলেন। তিনি একটি বকরীকে শুইয়ে ফেলে জবেহ করার উপযুক্ত করে ধরলেন। হাতে ছুরি নিয়ে নীচু হয়ে বিসমিল্লাহ বলে আমি প্রস্তুত। দেখলাম আমার হাত কাঁপছে।

এই সুন্দর ছোট্ট জীবনটাকে আমি হত্যা করব? সামান্য একটি বকরীর গলায় ছুরি চালাতে যদি এত দ্বিধা, হযরত ইবরাহিম আ কেমন করে নিজ হাতে পুত্রকে শুইয়ে খঞ্জর চালিয়েছিলেন তাঁর গলায়? দ্বিধা জাগে নি? হাত কাঁপেনি তাঁর? সামনে ছিল প্রভুর আদেশ। সেই আদেশে সব কিছু জয় করেছিলেন তিনি। আমার উপরেও ত সেই আদেশ বর্তমান। আল্লাহর আদেশের চেয়ে আর কোন কিছু বড় হতে পারে না, জীবন গেলেও না। প্রকৃতপক্ষে কুরবানী ত একটি পরীক্ষা ঃ "নিশ্চয়ই এ ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা।" ৩৭ঃ১০৬। এ পরীক্ষা, হল উৎসর্গের পরীক্ষা, সমর্পণের পরীক্ষা, নিবেদনের পরীক্ষা। এই কঠিন পরীক্ষায় হযরত ইবরাহিম আ সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেনঃ "হে ইবরাহিম! তুমি ত স্বপ্নাদেশ সত্যসত্যই পালন করলে।... অমি তার পরিবর্তে কুরবানীর জন্য এক হৃষ্টপুষ্ট জন্তু দিলাম।" ৩৭ঃ১০৫-১০৭। আমার মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কেটে গেল, বকরী ত বকরী— আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য এই মুহূর্তে আমি নিজেকেও কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। বিসমিল্লাহ বলে ছুরি ধরে বিনম্র কণ্ঠে উচ্চারণ করলামঃ ইন্না সালাতি অ নোসকি অ মাহইয়া"...নিশ্চয়ই আমার নামায আমার রোজা, আমার জীবন আমার মৃত্যু, আমার সকল কুরবানী বিশ্বনিখিলের প্রতিপালক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। একদিকে কঠিন হাতে আমি ছুরি চালাচ্ছি, আর একদিকে বিনীত কণ্ঠে নিজেকে নিবেদন করছি আল্লাহর কাছে। অশ্রুসজল চোখে কাতর কণ্ঠে নিজেকে সমর্পণ করে বলছি ঃ আমার যা কিছু শ্রেয় যা কিছু প্রিয় সকল কিছু আপনার কাছে উৎসর্গ করলাম। একদিকে রক্তপাত অন্যদিকে আত্মোৎসর্গ। রক্তপাতের মাধ্যমে অতুলনীয় এই আত্মনিবেদন। কুরবানী তাই নিছক জীব হত্যা নয়, আত্মোৎসর্গের এক মহান উদ্বোধন অনুষ্ঠান।

বেদনা ও পরিতাপের বিষয় অমুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য সঠিক অর্থ উপলব্ধি না করে এই মহান উৎসবকে

বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের দৃষ্টি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে বলে উৎসবের অন্তর্নিহিত মহান ভাবসত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম হন। ধৈর্য নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমে অনুধাবন করলে দেখতেন কুরবানী হল সর্বোতভাবে এক বিনীত আত্মসমর্পণ, এই মহান অনুষ্ঠান দিয়ে শুরু হয় আত্মোৎসর্গের উদ্বোধন পর্ব।

ত্যাগ ও সমর্পনের সঙ্গে বীরের ধর্মে দীক্ষা দেয় কুরবানী। কখনো বা সংসার জীবনে, কখনো বা জাতীয় সংকট মুহূর্তে যখন তখন যে কোন বিপর্যয় এসে যেতে পারে এবং সংঘর্ষের সেই মারাত্মক মুহূর্তে আমরা যেন ভেঙে না পড়ি, কাতর না হই। বিপর্যয় মুহূর্তে খুন-জখম দেখে বহুতর দুর্বল চিত্তের মানুষ এমনই ভীরু ও তটস্থ হয়ে পড়েন যে প্রতিরোধ করা ত দূরের কথা, তাঁদের দেহমনে প্রতিবাদ করার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত আর অবশিষ্ট থাকে না। এ জন্যে কুরবানীতে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা প্রতিটি মুসলমানদের স্বচক্ষে দেখা উচিত। এই পবিত্র রক্ত প্রবাহ, প্রবাহিত রুধির স্রোত মানুষের অগোচরে মানুষকে বীরোচিত ধৈর্য দীক্ষা দেয়, তার দেহ থেকে ভীরুতার খোলস ছাড়িয়ে ফেলে তাকে বীরের বর্মে সজ্জিত করে। সুতরাং কুরবানীর একদিকে আত্মসমর্পন অন্যদিকে আত্মসজ্জা, একদিকে ভক্তিপ্লুত বিনীত নিবেদন অন্যদিকে নবশক্তির বহ্নিমান উদ্বোধন। কুরবানীর মাধ্যমে ইসলাম তাই নতুন রূপে জিন্দা হয়ে ওঠে। সমর্পন ও জাগরণের এক আশ্চর্য উৎসব। পৃথিবীর কোন ধর্মে এমনটি দেখা যায় না।

আরো একটি প্রধান শিক্ষা আছে কুরবানীর মধ্যে। হযরত ইবরাহিম আ কুরবানী করার আগে প্রথমে কুরবানী করেছিলেন শয়তানী প্রলোভনকে, তাঁর রিপুকে। মানুষের মধ্যে যতক্ষণ পঞ্চ-রিপু প্রবল থাকে, সমর্পন কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। আর মহান আল্লাহ পশুর গোশত বা রক্ত অপেক্ষা মানুষের ধর্মভীরুতাকে অনেক বেশী ভালবাসেনঃ "আল্লাহর কাছে ওদের গোশত পৌঁছায় না বরং পৌঁছায় তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা।" ২২ঃ৩৭। সুতরাং

আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভই যদি কুরবানীর উদ্দেশ্য হয় তা হলে পশু কুরবানীর সঙ্গে সঙ্গে সকলের উচিত সম্পূর্ণরূপে শয়তানী কুহক থেকে মুক্ত হওয়া, পঞ্চ রিপুকে কুরবানী করা।

মুসলিম শরীফের বিশুদ্ধ হাদিসে দেখতে পাচ্ছি বিদায় হজে রসূলুল্লাহ স নিজ হাতে কুরবানী করেছিলেন। একটি দুটি নয়, একশটি উটের মধ্যে পর পর তেষট্টিটি আপন হাতে কুরবানী কবার পর অন্যগুলি হযরত আলীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটি এক বিস্ময়কর হিম্মতের ব্যাপার। কুরবানী সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেক পশু থেকে কিছু কিছু গোশত নিয়ে একটি দেগে রান্নার নির্দেশ দিলেন। রান্না হলে তিনি এবং আলী দুজনে সেই গোশত খেলেন এবং শুরুয়া পান করলেন। সাহাবাদের মধ্যে গোশত বণ্টন করা হয়েছিল, তিনি তাঁদের বললেনঃ আজ তোমরা সকলে খাও আনন্দ কর. .

এই কথাগুলি সাধারণতঃ আমরাও বলে থাকিঃ খাও এবং মৌজ কর। এগুলি সাধারণ উচ্চারণ। কিন্তু তিনি এর পরও আরো কিছু কথা বললেন এবং সেই কথাগুলি হল প্রজ্ঞার কথা, আল্লাহর রসূলের উপযুক্ত কথাঃ তোমরা সকলে খাও আনন্দ কর এবং আল্লাহর এবাদত কর। বুখারী শরীফ।

খাও আনন্দ কর কিন্তু আল্লাহর কথা ভুলো না। মনে রেখঃ তোমার রোজা তোমার জীবন তোমার মৃত্যু তোমার উৎসর্গ তোমার কুরবানী সকল কিছু বিশ্বনিখিলের মহান প্রতিপালক আল্লার জন্য নিবেদিত।

১. কুরবানীর বিভিন্ন মসলা-মসায়েল সংক্রান্ত আরো কিছু সহি হাদিস আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম :

ক. তিনি (হযরত আলি) বলেছেন, রসূলুল্লাহ স আমাকে কুরবানী করার পর কুরবানীর পশুর আচ্ছাদন ও চামড়া সদকা করে দেবার আদেশ করেছেন। বুখারী শরীফ, ১৫৮৯।

খ. আলি রা থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) নবী স তাঁকে নিজের কুরবানীর পশুর পাশে থাকতে, তার সমস্ত গোশত

ব্রীজের তলদেশ থেকে বেরিয়ে আসা নদীটিকে যেমন হঠাৎ নতুন মনে হয়, কুরবানীর মহান ব্রতটি সমাপ্ত করে প্রাচীর বেষ্টিত সেই স্মৃতিমুখর স্থান থেকে বাইরে এসে নিজেকে তেমনি সম্পূর্ণ নতুন মনে হল। হজ হয়ে গেছে কাল, রমি করেছি সকালে, এইমাত্র সমাপ্ত হল কুরবানী—ভারমুক্ত এই আমি একেবারে যেন অন্য মানুষ। খুব হাল্কা মনে হচ্ছে, হাওয়ায় গাছের পাতা দুলে নেচে ওঠার মত উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছি। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই দেখতে পেলাম কয়েক সহস্র মানুষ খুর কাঁচি নিয়ে হাজি সাহেবদের মস্তক মুণ্ডনের কর্মে ভীষণ ব্যস্ত। আর কি আশ্চর্য, কেবল এইটুকু দৃষ্টিগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুকনো পাতা ঝরে পড়ার মত আমার দেহ থেকে মুহূর্তে উল্লাসেরা ঝরে গেল। আমার মধ্যে যে উদ্দাম অধীরতা জেগেছিল তার আর কোন চিহ্নই খুঁজে পেলাম না। উদ্দামতা কি উচ্ছৃঙখলতার পূর্বলক্ষণ? মহান আল্লাহ সেই অশুভ শক্তির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করলেন। ব্রীজের তলা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসা ধাবমান নদীটিকে দেখে নতুন মনে হলেও সে ত নতুন কিছু নয়—সে তার অবিছিন্ন ধারাবাহিক স্রোতধারারই পূর্বরূপ কুরবানী-গাহ্ থেকে বেরিয়ে এসে কর্তব্যের সফল সমাপ্তির আনন্দে

চামড়া ও জিন বণ্টন করে দিতে এবং (কশাইকে) পারিশ্রমিক হিসেবে তার গোশত থেকে কিছুই না দিতে আদেশ করেছিলেন। বু. শ. ১৫৯৯।

এই হাদিস থেকে জানা যাচ্ছে যে কুরবানীর গোশত কশাইকে তার কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না, আলাদা টাকা দিয়ে তার মজুরী মেটাতে হবে।

গ. জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা আমাদের কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খেতাম না। তাই নবী স এ ব্যাপারে আমাদের অনুমতি প্রদান করে বললেন, খাও এবং সঞ্চিত করেও রাখ। তাই আমরা খেলাম এবং জমা করেও রাখলাম। বু. শ, ১৬০১।

হঠাৎ উদ্দাম হয়ে ওঠার মুখে মনে হল আমিও ত অখন্ড জীবন প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বিচ্ছিন্ন হওয়া মানেই শেষ হয়ে যাওয়া। মূল প্রবাহ থেকে বিছিন্ন হলে নদীও ত মরে শেষ হয়ে যায়। মস্তক মুন্ডন, এহরাম খোলা, গোসল, ক্ষুধার্থ স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতের জন্য খাদ্য সংগ্রহ ছাড়াও এখুনিই আমাকে আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়াতে হবে জোহরের নামাযে। সুতরাং একজন মুসলমান কোন সময়ই কর্মবহুল কর্মসূচির আওতার বাইরে যেতে পারেন না। যিনি যান তিনি শয়তানী কুহকে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য রূপে উল্লাসে মত্ত হন আর এভাবে এবাদৎ থেকে দূরে সরে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যান।

কুরবানী-গাহ্ থেকে বাইরে এসে কয়েক মুহূর্ত আমি স্তব্ধ হয়ে মস্তক-মুন্ডন লক্ষ্য করলাম। অবাক-বিস্ময়ে দেখলাম মাত্র দেড়-দু মিনিটের মধ্যে কয়েক হাজার হাজি সাহেবের মস্তকের পবিত্র কেশদাম কেমন ভাবে মরুর ধূলায় লুটিয়ে বিছিয়ে পড়ছে, তাঁরা বেলমুন্ডা হচ্ছেন। ক্ষৌর কর্ম সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের শূন্য আসনে বসে যাচ্ছেন আবার কয়েক সহস্র হাজি সাহেব। দু মিনিটের মধ্যে নতুনদের জন্য স্থান শূন্য করে উঠে পড়ছেন তাঁরাও। এই-ই চলছে অবিরাম। আমি চুল না কেটে তাঁবুর দিকে পা বাড়ালাম।

এই মুহূর্তে মরুর সূর্য অসম্ভব রকম ক্রুদ্ধ, সে যেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তার প্রতিপক্ষ পৃথিবীকে শায়িত করে ফেলেছে, এখন তার বুকের উপর চড়ে বসে শেষ রসবিন্দুটুকু শোষণ করে তার অনন্ত পিপাসা নিবৃত্ত করছে। অল্প একটু হাওয়া ছিল, যদিও শুকনো হাওয়া—ধূলো থেকে আবর্জনাগুলোকে ঝাঁট দেবার মত গাত্রচর্মের উপরে কিলবিল করা তাপগুলোকে অনবরত সরিয়ে দিচ্ছিল কিছু-দূরে। হাওয়ায় অনেক সময় তাপেরা ঠিকমত জাঁকিয়ে বসতে পারে না।

মিনার একেবারে শেষ প্রান্ত ধরে ধীরে ধীরে একা পথ হাঁটছিলাম আমি। আমার বুবুক্ষু দৃষ্টিরা চার পাশের দৃশ্যাবলীর উপর

অনবরত ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। কত বড় সৌভাগ্য আমার যে আজ কুরবানী সমাপ্ত করে এই মহান প্রান্তরের উপর দিয়ে আহ্লাদয় তৃপ্ত ভরপুর মন নিয়ে একা একা হেঁটে চলেছি। শোকরিয়ায় কৃতজ্ঞতায় আমি বারে বারে নত হয়ে পড়ছিলাম, সুনীল আকাশের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি আমার ঘাড়টা ছোট হয়ে গেছে, শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে যেন দেহের ভিতরে বসে যাচ্ছে, আর আমি পাগলের মত কাঁদছি। কেন এমন হল? এ কি উল্লাসের ক্রন্দন? এ কি শ্রদ্ধার সজল অশ্রু? একি শোকরিয়ার বিনম্র আবে জমজম? অনেক সময় বিশেষ কোন উপলক্ষেরও প্রয়োজন হয় না, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা অনুভূতির উষ্ণ স্পর্শে কওসরের নির্ঝর হয়ে ঝরে পড়ে। কিছুই খাওয়া হয়নি, সঙ্গত কারণেই ক্ষুধার আগুন জ্বলছিল পেটে কিন্তু সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল আকণ্ঠ পিপাসা। এই সজল ছায়া স্নিগ্ধ বঙ্গ-পল্লীতে প্রচণ্ড ক্ষুধার সময় খাবারের বদলে এক গ্লাস পানি নিতান্তই অর্থ-হীন মনে হয় আর এমন সময় সম্ভবতঃ শুধু পানি পান করাও যায় না। কিন্তু মরুভূমিতে ক্ষুধা আর পিপাসা দুই স্বতন্ত্র ব্যাপার। অসম্ভব ক্ষুধিত মুহূর্তেও এক গ্লাস পানি সেখানে অমৃতের কাজ করে। দু রিয়েল দিয়ে পথ পার্শ্বের এক দোকান থেকে বরফ-শীতল প্লাস্টিকের এক বিরাট বোতল ভরা পানি কিনে নিলাম। মুখটা খুলে কয়েক ঢোক পান করতেই নিভন্ত প্রদীপ যেন নতুন তেজে জ্বলে উঠল। আশ্চর্য ক্ষুধার দাপাদাপিও যেন কিছু সময় স্তব্ধ হয়ে গেল একেবারে। বোতলের মুখ বন্ধ করে পানিটা আমি আমার প্রিয়জনের জন্য বয়ে নিয়ে এলাম তাঁবুতে। ফেরার পথে ভুল করে প্রায় দেড় কিলোমিটার পথ সেই সিদ্ধ হওয়া রোদে ঘোরাঘুরি করে যখন তাঁবুতে পোঁছালাম, নীরব জিজ্ঞাসায় স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন। তাঁর ব্যাকুল দৃষ্টিপাতে প্রশ্নগুলি এমন সরব হয়ে উঠেছিল, যেকেউ তা পড়ে নিতে পারতেন। মৃদু হেসে আমি উত্তর দিলাম, আল্লাহর ইচ্ছায় সব কাজ সুন্দর ভাবে সম্পূর্ণ হয়েছে, কুরবানীতে কোন অসুবিধা হয়নি।

উত্তরে আশ্বস্ত হওয়ার পর তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল, বুঝলাম

তিনি শোকরিয়া আদায় করছেন।

কালবিলম্ব করা চলে না আর, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে অনেক। হাত মুখ ধুয়ে অযু করে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে জোহরের নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত নামাযে মগ্ন হয়েছেন অনেক আগেই, সম্ভবতঃ কুরবানীর শুভ সংবাদটি শোনার জন্যেই তাঁরা আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করছিলেন।

আমাদের তাঁবুর মধ্যে কয়েকজন হাজি সাহেবকে দেখলাম সেফটি-রেজার দিয়ে নিজেরাই একে অন্যের চুল-দাড়ি কেটে দিচ্ছেন। ব্যাপারটি আমার ভাল লাগল। এতে কোন খরচ নেই, ঝামেলাও নেই। বিদেশে একটি রিয়েলের মূল্য অনেক। কুরবানী-গাহ্ থেকে ফিরে এসে আর একটি জিনিষ বিশেষ রূপে আমার চোখে পড়ল। দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে রান্নার নির্দিষ্ট এলাকায় বড় বড় দেগ চড়ে গেছে। চারদিকেই একটা উল্লাসের সাড়া। মিনার মাটিতে বসে কুরবানীর গোশত রান্না করে খাওয়ার জন্যে অনেকেই দেশ থেকে মশলাপাতি সঙ্গে করে এনেছিলেন। আজ এই মুহূর্তে বিশাল মিনার সমস্ত অলিগলি গোশত পাকানোর সুন্দর সুগন্ধে ম ম করছে। ডাইনে বামে সামনে পিছনে সকল দিকের আবহাওয়া আনন্দ-উৎসবের এক মধুর গুঞ্জণ ধ্বনিতে মুখরিত।

নামায থেকে ফারাগাত হয়ে একটি পাত্র হাতে দিয়ে স্ত্রী বললেন, কিছুই কি পাওয়া যাবে না—দেখুন না বেরিয়ে, কাল রাত থেকে ত কিছুই খান নি।

আবার সেই গা-পোড়া রোদ, ভাঁপ-ওঠা রাস্তা। মিনিট সাতেক ঘোরাঘুরি করে থালা বোঝাই গরম ভাত আর প্লেট ভরা গোশত নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম এক সময়। দু'জন বাংলাদেশী বিশাল দুটি দেগে ভাত আর একটি দেগে গোশত রান্না নিয়ে বিক্রি করছিলেন। মিনায় এই প্রথম ভাত দেখলাম। অসংখ্য লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাঁদের উপর। আরাফাতের দিন জবলে রহমতের মত অবস্থা আর কি। কেবল মানুষ আর মানুষ। কি করে ভাত নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম তা স্পষ্ট মনে নেই। স্ত্রী জায়গা প্রস্তুত

করলে আমরা তিন জনে খেতে বসলাম। আমাদের ঠিক পাশেই ছিলেন জোবেদা ফারুকি, জয়পুরের এই অসামান্যা গুণবতী মহিলার সঙ্গে আমাদের একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অত্যন্ত মিষ্টিভাষী, বিনম্র ব্যবহার, সকল সময় প্রসন্ন মুখ। খাবার সময় ইনি কিছু না কিছু আমাদের দিয়ে তবে ছাড়তেন। আর তাঁর সংগ্রহেও ছিল অদ্ভুত সব দ্রব্য সামগ্রী—চানাচুর কেক কিসমিস কমলা হালুয়া মোসাম্বি কলা অরেঞ্জ পাউডার অন্ততঃ আরো দশ রকম জিনিষ। এই মহিলাকে আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের সঙ্গী করে নিলাম। এবং একে সঙ্গে নিতে পেরে মনটাও বেশ প্রসন্ন হয়ে গেল। বিসমিল্লাহ বলে চার জনে খাওয়া শুরু করেছি, দেখি জয়পুরের আব এক দম্পতি—হাজি সাহেব এবং তাঁর স্ত্রী, বেশ লুব্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখে চোখ পড়তেই বললেন, ছালুন বহুত আচ্ছা পাকায়া, কাঁহাছে লায়া আপনে? বুঝলাম গোশতের সুন্দর গন্ধে তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন। তাঁদের আকুলতা লক্ষ্য করে একটি মন বলল, আমাদের খাবার থেকেই কিছু দিয়ে দিই ওদের। আর এক মন বাধা দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, আমাদেরও ত ক' ওয়াক্ত খাওয়া হয়নি ভাল করে। তা ছাড়া একজনকে ত দিলাম, আরো দিতে গেলে হয়ত নিজেরাই ফাঁক পড়ে যাব। শেষ পর্যন্ত সংকীর্ণ এই দ্বিতীয় মনেরই জয় হল, আমি অনুদার হয়ে গেলাম। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে হাসি মুখে প্রাপ্তিস্থানের হদিস দিলাম। এমন কি এ কথা বলে উৎসাহিত করলামঃ এই ত কয়েক পা—আপনি গেলেই পাবেন ,ফুরিয়ে যায়নি এখনো।

কি ক্ষতি হত যদি সকলের খাবার থেকে কিছু কিছু নিয়ে এই বৃদ্ধ হাজি সাহেবদের উপহার দিতাম। আমাদের খাবার না হয় কিছু কম হত—তাতে নিশ্চয়ই মারা যেতাম না। দিন যায় স্মৃতি জমে থাকে, কাটা জুড়ে যায় মনের ব্যথা সারে না। হজের অনেক গোপন ব্যথার মধ্যে এই ঘটনাটি অন্যতম একটি ব্যথা হয়ে আজো হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে জমা হয়ে আছে। অনেক সময় মানুষের মন বিশাল হতে হতে হঠাৎ কেন যে এমন সংকুচিত হয়ে যায়!

খাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার কিছু পরে তাঁবুর কয়েকজন সঙ্গীসহ স্ত্রী জুমরাতুল আকাবায় রমি করতে চলে গেলেন আর আমি সেই অসম্ভব তাপের মধ্যেই কিছু বিশ্রামের আশায় মরুশয্যা গ্রহণ করলাম। ও'রা কখন ফিরে এসেছিলেন জানিনা কিন্তু স্ত্রী যখন আমাকে ডেকে তুললেন, আসরের বেশি বাকি ছিল না। অতি দ্রুত অযু সেরে নামায পড়ে সেই পাটিতেই মগরিবের জন্য বসে রইলাম। জামাতে মগরিব ও এশা পড়ে কিছুক্ষণের জন্যে দুজনে জমজমাট মিনার অপরূপ নৈশ সৌন্দর্য উপভোগ করতে বেরুলাম। প্রকৃত-পক্ষে বিগত দু'দিনের কঠোর পরিশ্রম এবং অবিরাম রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে কোন কিছুতেই ভাল করে মন দিতে পারছিলাম না, তবুও একরকম নেশাগ্রস্থের মত ঘোরাঘুরি করছিলাম। ওদিকে আবার এক কাপ চায়ের জন্যে বসে আছেন হাশমি ইশরাত। মৃদু কণ্ঠে স্ত্রী শুধালেন, আর দেরি করা ঠিক হবে? এক দোকান থেকে প্লাস্টিকের পাত্রে তিন কাপ চা নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলাম আমরা। চায়ে চুমুক দিতে দিতেই বুঝলাম আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। বিকেলে সকলকে নিয়ে তওয়াফের জন্যে আল্ কাবায় যাবার কথা ছিল, তা হয়নি। হজের পর এই তওয়াফ জরুরী, অবশ্য কর্তব্য—এ তওয়াফ না হলে হজ সম্পূর্ণ হয় না। সেই কর্তব্যের কথা শেষ বারের মত সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলামঃ রাতের আঁধার মাথায় নিয়ে রওনা হতে হবে কাল, সুতরাং আজ আর অযথা কালক্ষেপ নয়। কথা বলতে বলতে ক্লান্ত শরীর, জীর্ণ হাত-পা নিয়ে মরুর বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। এমনি করে হজ পর্বের সব চেয়ে কর্মব্যস্ত এবং কঠিনতম দিনটি শেষ হয়ে গেল।

২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩২, মঙ্গলবার।

তাঁবুতে পাঁচ মিশেলি লোকের ভিড়। কারো রাতে ঘুম হয়, কারো হয় না, কারো বা প্রকৃতির ডাক পড়ে রাত তিনটে থেকে। সুতরাং বলা যেতে পারে অনিদ্রা এবং প্রকৃতি উভয় মিলে রাত তিনটের পর তাঁবুতে আত্মসচেতন আর কাউকে ঘুমুতে দেয় না।

আমাদেরও ঘুম ভাঙল। পাশমোড়া দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে হাই তুলে আলস্য ভেঙে উঠতে উঠতে পৌনে চারটে। অযু নামায সেরে সত্য সত্যই ভোরের অন্ধকার মাথায় নিয়েই আমরা আল্ মক্কা আল্ মোকাররমার উদ্দেশ্যে তাঁবু ত্যাগ করলাম। সস্ত্রীক প্যাটেলজীরাও আমাদের সঙ্গী হলেন। সামান্য পথ সঙ্গে থেকে তাঁরা আবার দলছুট হয়েও গেলেন। সকালে বেরিয়েছিলাম বলেই আমাদের যানবাহন পেতে কোন অসুবিধা হল না। হাইওয়েতে দাঁড়াতেই একটা প্রাইভেট গাড়ি পেয়ে গেলাম। ভোরের ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি হু হু শব্দে কাবার পথে এগিয়ে চলল।

কেন জানিনা মনটা আজ বড় উদাস। ভোরের এই আধা অন্ধকারে মসজিদুল হারাম এর দিকে অগ্রসর হচ্ছি অথচ পৃথিবী জোড়া কেমন একটা ঔদাসীন্য সমগ্র মনটাকে অধিকার করে বসে আছে। কদিনের অবিরাম ছোটাছুটি ও কর্মব্যস্ততার পর ক্লান্ত মানুষজন গাড়ি ঘোড়া পথঘাট সব যেন ঘুমিয়ে আছে। একটু পরে হয়ত জাগবে, ভিড় বাড়বে, কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হবে পথঘাট তখন এই উদাস মনটা কোন সুরে কথা কইবে আমি জানি না কিন্তু এখানকার এই নিরিবিলি মুহূর্তে সে ভীষণরকম একলা। পাহাড়ের পর পাহাড়, ফ্লাইওভারের পর ফ্লাইওভার অতিক্রম করে আমাদের গাড়ি দ্রুত মিনা ছেড়ে মক্কার দিকে এগুচ্ছে। পথঘাট ঠিক মত জানিনা তবুও মনে হল আমরা উত্তর দিক দিয়েই শহরের মধ্যে প্রবেশ করছি। উত্তরে প্রসারিত হয়ে গেছে মদিনার পথ। শহরে প্রবেশ করেও বুঝলাম মক্কা এখনো ঠিক মত জাগেনি, জনবিরল পথঘাট সব যেন খাঁ খাঁ করছে। একটা বিরাট ফাঁকা জায়গায় এসে আমার মনটাও হঠাৎ কেমন যেন মোচড় দিয়ে চমকে উঠে ভীষণ ব্যথাতুর হয়ে গেল। পথিপার্শ্বের সেই বিস্তীর্ণ ফাঁকা জায়গার দিকে লক্ষ্য করে হঠাৎ প্রশ্ন বেরিয়ে এল, এই কি সেই বিহ্বল বেদনাতুর জায়গা? এখানে বসেই কি প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে বিবি উম্মে সালেমা তাঁর প্রিয়তম স্বামীর জন্যে বুকফাটা ক্রন্দন করতেন? এই কি সেই উন্মুক্ত ঐতিহাসিক বেদনাস্তীর্ণ প্রান্তর?

এক মহৎ উপস্থিতির মত তাঁরা সকলেই ছিলেন, বিলীয়মান কর্পূরের গন্ধের মত আজ আমি তাঁদের সেই পবিত্র উপস্থিতির সমস্ত সৌরভ একান্ত করে অনুভব করতে পারছি। হিজরতের নির্দেশ প্রচারিত হয়েছে। অত্যাচারিত অন্ধকার থেকে আলোর পথের যাত্রীরা বেরিয়ে আসছেন একে একে, স্থির পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন মদিনার পথে। কালো রাত্রির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে এলেন ও'রাও—আবু সালেমা আর তাঁর স্ত্রী উম্মে সালেমা, বুকে নিয়ে এক শিশু সন্তান। মক্কার অলিগলি পার হয়ে অতিদ্রুত এগিয়ে চলছিল তাঁদের উট আর নিজেরা ভীত চকিত চাউনি মেলে চার দিক দেখতে দেখতে মহান আল্লাহর নাম স্মরণ করছিলেন ক্রমাগত। অকস্মাৎ এমনি এক উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁদের গতি রুদ্ধ হল। আবু সালেমার শ্বশুরকুলের পৌত্তলিক ক্রুদ্ধ স্বজনেরা সংবাদ পেয়ে ছুটে এল দ্রুতগামী চিতার মত। ভীষণ এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বিবি উম্মে সালেমা তখন এক হাতে শিশু অন্য হাতে স্বামীকে জড়িয়ে ধরেছেন প্রবল ব্যাকুলতায়। কিন্তু মুহূর্তকাল, তারপরই মূলছিন্ন লতার মত চকিতে স্বামীর বক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। আবু সালেমাকে শত্রুপক্ষ চিৎকার করে বললেঃ তুই মরতে জাহান্নামে যাচ্ছিস যা, আমাদের মেয়েকে যেতে দেব না তোর সঙ্গে। বিবি উম্মে সালেমা বুক ফাটা ক্রন্দনে ভেঙে পড়লেন, ঠিক সেই মুহূর্তে আবু সালেমার গোত্রের লোকেরা এসে হাজির, মুহূর্তে বাজ পাখির ক্ষিপ্রতায় সালেমার বুক থেকে শিশু সন্তানকে কেড়ে নিয়ে বললেঃ আমাদের একমাত্র বংশের বাতিকে কখনই তোর সঙ্গে জাহান্নামে যেতে দিতে পারি না।

আবু সালেমা উটের উপর। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি দেখছেন, স্ত্রী বুক ফাটা ক্রন্দন করছেন আর তার শ্বশুর কুলের লোকেরা তাঁকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছেন। শিশুটিও কাঁদছে, তাকে পিঠে ফেলে তাঁর স্বজনেরা মক্কার দিকে চলে গেল। সেই বিরল প্রান্তর এখন অপসৃয়মান করুণ ক্রন্দনের সুরে সজল হয়ে উঠেছে। আবু সালেমার চোখ দুটি অশ্রুতে ভরে উঠল। আকাশের দিকে মুখ তুলে

তিনি প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় হলেনঃ প্রভু! আমার সকল কুরবানী আপনাকে পাওয়ার জন্য। আপনি আমাকে সাহস দিন, শক্তি দিন, সকল কিছু সহ্য করে আপনার পথে এগিয়ে যাওয়ার বিশাল প্রাণ দিন।

ধন-সম্পদ তিনি পূর্বেই ত্যাগ করেছিলেন, এখন স্ত্রী সন্তানকেও উৎসর্গ করলেন আল্লাহর পথে, দীন-ইসলামের পথে। চোখ দুটি মুছে নিলেন, হাতের বলগা আন্দোলিত হল, উট এগিয়ে গেল মদিনার পথে।

এই সব আত্মনিবেদিত মহান সাহাবীদের কথা ভাবা যায় না। ঘরের বন্ধন নেই, সংসারের আকর্ষণ নেই—আল্লাহ প্রেম এবং রসূলের ভালবাসায় সব হেলায় পরিত্যাগ করে এই সব জিন্দাদিল সাহাবীরা এগিয়ে গিয়েছেন মঞ্জিলে মাকসাদের দিকে।

কিন্তু আলাদা করে দিলেই কি সব বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়? পৃথক হয়ে যায়? ফুলকে বৃন্তচ্যুত করা যায় ঠিকই কিন্তু পাপড়ি থেকে খোশবুকে কি বাস্তুচ্যুত করা সম্ভব? আবু সালেমার গোত্র আর তার শ্বশুরকুল মা এবং শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবলে আবু সালেমাকে খুব জব্দ করা গেল, কদিন তারা হাসি-মস্করা করে মনের সুখে কাটিয়েও দিলে কিন্তু এক পক্ষ কালের তিক্ত অভিজ্ঞতায় তারা উপলব্ধি করল, শিশুকে তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা যাবে না। সুতরাং এক শুভ প্রাতঃকালে মাতা ও সন্তানের মিলন হয়ে গেল। তবুও বিবি উম্মে সালেমার বুকের আগুন নেভে না, যন্ত্রণা বেড়েই চলে। যেখানে স্বামীর বুক থেকে তাঁকে ছিন্ন করা হয়েছিল, শেষ দিনালোকটুকু মিলিয়ে গেলে তিনি চলে আসেন সেখানে। সন্ধ্যার তরল অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সেই আবছায়ার ব্যথা ঢেলে করুণ ক্রন্দনে তিনি সমগ্র এলাকাকে ব্যথাতুর করে তোলেন। সেই করুণ ক্রন্দন শুনে অচেনা পথিকেরা থমকে দাঁড়ায়, অজানিতে তাঁদের চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। এক দিন, দু দিন—এমনি চলে দীর্ঘ এক বছর। মক্কার কোন কোন ঘর থেকে প্রতিবাদ ভেসে আসে, যাকে ধরে রাখার ধরতে পারলে না, যাকে শাস্তি দেবার সে বসে আছে মদিনায়—প্রাণে মারা হচ্ছে কেবল এই অবলা মেয়েটাকে। এ কেমন কথা। বিশেষ

করে উম্মে সালেমার এক খালাত ভাই এ ঘটনায় মর্মাহত হলেন। তিনি সকল রকম উদযোগ গ্রহণ করে তৎপরতার সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনকে বুঝিয়ে বলে-কয়ে উম্মে সালেমাকে একটি উটে করে মদিনায় পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। শিশু সন্তানকে বুকে নিয়ে কালবিলম্ব না করে বিবি উম্মে সালেমা উটে সওয়ার হয়ে একাকী মদিনার পথে যাত্রা করলেন। এই সুদীর্ঘ বিপদ সঙ্কুল পথে পাড়ি দেওয়া সম্পর্কে পরবর্তী কালে উম্মে সালেমা বলেছেনঃ দীর্ঘ মরুপথ, ঘন বিপদে ভরা। আমি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করিনি কোন ভয়ে আমি ভীত হইনি। এক আল্লাহর উপর ভরসা করে পথেবার হয়েছিলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাকে এমনতর শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, পথের সমুদয় বিপদে তিনিই আমাব সহায় হবেন, তিনিই আমাকে মদিনায় পেঁৗছে দেবেন।

প্রকৃতপক্ষে ঘটনাও ঘটেছিল প্রায় সেই রকম। শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে নিয়ে উটে চলেছেন উম্মে সালেমা, পথে উসমান ইবনে তালহার সঙ্গে দেখা। তিনিও এক পথিক। শুধালেন, কোথায় যাবেন? উম্মে সালেমা বললেন, মদিনায়। উসমান জিজ্ঞেস কবলেন, সংগে আর কে আছেন? নিঃশঙ্ক চিত্তে উম্মে সালেমা উত্তর দিলেন, আল্লাহ। উত্তর শুনে উসমান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই মহিলার অসামান্য আল্লাহ-নির্ভরতা এবং চিত্তের দৃঢ়তায় তিনি অবিশ্বাস্য-রকম বিস্ময়বোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই সংগে করে বিবি উম্মে সালেমাকে মদিনায় পেঁৗছে দিলেন। এমনি করে ইসলামের এক করুণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল।

এই বেদনা সজল প্রান্তর অতিক্রম করে আমাদের গাড়িটা কাবার পথে এগিয়ে চলল।

২৫.

মহাসাগরের অবিরাম আকর্ষণে খালবিল নদীনালা হু হু শব্দে ছুটে যায়, এক মহাজাগতিক দুর্নিবার আকর্ষণে আমরা তেমনি অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছি মহাকাবার দিকে। নানান প্রান্ত থেকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মহাকেন্দ্রের দিকে উন্মুখ হয়ে ছুটে আসছে। সূর্য ওঠার একটু পরেই ড্রাইভার আমাদের সকলকে বাবুল উমরায় নামিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। মিনা-আরাফাতের দিনগুলিতে এতটুকু বিশ্রাম থাকে না গাড়িগুলোর। আজ এবং আগামি কাল আরো দুটো দিন যাত্রী আনা নেওয়ার সমান চাপ থাকবে। তারপর থেকে চাপ কিছুটা কমে আসবে। শুনলাম এক একটি ট্যাক্সি-ড্রাইভার হজ মৌসুমে এক মাসে ভারতীয় মুদ্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকার অবিশ্বাস্য রকম আয় ঘরে তোলেন।

ভিতর ভিতর ভীষণ উতলা হয়ে পড়ছিলাম আমি। শুক্রবার রাতে মিনায় গিয়েছি আজ মঙ্গলবারের ভোর—তিনদিনেরও কিছু বেশী সময় কাবাকে দেখিনি। সুতরাং আর মুহূর্তকাল বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না। আমরা তিন জনে বাবুস সালামেব সুবিশাল দরজা পার হয়ে ধীরে ধীরে কাবায় প্রবেশ করলাম। প্রায় প্রথম দর্শনেব মত অজানিত পুলকে দেহমন আপ্লুত হয়ে গেল। মসজিদের অভ্যন্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হবার সময় বার বার থামে দৃষ্টি আড়াল হতে হতে যেই কালো গেলাফে ঢাকা উজ্জ্বল কাবায় চোখ পড়ল, আমি প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলামঃ আলহামদো লিল্লাহ্। আমার স্ত্রী খুশিতে কাঁপছিলেন। আবেগে উত্তেজনায় অশ্রুতে মাখামাখি হয়ে তিনিও উচ্চারণ করলেনঃ আলহামদো লিল্লাহ্। আর কি আশ্চর্য আমরা এতটুকু অগ্রসর না হয়ে সেখানেই কৃতজ্ঞতা জানাতে শুকরের নামাযে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। দু রাকাত নামায শেষ করে চত্বর পার হয়ে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম তওয়াফের রেখার উপর, এখান থেকেই তওয়াফ শুরু করতে হবে। স্ত্রীর বড়

সাধ তিনি আমার হাত ধরে পাশাপাশি এক সঙ্গে আজকের এই তওয়াফ করবেন, কথাটি বার বার বহু প্রসঙ্গে বলে রেখেছিলেন, সুতরাং তাঁর আকাঙখানুযায়ী আমরা এক সঙ্গে তওয়াফ শুরু করলাম। তখন তওয়াফে বিশেষ ভিড় ছিল না। আল্লাহর নাম করে সবেমাত্র আল্লাহর ঘরের প্রদক্ষিণ শুরু করেছি, কত কথা এক সঙ্গে মনের আকাশে ডানা মেলে উড়ে এলঃ এই ত সাফা পর্বত যেখানে পাষাণ আবুজেহেল পাথর মেরে রসুলুল্লাহ স-এর কপাল থেকে দরবিগলিত ধারায় রক্ত প্রবাহিত করে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়েছিল, এই ত সেই কাবা যেখানে সিজদানত মুস্তাফা স-এব পিঠের উপর উটের গলিত বিশাল ভুঁড়ি ও মল চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এই ত সেই কাবা যেখানে পিছন হতে অতর্কিতে আল্লাহব রসুলের গলায় ফাঁস লাগিয়ে ক্রমাগত পাক দিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে আবু তালিবের এতিমকে চিরদিনের মত ধবা পৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেবার সকল রকম নিষ্ঠুর তৎপরতা চালান হয়েছিল। এ সব কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুকটা মোচড় দিয়ে দু চোখে হু হু শব্দে বন্যার প্রবাহ মুক্তি পেল। আমি কাঁদতে শুরু করলাম—কখনো ডাক ছেড়ে. কখনো বা চাপা দুর্বোধ্য শব্দে, কখনো বা নীবব শান্ত ধারায়। স্ত্রীও কাঁদতে শুরু করলেন এবং কাঁদতেই থাকলেন। কাবা যেন ক্রন্দনের এক বিশাল উৎস কেন্দ্র।

তওয়াফ করছি, আমার হাত ধরে আমার পাশে পাশে বিনম্র পদ সঞ্চারে এগুচ্ছেন আমার স্ত্রী। এক বিনীত আত্মসমর্পণের উতল আবেগে এই মুহূর্তে আমরা জগৎ-সংসার বিশ্বভুবন থেকে একেবারে পৃথক হয়ে পড়েছি। অশ্রুসজল কণ্ঠে বললামঃ লাব্বায়েক। প্রভু এই ত আমরা হাজির। হজের সব ত্রুটি সব অসম্পূর্ণতাকে ক্ষমা করে দীন দাসের পক্ষ থেকে আপনি তাকে কবুল করুন। জানি কোন অবস্থাতেই আমাদের এই ভাঙাচোরা আহত জীর্ণ হজ কবুল হবার নয় কিন্তু প্রভু আমরা ত আপনার অনন্ত রহমতের প্রত্যাশায় উন্মুখ। তওয়াফের মাঝে আমাদের যত সংগী সাথী বন্ধু-বান্ধব সকলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও মঙ্গল

চেয়ে নিলাম। একসময় বললামঃ প্রভু! আমরা দু জনে আপনার অনন্ত অনুগ্রহে জীবনের এতটা পথ পরিক্রমা করে চলে এসেছি, আর কটা দিনই বা বাকি—এই দিনগুলিও যেন প্রেমপ্রীতি হার্দ্র নিবিড়তায় এমন করে কাটিয়ে দিয়ে হাসি মুখে আপনার কাছে চলে যেতে পারি।

অসম্ভব কান্নাকাটির ভিতর দিয়ে এক সময় আমাদের তওয়াফ শেষ হয়ে গেল। মাকামে ইবরাহিমের পাশে বসে দু রাকাত ওয়াজেব এ তওয়াফ নামায এবং মুনাযাতের পর আমরা চলে এলাম আল সাফায়, এখান থেকেই শুরু হবে সাফা-মারওয়া সায়ী—সাত বার যাওয়া-আসা। দীর্ঘ পথ, এ পথে চলতে চলতে সকলের মুখে একটি শব্দই শুনতে পেলাম, আল্লাহ্। আবাল বৃদ্ধ বনিতারা সায়ী করছেন আর তালে তালে উচ্চারণ করছেন আল্লাহ্! আল্লাহ্!! আর এই শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে বিশাল সাফা পর্বতের প্রতিটি রেণুতে যেন ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। পাহাড়ী পাথর আজ পুষ্পের সুবাসিত কোমল পাপড়ি। অথচ একদিন এই সাফা পাহাড়ে একের পর এক কি ভয়ংকর পাশবিক ঘটনাগুলিই না ঘটে গিয়েছে।

একদিন প্রাতে সাফা-শীর্ষে উঠেছেন রসুলুল্লাহ্। ইসলাম প্রচারের একেবারে প্রাথমিক যুগ তখন। নিয়ম ছিল কোন মারাত্মক বিপদের সম্ভাবনা থাকলে, কোন জরুরী ঘোষণা থাকলে এই পাহাড়ে উঠে বিশেষ কয়েকটি শব্দ উচ্চারণ করলেই মক্কাবাসীরা সকলে সকল কাজ ফেলে সাফার পাদদেশে সমবেত হতেন। রসুলুল্লাহ্র আহ্বানেও যথাসময় সকলে সমবেত হলে তিনি সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যদি বলি এই পাহাড়ের বিপরীত দিকে একদল সুসজ্জিত শত্রুসৈন্য আক্রমণ ও যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে তা হলে আপনারা কি তা বিশ্বাস করবেন? সমবেত সকল কুরেশ ও মক্কাবাসীরা বলল, হে আল আমীন! হে আমাদের প্রিয় সত্যবাদী—হ্যাঁ আমরা নিশ্চয়ই তোমার কথা বিশ্বাস করব, কেন না আজ পর্যন্ত আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী রূপে পাইনি। রসুলুল্লাহ তখন উদাত্ত স্বরে সকলকে আহ্বান জানালেনঃ হে আব্দুল মোত্তালেবের বংশধরগণ! হে আব্দে মোনাফের বংশধরগণ!

হে জোহরার বংশধরগণ! আমি তোমাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ দেখাতে এসেছি। তোমরা প্রতিমা পূজা ত্যাগ কর, এক আল্লাহর উপাসনা কর, তা হলেই আলো পাবে—অন্ধকার দূর হবে। এতটুকু শুনেই ইসলামের চিরশত্রু ক্রুদ্ধ আবুলাহাব চিৎকার করে অভিশাপ দিল, তোর সর্বনাশ হোক! এ জন্যে তুই আমাদের এখানে ডেকেছিস। এসব কথা বলতে বলতে সে তার দলবল নিয়ে স্থান ত্যাগ করল।

সাফার নীরব গুহায় আল্লাহর এবাদতে মশগুল ছিলেন রসূলুল্লাহ, তন্ময় হয়ে জিকির করছিলেন আল্লাহর নাম—সেখানে হঠাৎ এল পাষাণ আবুজেহেল। আসার কথা নয়, এসে গেল। এসে সামনে পেল একা অসহায় মুস্তাফাকে। বিনা কারণে শুরু করল গালাগালি, তাতেও আল্লাহর রসূলকে অবিচল দেখে একটা পাথর তুলে নিক্ষেপ করল সজোরে, চিরদিনের মত আল্লাহর নামকে মিলিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল তার, হল না, প্রাণে বেঁচে গেলেন রসূলুল্লাহ। কিন্তু আহত হয়েছেন ভীষণ ভাবে, কপাল থেঁতো হয়ে হু হু করে রক্ত ঝরছে, সঙ্গে সঙ্গে রক্তে লাল হয়ে গেল সারা দেহ, ক্ষতস্থানে হাত চেপে বসে পড়লেন তিনি। দূরে দাঁড়িয়ে হায়েনার হাসি হাসছে আবুজেহেল, কই আল্লাহ আল্লাহ কর না এবার—আল্লাহ বলার সাধ মিটিয়ে দিই একেবারে!

এই সেই সাফা! আজ আল্লাহ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যায় না এখানে। এই মহান পবিত্র শব্দ এখান থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে কাবার বিশাল সুউচ্চ মিনার ছাপিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে নিখিল বিশ্বে, কোন শক্তি নেই তাকে বাধা দেয়, কোন শক্তি নেই তাকে প্রতিরোধ করে দাঁড়ায়।

এ পথ-পরিক্রমায় কতবার চোখ দুটি অশ্রুসজল হয়ে উঠল, কতবার সবার অলক্ষে মুছলাম! এক সময় সায়ী শেষ হল। বেরিয়ে এলাম কাবার বিশাল চত্বরে। কাবার তখন অন্যরূপ। এই এক ঘণ্টার মধ্যে কাবা প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। পলকে প্রলয়ের মত অবস্থা। সারা মিনা যেন এই এক ঘণ্টার মধ্যে কাবায় উঠে এসেছে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। সমগ্র চত্বর জুড়ে তওয়াফ শুরু

হয়েছে, সেখানেও লোক ধরে না, হাজার হাজার মানুষ দু তলার উপর দিয়ে তওয়াফ শুরু করেছেন এবং এই পথটি সাধারণ তওয়াফের পথরেখার অন্ততঃ বিশগুণ বেশি। এই পথে যাঁরা তওয়াফ করছেন তাঁদের আর কষ্টের শেষ নেই। আঁধার মাথায় নিয়ে মিনা থেকে বেরিয়ে এক ঘণ্টা আগে এসেছিলাম বলেই সকল কিছু সুচারু রূপে আমরা সম্পন্ন করতে পারলাম। সকল হাজি সাহেবদের আমরা বলব, হজকে সুসম্পূর্ণ করতে হলে তাঁরা যেন আরাম-আয়েশের দিকে বেশি দৃষ্টি না দেন। 'সব কাজ আগে করব' এই মনোভাব থাকলে আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করবেন।

স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত দুজনে মিসফালার বাসায় চলে গেলেন। রাস্তার পাশে একটা ভাল সেলুন দেখে মাথাটা কামিয়ে নেবার জন্য আমি প্রবেশ করলাম সেখানে। ধূলাবালিতে বেশবাস বেশ মলিন ছিল, তার উপর তিন দিন গোসল নেই—আমাকে দেখেই সেলুনওয়ালা যেন নাক টান করে দাঁড়ালেন। ভাবখানা এই রকমঃ এ সেলুনে ধনী শেখেরা আসেন—তুমি কে হে রাখালের পো রাখাল, বলা নেই কওয়া নেই ঢুকে পড়লে এখানে?

প্রবেশ যখন করেছি, আমাকে আর বার করে দিতে পারলে না কিন্তু দুটো হাতের দশটা আঙুল উঁচু করে দুবার দেখাল অর্থাৎ চুল কাটবে? দক্ষিণা কুড়ি রিয়েল? পারবে দিতে?

মাথা কামানোর জন্যে কুড়ি রিয়েল অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ষাট টাকা। হাসব না কাঁদব। উপায় ছিল না, শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে আমি মাথাটা পেতে দিয়েই বসে পড়লাম। যতক্ষণ মাথা কামালাম মনটা ভীষণ খচখচ করতে থাকল, আমার দশ দিনের চলাচলতি হায় স্রেফ মাথা কামাতেই চলে গেল!

স্ত্রী এবং হাশমী ইশরাত আগেই বাসায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, মস্তকমুণ্ডন শেষ করে আমিও হাজির হলাম যথা সময়। তিন দিন গোসল নেই তার উপর মস্তকমুণ্ডন জনিত অস্বস্তি, বিশাল দীঘিতে ঝাঁপ দিয়ে গোসল করার ইচ্ছে হচ্ছে তখন, সেই মুহূর্তে স্ত্রী বললেন এক বিন্দু পানি নেই বাথরুমে। এমন পরিস্থিতিতে রাগে

উত্তেজনায় ফেটে পড়াই স্বাভাবিক কিন্তু আমি 'ইয়া আল্লাহ' বলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বসে পড়লাম। ইয়াকুব আদম ঘরে ছিলেন, বললেন, তিন মিনিট সময় দিন হাজি সাহেব—পানি এনে দিচ্ছি। আসলে সৌদি সরকারের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা এতদিন নিয়োজিত ছিল মিনা এবং অরাফাতে হাজি সাহেবদের পানি সরবরাহের কাজে, ফলে মক্কায় তখন পানির বেশ সংকট। দেখতে দেখতে বড় দু'বালতি পানি উপর থেকে এনে দিল ইয়াকুব আর তাতেই আমাদের সকলের তৃপ্তি সহকারে গোসল, এমন কি ছোটখাট কাচাকুচিও হয়ে গেল কিছু। সম্পূর্ণ তরতাজা হয়ে আল্লাহর কাছে শোকর করতে করতে অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে এক সঙ্গে চা-নাশতা খেলাম সকলে। তারপর দরজা-জানালা বন্ধ করে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আবার যখন পথে নামলাম আমরা—সূর্যের কোলাহল অনেক কমে এসেছে। সেই পড়ন্ত বিকেল মাথায় নিয়ে কাবা শরীফে আসর পড়ে ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি ধরে জুমরার দিকে রওনা হয়ে গেলাম। জুমরাতুল আকাবায় নামিয়ে দেবে এই সর্তেই ট্যাক্সিতে উঠেছিলাম কিন্তু মাঝ পথে এক স্থানে থেমে ড্রাইভার বললে, এটাই হল আকাবা উপত্যকা, এখান থেকে নেমে একটু হেঁটে গেলেই জুমরা পেয়ে যাবেন, গাড়ি আর ওদিকে যাবে না। অগত্যা ভাড়া মিটিয়ে নেমে এলাম সকলে। দলবদ্ধ লোকেরা ভিড় করে এগিয়ে চলেছেন, আমরাও সেই ভিড়ে মিশে গেলাম।

দেখলেই বোঝা যায় এক সময় এই প্রান্তর একেবারে জনবিরল ছিল, এখনো যে মারাত্মক ঘনত্বে ঘরবাড়ি তৈরি হয়ে গেছে তা নয় তবুও জনবসতি চোখে পড়ে। হ্যাঁ—এই সেই ঐতিহাসিক আকাবা, এরই নির্জন পথ বেয়ে চলতে চলতে নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে কয়েকজন বিদেশী মানুষকে নিজেদের মধ্যে আলোচনারত অবস্থায় দেখতে পেলেন রসুলুল্লাহ।

তখন ছিল হজ মৌসুম। নবুয়তের দশম বছরের কথা।

হেজাজের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তখন হজ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হয়েছেন। কিন্তু মক্কায় ইসলাম প্রচারে প্রতিনিয়ত নানান অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ায় বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন রসুলুল্লাহ। মক্কা থেকে কিছুটা দূরে নির্জন রাতে পথ বেয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে দেখলেন, ছ'জন লোক আকাবার এক কিনারায় বসে কথাবার্তা বলছেন। পরিচয়ের পর আল্লাহর রসুল জানতে পারলেন যে তাঁরা মদিনা বাসী। তিনি বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের পাশে বসে নম্র কণ্ঠে বললেন, আপনারা যদি আমার কয়েকটি কথা শোনেন খুশি হই। কথাগুলি যদি আপনাদের ভাললাগে গ্রহণ করবেন অন্যথায় যা আপনাদের অভিরুচি। সন্তুষ্টচিত্তে আগন্তুকেরা রসুলুল্লাহ স-এর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তখন রসুলুল্লাহ অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাবে ইসলামের মূল বিষয়গুলি তাঁদের সামনে তুলে ধরলেন এবং মধুর কণ্ঠে কালাম পাকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শোনালেন। অবশেষে মহান ইসলামের প্রতি তাঁদের আহ্বান জানালেন।

একজন নবীর আসার কথা এ'রা পূর্বেই শুনেছিলেন, রসুলুল্লাহর কথা এবং কোরআনের আয়াত তাঁদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। একসময় তাঁরা বললেন, দেখবেন মদিনার ইহুদীরা যেন আমাদের পরাজিত না করে। নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনার পর কি আশ্চর্য সেই লোকগুলি সানন্দে একযোগে মুসলমান হয়ে গেলেন।

সেই আকাবা আজ কল্লোলিত। আমরা সকলে দলবদ্ধ ভাবে সেই উপত্যকার উপর দিয়ে জুমরার দিকে এগুচ্ছি। পরের বছর নবুয়তের একাদশ বছরে, আকাবার এই নির্জন প্রান্তরে রসুলুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হলেন বার জন মদিনাবাসী। তাঁরা নবীজীর হাতে হাত রেখে ইসলামে দীক্ষিত হন এবং বাইয়াত বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। ইতিহাসে এটাই 'আকাবার প্রথম বাইয়াত' হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। কয়েকদিন রসুলুল্লাহর মহান সঙ্গলাভ করার পর বিদায়ের সময় এ'রা মিনতি জানালেনঃ ইয়া রসুলুল্লাহ! কোরআন এবং ইসলামের বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন এমন একজন

লোককে যদি আমাদের সঙ্গে দিতেন বড় ভাল হত। সাহাবাদের এই প্রার্থনা মত নবীজী বিখ্যাত সাহাবী মোসআব ইবনে উমাইরকে তাঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন।

আকাবার এই মরুময় উপত্যকায় ইতিহাসের কত না উজ্জ্বল রত্ন ছড়িয়ে আছে। প্রতিবিন্দু ধূলিকণা যেন ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাসের এক একটি মোহময় ঘটনাবহুল পৃষ্ঠা। মোসআব ইবনে উমাইর এর ইতিহাসটি কি কম বিস্ময়ের!

মোসআব ইবনে উমাইর! অভিজাত ধনীর ঘরে অসম্ভব আদরে মানুষ। একেবারে আলালের ঘরে দুলাল। ইংগিত মাত্র সব কিছুই তাঁর সামনে এসে হাজির হত। বাজারের সব চেয়ে দামী কাপড়টি তাঁর জন্যে থাকত নির্দিষ্ট। আর সেই বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তিনি যখন মক্কার পথে বার হতেন তাঁর আগে-পিছে থাকত আর্দালীর দল। তাঁর চলার সাথে সাথে হতবাক হয়ে যেত পথিকেরা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সেই মোসআব যখন আল্লাহর রসূলের হাতে হাত রেখে সত্য ধর্মে দীক্ষিত হলেন, তাঁর সম্বল হল একখানি মাত্র কম্বল। ঝড়ে যেমন ডাল থেকে শুকনো পাতারা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরে যায়, ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর দেহ থেকে তেমনি দর্প-অহমিকা অহঙ্কারেরা নিমেষে ঝরে নিঃশেষ হয়ে গেল। সর্বভোগী হলেন সর্বত্যাগী। তিনি হয়ে উঠলেন একজন কোরআন বিশেষজ্ঞ, ইসলামের অন্যতম এক স্তম্ভ। বদর যুদ্ধে ইসলামের জাতীয় পতাকার মহান মর্যাদাবান বাহক ছিলেন এই মোসআব, ওহোদের অগ্নি পরীক্ষাতেও এই গৌরবময় পতাকা বহন করার দায়িত্ব রসূলুল্লাহ মোসআবকেই অর্পন করেছিলেন। ওহোদের কঠিন সময়ে পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য এই আত্মসমর্পিত সাহাবা প্রথম হতেই প্রাণপন শক্তিতে যুদ্ধ করছিলেন, শত্রুপক্ষের তরবারি তীর ও বর্শার আঘাতে তাঁর শরীরে কোন স্থান অক্ষত ছিল না, তবুও তিনি অবিরাম যুদ্ধ করছিলেন। ডান হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। দুর্ধর্ষ কুরেশ ইবনে কামিয়া তা লক্ষ্য করে অতি দ্রুত ছুটে আসে এবং তরবারির এক কোপে তাঁর

ডান হাতকে দেহ থেকে ছিন্ন করে দেয়। মোসআব তখন বাঁ হাত দিয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করেন। পাষাণ ইবনে কামিয়া নিকটেই ছিল, মোসআবকে কাবু করতে তার সময় লাগল না। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় কোপে বাম হাতটিকেও দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। দুহাত ছিন্ন অবস্থায় মহামান্য সাহাবী অসীম যন্ত্রণা সহ্য করতে করতে সবে দাঁড়িয়েছেন, চোখের পলকে শত্রুপক্ষের একটি তীর এসে তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ বক্ষদেশ ভেদ করে চলে গেল। কাটা কবুতরের মত ছটফট করতে করতে ওহোদের বালুময় প্রান্তরে লুটিয়ে পড়লেন জ্ঞানতাপস মোসআব, কিছু পরে তাঁর সকল যন্ত্রণার শেষ হল, তিনি জান্নাতলোকে চলে গেলেন।

এই সাহাবীর বিলাস বহুল পূর্ব জীবন সম্পর্কে নবীজী সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন, ইসলাম গ্রহণের পর সর্বস্বত্যাগী হয়ে একটি মাত্র ছেঁড়া কম্বলকে সম্বল করে ফকিরের মত নিদারুন কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করতে দেখে একদিন কেঁদে ফেললেন রসূলুল্লাহ। ওহোদ সমরে যেদিন মোসআব মারা গেলেন, সেদিনও তাঁর সম্বল ছিলএকখানি কাপড় এবং সেটি তাঁর পরনেই ছিল। কাপড়টি এত ছোট ছিল যে দাফন করার সময় দেখা গেল মাথার দিকে টেনে দিলে পা বেরিয়ে যায় আবার পায়ের দিকে টেনে দিলে মাথা আলগা হয়। এমন অবস্থায় মাথা ঢেকে পায়ের উপর কিছু আজখার ঘাস রেখে দাফন করার নির্দেশ দিলেন মুস্তাফা।

এই মোসআবকেই কোরআন এবং ইসলাম শিক্ষা দেবার জন্য রসূলুল্লাহ পাঠিয়ে দিলেন মদিনায়।

মদিনায় এসে তিনি আসআদ ইবনে যোবারার বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন। শিক্ষাপদ্ধতি এবং প্রচারের একটিধারা ঠিক করে নিয়েছিলেন, সেই ধারা অনুযায়ী প্রতিদিন তিনি এক-একটি গৃহে গমন করতেন এবং ইসলামের আদর্শ বর্ণনা ও কোরআন পাঠের পর মদিনাবাসীদের সত্যধর্মের প্রতি আহবান জানাতেন। তাঁর অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে প্রতিদিন একজন দুজন করে মুসলমানের সংখ্যা বাড়তেই থাকে এবং অল্পকালের মধ্যে মদিনার প্রায় সকল

গোত্রের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে যায়। মদিনার মানুষেরা তাঁকে 'আল্ মুকরী' বা অধ্যাপক নামে আখ্যায়িত করতেন।

মোসআবের প্রচারের ধারা যে কত মধুর আকর্ষণীয় এবং হৃদয়স্পর্শী ছিল দু-একটি ঘটনা থেকেই আমরা তাঁর স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। তখন আশহাল গোত্রের প্রধান সমাজপতি এবং নেতা ছিলেন সাআদ ইবনে মাআজ। মদিনার সমগ্র পৌত্তলিক সমাজের উপরেও তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম। বানু জাফর গোত্রের দলপতি হলেন উসায়েব। একদিন সাআদ আর উসায়েব দুজনে একত্রিত হয়ে ঠিক করলেন যে, যেমন করেই হোক মোসআবের প্রচারে বাধা দিতে হবে অন্যথায় কিছুদিনের মধ্যে মদিনার সব লোক মুসলমান হয়ে যাবে। প্রতিবাদের জন্য উসায়েবকে পাঠিয়ে ফলাফল শোনবার অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে বসে রইলেন সাআদ। ওদিকে মোসআব তখন একজনের বাড়িতে ধর্মের ব্যাপারে গভীর আলোচনায় মগ্ন ছিলেন। উসায়েব সেখানে এসেই অশ্লীল ভাষায় মোসআবের বিরুদ্ধে গালিগালাজ শুরু করলেন এবং শেষে তরবারি উন্মুক্ত করে বললেন, ভাল চাও ত এখুনি মদিনা ছেড়ে চলে যাও।

মোসআব শান্ত ভাবে পবিত্র দৃষ্টিতে তাকালেন। একজন আত্মীয় যেমন আত্মীয়কে সম্বোধন করে তেমনি ভালবাসায় আর্দ্র নম্র স্বরে বললেন, আপনি ত আমার কোন কথা শোনেন নি। অতি সামান্য সময়ের জন্য বসুন, আমার কথা শুনে যদি আপনার খারাপ লাগে তখন যা বলার বলবেন।

এমন বিনয় ব্যবহারে উসায়েব মনে মনে বেশ লজ্জিত হয়ে সেখানে উপবেশন করলেন। ইসলামের উদারতা এবং ঔজ্জ্বল্যের ব্যাখ্যার পর মোসআব মধুর কণ্ঠে কালাম পাকের কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে উসায়েবের মনে এক অসম্ভব রকম বেহেশতি আলো এসে পড়ল, কালবিলম্ব না করে তিনি মোসআবের হাতে হাত রেখে ইসলাম কবুল করলেন।

বাঞ্ছিত সময়ের অনেক পরে ধীর পায়ে ফিরে এলেন উসায়েব। সাআদ অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? আমতা আমতা

করে উসায়েব বললেন, লোকটি কি বলে আমি ঠিক বুঝি না, আপনি একবার গেলে ভাল হত।

বোধহয় এমন কথার অপেক্ষা করছিলেন সাআদ, অস্ত্রসজ্জিত হয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। মোসআবের সম্মুখে এসে যথারীতি গালিগালাজ করতেই তিনি পূর্বের মত শান্ত কণ্ঠে এবং মধুর ব্যবহারে উগ্র সাআদকে কিছুটা আওতার মধ্যে নিয়ে এলেন। সাঁপুড়ের হাতে ফণা তোলা কাল কেউটে যেমন বশ হয়ে যায়, সুমধুর এলাহানের কালাম পাকের আয়াত শ্রবণে অবশেষে উদ্ধত সাআদের অবস্থাও তেমন হয়ে গেল। তাঁর কথার বিষ দূর হল, হাঁক-ডাক ভুলে গেলেন তিনি এক আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্রমেই তাঁর মাথা নত হয়ে আসছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে নতুন জীবন লাভ করলেন। কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেলেন আপন গোত্রের লোকদের কাছে। তাদের সকলকে কাছে ডেকে শুধালেন, তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে কর? সকলে সমস্বরে উত্তর দিলঃ নিঃসন্দেহে আপনি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আমরা ত আপনাকেই অনুসরণ করি। সর্বজন সমক্ষে দ্বিধাহীন উদাত্ত কণ্ঠে সাআদ ঘোষণা করলেন, তবে সকলে জেনে রাখ আমি এখন মুসলমান। মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। উসায়েবও আপন গোত্রের কাছে নিজের মুসলমান হওয়ার কথা প্রকাশ করলেন। মোসআবের প্রচেষ্টা আর এই দুই নেতার অবিরাম তৎপরতার জন্যে দুই গোত্রের সকলে প্রায় একযোগে মুসলমান হয়ে গেলেন।

এমনই ছিল সর্বত্যাগী আল মুকরী মোসআবের ইসলাম প্রচারের ধারা। আজ ভেবে অবাক হয়ে যাই আকাবার এই বিরল প্রান্তর থেকে সেদিন কতবড় সৌভাগ্য আর হীরক খণ্ডকে সঙ্গে নিয়ে আকাবার যাত্রীরা ইয়াসরেবে ফিরে ছিলেন!

আকাবার এই উষর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'আকাবার দ্বিতীয় বাইয়ত।' নতুন তৈল সিঞ্চনে নিভু নিভু দীপ শিখার

উজ্জ্বল হয়ে ওঠার মত এই দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞায় ইসলাম যেন প্রচন্ড প্রাণশক্তিতে পুনর্জীবিত হয়ে উঠল।

নবুয়তের দ্বাদশ বছর।

দেখতে দেখতে অতিবাহিত হল আরো একটা বছর। হজ মৌসুম এসে গেল আবার। সারা আরব চঞ্চল। সবার লক্ষ্য কাবা, তীর্থ এবং বাণিজ্য—এক সঙ্গে দুই কাজ। মদিনা থেকে বহির্গত হল পাঁচ শত জনের এক বিশাল কাফেলা, মুসলমানদের একটি দলও এল কাবায়। এই দলে ছিলেন ৭২ জন মুজাহিদ আর এই ৭২ জনের একজন হলেন কাব ইবনে মালিক। তিনি বলেনঃ 'আমরা মক্কায় এসে হযরতের দর্শনলাভের জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। বারা ইবনে মারুর হলেন মদিনার এক গোষ্ঠীর প্রধান এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি বার হয়ে পড়লাম। কিন্তু আমরা কেউ হযরতকে চিনতাম না। বিশেষ অনুসন্ধানে অবগত হলাম যে তাঁর পিতৃব্য আব্বাস এবং তিনি কাবায় বসে আছেন। আমরা দ্রুত সেখানে হাজির হলাম। সালাম জানিয়ে এক পার্শ্বে উপবেশন করতেই রসুলুল্লাহ স আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এঁদের চেনেন? ব্যবসা বানিজ্য উপলক্ষে আলাপ থাকায় তিনি বললেন, হ্যাঁ চিনি। ইনি বারা ইবনে মারুর, মদিনার এক সম্মানীয় গোষ্ঠীপতি। আর আমাকে দেখিয়ে বললেন, ইনি মালিকের পুত্র কাব। কাব বলছেন, একথা আমি জীবনে বিস্মৃত হব না, যখন রসুলুল্লাহ আমার নাম শুনে বললেন, 'কাব—যিনি কবি?' আব্বাস বললেন, হ্যাঁ তিনিই।' (বুখারী শরীফ। উৎসঃ মোস্তাফা চরিত)

মদিনার মুসলমানগণ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদনের পথে অগ্রসর হলেন। এবার তাঁরা এসেছেন রসুলুল্লাহকে তাঁদের দেশে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পেশ করার জন্যে। এ বিষয়ে অত্যন্ত সংগোপনে কথাবার্তা চলছিল। অবশেষে বিস্তারিত আলাপ আলোচনার জন্যে স্বয়ং রসুলুল্লাহ স স্থান এবং সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন। বললেন, বারই জিলহজ গভীর রাত্রে

আকাবার নির্দিষ্ট এলাকায় সকলে যেন একত্রিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে সতর্কতামূলক উপদেশ দিলেন, সাবধান যে যার মত চলে আসবে, কেউ কারো জন্যে অপেক্ষা করবে না, সোরগোল করে ডাকাডাকি করো না, কেউ ঘুমিয়ে পড়লে তাকে জাগাবার চেষ্টা করো না। বিরুদ্ধ পক্ষেরা যেন কোন অবস্থায় কোন কথা অবগত হতে না পারে।

যে আকাবার উপর দিয়ে এই মুহূর্তে আমরা দলবদ্ধ ভাবে জুমরার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, সেদিন বারই জিলহজ তারিখের সেই নির্দিষ্ট রাতে মদিনার সেই আশ্চর্য মুসলমানেরা ঘন অন্ধকার মাথায় নিয়ে এক অসম্ভব মনোবল সম্বল করে এই আকাবাতেই সমবেত হলেন সকলে। প্রিয় চাচাজী হযরত আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে এই উদ্বেলিত জনতার সঙ্গে মিলিত হলেন রসুলুল্লাহ স। অসম্ভব মূল্যবান সময়, অপচয় করা চলে না এক মুহূর্ত। হযরত আব্বাস কথার সূচনা করলেন। তিনি তখনো মুসলমান হননি। তবুও সকলকে সম্বোধন করে বললেন, হে খাযরাজ গোত্র! হে আউস গোত্র! সকল দিক ভালভাবে বিবেচনা করে কাজ করুন। মুহম্মদ স, হাজার হোক আমাদেরই লোক। শত্রু-মিত্র, দোস্ত-দুষমণ সকলেই তাঁর সম্ভ্রম ও চরিত্রমহত্ত্ব স্বীকার করে। এখানে তাঁর আপনার লোকও দু-চার জন আছে। আমরা সুখে দুঃখে সকল সময় তাঁর সঙ্গে আছি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর হয়ে মোকাবিলা করি। এখন আপনারা তাঁকে স্বদেশে নিয়ে যেতে চাইছেন, ব্যাপারটি কিন্তু সহজ নয়। ভেবে দেখুন, যদি মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে থাকতে পারেন ভাল কথা, অন্যথায় বিষয়টি এখনো ভালভাবে চিন্তা করুন।

হযরত আব্বাসের বক্তব্য সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে আনসারদের পক্ষ হতে হযরত বারা দীপ্ত স্বরে ঘোষণা করলেন,আমরা তরবারির নিচে লালিত পালিত, যুদ্ধবিগ্রহ আমাদের রক্তের মধ্যে রয়েছে এবং আমরা তাতে বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত।

এই কথার মধ্যে আনসারদের মনোভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিধ্বনি করে আবুল হাইসাম বললেন, হে আল্লার রসুল! ইহুদিদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। আপনার নিকট

বাইয়াত গ্রহণের পর তারা আমাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে, সমগ্র আরব আমাদের বিরুদ্ধে হয়ত যুদ্ধ ঘোষণা করবে, আমরা তাদের মুকাবেলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কি পাব?

সঙ্গে সঙ্গে রসূলুল্লাহ স উত্তর দিলেন, বিনিময়ে তোমরা পাবে নাজাত—মুক্তি, অনন্ত বেহেশত আর আল্লাহর প্রসন্নতা।

আবুল হাইসাম তাঁর সকল সন্দেহ দূর করে নিতে চান। পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন ,ইসলাম যখন বিজয়ী হবে আর যখন আপনি হবেন শক্তি ও ক্ষমতার বিপুল অধিকারী, আমাদের ত্যাগ করে তখন কি আপনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন?

দৃঢ় কণ্ঠে রসূলুল্লাহ স উত্তর দিলেন, না তা হবার নয়। এখন আমি তোমাদের একজন, জীবন মরণের সম্বন্ধ এখন তোমাদের সঙ্গে। সুখে-দুখে সমরে-শান্তিতে, জয়-পরাজয়ে, আনন্দে-বেদনায় সকল অবস্থায় আমি তোমাদের সঙ্গে থাকব।

এই কথায় সকলের শিরায় শিরায় এক উদ্দাম উৎসাহের উল্লাস ছড়িয়ে গেল। আর কোন দ্বন্দ্ব নেই, কোন দ্বিধা নেই,। বাইয়াতের জন্য সকলেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ স-এর হস্ত মুবারক স্পর্শ করে বাইয়াত গ্রহণ চলছে, এক সাবধানী দূরদর্শী আনসার সাদ বিন যোরারা দণ্ডায়মান হয়ে গম্ভীর স্বরে বললেন, হে আমার স্বদেশবাসিগণ, ক্ষান্ত হও, স্থির হয়ে আবার একটু চিন্তা কর। জেনে রাখ এই বাইয়াতের কারণে আরব অনারব সকল জাতি, সকল গোত্র আমাদের দুষমণ হয়ে যাবে আর এই বাইয়াতের অর্থ হল সকল জাতির সঙ্গে অনিবার্য যুদ্ধ ঘোষণা। সুতরাং এখনো সময় আছে, উত্তমরূপে চিন্তা করে দেখ। যদি কাপুরুষতা তোমাদের গ্রাস না করে তা হলে বিসমিল্লাহ! অগ্রসর হও সম্মুখে। এর চেয়ে কল্যাণকর পদক্ষেপ আর কি হতে পারে!

সমবেত আনসারগণ দলবদ্ধভাবে মস্তক আন্দোলিত করলেন, আমরা যথেষ্ট ভেবে দেখেছি, আর ভাবার কিছু নেই। আমরা সকলে সকল পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

বাইয়াত গ্রহণ সমাপ্ত হলে আল্লাহর রসূল সেই জিন্দাদিল মুজাহিদগণের মধ্য হতে বারজন নকীব বা প্রচারক মনোনীত করার নির্দেশ দিলেন। মদিনাবাসিগণ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর বার জন সম্মানীয় ব্যক্তিকে এই পদের জন্য মনোনীত করলেন। মনোনয়ন পর্ব সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ স তাঁদের কর্তব্য বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, স্বদেশে গিয়ে আল্লাহর নামে বিজয় ঘোষণা এবং ইসলাম প্রচার এই হবে আপনাদের কাজ। অন্ধকারের মধ্যে শত বিপদের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে হবে—এ জন্যে কি প্রস্তুত আছেন আপনারা?

এক আশ্চর্য বিদ্যুৎ শিহরণের মত সকলেই দেহের প্রতিটি বিন্দুতে এক অলৌকিক শক্তি অনুভব করলেন। স্থির প্রত্যয়নিষ্ঠ দৃঢ় কণ্ঠে সমবেত ভাবে সকলে উত্তর দিলেন, আমরা প্রস্তুত।

এই অকুতভয় আত্মত্যাগী দ্বাদশ মহান সাহাবী প্রত্যেকেই ছিলেন আপন গোত্রে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান। ফলে এঁদের ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় গোটা মদিনা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে গেল।

বাইয়াত গ্রহণ তখনো সম্পূর্ণ হয়নি, কথাবার্তা কিছু উচ্চ হতেই হযরত আব্বাস সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, আস্তে আস্তে। ভুলে যাবেন না চারদিকে শত্রুরা ঘিরে আছে।

কথাটি কিছু পরেই সত্যে পরিণত হল। তথ্য সংগ্রহের জন্য কুরেশদের চর শয়তানের মত চতুর্দিকেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এই চরেদের মধ্যে এক শয়তান মোনাববাহ (?) ঘুরতে ঘুরতে আকাবার এই নির্জন পথে এসে এতগুলি মানুষকে রসূলুল্লাহ স-এর সঙ্গে দেখে চিৎকার করে উঠলঃ হে কুরেশ সর্দ্দারগণ! তোমরা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছ আর এ দিকে হতভাগাটা তার দলবল নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে মারাত্মক ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে। এই মোনাববাহ ছিল রসূলুল্লাহ স এর জীবনের দুষমণ। হিজরতের রাতে অনেকের সঙ্গে এই শয়তান তার ভাই নবীহকে সঙ্গে নিয়ে নবীজীকে হত্যার জন্যে সারা রাত ঘর পাহারা দিয়েছিল।

চিৎকার শুনে রসুলুল্লাহ স বললেন, ঐ শব্দে বিচলিত হয়ো না, ও আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর, শান্ত নীরব চারদিক। শীতল হাওয়া বইছে মৃদু মৃদু। বাইয়াত সম্পূর্ণ হলে নবীজীর নির্দেশ মত ইয়াসরেববাসিগণ নিঃশব্দে নিজ নিজ কাফেলায় গমন করলেন, আল্লাহর রসুলও এক সময় পিতৃব্য আব্বাস সহ শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন। সকালে কিন্তু হুলুস্থূল কান্ড বেধে গেল কুরেশদের মধ্যে, কথাটা আদৌ চাপা থাকে নি, তারা মদিনাবাসীদের কাছে এসে তপ্ত কণ্ঠে কৈফিয়ত তলব করল, আমরা তোমাদের বিশ্বাস করি, ভাল সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছি আর এদিকে গোপনে গোপনে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ তোমরা।

মদিনার বিশাল কাফেলা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তোড়জোড় করছিল তখন, মুসলমানেরা কোনকথা না বলে নত মুখে যে যার উটে দড়িদড়া বাঁধছিলেন, ওদিকে পৌত্তলিকেরা কেউই এ সংবাদের কিছুই জানত না। সুতরাং তারা অবাক হয়ে পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করল। ব্যর্থকাম কুরেশদল মক্কায় ফিরে এল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি রোধ করে সাধ্য কার! আকাবার ঊষর প্রান্তদেশ থেকে জিন্দা ইসলাম নবতর শক্তিতে বলীয়মান হয়ে ছড়িয়ে গেল দূর মদিনার ঘরে ঘরে।

পথ হাঁটতে হাঁটতে এই মুহূর্তের জনবহুল আকাবা উপত্যকার দিকে চোখ তুলে তাকালাম আমি। হৃদয় মন উথাল পাতাল, অতীতের কত না সংঘর্ষ মুখর সোনালি ইতিহাসের মনিমানিক্য ছড়িয়ে আছে এই পবিত্র মরুর প্রতিবিন্দু ধূলিকনায়! ভাবা যায় না। গভীর একটি দীর্ঘ শ্বাসের সঙ্গে হৃদয়ের তলদেশ থেকে বেরিয়ে এলঃ অল্লাহ হু, আল্লাহ মহান। আপনার কুদরতের কোন সীমা নেই, শেষ নেই।

হাশমি ইশরাত কেবলই পিছিয়ে পড়ছিলেন। পিছন ফিরে তাগাদা দিতে কয়েক পা দ্রুত আসেন তারপর গতি শ্লথ হয়ে যায় আবার। দেখলাম তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আবহাওয়ার

যথেষ্ট উত্তাপ ছিল, সকলের চোখে-মুখেই ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। সড়কের দু পাশে বহু বিদেশী মানুষ আস্তানা গেড়েছেন, এর মধ্যে রইস আর খান্দানী মানুষের সংখ্যাও কম নয়। তাঁবুগুলি দেখলেই আভিজাত্যকে অনুমান করা যায়। একটি তাঁবুতে আমাদের দৃষ্টি আটকে গেল। প্রবেশ মুখে ঝালর দেওয়া দামী পর্দা, মেঝেয় বহুমূল্যবান পুরু কার্পেট, দু পাশে দুটি এয়ার কুলার রীতিমত অভিজাত ব্যবস্থা। হয়ত এই বিত্তবান ইরাণী দম্পতি কোন হোটেলে ঠাঁই পাননি অথবা রসুলুল্লাহ স তাঁবুতে অবস্থান করেছিলেন বলেই এ'রাও স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন গ্রহণ করেছেন। কোন্ মানুষের মনে রসুলের প্রতি কত গভীর ভালবাসা জমে আছে কে জানে! এই তাঁবুর কাছে এসে আমার গতি অত্যন্ত শ্লথ হয়ে গেল। পরপর অনেকগুলি তাঁবুতে কার্পেট বিছানো দেখতে পেলাম। এই তাঁবুগুলির একটির সামনে দাঁড়িয়ে পড়লেন হাশমি ইশরাত। দাঁড়াতেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ভিতর থেকে, ঠিক যেমন ঘন মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বেরিয়ে আসে, অপরিমেয় স্বাস্থ্য নয়নাভিরাম রূপ—চোখ ফেরানো যায় না। মনে হল তাঁবুর মুখটা মুহূর্তে ঝিলমিলিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি এক চোখ প্রশ্ন নিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। হাশমি ইশরাত ভাবপ্রকাশের আদিমতম প্রথায় বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি অত্যন্ত পিপাসার্ত। এই ভাবে একজন অপরিচিতজনের কাছে পানি চাইতেই আমি বেশ বিরক্ত হয়ে বললাম, আমাকে বললেই ত এক বোতল পানি কিনে দিতাম। স্ত্রী বললেন, আপনার রাগ করা ঠিক হচ্ছে না, একজন বৃদ্ধার পক্ষে এই অবস্থায় এক বুক পিপাসা নিয়ে ধৈর্য ধরা কঠিন। বুঝলাম, এভাবে বিরক্তি প্রকাশ করা ঠিক হয়নি, আমারই ধৈর্য ধরা উচিত ছিল। ও দিকে পানির কথায় দেখলাম ভদ্রলোক যেন তৈরি ছিলেন এর জন্যে, ছুটে ভিতরে চলে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলেন বরফ-শীতল পানি আর এক মুঠো দামী খুর্মা। আতিথেয়তার সুযোগ পেয়ে যেন কৃতার্থ হয়ে গেলেন। মুখে সে এক অদ্ভুত বিনয় আর শ্রদ্ধা মেশান মৃদু হাসি। এই পবিত্র মৃত্তিকায় আইয়াম

তাশরিকের এই পবিত্র দিনে তিনি যে এমন একটি কাজ করার সুযোগ পেলেন এর জন্যে তিনি যেন আমাদেরই মুবারকবাদ জানাচ্ছেন।

কতটা পথ হেঁটে এলাম আমরা নিজেরা জানি না। অথচ যাকে জিজ্ঞাসা করি তিনিই বলেন, জুমরা? এই ত সামনে। একটা বাজার পার হলাম, মক্কা থেকে যে সুড়ঙ্গ পথটি এসেছে সেটিও অতিক্রম করলাম এক সময়, কিছু দূরে দেখলাম নির্মীয়মান এক বিশাল মসজিদ এবং এসব দেখতে দেখতে অবশেষে বহুবাঞ্ছিত জুমরা দৃষ্টি গোচর হল। কাল যে জুমরায় অনায়াসে পাথর মেরেছি আজ জনারণ্যে দুর্গম সেই পবিত্র স্থানে পোঁছানই প্রায় অসম্ভব মনে হল। প্রচন্ড চাপে অক্লান্ত পরিশ্রমে অগ্রসর হতে হতে যখন প্রায় হাত ত্রিশ দূরে আছি, দেখি জনস্রোতের দুর্বার ঢলের মুখে আমরা দ্বিতীয় জুমরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে সেখানেই দাঁড়িয়ে শয়তানের দিকে পাথর ছুঁড়লাম। মনে হল একটিও সঠিক লক্ষ্যে পোঁছাল না, শয়তানকে আঘাত করার পরিবর্তে হয়ত সেগুলি অনেক হাজি সাহেবের মস্তক স্পর্শ করেছে কিন্তু আমরা নিরুপায়, আল্লাহ আমাদের অন্তর জানেন। মনে বেশ কিছু বেদনা আর অস্বস্তি নিয়ে এই ভাবে আমরা সেদিন তিনটি জুমরায় রমি করা শেষ করেছিলাম। এখানে একটি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজনঃ রাস্তার উপর এবং নিচে উভয় দিক দিয়েই রমি করার ব্যবস্থা আছে। প্রথম দিন রমি করেছিলাম রাস্তার উপর দিয়ে আর দ্বিতীয় দিনে রাস্তার তলদেশে দাঁড়িয়ে।

ছিন্নভিন্ন অবস্থায় বাইরে এসে দেখি মগরিবের সময় প্রায় উত্তীর্ণ। আমাদের সঙ্গে কোন নামাযের পাটি ছিল না। দাঁড়িয়ে ভাবছি হঠাৎ দেখি একটি গাড়ি এসে থামল এবং তার ভিতর থেকে দ্রুত নেমে এলেন কয়েকজন ইন্দোনেশীয় যুবক। তাঁরা পিচ বোর্ড বিছিয়ে তার উপর নামাযের উদ্যোগ করতেই আমরাও পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। নামাযের আর কোন অসুবিধা রইল না।

নামায থেকে ফারাগাত হয়ে ভারহীন মুক্ত মনে চুপচাপ বসে

রইলাম কিছুক্ষণ। আমাদের পাশে এসে দাঁড়াল বরফ শীতল পানির একটা বিশাল ভ্যান, মনে হল হাজার তিনেক প্লাস্টিকের বোতল আছে তাতে। মুহূর্তে সকলেই ছুটে এসে ঘিরে ধরল গাড়িটাকে, এইভাবে ভীষণ রকম কসরত করে শয়তান মেরে সকলেই পিপাসার্ত। আধ ঘণ্টারও কম সময়ে সব শেষ। আমরা বসে হিসাব কষলাম, দুই থেকে আড়াই শো রিয়েল খরচ আর আয় পাঁচ থেকে ছ হাজার। সুতরাং আমরা বসে বসে ঠিকই করে ফেললাম, মক্কায় থেকে গিয়ে পানির ব্যবসা করব। স্ত্রী মুখ টিপে হাসলেন। কেননা তিনি আমার ব্যাপার স্যাপার ভালভাবেই জানেন। সেবার দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়ে বাঙ্গালোর মহীশূর মাদ্রাজ কোদাই ক্যানেল উটি কন্যাকুমারীতে হোটেলের চাহিদা এবং ভাড়ার হার দেখে সর্বত্রই হিসাব করে ঘোষণা করেছিলাম, কলকাতায় ফিরেই হোটেল ব্যবসা শুরু করছি। জানি না জগৎ সংসারে আমার মত অকর্মন্য আব কেউ আছেন কি না, হয়ত আছেন, যাঁরা কিছুই করতে পারেন না অথচ মনে মনে অবিরাম হাতি ঘোড়া মারেন, লাখ লাখের হিসাব করেন।

তারা ভরা আকাশ মাথায় নিয়ে ধীরে সুস্থে আমরা এক সময তাঁবুতে ফিরে এলাম। দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সমস্ত শরীর এমন ভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, কারো পক্ষে আর বসে থাকা সম্ভব ছিল না। এশার নামায পড়ে মরু শয্যায় দেহ এলিয়ে দেবার আগে স্ত্রীকে বললাম, আজই মিনায় আমাদের শেষ রাত্রি যাপন, কাল সকালেই মক্কায় ফিরতে হবে।

জাগো মুসাফির ওঠাও ডেরা যেতে হবে দূর পথ—ভোরের আবছা অন্ধকারে ভাঙচুর শুরু হয়ে গেল মিনায়। তাঁবু ভাঙা, জিনিষপত্র গোটান ব্যস্তবাগীশ মানুষেরা এসব কাজে আগেভাগেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, সাবধানীরা চুপচাপ, তাঁরা সব কিছু দেখে শুনে পা তুলবেন। ফজরের নামাব শেষ করে আমি চলে গেলাম শেষ বারের মত রমি করতে, তিন দিন রমি করার আজই ছিল শেষতম দিন। স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাত বাঁধা-ছাঁদার কাজে ব্যস্ত রইলেন,

তাঁদের রমি করার ভারটি অর্পণ করলেন অমার উপর। দ্রুত পথ হেঁটে জুমরায় এসে দেখলাম একেবারেই ভিড় নেই। সাধারণভাবে দু-পাঁচ শো লোক ঘোরাফেরা করছেন, পাথর মারা হয়ে গেলে ঘেরা জায়গায় মুখ ঝুঁকিয়ে শয়তানের (স্তম্ভের) তলদেশ পর্যন্ত ভালভাবে দেখে কৌতূহল নিবৃত্ত করছেন। যতটা নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব ততটা কাছে গিয়ে বিসমিল্লাহে আল্লাহু আকবার বলে প্রাণ ভরে রমি করলাম, দেখলাম প্রতিটি কাঁকর স্তম্ভকে স্পর্শ করল। কাল রমিতে যে অপূর্ণতা ছিল, মহান আল্লাহ্ আজ যেন তা পূর্ণ করে দিলেন। ফুটি ফুটি কুসুমের আবদ্ধ পাপড়িতে যেমন ব্যাকুল খোশবু থাকে, এক বুক উতলা তৃপ্তি নিয়ে আমি তাঁবুতে ফিরে এলাম। স্ত্রী তখন সব কিছু গোছগাছ করে নিয়ে আমার জন্যে বসে আছেন। আমি যেতেই জুবেদা ফারুকী জয়পুরের সেই হাজি দম্পতি এবং আরো কয়েকজন, যাঁদের সঙ্গে এক আকাশের তলায় এক তাঁবুর নিচে এই কদিন অতিবাহিত করেছি, ঘিরে ধরলেন। ঠিকানা লেনদেন হল, বার বার অনুরোধ জানালেন, জয়পুরে অবশ্যই আসবেন ভুলে যাবেন না যেন। জানি জীবনে আর হয়ত কোনদিনই দেখা হবে না তবুও তাঁদের আগ্রহ আর আন্তরিকতা হৃদয় স্পর্শ করে গেল। চলার পথে এই প্রাপ্তিটুকুই এক অখণ্ড কোহিনুর, যা চিরকাল মনের গোপন কোনে সঞ্চিত থেকে চকিত আলো ছড়ায়।

আবার বোঁচকা পোঁটলা কাঁধে নিয়ে পথে নামলাম। মিনার বালুময় প্রান্তর থেকে উন্মুল কোরা। পথ জনসমুদ্র। প্রায় পনের লক্ষ মানুষ এবং এক লক্ষ যানবাহন এক সঙ্গে পথে নামলে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটে তারই সূচনা। অথচ বিশৃঙ্খলা নেই কোথাও। আমরা ভারতীয়রা যারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে নিয়মিত অভ্যস্ত, তারাও যেন কেমন শৃঙ্খল-শিকলে বন্দী হয়ে পোষ মেনে গেলাম। আজ নতুন গরিমায় আবার উপলব্ধি করলামঃ সৎসঙ্গী এবং সৎ প্রতিবেশী জীবনকে ওলট-পালট করে দিতে পারে।

আমার কাঁধে ব্যাগ হাতে ছাতা অন্য হাতে ভারি স্যুটকেট।

স্ত্রীর হাতে একটা নোংরা মলিন ছিন্ন পোঁটলা, কলকাতায় যা ও'র হাতে কল্পনাও করা যায় না, এই পোঁটলাটি আবার আমার বৃদ্ধা সঙ্গীর যাঁর ব্যাগ ছিঁড়ে গেছে, আল্লাহ মেহেরবান, বয়ে চলেছি। অসম্ভব পরিশ্রমে প্রায় বিশ হাত চড়াই অতিক্রম করে এক সময় ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর এসে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করলাম, অনেক কৌতূহলী দৃষ্টি অনেক ঘৃণা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টি আমাদের উপর পড়ছে।কিন্তু ট্যাক্সি কই? যাত্রী বোঝাই অসংখ্য বাহন ছুটে চলেছে সম্মুখ দিয়ে কিন্তু এই দুর্ভাগাদের দিকে দৃষ্টি দেবার মত অবকাশ নেই তাদের। ভাবছি আর টালমাটাল পদে পথ হাঁটছি, হাত তুলছি দেখে দেখে। অবশেষে এক সৌদি বাবাজী সদয় হলেন, তাঁর ভরা তরীতে আরো তিন জনকে তুলে নিলেন। মক্কায় পেঁাছলাম প্রায় সাড়ে ন-টায়। মক্কার ড্রাইভারদের সম্পর্কে মারাত্মক অভিজ্ঞতা হয়েছে আমাদের, এক জায়গায় নামাতে বললে ছেড়ে দেয় আর এক জায়গায়। ঠিকই করেছিলাম, পথে কোথাও নামব না, গাড়ি যখন কাবা শরীফে যাবে, সেখানে অবতরণ সব চেয়ে নিরাপদ। চেনা জায়গা, ঝামেলা থাকবে না। গাড়ি ছুটে চলেছে। এক সময় মনে হল মিসফালার উপর দিয়ে যাচ্ছে। এই কয়দিনে ওখানকার পথ ঘাট কিছু চিনেছিলাম। ড্রাইভারকে থামতে বলতেই সে দাঁড়িয়ে গেল। স্বগতোক্তির মত বললাম, আমরা ত মিসফালায় যাব। আঙুল বাড়িয়ে চারিদিকটা দেখিয়ে সে বললে, কুল্লো মিসফালা—সবটাই মিসফালা।

এই প্রথম একেবারে বাড়ির কাছে নেমে গেলাম।

মধ্যাহ্নে মিসফালা মসজিদে জোহরের নামায পড়তে গিয়ে আমার জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল। এমন একটি ঘটনা যা এতদিন পর আজো আমার অনুভূতিতে চাঁদ ওঠার মত স্পষ্ট হয়ে আছে।

মক্কার মসজিদ, তার আভিজাত্য আর গৌরবই আলাদা, তায় আবার হজ মওসুম। মসজিদ একেবারে ভরপুর। খাস সৌদি

আছেন অনেক জন, নাইজেরিয়ান প্রায় অর্ধেক, অন্যান্য দেশের নামাযীও আছেন প্রচুর। সকলের সঙ্গে একেবারে সামনের কাতারে আমিও নামায পড়ছি। চার রেকাত সুন্নত নামায সমাপ্ত করে বসে আছি ইমামের পিছনে ফরজ পড়ার আশায়। হঠাৎ ঘোষণা হয়ে গেল ইমাম আসেন নি। মুয়াজ্জিন বললেন, ইমাম মাফি অর্থাৎ কোন কাজে ইমাম আটকে পড়েছেন, আসতে পারেন নি। সকলের দেখাদেখি আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম। হঠাৎ দেখি মুয়াজ্জিন আমার মুখের দিকে তাকালেন। তিনি কি বুঝলেন জানি না কিন্তু কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আমাকেই ইমামের জায়গায় ঠেলে দিয়ে ইকামত দিতে শুরু করলেন। আমার তখন ফাঁসির মঞ্চে ওঠার মত অবস্থা। ইয়া আল্লাহ! হজ থেকে সবে মাত্র ইজ্জতের সঙ্গে ফিরিয়ে এনে হঠাৎ আপনি আমাকে এমন অগ্নি পরীক্ষায় দাঁড় করিয়ে দিলেন! আমার মত এক পাপী নাদান, মক্কার মসজিদের ইমাম! ভাবা যায় না। সকলের নামায হয়ত বরবাদ হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম মনে হল, এ এক দারুন মসিবত কিন্তু একামত শেষ হতেই সব ভয় সব দ্বিধা সংকোচ আল্লাহ মনের ভিতর থেকে দূর করে দিলেন। আমি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে নামায শুরু করলাম। এক সময় শেষও হয়ে গেল। না কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি।

মক্কার মসজিদে এই আমার প্রথম ইমামতি।

২৬.

হজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর মিনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে জনাব মাওলানা মুহম্মদ তাহের সাহেবের কথা বেশি করে মনে পড়ল। এই সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে যে উদ্দেশ্যে এই পবিত্র ভূমিতে এসেছিলাম, আল্লাহর অনন্ত করুণা ও রহমতে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। হজের পর এই যে অখন্ড অবসর, এই বিরল মুহূর্তে আমি কি করব এমন প্রশ্ন মনে উদয় হতেই তাহের সাহেবের উপদেশ অনুযায়ী ঠিক করে ফেললাম যত বেশি সংখ্যায় পারি আল্লাহর ঘরকে বিনীত চিত্তে তওয়াফ করে যাব, ক্লান্ত হয়ে এসে বসব মুসজিদুল হারামের শীতল ছায়ায়, বসে বসে তাকিয়ে থাকব বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে, দু চোখ ভরে দেখব আমার স্বপ্নের জান্নাতকে, চোখ বন্ধ করে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ের গোপনতম পর্দায় তার অবিকল ছবি তুলে নেব, এমন কি সূর্যের বাড়া-কমার সঙ্গে গেলাফের রঙ পরিবর্তন সহ হাওয়ায় দুলে ওঠা তার মৃদু কম্পনটুকু পর্যন্তও সুস্পষ্ট এঁকে নেব মনের পর্দায়। প্রভাতের মধুর আলোয় কাবার রূপ, মধ্যাহ্নে মরুর সূর্যে তার চিত্র, পড়ন্ত কোমল রোদে তার রূপবৈচিত্র, সন্ধ্যা ও রাতে আলো ঝলমল কাবা, মেঘমেদুর আকাশের নীচে গম্ভীর কাবা, বর্ষণ সিক্ত কাবার রূপৈশ্বর্য, শেষ রাতের বরকতময় মুহূর্তে কাবার অনন্ত রূপরাশি সব সবকিছু আমি আমার মনের পর্দায় তুলে নিতে চাই। সোলেমানপুরের নির্জন কুটিরে ফিরে চোখ বন্ধ করলেই যেন আমি আবার কাবায় চলে আসতে পারি। তওয়াফের বিশাল বৃত্তপথে হাজার হাজার প্রেম দিওয়ানা যখন লাব্বায়েকের গুঞ্জনে চক্রাকারে পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে, ভক্ত হৃদয় বেষ্টিত বায়তুল্লাহর সেই অনন্ত রূপরাশি যেন আমার স্তব্ধ আঁখি পল্লবে মুহূর্তে দুলে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে সে মতই আমার সাধনা শুরু হল। আর তখনই নতুন করে উপলব্ধি করলাম: আল্লাহর পথে মহাপ্রেমের এই অভিসারে কোন সমাপ্তি নেই, শেষ

নেই। এ পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় ততই তৃপ্তি, ততই বিভোরতা। আত্মহারা হয়ে আত্মাকে যে এমন করে পাওয়া যায় তা আগে কে জেনেছিল। আমার মত মহাপাপীর চোখে এই পথ ধরা পড়ে না, হৃদয় কম্পিত হয়, দেহমন আকুল, কাঙালের মত জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ গাত্রে পথ পার্শ্বে পড়ে থাকি, আলেমুল গায়েব জানেন আমরা কোনদিন তাঁর অপার রহমতের এককণা পাব কিনা।

হজ থেকে ফিরে এসে এই তওয়াফ, তওয়াফ-ক্লান্ত শরীরে নিষ্পলকে কাবার দিকে চেয়ে থাকা এবং তারপর অনন্ত থেকে ছুটে আসা সেই আবেগাকুল অশ্রু জল—এই আমার প্রতিদিনের সম্বল হয়েছিল। পরপর কয়েকদিনের ডাইরির পৃষ্ঠায় আমার সেই সময়কার মনোভাব কিছুটা আভাসিত হয়েছে, এছাড়া হজ-উত্তর পর্বের মহাকাবার কিছু টুকরো চিত্রও পাওয়া যাবে এই সব বিক্ষিপ্ত পরম্পার্যহীন দিনলিপিতেঃ

৩০ সেপ্টেম্বর ৮২। ১৩ আশ্বিন ৮৯। ১২ জিলহজ ১৪০২। বৃহস্পতিবার।

রাত চারটায় ঘুম ভাঙল। কাল সারাদিন কাবার মুখ দেখিনি, আজ তাহাজ্জদ এবং ফজর নামাযের জন্য চলে এলাম। দেখলাম, শেষ রাতে হজ হয়ে যাবার পরও, কাবা উপছে পড়ছে। এই সব মানুষ, এই সব আল্লাহ প্রেমিক মহান দরবেশের দল কত গভীর রাতে উঠে কাবায় চলে এসেছেন! এঁদের মহব্বতের সঙ্গে আমাদের স্বার্থগন্ধী আল্লাহ-প্রেমের কোনই তুলনা হয় না। কোন রকমে সিঁড়ির এক পাশে, অতি অতি সংকীর্ণ একটু খানি জায়গা করে নিয়ে তাহাজ্জদ পড়ে নিলাম। আমার মত জাহেল, যারা চারটে পর্যন্ত নিশ্চিন্তে পবিত্র কাবা নগরীতে নিদ্রা যায়, বায়তুল্লাহ শরীফে তাদের স্থান হওয়াই উচিত নয়। শোকর আল্লাহর তিনি এতটুকু জায়গা আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আজ একজন নতুন ইমাম ফজরের নামায পরিচালনা করলেন, জোহরেও ইমামতি করলেন তিনি। আসর জামাত পেলাম না, একা একা কাবার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে নিলাম।

মগরিব এশা জামাতে। দীর্ঘ মুনাযাতে মশগুল রইলাম। ভীষণ কান্নাকাটি। বাড়ি ফেরা। আসরের পরও অশ্রুসজল মুনাযাত। জানি না এ নাদান মূর্খের প্রার্থনা মহান আল্লাহর দরবারে কি ভাবে হাজির হচ্ছে। যে ভাবেই হোক, আল্লাহ আপনি মাফ করুন। আমি আপনার ক্ষমা আর সদা প্রসন্নতা চাই, চাই আপনার রহমত। আর? আর সেই প্রতিশ্রুত মহাদিনে আপনার দিদার—দিদারে এলাহি। আর কিছু না, আর কোন প্রার্থনা নেই আমার।...

প্যাটেলজীর সঙ্গে কথা একটু কমিয়ে দিয়েছি। যিনি কথা বলতে জানেন না এবং হঠাৎ হঠাৎ রেগে যান তাঁর সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভাল। আত্মসম্মান রক্ষার বোধ হয় এ এক সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।...

১ অক্টোবর ৮২। ১৪ আশ্বিন ৮৯। ১৩ জিলহজ ১৪০২। শুক্রবার।

আজ একমাস দুদিন হল আমরা দেশ ছেড়েছি। এতদিনে কোন সময় বাড়ির কথা বিশেষ করে মনে পড়েনি। হজ হয়ে যাবার পর, আজ যেন বেশি করে সকলের কথা স্মরণ হচ্ছে। এর মধ্যেও হয়ত আল্লাহর কিছু ইঙ্গিত-ইশারা রয়েছেঃ যে কর্তব্যের আহ্বানে তোমরা এখানে ছুটে এসেছিলে তা সম্পন্ন হয়েছে, এখন ফিরে যাও যে যার সংসারে, সেখানে অপেক্ষায় আছে তোমার স্নেহাস্পদ সন্তানেরা মুখ চেয়ে আছে স্বাধী স্ত্রী, প্রিয়পরিজন।

দশটায় জুমআর নামাযের জন্য সস্ত্রীক চলে এলাম বায়তুল্লায়। আসতে আসতে ভাবছিলামঃ নিশ্চয়ই আমরা অনেক সকাল সকাল যাত্রা করেছি। কিন্তু হায়! তখনো আমাদের জানা ছিল না, অনেকের মধ্যে নামাযের আকুলতা আমাদের শতগুন এবং তাঁরা আসতে শুরু করেছেন দশটায় নয় ভোর ছ-টা থেকে। লোকারাণ্য। তবু হজের আগের শুক্রবারে যে দুর্গম জনারণ্য ছিল আজ তা নেই। ঠাঁই পেতে বেশ কষ্ট হল। আজো সিঁড়ির এক পাশে একটু জায়গা করে নিলাম। স্ত্রী চলে গেলেন মহিলাদের জামাতের দিকে, কিছুক্ষণ

তাঁকে আমি লক্ষ্য রেখে ছিলাম তারপর তিনি আমার দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেলেন। সেই অসম্ভব ভিড়ে ঠিক আমার সামনেই দুজন নাইজেরিয়ান জায়গায় দখল নিয়ে প্রচণ্ড বিক্রমে কথা কাটাকাটি শুরু করে দিলেন, কিছু পরে শুরু হল ধাক্কাধাক্কি, আরো পরে ভীষণ নোংরা ভাবে মারামারি। চারপাশে অসংখ্য হাজি সাহেব, কেউ দেখলেন, কেউ মজা পেলেন, কেউ মুচকি মুচকি হাসলেন, কিন্তু সবল দুটি হাত নিয়ে এগিয়ে এলেন না কেউ। মিনিট দশেক পরে দেখি সেই নাইজেরিয়ান দুজন হেসে হেসে পরস্পর কথা বলছেন, গল্প করছেন। নামায শেষ হল একটার কিছু আগে। বাসায় ফিরে ডাইরি লিখলাম।

ত্রিশ-চল্লিশ হাজার করে লোক মক্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কেউ জেদ্দা হয়ে পাড়ি জমাচ্ছেন স্বদেশে, কেউ বা মদিনার পথে। আরব মিশর ইরান তুরষ্ক নাইজেরিয়া নিকটের বাসিন্দারা সকলেই স্বদেশাভিমুখী ব্যস্ত পথিক। ঘরমুখী এই ব্যস্ততার ছাপ এশার কাতারে সুস্পষ্ট ফুটে উঠল, কাতার বেশ খালি খালি মনে হল।

সিজারকে আজ একটা চিঠি লিখতে শুরু করেছি, ইনশাআল্লাহ কাল শেষ করে ডাকে দেবার ব্যবস্থা করব।

২ অক্টোবর ৮২। ১৫ আশ্বিন ৮৯। ১৪ জিলহজ ১৪০২। শনিবার।

ফজর জোহর মগরিব এশা আল কাবায় জামাতে পড়লাম, আসর কাবা শরীফে পড়লাম একা একা। মক্কা ক্রমেই খালি হচ্ছে, জামাতে এবং তওয়াফে তা অনুভব করছি। তবে এখনো ভিড়। দোকানে দোকানে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা। ব্যস্ততা।

এশার নামায পড়ে তওয়াফ করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, কাবার সুউচ্চ বিশাল জোড়া মিনারের পাশ দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। অপরূপ, নয়ন ভুলান। চাঁদকে বহুদিন এত ভাল লাগেনি। রসুলুল্লাহ্ স হয়ত কাবার এই চত্বরে এই খানে দাঁড়িয়ে বহুদিন এই ভাবে চাঁদ দেখেছেন আর আল্লাহর সৃষ্টি সৌন্দর্যে তাঁর

চিত্ত কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে। আমার পার্শ্বে কৃষ্ণ প্রস্তর—হাজরে আসোয়াদ, কাবার গায়ে লাগান। ঐ পাথরে নবীজীর হস্তমুবারকের পবিত্র স্পর্শ রয়েছে, তিনিও ঐ পাথর চুম্বন করেছেন, সেই চুম্বনের সুমধুর পরশও মিশে আছে সে পাথরে। হযরত ইবরাহিমের স্পর্শ, হযরত ইসমাইলের ছোঁওয়া আজো স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারছি তার কালো বুকে। এতসব মহান অঙ্গের পবিত্র আলিঙ্গনের আনন্দে কালো পাথর বোবা হয়ে গেছে, তার বুকে রয়েছে শুধু পরম তৃপ্তির এক বেহেশতি গুঞ্জরণ!

আজ সকালে বাসায় পানি ছিল না। নীচে দুটি ছোট্ট নাইজেরিয়ান ছেলে আইসক্রীম এবং টিনজাত ফ্রুট জুসের দোকান করেছে, তাদের একজনকে দেড় রিয়েলের বিনিময়ে এক জার পানি এনে দিতে বললাম। সে এনেও দিল কিন্তু তার বড়ভাই তাকে কিছুতেই পয়সা নিতে দেবে না। উপকাব কবে পয়সা নেওয়া হারাম, 'হারাম' শব্দটা সে বার কয়েক উচ্চারণ করল। অবশেষে অনেক বুঝিয়ে তবে তাকে টাকাটা দিতে পারলাম। কালো, একেবারে কয়লা-কালো, যাদের আমরা অবজ্ঞা করি, তাদের মধ্যে নৈতিক জোরটা হীরক-দীপ্তির মত কিভাবে ঝলকিত হয়ে উঠেছে ভেবে দেখার মত।

৩ অক্টোবর ৮২। ১৬ আশ্বিন ৮৯। ১৫ জিলহজ ১৪০২। রবিবার

তাহাজ্জদ ফজর জোহর মগরিব এশা জামাতে আল কাবায়, আসর জামাত পেলাম না, একা একা পড়লাম। স্ত্রী তওয়াফ করলেন এশার সময়, আমি জোহর বাদে প্রতি নামাযের শেষে। হাশমি ইশরাত হারিয়ে গিয়েছিলেন অনেক রাতে একা একা বাসায় ফিরে এলেন।

আল কাবা চিরদিন আমার চেতনায় বেগ সঞ্চার করেছে, করবে। কেবল আমার নয়, নিখিল মুসলিম চেতনায় এ এক অনির্বান আলোকবাহী তড়িৎ প্রবাহ যা জ্বলে উঠে অন্ধকারকে ছিন্ন ভিন্ন

করে দেয়। কতকাল কতযুগ সৃষ্টির সেই আদিমতম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল কাবা আমাদের চিন্তা-ভাবনাকে এমনি করেই আলোড়িত এবং প্রভাবিত করে আসছে এবং করবে। কাবার পাদদেশে দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থেকে বার বার প্রশ্ন করেছিঃ কাবা কি? সে কি কেবল কতকগুলি পাথরের সমষ্টি? সে কি কেবল একটি ঘর? একটি নিরাপদ গৃহ মাত্র? কি আছে কাবায়? কোন শক্তি বলে বিশ্ব মুসলিমকে সে এমন ভাবে আকর্ষণ করে?

উত্তরও খোঁজার চেষ্টা করছি, তার কিছু আমি পূর্বেও বিবৃত করছি। প্রকৃতপক্ষে কাবা ত কতকগুলি পাথরের সমষ্টি মাত্র নয়। কতকগুলি পাথর কখনই আমাদের কাছে আদরণীয় হতে পারে না। কাবাকে কেবল একটি নিরাপদ গৃহ হিসাবে কল্পনা করলেও তার কোন পৃথক মর্যাদা খুঁজে পাওয়া যায় না। এমন গৃহের সংখ্যা ত পৃথিবীতে কম নয়। সুতরাং কাবার বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের দৃষ্টি ভিন্নমুখী এবং সুদূর প্রসারী করতে হবে। যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমার চোখে স্পষ্ট হয়েছে তা একে একে উল্লেখ করছিঃ

ক. নিখিল বিশ্বমুসলিমের সকলেরই 'আল্লাহ এক, কোরআন এক, রসুল এক, কাবা এক।' জাহেলিয়াত যুগে পৌত্তলিকদের ঈশ্বর প্রীতি ছোটবড় সংখ্যাতীত ঈশ্বর-দেবতায় বিভক্ত খন্ড খন্ড হয়ে বিলুপ্তির সীমানায় দাঁড়িয়ে ছিল। রসুলুল্লাহ স এসে সকলের সেই বহুবিভক্ত এবং বিখণ্ডিত বিশ্বাসকে এক আল্লাহতে কেন্দ্রীভূত করলেন, এক কোরআন তাদের কণ্ঠে তুলে দিয়ে সেই বিশ্বাসকে আরো সংহত রূপ দিলেন, অটল বিশ্বাসে শ্রদ্ধাবনত চিত্তগুলি যখন এক কাবার দিকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল, এই কেন্দ্রীভূত চৈতন্য এক অসাধারণ নিটোলতায় উচ্চতম গ্রাম স্পর্শ করল। এক কাবা সমগ্র মুসলিম-চেতনাকে এক সূত্রে নবতর গরিমায় গ্রথিত করল।

খ. সুতরাং কাবা হয়ে উঠল বিশ্ব মুসলিমের মিলন কেন্দ্র'। এই মহাতীর্থ ভূমিতে বিশ্বের সকল মুসলিম প্রাণ যেন অনায়াসে এক হয়ে মিশে যায়। পুকুরের পানি, খালের পানি, বিলের পানি,

নদীর পানি—সমুদ্রে পড়ে সকলেই অস্তিত্বহারা, মিলেমিশে একাকার, কে মিশরী কে ইরানী কে ভারতীয় কে পাকিস্তানী কে বাংলাদেশী কে আফগানী—কূলহারা মহাসমুদ্রে সকলেই গোত্রহীন, সকলে পাশাপাশি নামায পড়েছেন, সালাম করছেন, মোছাফাহ করছেন, কুশল বিনিময় হচ্ছে, একে অপরের সংবাদ নিচ্ছেন, সাহায্য করছেন, তওয়াফের বৃত্তরেখায় পাশাপাশি হাঁটছেন, সায়ী করছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাসছেন, কথা বলছেন, কাঁদছেন, আল্লাহর দরবারে হাত তুলছেন এক সাথে, 'আল্লাহু আকবর' মহামন্ত্রে সিজদায় মাটি স্পর্শ করছেন একই আকুলতায়। এই বিশ্বমিলন কেন্দ্রে সকলেই মিলনের আকুলতায় অধীর আর এই মিলন বাইরের যতটা অন্তরের দিক দিয়ে ততোধিক আর আত্মিক মিলনই চিরস্থায়ী।

গ. এক কাবা আর এক মিলন কেন্দ্র থেকেই গড়ে ওঠে এক 'বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ব'। রসূলুল্লাহ স-এর বিখ্যাত হাদিসটি আমরা এখানে স্মরণ করতে পারিঃ কুল্লো মুসলিম এখোয়াতোন—সকল মুসলমান ভাই ভাই। বেদনা-ব্যথায় আনন্দ উল্লাসে ভাই যেমন ভাইয়ের পাশে এসে দাঁড়ায়, রক্ত সম্পর্ক শূন্য ভাইগুলি তেমনি পরস্পরের সাহায্যের জন্য সদাপ্রস্তুত। এই ভ্রাতৃত্ববোধ কেবল হজযাত্রীদের মধ্যে নয়, রাষ্ট্র নেতাগণ—যাঁরা হজ উপলক্ষে একত্রিত হন, পরস্পরের মধ্যে বিরোধগুলি মীমাংসার অধীরতায় অধিকতর আন্তরিকতায় একত্রিত হবার জন্যে সচেষ্ট হন। কাবাকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়ে পরস্পর পুনরায় আলাপ-আলোচনায় মিলিত হবার জন্য দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুত করে নেন। কাবাকে কেন্দ্র করেই হয় এই ভ্রাতৃত্ববোধের শুভ উদ্বোধন।

ঘ. 'বিশ্বমুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি'র লেনদেন এই মহামিলন তীর্থের আর এক বিশেষ অবদান। কাবার ছোট্ট এলাকায় নিখিল বিশ্বের সমূহ সংস্কৃতি যেন উঠে আসে এক দিনেই। ছোট্ট আঙিনায় সমবেত হওয়া সেই বিশ্ব সংস্কৃতির যেন শোভাযাত্রা চলে কিছুদিন। পথে বেরুলেই আপনি অসংখ্য নাইজেরিয়ানদের দেখতে পাবেন, তাদের বর্ণ তাদের ভাষা তাদের লেবাস তাদের জুব্বা-

টুপি-তসবিহ তাদের খাদ্য তাদের আচার ব্যবহার সব কিছুতেই নাইজেরিয়ান সংস্কৃতির সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পাবেন। আমি অনেককে তাঁদের দেশের উঁচু লম্বা টুপিগুলি কিনে মাথায় দিতে দেখেছি। ইন্দোনেশিয়ানদের সাজসজ্জা তাদের নম্রতা ধীরতা তাদের বিশেষ স্নিগ্ধ সংস্কৃতি অনেকেরই ভাল লাগবে। ভাল লাগবে মিশর ইরানের বিশেষ কৃষ্টি সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হতে। আর সৌদি সংস্কৃতি বিশেষ করে তার লেবাস প্রায় অর্ধেক হাজি সাহেব ত অঙ্গে ধারণ করেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তওহিদবাদ এবং ইসলামী তাকওয়া যা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রীয় শক্তি, সৌদি আরবে—মক্কা ও মদিনায়—তার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে অনেক তীর্থযাত্রীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের স্বরূপই পাল্টে যায়। এতদিনের ভ্রান্ত ধারা পরিত্যাগ করে তাঁরা যেন আপন স্বরূপে ফিরে আসেন। মহাহজ উপলক্ষে বিশ্ব মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই অদৃশ্য লেনদেন কাবার এক অনন্য অবদান। দেশে দেশে মানুষে মানুষে মনের এই লেনদেন বিশ্বের আর কোথাও এমন ভাবে হয় না। কাবার বাগিচায় ফুল ফুটেই আছে, মনের মৌমাছি এই লেনদেনের মধু কতটা সংগ্রহ করবে তা সকলের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও গ্রহণ ক্ষমতার উপর নির্ভর কবে।

ঙ. 'বিশ্ব বাণিজ্যের তীর্থক্ষেত্র' এই কাবা। বলা যেতে পারে পেট্রল ছাড়া আর সব কিছু বিদেশ থেকে সৌদি আরবে আমদানী হয়। এখানে মুসলিম দেশগুলির অধিকার সর্বাগ্রে। ১৯৮২ সালের হজ মৌসুমে দেখেছি পাকিস্তানের কাপড়ে মক্কা-মদিনার বাজার ছেয়ে আছে, কোরআন শরীফ সহ তাদের অন্যান্য বইপত্রের কদরও লক্ষ্য করেছি সর্বত্র। ছোটখাট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এসেছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। সুতরাং কাবাকে কেন্দ্র করে নিখিল মুসলিম জগতে এক অখণ্ড রাজনীতি অর্থনীতি ও বাণিজ্যনীতি গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে, সবার অলক্ষ্যে।

চ. এ ছাড়া কাবার যে বৈশিষ্ট্যটি আমার কাছে সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে তা হল কাবা একই সঙ্গে আল্লাহর এবং মানুষের, বেহেশতের

এবং পৃথিবীর। পৃথিবীর মাটিতে স্থাপিত হয়েও সে যেন এই পৃথিবীর নয়, তার সর্বাঙ্গে অনন্তের সৌরভ। এর বিশাল চত্বরে এসে দাঁড়ালেই যেন মঙ্গলময় মহান আল্লাহর সঙ্গে অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়, সেই অনির্বচনীয়কে যেন নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করা যায়, একান্ত আপন করে পাওয়া যায়। সুতরাং কাবা যেন জাগতিক এক বেতার প্রেরক যন্ত্র অথবা টেলিফোন ভবন অথবা উপগ্রহ—আল্লাহ-সংযুক্তির এক পবিত্রতম মাধ্যম।

ছ. কাবা একই সঙ্গে প্রেরক যন্ত্র এবং গ্রাহক যন্ত্রও। মানুষের কথা যেমন আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়, মানুষের আর্জি যেমন শোনেন আল্লাহ—মানবচিত্তও সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যান তাঁর রহমত, তাঁর পরম প্রশান্ত অদৃশ্য পরশ। সুতরাং কাবা মহান আল্লাহর কাছে সমূহ আবেদন নিবেদনের এবং তার ফলশ্রুতির এক অনন্য মাধ্যম।

জ. সবার উপরে আছে আল্লাহর আদেশঃ হজ উপলক্ষে কাবায় সমবেত হও। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশে কাবা এমন এক গৃহে পরিণত হয়েছে, যেটি হয়েছে বিশ্বমুসলিমের প্রাণকেন্দ্র, তাদের সমগ্র শক্তি ও সাধনার উৎস, সমগ্র চিন্তা ও চেতনার বিকাশক্ষেত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মিলনভূমি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের ধারক ও বাহক, একই লক্ষ্য ও পথে বিশ্বমুসলিমের পরিচালক। এই পটভূমিতে কাবাকে যখন প্রত্যক্ষ করি, কাবা আর তখন কয়েকটি পাথরের সমষ্টি একটি গৃহ মাত্র নয়, পরিণত হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম বিপুল মঙ্গল-মুখী এক মহাশক্তির উৎস কেন্দ্রে—যার তুলনা নিখিল বিশ্বে আর দ্বিতীয় নেই।

পাথর থেকে বিপুল প্রাণপ্রবাহ ঝরে পড়তেই থাকে—তা অব্যয়, তা অক্ষয়। বিশ্বমুসলিমে যখনই কোন বিপর্যয় দেখা দিয়েছে কাবা থেকে তারা শক্তি সঞ্চয় করেছে।

আজ রাইপুরের জনাব আইয়ুব আলি সাহেবের সঙ্গে কাবা শরীফে দেখা। রাতে বাসায় এসে দেখা করে গেলেন, সঙ্গে সাঁড়াপুল মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তিনিও হজে এসেছেন। সকলেই প্রায় পাশাপশি মিসফালায় আছি।

বাজার থেকে আজ এক সেট সৌদি পোষাক ক্রয় করলাম আঠাশ রিয়েল দিয়ে। সৌদি পোষাক বলতে আজানুলম্বিত ঢিলা পিরহান আর একটি পাজামা, অবশ্যই সাধারণ শাদা কাপড়ের। রসুলুল্লাহ স এই শাদা রংটাই বেশি পছন্দ করতেন। তখন কে জানত, আজ থেকে এই পোষাকই হবে আমার অঙ্গের একমাত্র আচ্ছাদন।

৪ অক্টোবর ৮২। ১৭ আশ্বিন ৮৯। ১৬ জিলহজ ১৪০২। সোমবার

কাল রোদে চারবার তওয়াফ করে এমনই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এলার্ম ঘুম ভাঙিয়ে দিলেও রাত চারটেয় উঠতে পারলাম না। স্থানীয় মসজিদে জামাতে ফজরের নামায পড়ে নিলাম প্রথম সৌদি পোষাক পরে, কাবাতে জোহরও পড়ে এলাম ঐ পোষাক পরে। মগরিব এবং এশাও। আজ আসরের পর একজন পাকিস্তানীকে ডুকরে কাঁদতে দেখলাম আল্লাহর কাছে, মগরিবের পর তওয়াফের মধ্যে এক অচেনা মহান মানুষকে প্রায় পাগলের মত দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করতে দেখলাম কাবার সামনে। কতজন কতজনের দুঃখ ব্যথা ফরিয়াদ জানাচ্ছেন মহাপ্রভুর দরবারে। এদের মধ্যে কত অলি আউলিয়াও আছেন, আছেন পীর গওস কুতুব!

প্রতি ওয়াক্তে এক বা একাধিক জানাজা থাকেই। আজ এশার পর জানাজার নামায হল তিনজনের। এঁরা কত সৌভাগ্যবান! এঁদের নামাযে ইমামতী করলেন কাবার ইমাম, অংশগ্রহণ করলেন কয়েক লক্ষ হাজী সাহেব। পৃথিবীর আর কোথাও কোন জানাজায় এত হাজী শরীক হবেন না।

৫ অক্টোবর ৮২। ১৮ আশ্বিন ৮৯। ১৭ জিলহজ ১৪০৮। মঙ্গলবার

কেবল মক্কায় নয় সম্পূর্ণ সৌদি আরবে কোথাও সিনেমা হল নেই, থিয়েটার নেই—এগুলি নিষিদ্ধ, হারাম। যাঁরা পানাসক্ত, নিরুপায় হয়ে পড়েন তাঁরাও—সারা দেশে কোথাও মদ পাওয়া যায়

না। শুনলাম, আজকাল আমাদের মত শয়তান হাজীদের দ্বারা কিছু কিছু অত্যন্ত গোপনে চোরাগোপ্তা এসে যাচ্ছে। এজন্যে ভারতীয় এবং বাংলাদেশী হাজিদের বিশেষ বদনাম রয়েছে। অবশ্য কঠোর সতর্কতার ফাঁক দিয়ে ছিটেফোঁটা যা আসছে তা ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না এবং তাও বন্ধের সব রকম চেষ্টা চলছে। এই যে সিনেমা-থিয়েটার-মদহীন একটা দেশ—আমাদের মহাপণ্ডিত বুদ্ধি-জীবীদের বিদ্যায় ও বিচারের নিরিখে এই দেশের ত কোন সাহিত্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতি থাকতেই পারে না, অন্তত থাকা উচিত নয়। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আরবী সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিশ্বের উন্নততম মানের অন্যতম অংশীদার। তাদের সাহিত্য, তাদের কৃষ্টিসংস্কৃতি তাবৎ বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করে। আজ সৌদি আরব জীবনের কোন ক্ষেত্রে মর্যাদায় পিছিয়ে নেই, উন্নততম পর্যায়ের দেশগুলি তাদের রীতিমত সমীহ করে কথাবার্তা বলে এবং দিবারাত্র তোয়াজ করে চলে। সুতরাং মদ না হলে আধুনিক হওয়া যাবে না, সিনেমা-থিয়েটার না থাকলে সংস্কৃতি বিলুপ্ত হবে তথা কথিত বুদ্ধিজীবীদের এইসব ‘ছেঁদো বুলিগুলি’ কতখানি ‘মূল্যবান’ অর্থ বহন করে তা রীতিমত ভেবে দেখাব মত। অথচ আশ্চর্য তর্কের খাতিরে কূটচাল বিস্তারে এই মামুলি কথাগুলির ধূর্ত-ব্যবহারে আমরা প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি এবং হয়ে-চলেছি।

সৌদি আরবের এই যে শক্তি এর উৎস কি? এ শক্তি এল কোথা থেকে? এ কি কেবল পেট্রলজাত? পেট্রল অবশ্যই আর্থিক শক্তির উপাদান, আত্মিক শক্তির নয়। আত্মিক শক্তি, যা সৌদি আরবের সমগ্র ক্ষমতার উৎস, তা তারা অর্জন করেছে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ‘সিরাতম মুস্তাকিম’ থেকেই। তাদের সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে শরিয়তের উপর ,তাদের অর্থনীতি শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ কোরআন ভিত্তিক, তাদের ধর্মীয় এবং ব্যবহারিক জীবন সম্পূর্ণ রূপে কোরআন এবং হাদিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। অযথা শৈথিল্য নেই, অযথা গোঁড়ামিও নেই—ভণ্ডামিকে তারা

একেবারেই বর্জন করেছে। আর এ সব কিছুই চিরকালীন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর সত্য চিরকাল মিথ্যার উপর জয়ী হয়।

আজ তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়লাম আল কাবায়। পড়লাম জোহর মগরিব এবং এশা। এসে থেকেই দেখছি আসরের জামাত প্রায়ই পাই না। জোহর পড়ে ক্লান্ত হয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে উঠতে উঠতে আসরের জামাত শেষ হয়ে যায়। কাবা শরীফ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থানের জন্যেই অধিকাংশ সময় আসর বাদ পড়ে। এবার যদি কখনো আল্লাহ এই পবিত্র শহরে এই অধমকে আনেন, ইনশাআল্লাহ কাবার অতি সন্নিকটে থাকার চেষ্টা করব, আযানের সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেও যেন জামাত পাওয়া যায়।

কাবার দিকে তাকিয়ে একটু নিবিষ্ট হলেই দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকে। পাশের লোক কি ভাববে বা কি মনে করবে এমনতর চিন্তা মনে উঁকি দিলেই সঙ্গে সঙ্গে সবার অলক্ষে অশ্রুর ফোটা মুছে নিই, কখনো বা অন্যের গভীরতর আকুল কান্না দেখে আমি নিজে যেমন অশ্রু সিক্ত হয়ে উঠি তেমনি আমার ক্রন্দন দেখে যাতে অন্যেরা পার্থিব আলাপ-আলোচনা বন্ধ রেখে আল্লাহতে মগ্ন হয় তার জন্যে আপনার অশ্রুপ্রবাহকে উন্মুক্ত রাখতে ইচ্ছে করে। আল্লাহ যেন এই অশ্রুর মধ্যেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন.!

৬ অক্টোবর ৮২। ১৯ আশ্বিন ৮৯। ১৮ জিলহজ ১৪০২। বুধবার

মক্কার পথে পথে অলিতে গলিতে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা অসংখ্য হোটেলের প্রবেশ মুখ এখন স্তব্ধ। লোক সংখ্যা যত কমছে, এদের সংখ্যাও বিলীয়মান হচ্ছে সেই পরিমানে। স্থায়ী হোটেলগুলি খরিদ্দার সামলাতে এখন রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। এসব হোটেলে পঁচিশ ত্রিশ কেজি ওজনের আস্ত দুম্বা গোটা রোস্ট হচ্ছে একদিকে, অন্যদিকে পাঁচ সারিতে রোস্ট হচ্ছে গোটা পঞ্চাশেক আস্ত মুরগী। গোটা দুম্বা বা বড় খাসি রোস্ট হতে জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আর একপ্রকার কাবাব হতে দেখলাম শিক জাতীয়, এক সঙ্গে এক

শিকে প্রায় এক মণ গোশত গাঁথা, মাঝে মাঝে চর্বির স্তর, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধারগুলি পোড়ান হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে রোস্ট হওয়া গোশত কেটে মশলাসহ গরম গরম পরিবেশিত হচ্ছে প্লেটে প্লেটে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের কিছু লোক মক্কার বিভিন্ন স্থানে হোটেল করেছেন। এসব হোটেলে কলকাতা-ঢাকা-করাচির সব রকম খাদ্য পরিবেশিত হতে দেখলাম—বিরিয়ানী কিমা-গোশত ডাল-গোশত ভাত-রুটি চাপাতি-পারাটা—ঠিক যেন আপনি কলকাতার কোন রেস্তোরায় বসে আরামে পরিপাটি খাওয়ায় মগ্ন।

রাস্তার ধারে ধারে আর এক শ্রেণীর জনপ্রিয় হোটেল আছে, এসব হোটেলে পাওয়া যায় বিশিষ্ট আরবীয় রীতির ধূমপান—হুঁকা। বিরাট আলবোলায় তামাক সাজা কল্কে বসিয়ে দিয়ে যাবে হোটেল বয়েরা, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আবা পরা সৌদিরা বসে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিশ্চিন্তে পরম আরামে টানছেন আর গল্প করছেন, এমন ভাবে গল্প করছেন যেন নিজের বাড়ি, হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরুতে হবে না আর, এমনই নিরুদ্বেগ চিত্ত। এক কল্কে শেষ হলে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে আরো, প্রতি কল্কে এক রিয়েল, যেমন ইচ্ছা যত ইচ্ছা পান করুন গল্প করুন মশকরা করুন, কেউ কিছু বলবে না।

সৌদিরা কি একটু বেশি মাত্রায় গল্পগুজব ভালবাসেন?

সেদিনও বসে বসে গল্প করছিলেন কয়েকজন কুরেশ সর্দার। পরিবেশ বেদনাদীর্ণ, খোশ মেজাজে ছিলেন না। ম্লান চোখগুলি ঘুরছিল কাবার দিকে, অপমানে মলিন মুখ, পরাজয়ে নত শির, দৃষ্টিরা বিষণ্ণ। বসে বসে নিজেদের অপমান হজম করছিলেন সকলে আর বাক্যালাপ করছিলেন মৃদুকণ্ঠে। ছিলেন আবু সুফিয়ান, ছিলেন এতাব ইবনে উসাইদ, হারেস বিন হেশাম এবং আরো কয়েকজন। সকলেই কুরেশ নেতা, কুরেশ সর্দার, সম্মানীয় ব্যক্তি। গতকাল পর্যন্ত কাবা শরীফ তাদের ছিল, ছিল তাদের অহংকারেব কেন্দ্রবিন্দু। আজ মক্কা বিজয়ের দিন। আজ তা চলে গেছে মা আমিনার এতিম মুহম্মদ স-এর হাতে, সেই লোকটার হাতে যাঁকে

তাঁরা সমবেত ভাবে একদিন মেরে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। গণ্যমান্য সর্দারেরা বসে বসে সে সব কথাই আলোচনা করছিলেন।

বিজয় সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর আল্লাহর রসূল হযরত বেলালকে আযান দেবার নির্দেশ দিলেন। পবিত্র বায়তুল্লাহর ছাদে উঠে গেলেন হযরত বেলাল, তারপর মুসলিম বিশ্বের প্রথম মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে উচ্চারিত হল আল্লাহর মহান পবিত্রতা, হাজার হাজার জিন্দাদিলে হিল্লোল তুলে সেই শিরিন সুর কাবার চত্বর পেরিয়ে ছড়িয়ে গেল দূরে বহু দূরে। যে সমস্ত অবিশ্বাসী সর্দার হযরত মুহম্মদ স-কে আল্লাহর রসূল বলে মানতে কিছুতেই সম্মত নন এবং যাঁরা এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে নিশ্চুপ ছিলেন, এই আযান তাঁদের অন্তরে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিল। এটাকে কিছুতেই তাঁরা সহ্য করতে পারছিলেন না। কাবার চত্বরে বসেই এতাব ইবনে উসাইদ মর্মবেদনায় আফসোসে ফেটে পড়লেন। বললেনঃ "আমার পিতা (উসাইদ) আজ এ পৃথিবীতে নেই। ভালই হয়েছে, তাঁর ইজ্জত রক্ষা হয়েছে—এই আওয়াজ (আযান) তাঁকে শুনতে হল না।" ইবনে হিশাম। অন্য একদল কুরেশ নেতা বললেনঃ "এখন আর বেঁচে থাকা অর্থহীন।" —এসাবাঃ তাযকিরাতু এতাব বিন উসাইদ। এই সব আত্মগর্বী কুরেশ সর্দারগণ কিছুতেই আবদুল্লাহর পুত্রকে আল্লাহর রসূল বলে স্বীকার করতে রাজি নন। কি আছে ঐ লোকটার মধ্যে যে তিনি আল্লাহর নবী হবেন?

এই দলের মধ্যে ছিলেন হারেস বিন হাশেম। আযান শুনে তিনি বললেনঃ আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি যে এটাই সত্য তবে তা মেনে নেওয়াই ভাল। আবু সুফিয়ান বললেনঃ আমি কোন কথাই বলব না, যদি কিছু বলি তবে এই পাথরের কণাটুকু পর্যন্ত গিয়ে মুহম্মদ স-কে সংবাদ দেবে যে কে কি বলেছে।

সমবেত কুরেশ সর্দারেরা আবু সুফিয়ানের এই কথাকে একেবারে বাজে ও অর্থহীন বলে মনে করলেন। তাঁরা সকলে মিলে কথাবার্তা বলছেন এমন সময় রসূলুল্লাহ স এগিয়ে এলেন সেদিকে। তাঁদের সন্নিকটে এসে মৃদু কণ্ঠে বললেন এখানে যেসব আলোচনা হয়েছে

তা তাঁকে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর তিনি যে যা বলেছেন একে একে হুবহু সব কথাই বলে দিলেন। সমবেত কুরেশ সর্দারেরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে তাঁরা বললেনঃ আমাদের এখানে ত আর কেউ ছিল না যে গিয়ে আপনাকে সংবাদটি অবগত করাবে। নিশ্চয়ই আপনার এই জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ হতে এবং এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে আপনি আল্লাহর রসুল।

সেইখানে সেই মুহূর্তে ইসলামের বড় শত্রু এতাব ইবনে উসাইদ এবং হারেস বিন হাশেম কলেমা শাহাদাতে কণ্ঠ মিলিয়ে ইসলাম প্রচারের বড় শক্তিতে পরিণত হলেন। আর আবু সুফিয়ান ত পূর্বাহ্নেই মুসলমান হয়েছিলেন।

৭ অক্টোবর ৮২। ২০ আশ্বিন ৮৯। ১৯ জিলহজ ১৪০২হি। বৃহস্পতিবার

আজ প্রথম দেখলাম ফজর এবং জোহরে কোন জানাজা হল না অর্থাৎ হজযাত্রীদের মধ্যে আজ কেউ ইন্তেকাল করেন নি। আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন! সকলে যেন সহি সালামতে স্বদেশ-স্বজনের মাঝে হাসি মুখে ফিরে যেতে পারেন।

আজ কাবার এক ইমামের সঙ্গে মুসাফাহ্ করলাম, আরো দু-একবার ভাল ভাবে তাঁর চেহারা মুবারক লক্ষ্য করার সৌভাগ্য হয়েছে, সর্বাঙ্গে ভোরের শেফালির মত এক পবিত্রতা ছড়িয়ে রয়েছে। দেহ শীর্ণ কিন্তু কণ্ঠে মধু ঢালা। কোথা থেকে যে তিনি এই কণ্ঠ পেয়েছেন! নিখিল বিশ্বের তাবৎ কোকিল যেন এক সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে স্বপ্নের মধ্যে কথা কয়ে ওঠে। তিনি যখন নামায পড়ান মনে হয় সুদূর আকাশ হতে এক জান্নাতি কণ্ঠ কালামপাক পাঠ করছেন, আর সেই সুরের স্রোত গগন-পবন আপ্লুত করে অবিরল ধারায় পৃথিবীতে নেমে আসছে। সেই পাঠে লক্ষ লক্ষ নামাযী-শ্রোতারা তন্ময় হচ্ছেন, মুগ্ধ হচ্ছেন, নামাযের মধ্যে গভীরতর ভাবে নিমগ্ন হচ্ছেন, কেউ কেউ আবার ক্রন্দনাকুল। আল্লাহর

কালাম সঠিক উচ্চারণে ধীর স্থির ও মধুর এলাহানে পাঠ করলে শ্রোতাদের মনে কি অপরিসীম প্রভাবই না বিস্তার লাভ করে! এই ইমাম সাহেবের কণ্ঠে সুর নানান ভাবে খেলা করে বেড়ায়। কখনো তিনি কোন উচ্চারণে টান দিয়ে সুরকে একেবারে উন্মুক্ত করে দেন, কখনো আবার সেই সুরকে প্রয়োজনের প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। এমন মধুর কোরআন শরীফ পাঠ শুনে বার বার মনে হয়েছে, আমার মৃত্যু শয্যায় যদি এমন ভাবে কেউ সুরে ইয়াসীন পড়ে শোনান, ইনশাআল্লাহ্ আমি মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলে ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ব! আমি আমার প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যাব!

আল্লাহর কালাম পাঠের অপূর্ব প্রতিক্রিয়া ও মোযেজা ত রসুলুল্লাহ স-এর মাধ্যমে বার বার জ্বলন্ত সত্য হয়ে উঠেছে। সেই গুণীন লোকটির কথাই ধরা যাকঃ

জেমাদ ইবনে সালা, মহামন্ত্রবিদ ওঝা, বিখ্যাত গুণীন। তাঁর সময়ে সারা আরবে তিনি এক জীবন্ত কিংবদন্তী। এমন মহামন্ত্রবিদ গুণীন ওঝা কালে ভদ্রে কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁর উপর সমগ্র আরব জাহানের এমনই বিশ্বাস। মন্ত্রের সাহায্যে তিনি অসাধ্য সাধন করেন, ভূত-পেত ত সামান্য কথা—তাঁর যাদু মন্ত্রে পলকে প্রলয় ঘটে যায়। সেই অসাধ্য সাধনকারী বহু বিখ্যাত জেমাদ এলেন ভূত ছাড়াতে। তাঁর কাছে সংবাদ গেছে যে হযরত মুহম্মদ স-এর ঘাড়ে এক মস্ত ভূত বাসা বেঁধেছে, তাই তিনি বহু সম্মানীয় দেবদেবীর বিরুদ্ধে বলছেন যা তা।

আজদ গোত্রের জেমাদ হযরতের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন দেখুন মুহম্মদ স—আপনার ঘাড়ে যে মস্ত ভূতটি চড়ে আছে এবং যে আপনাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দিচ্ছে আমি তাকে ছাড়াতে এসেছি, এখন ঠিকঠাক সোজা হয়ে বসুন।

ধৈর্যের প্রতিমূর্তি রসুলুল্লাহ স শান্ত হয়ে, এই সব আজগুবি কথাবার্তা শুনলেন তারপর অত্যন্ত স্থির কণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে—এতকষ্ট করে যখন এতদূর পথ এসেছেন—আপনার কথা শুনব। তার আগে আপনিই একটু বসুন শান্ত হয়ে আর এই সময়

আমার দু-একটি কথা শুনুন। এরপর হামদনাত পাঠ শুরু করলেন রসুলুল্লাহ সঃ 'আল হামদো লিল্লাহে, নাহ্মাদুহু অ নাসতাঈনুহু'—এই পর্যন্ত বলার পর একটু থামলেন, বাতাসে তাঁর সুমধুর কণ্ঠধ্বনি তখনো হিল্লোলিত হয়ে ফিরছিল। গুণীন জেমাদ এইটুকু মাত্র শ্রবণ করেই রুদ্ধবাক, মুগ্ধ। ভূত বশ করতে এসে নিজেই বশীভূত। ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, মুহম্মদ স আর একবার পড়ুন দেখি। প্রথম থেকে শুরু করে কালাম পাকের দু-একটি আয়াত পাঠ করলেন রসুলুল্লাহ স, আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে জেমাদ বলে উঠলেন, এ কি শুনলাম! একি শুনলাম!! অনেক মন্ত্রপাঠ শুনেছি. অনেক কবিদের রচনা আবৃত্তি শুনেছি কিন্তু একি! এ ত সমুদ্রের ন্যায় গভীর, আকাশের মত সীমাহীন। এ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর বাণী! মুহম্মদ স—হস্ত প্রসারিত করুন, এ দীন জেমাদ আজ হতে মুসলমান!

আল্লাহর বাণীর অনন্ত প্রভাব এবং অলৌকিক প্রতিক্রিয়া বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। আজো, বর্তমান বিশ্বের নানান প্রান্তে নানা ভাবে অসংখ্য হৃদয়ে এই ঐশী গ্রন্থের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়ত হয়ে চলেছে। এ বাণী চিরসত্য, অবিনশ্বর!

৮ অক্টোবর ৮২। ২১ আশ্বিন ৮৯। ২০ জিলহজ ১৪০২। শুক্রবার

সম্ভবতঃ বিশ বা বাইশ অক্টোবর আমাদের পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জম ছেড়ে মদিনা মনোয়ারার অভিমুখে যাত্রা শুরু করতে হবে। সেই বিচ্ছেদের দিনটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। যত এগিয়ে আসছে মন বিষণ্ণ হয়ে উঠছে ততই। ভারি আর ব্যথাতুর হচ্ছে। চিরদিনের মত মক্কা ছেড়ে চলে যেতে হবে! এই পাপ চোখে কাবাকে আর দেখতে পাব না কোন দিন? কেমন হবে সেই দিন, কি করব আমি বিদায়-মুহূর্তে এসব কথা এখন আর ভাবতেই পারছি না। স্থির চিন্তা ভাবনার মানুষ বলে আমার একটা অখ্যাতি আছে কিন্তু এখন সব কিছু গোলমাল

হয়ে যাচ্ছে। এমনি করে প্রতিনিয়ত মানুষের জীবনের শেষ দিনটি অনিবার্য ভাবে এগিয়ে আসছে। এবং সেদিন তাকে এই মনোরম পৃথিবী ছেড়ে চিরতরে চলে যেতে হবে, মায়া-মহব্বত প্রেম-প্রীতি স্নেহ-ভালবাসা মুহূর্তে সকল বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে, পড়ে থাকবে সকল কিছুই, সঙ্গে যাবে কেবল আমলঃ সৎ এবং অসৎ—বদ এবং নেক। পৃথিবীর ফলবান ফসলর ক্ষেত্রে যে যেমন কর্ষণ ও চাষাবাদ করে যাবে, ফল পাবে অনুরূপ, এতটুকু বেশি নয় এতটুকু কম নয়। আল কাবার কর্ষণ ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কোন বীজই বপন করে যেতে পারলাম না, সব কিছুই অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। নামায ত্রুটি পূর্ণ, তওয়াফ হৃদয়হীন, দর্শনও প্রীতি শূন্য। আর হজ? সম্ভবত সব চেয়ে আবিল। কেবল ত্রুটিপূর্ণ নয়, একেবারে খোঁড়া এবং বিকলাঙ্গ. আল্লাহর অনন্ত রহমত ছাড়া এমনতর হজ কখনো কবুল হতে পারে না। .. প্রভু গো! শত কোটি ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে ক্ষমা করে আপনি কি আমাদের এই দীন হজকে কবুল করে নেবেন না?

প্রতিটি মানুষের জীবনে আর একটি মহাদিন অতিদ্রুত এগিয়ে আসছে, মক্কা ছেড়ে যাবার দিনটির মত, পৃথিবী পরিত্যাগের শেষ ক্ষণটির মত অকস্মাৎ শোনা যাবে এক মহাগর্জ্জন, তারপর সকলেই দেখতে পাবে সেই প্রতিশ্রুত মহাদিনটিকে, শেষ বিচারের দিন, রোপিত ফসলের হিসাব নেবার দিন। সেদিন কি ঘটবে আমি জানি না। আপনি মারুন কাটুন যত ইচ্ছা সাজা দিন যা আপনার বিচার হয় করবেন কিছু বলার নেই আমার। কিন্তু প্রভু! আপনার অসীম জ্যোতিঃপুঞ্জে সিজদায় লুটিয়ে এ গুনাহগার শুধু বলতে চায়ঃ লাব্বায়েক—এ অধম গোলাম হাজির, সব চেয়ে নাদান মূর্খ এবং পাপী তার সব পাপ আর কলঙ্ক নিয়ে আপনার মহান দিদারে হাজির।

দিনগুলো যে কত দ্রুত কি ভাবে কেটে যাচ্ছে!

৯ অক্টোবর ৮২। ২২ আশ্বিন ৮৯। ২১ জিলহজ ১৪০২। শনিবার

ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্যে ভাল কোরআন শরীফের অন্বেষণে চলে এলাম মক্কার পুস্তক বাজারে। পথের দু পাশেই অবশ্য কোরআন শরীফ ঢালাও বিক্রি হয়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রণ, বিভিন্ন আকার, যেটা ইচ্ছা কিনে নিলেই হয়। আমি বেছে বেছে দামেস্কে মুদ্রিত একটি ছোট আকারের কোরআন শরীফ কুড়ি রিয়েলে পছন্দ করলাম। আর একটি কালাম পাক ক্রয়ের জন্য বিশেষ ভাবে লুব্ধ হলামঃ বড় আকার, প্রতিটি পৃষ্ঠা বর্ণবহুল, পাঁচ রঙে মুদ্রিত, একেবারে নয়নাভিরাম কিন্তু দাম শুনে হাত গুটিয়ে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে—দু শো রিয়েল, ছ শো টাকা! মক্কায় বসে যা আমার কাছে স্বপ্ন মাত্র!

এশার নামায শেষে প্রতিদিনের মত শুরু করলাম তওয়াফ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছিল শুরু থেকেই, একটু পরে এল চেপে। বৃষ্টি না যত—তার অধিক বিদ্যুতের ঝিলিক এবং সশব্দ বজ্রপাত। আর সে কত! একেবারে মুহূর্মুহু। আমার জীবনে আর কখনো এক সঙ্গে এত বজ্রপাতের সম্মুখীন হয়েছি বলে বিশেষ মনে পড়ে না। আর এই বজ্রপাতে আমার ভীষণ ভয়, সম্ভবতঃ অন্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি। বাড়িতে থাকলে এমন দিনে দরজা জানালা বন্ধ করে দিই, কখনো বা বিদ্যুতের তীক্ষ্ন ঝলকানি এড়ানোর জন্য চোখে কাপড় জড়িয়ে রাখি। তা ছাড়া বৃষ্টিও সহ্য হয় না আমার, একটু ভিজলেই সর্দি, জ্বর। সুতরাং না ভিজে এবং কিছুটা বিদ্যুতের শাসানি এড়াবার জন্যে আমি তওয়াফ ছেড়ে মসজিদের ভিতর উঠে এলাম। অসংখ্য লোকের ভিড়ে ছাদের তলায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়ার পর আমার মনে দারুন এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। মনে হল, আমার মত ভীরু কাপুরুষ আর দ্বিতীয় নেই। সকলেই ভিজে ভিজে মহানন্দে তওয়াফ করছেন, বজ্রের ঝিলিক এবং হুংকার পদতলে পিষ্ট করে তওয়াফের রেখায় তাঁরা অটল এবং নির্ভিক। আমার এই ঘৃণ্য পলায়নী মনোবৃত্তির কথা

ভেবে আমি ব্যথিত হলাম। মনে হলঃ আমার ঈমান অত্যন্ত দুর্বল, সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হলে হয়ত এমন করে তওয়াফ ছেড়ে চলে আসতাম না। স্ত্রী কিন্তু ভিজে ভিজে সেই বজ্রবিদ্যুতের ভয়াল ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তওয়াফ করেই চললেন।

বজ্র বিদ্যুতের ভয়ঙ্কর এই দুর্যোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার আরো একটি কথা মনে হল হঠাৎ। কাবা শরীফের উপর কি কখনো বজ্রপাত হয়েছিল? এবারের বর্ষায় কালীঘাটের মন্দিরে বজ্রপাত হয়েছিল এবং তাই নিয়ে সে এক হুলুস্থূল কান্ড। অতীতে আরো কোন কোন সময়ে বজ্রঘাতে এই মন্দির এবং প্রতিমা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল সে সময়কার সংবাদপত্রে—যতদূর মনে পড়ে। আমি এই সংবাদ পরিবেশন করছি কারো মনে কোন আঘাত দেবার জন্যে নয় বা কোন ধর্মকে হেয় করার জন্যে নয়। কাবার এই প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে এই দুর্যোগপূর্ণ রাতে হঠাৎ এই সব কথা একের পর এক মনে পড়ছে। আজ পর্যন্ত আল হারামে একটিও বজ্রপাত ঘটেনি এবং অধিকতর আশ্চর্যের বিষয় বজ্রনিরোধক কোন ব্যবস্থা নেই এখানে। কাবার ব্যাপারে এটি কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। এই পবিত্র গৃহের ভার স্বয়ং আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। অহংকারী আবরাহার কথা ত কারো অজানা নেই। কাবা ধ্বংস করতে এসে বিশাল সৈন্য ও হস্তীবাহিনী সহ তার মর্মান্তিক মৃত্যু আজো সমানে সকলের ঘৃণার উদ্রেক করে।

তবে কি কাবা কোন দিন ধ্বংস হবে না? এ গৃহ কি চিরস্থায়ী? হাদিসে এই জটিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। কিয়ামতের কিছু পূর্বেই এই পবিত্র গৃহের ধ্বংসের সুস্পষ্ট ইংগিত পাই কয়েকটি হাদিসে। সেখানে উল্লেখিত হয়েছেঃ এক কালো স্থূলকায় হাবশী যার পায়ের গোছা মোটা সে এসে কাবাকে ধ্বংস করবে। সম্ভবতঃ এমন ঘটনা যখন ঘটবে, বাধা দেবার জন্যে একজন মুমেনও পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে না তখন।

১০ অক্টোবর ৮২। ২৩ আশ্বিন ৮৯। ২২ জিলহজ ১৪০২। রবিবার

ঠিক রাত আড়াইটায় ঘুম ভেঙে ছিল। আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন, সকলেই গভীর ঘুমে মগ্ন। একবার ভাবলাম, এই গভীর রাতে চলে যাই কাবায়, নামাযে মগ্ন হয়ে যাই সেখানে, অথবা তওয়াফে, অথবা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি স্বপ্নের সেই ধনকে। এই সব ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। চকিতে জেগে ওঠা চেতনা আবার হারিয়ে গেল। ঘুম ভাঙল চারটেয়, উঠি উঠি করে সাড়ে চার। ভাবলামঃ আজ আর কিছুতেই বায়তুল্লাহতে গিয়ে জামাত পাওয়া যাবে না, নিকটবর্তী মসজিদের জন্য তৈরি হয়ে ঘর থেকে বার হলাম। আর আল্লাহর কি অসীম রহমত, রাস্তায় নেমেই পেয়ে গেলাম বাস, দু মিনিটেই কাবা শরীফ। কিছু পরে আযান হল, সুন্দর ভাবে নামায পড়লাম। মেঘ ভাঙা উজ্জ্বল দিনের মত মনটা প্রবল ভাবে প্রসন্ন হয়ে উঠল।

সকালে কিছু টুকিটাকি লেখার কাজ ছিল, সেগুলি শেষ করলাম। মগরিব এশা জামাতে, প্রচুর কান্নাকাটি। আল্লাহর কাছে রাত দিনের প্রার্থনাঃ হে আল্লাহ! আপনি আমায় প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতা হতে বাঁচান। দুর্বল ঈমান হতে রক্ষা করুন, নামাযে অটল রাখুন, দৃষ্টি জিহ্বা এবং ইচ্ছা যেন সংযত পবিত্র হয়। আপনার সৃষ্টির প্রতি কখনো যেন অন্যায় না করি, অন্যায় যেন না সই, আর? আর সেই প্রতিশ্রুত মহাদিনে আপনার পবিত্রতম দিদারের আকুল প্রার্থী।

বায়তুল হারামে কৃষ্ণকায়দের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছিল। ওদের সংখ্যা অনেক বেশি মনে হত এই কারণে যে ওরা দুজন একত্রে থাকলে অন্ততঃ দশজনকে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের প্রবণতা দেখিয়ে ভীত স্বন্ত্রস্ত করে রাখত। এখন ওরা একেবারে নেই বললেই চলে, প্রায় কাবা শূন্য করে চলে গেছে। চলে গেছে মিশরী ইরানী এবং তুর্কীরা। নিকটস্থ আরবদের কেউ নেই—আছেন কেবল পাকিস্তান বাংলাদেশ ভারত ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের লোকজন।

এ'রাও নিয়মিত চলে যাচ্ছেন যে যার তারিখ মত। এই যাওয়া সম্পূর্ণ হতে প্রায় নভেম্বর শেষ হয়ে যাবে।

আমার সামনেই মাকামে ইবরাহিম. স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সব কিছু। ইচ্ছে করলে আমি মাকামে ইবরাহিম স্পর্শ করে বসতে পারি কিন্তু ইচ্ছে করেই বসিনি, মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকলে সম্ভবতঃ সব কিছু স্পষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। এই সেই মাকামে ইবরাহিম, যার নিকটেই ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিন।

ইসলাম প্রচারের প্রথম যুগের সেই আশ্চর্য দিনগুলি এক একটি ইতিহাসের বিশাল পৃষ্ঠা হয়ে উল্টে যাচ্ছে একে একে। তখন পর্যন্ত কাবা গৃহের সম্মুখে কেউ উচ্চরবে কোরআন শরীফ পাঠ করতে পারতেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা এক শুভক্ষণে মহাসত্যে দীক্ষিত হলেন। দীক্ষিত হয়ে ঘোষণা কবলেন কাবা প্রাঙ্গণে তিনি উচ্চস্বরে 'সুরা রহমান' তেলায়ত করবেন। শুভানুধ্যায়ী সকলেই তাঁকে নিষেধ করলেন, মারাত্মক পরিণামেব বিষয়েও তাঁকে হুঁশিয়ার করা হল কিন্তু জিন্দাদিল এই সাহাবী সব কিছুই উপেক্ষা করলেন। যথা সময়ে নেমে এলেন কাবার পবিত্র চত্বরে, কাবাকে সম্মুখে রেখে এসে দাঁড়ালেন মাকামে ইবরাহিমেব সন্নিকটে, তারপর শুরু করলেন 'সুরা আররহমান' পাঠ। সুললিত কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়তেই কুরেশ দলপতিরা উৎকর্ণ হল, তারপর ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে। চতুর্দিক থেকে শুরু হল আক্রমণ—চড় কিল লাথি। আক্রমণের কেন্দ্রস্থল আবদুল্লাহর মুখমণ্ডল, যে মুখ দিয়ে কালাম পাকের মধুর ধ্বনি ক্রমাগত বাতাসে দোল জাগিয়ে বেরিয়ে আসছিল। দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব ছিল না, তবুও যতটা পাঠ করার ইচ্ছা করেছিলেন ততটাই পাঠ করলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তারপর মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আরো কিছু শিক্ষা দিয়ে চলে গেল মিথ্যার দল। প্রত্যাবর্তনের পথে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ দেখলেন তাঁর সারা মুখমণ্ডল অসম্ভব রকম স্ফীত হয়ে উঠেছে এবং ক্ষতবিক্ষত অংশ দিয়ে ক্রমাগত রক্ত ঝরছে।

কত তুচ্ছ কারণে আজকাল আমরা সতর্ক (!) হই, অহেতুক

ভয়ে সত্যের পথ থেকে নির্বিঘ্ন দূরত্বে সরে যাই,আর ইসলামের এই সব অকুতোভয় সেনানীরা সত্যের জন্য সেদিন হাসি মুখে জীবনকে বাজি ধরেছিলেন!

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছেঃ এই রক্তঝরা বৃথা যায় নি।

১১ অক্টোবর ৮২। ২৪ আশ্বিন ৮৯। ২৩ জিলহজ ১৪০২। সোমবার।

আজ জবলে নূর অর্থাৎ হেরা পর্বত দেখতে যাবার কথা ছিল। স্ত্রী সাধারণতঃ সকালে কাবায় যান না, আজ গেলেন। এ জন্যে আমরা উঠলাম রাত তিনটে ছেচল্লিশে। যথারীতি বাইরে বেরিয়ে দেখি বাদল হাওয়া, কিছুটা এলোমেলো ঝোড়ো ভাব। আকাশ মেঘে ভরা, যেকোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে। কাবার পথে চলতে চলতে দু-চার ফোঁটা বৃষ্টিও পেলাম। তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়ে যখন বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালাম, সোয়া পাঁচ। বেশ অন্ধকার তখনও। স্ত্রী এলেন একটু পরে। তারপর দু জনে কাউকে কিছু না বলে এক সঙ্গে আকাশের দিকে তাকালাম, বাদল ঘেরা আকাশ আমাদের সিদ্ধান্ত পাল্টে দিল। হেরা পর্বতে ওঠার সময় মাঝ পথে বৃষ্টি পেলে আর কোথাও যাবার উপায় থাকবে না। সুতরাং কাবা থেকে দ্রুত বাড়ি চলে এলাম। অল্প একটু ভিজেও গেলাম।

মক্কায়, আরব মরুতে এমন আকাশ দেখব আশা করিনি। একেবারে মেঘভারে ঝুলন্ত বাদল আকাশ, বর্ষায় মেঘমেদুর বাংলার আকাশের মত, সকালেই ঘন সন্ধ্যা হবার সংকেত, মেঘের ভারে শ্রাবণের নম্রনত আকাশ, সারাদিন রিমঝিম বৃষ্টি, বিরামহীন। আয়োজন চলছিল সকাল থেকেই, জোহরের পর এল চেপে, একটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত চলল একটানা, মক্কায় অতিদুর্লভ বর্ষণ। পাহাড়ী শহর তবুও বহু রাস্তায় পানি জমে গেল। কলকাতার মত জল-দীঘি না হলেও গাড়ির গতি শ্লথ হয়ে এল সকলের, প্রতিটি চালক সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাচ্ছেন যাতে তিনি কোন পথিকের

কষ্টের কারণ না হন। অথচ কলকাতার অনেক ড্রাইভার এমন সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তে চাইবেন না, পথিকের অঙ্গখানিকে তিনি একটু রাঙিয়ে দিয়ে যাবেনই!

হিমেল হাওয়ায় জোর ছিল সুতরাং রাস্তা-ঘাট জনবিরল। মক্কায় এসে আমরা তিন দিন বৃষ্টি পেলাম কিন্তু আজকের বৃষ্টি আকাশ এবং আবহাওয়া একেবারেই পৃথক। অন্য দুদিন বৃষ্টি হয়েছে এবং ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব কিছু পরিষ্কার। কিন্তু আজ চার পাঁচ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণের পরও আকাশের গাম্ভীর্যে কোন পরিবর্তন এল না, সে যেমন অখুশি ছিল, মুখে একরাশ অসন্তোষ মেখে ভয়ঙ্কর রকম বেজার হয়ে রইল, সবকিছু দেখে মনে হল এ মুখে সহজে হাসি ফুটবে না।

রান্না-খাওয়া এবং একটু বিশ্রাম সেরে অন্যান্য দিন আমরা সদলে বেরিয়ে পড়ি কাবার পথে, আসর মগরিব এশা এবং তওয়াফ সেরে বাসায় ফিরি দশটার কাছাকাছি। কিন্তু আজ? মগরিবের কিছু পূর্বে স্ত্রী বললেন, চলুন বেরিয়ে পড়ি, অন্ততঃ মগরিব-এশার জামাতটা পাওয়া যাবে তা হলে। একটু ভিজে গেলেই বা ক্ষতি কি?

ভিজতে হল না। সাড়ে পাঁচটার দিকে বৃষ্টি প্রায় ধরে এল, অল্পেসল্প যা পড়ছিল সেগুলিকে ফাউ বলা চলে। মগরিবের পর আমি আর স্ত্রী এক সঙ্গে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিম্নে, প্রাণভরে একটি সম্পূর্ণ তওয়াফ করলাম। কোথা থেকে এত অশ্রু আসে জানি না, অশ্রু সজল চোখেই আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম দু-জনেঃ প্রভু আমার! জীবনের ক্লেদ দূর করে পবিত্র করুন, বাকি দিনগুলিতে প্রতিষ্ঠিত করুন সুদৃঢ় ঈমানের উপর। কর্মে আল্লাহ, কথায় আল্লাহ, জাগরণে আল্লাহ, নিদ্রায় আল্লাহ, দুঃখে আল্লাহ, সুখে আল্লাহ, উল্লাসে আল্লাহ, বেদনায় আল্লাহ, শেষ নিঃশ্বাসে আল্লাহ, পুনর্জাগরণে আল্লাহ, মহাবিচারে আল্লাহ, কিয়ামতে আল্লাহ—আপনার অসীম জ্যোতিতে সিজদায় শির লুটিয়ে সোবহান আল্লাহ!

প্রভু আমার! দীন দুঃখী মুর্খ পাপীর ভিক্ষা কি কবুল হবে না!

১২ অক্টোবর ৮২। ২৫ আশ্বিন ৮৯। ২৪ জিলহজ ১৪০২। মঙ্গলবার।

আজ মিরাজ আর মনিরের চিঠি পেলাম। দেশের প্রথম চিঠি, মাটির গন্ধে ম ম করছে। সব কিছু শুভ। মিরাজ-মনির ঠিক মত নামায পড়ছে জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম, আল হামদোলিল্লাহ! আল্লাহ, আপনি আমার বংশধরদের সেরাতুল মুস্তাকিমের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখুন, তারা যেন তাদের জীবন-সম্পত্তি আপনার জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য কুরবান করে দিতে পারে।

আরো সুখবর, মনির টেস্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় হয়েছে। মিরাজ ঠিক মত হরফ দেখাশুনা করছে, অন্যান্য কাজকর্মও চলছে ঠিকমত। আশ্বিনের কাফেলা বেরুবে ২০ সেপ্টেম্বর।

আর চিঠি পেলাম রফিকউল্লাহর। ,আল্লাহ রফিকউল্লাহ এবং তাঁর পরিবারের সকলের মঙ্গল করুন!

কর্মকোলাহলে ক্লান্ত হয়ে আজকাল মাঝে মাঝে ভাবি এই বিশ্বসংসারে আমার কি কোন দোস্ত নেই, বন্ধু-বান্ধব? যার সঙ্গে দু দন্ড প্রাণ খুলে গল্প করতে পারি, বোঝা নামিয়ে হালকা হতে পারি? উত্তর খোঁজার, চেষ্টা করি। অলিতে গলিতে অন্বেষণ চলে, গভীরতম প্রদেশে জিজ্ঞাসার ডুবুরী নামে, উত্তর মেলে না। ধ্বনি কেবল ব্যর্থ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। মনে হয়ঃ এই মুহূর্তে কেউ-ই, যাকে দোস্ত বলা যায়, নেই। অথচ পরিচিতের সংখ্যা সীমাহীন। সকলের সঙ্গেই আন্তরিকতা সকলের সঙ্গে আলাপ অথচ কোথায় যেন একটা অদৃশ্য ব্যবধান। দুটি নদীর প্রবাহ একই সঙ্গে চলেছে পাশাপাশি অথচ মিশছে না, গোচরহীন দৃশ্যমান প্রাচীরে উভয়ে পৃথক, স্বতন্ত্র্য। আমার অন্তরের জমীন ঠিক মত কেউ দখল করতে পারছে না। তবুও এর মধ্যে যারা খুবই কাছাকাছি এসেছেন, রফিকউল্লাহ অবশ্যই তাদের অন্যতম। এই

দূর প্রবাসে একমাত্র তাঁরই চিঠি পেয়েছি এবং সে চিঠির আকুলতা আন্তরিকতা আমার সমগ্র হৃদয়কে স্পর্শ ও আপ্লুত করেছে।

চিঠি হাতে নিয়ে বহুক্ষণ তাঁর কথা ভাবলাম।

আজ প্রথম মধ্যাহ্ন মরুর রাগী সূর্যের মাঝে নেমে তওয়াফ করলাম। রোদের ভয়ে কোনদিন দাহন জ্বালা উপেক্ষা করে তওয়াফ করিনি, শীতল ছায়ায় বসে পাখার হাওয়ায় জোহর পড়ে চলে এসেছি। আজ প্রথম তীক্ষ্ন রৌদ্রের মাঝে নেমে তওয়াফ করলাম। তওয়াফ করতে করতে মনে হলঃ আজকের এই পরিবেশ ঠিক যেন কিয়ামতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কিয়ামতের আগুন জ্বলছে চারদিকে, মাঝে কাবা—যেন আল্লাহর আরশ—একমাত্র ছায়া, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ঐ ছায়ায় স্থান দেবেন, যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন। অন্যেরা দাবদাহে ছুটতে থাকবে, জ্বলতে থাকবে, কান্নাকাটি করবে, তাদের আবেদন-নিবেদন কোন কাজ হবে না। আখেরাতের জন্যে যাঁরা ঠিকমত মূলধন নিয়োগ এবং প্রাণপাত করবেন, তাঁদের ব্যবসাই লাভজনক হবে। পার্থিব লাভই যাঁদের একমাত্র কাম্য, আখেরাতে লোকসান তাঁদের জন্য অনিবার্য!

মধ্যাহ্নের তওয়াফে স্ত্রীও আমার সঙ্গে ছিলেন।

১৩ অক্টোবর ৮২। ২৬ আশ্বিন ৮৯। ২৫ জিলহজ ১৪০২। বুধবার।

গতকাল আমি তওয়াফ করেছিলাম এগারটা অর্থাৎ সাতাত্তর বার পবিত্র কাবাগৃহ পরিক্রমা করেছি এবং এর ফলে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে এলার্ম বাজা সত্ত্বেও কিছুতেই চোখ থেকে ঘুম ছাড়ছিল না। আধো ঘুম আধো তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ মনে হলঃ তা হলে কি আমি মক্কায় পড়ে আছি খাওয়া এবং নিদ্রার জন্য! এমন কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলে গেল। পলকে কোথায় চলে গেল ঘুম, কোথায় চলে গেল তন্দ্রা! একঘর অন্ধকার তাড়াতে একটুকরো মোমের আলোই যথেষ্ট। শুভ চেতনার শিখা হৃদয়ে জ্বলে উঠলে পাষাণ অন্ধকার—সে যত বিশাল এলাকা জুড়েই

থাক না কেন—দূরে হঠতে বাধ্য। পবিত্র বোধের উন্মেষ ঘটাই আসল কথা।

ঘুম থেকে উঠে অযু সেরে কাবায় চলে এলাম। তওয়াফের সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বাদশাহ ফাহাদের মধ্যম ভ্রাতা প্রিন্স আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজীজ এলেন, হঠাৎ রাজা এলেন সুতরাং বেশ কিছু সোরগোল পড়ে গেল জনতার মধ্যে। কার্পেট জাতীয় কিছু একটা বিছিয়ে দিতে চাইছিলেন একজন কিন্তু নিষেধ করলেন প্রিন্স আবদুল্লাহ, অন্যান্য সাধারণ তীর্থযাত্রীর মত পাথরের উপরেই নামায শুরু করলেন। রাজ পরিবারও ইসলামের সামান্যনীতির উর্ধে নন, দীন-দরিদ্র আমীর-উমরাহ সকলকে এক করে দিয়েছে ইসলাম। আর এই সাম্য কেবল গাল ভরা বাণীর মধ্যে সীমাবন্ধ নয়, বাস্তবের মাটিতে প্রতিদিন তার নবীনতর অংকুরোদ্গম প্রত্যক্ষ করছি। খুব ভাল লাগল প্রিন্স আবদুল্লাহর এই উদার মনোভাব। আল্লাহর কাছে আমাদের ত এমনই শূন্য অবস্থায় হাজির হতে হবে, কোন ধনরত্ন ও আভিজাত্য সঙ্গী হবে না।

মক্কা বিজয় সম্পূর্ণ। কাবা শরীফের দরজার দুদিকের দুটি বাজু ধরে দাঁড়িয়ে আছেন রসূলুল্লাহ স। সম্মুখে অসংখ্য পরাজিত কুরেশ নরনারী, পিছনে মুসলিম বাহিনী—বীর মুজাহিদ মুহাজির ও আনসার দল। এই প্রথম বারের মত জনারণ্যের সাধারণ সভায় ভাষণ দিলেন রসূলুল্লাহ সঃ "এক আল্লাহ ভিন্ন আর কোন উপাস্য নেই। তিনি তাঁর অংগীকার পূর্ণ করেছেন। জেনে রাখ, অদ্য হতে অন্ধকার যুগের সমস্ত গর্ব অহংকার সমস্ত রক্তের প্রতিশোধ এবং সমস্ত রক্ত পণের দাবী আমার পদতলে দলিত মথিত হয়ে বাতিল হয়ে গেল।"...

"হে কুরেশগণ! এখন আল্লাহ অন্ধকার যুগের গর্ব অহংকার ও বংশ আভিজাত্য বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। কারণ সমগ্র মানুষ আদমের বংশ আর আদম মাটি হতে।"...

এই অনবদ্য কালজয়ী ঐতিহাসিক ভাষণের মূল লক্ষ্য বিশ্ব-মানবের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা। কেউ ছোট কেউ বড় নয়, সব মানুষের

জন্ম মাটি থেকে। মাটির ত কোন গর্ব নেই অহংকার নেই আভিজাত্য নেই—সে সর্বংসহা, সকল কিছুই সে হাসি মুখে সহ্য করে, তার কাছে সকলেই সমান। সুতরাং মানুষে মানুষে কেন ভেদাভেদ গড়ে উঠবে অহেতুক, কেন ব্যবধানের প্রাচীর খাড়া হবে তাদের মধ্যে। কাবার বিশাল দরজায় হাত রেখে উদাত্ত কণ্ঠে রসূলুল্লাহ ঘোষণা করলেনঃ আজ থেকে কোন ভেদাভেদ থাকবে না কালো-শাদায়, প্রভু-গোলামে, আরব-আজমীতে। আল্লাহর কাছে সেই অধিকতর সম্মানীয় যে সৎকর্মশীল। ধর্মনিষ্ঠা ও আল্লাহ ভীরুতাই আজ থেকে হোক ছোট-বড় নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি।

দেড় হাজার বছর অতীতে এই কাবার প্রদত্ত রসূলুল্লাহ স-এর ভাষণের বাস্তব রূপায়ণ প্রত্যক্ষ করলাম আজ এই কাবাতেই। রাজা-প্রজা এক কাতারে বসে এক মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে এক সঙ্গে সিজদায় শির লুটিয়ে দিয়েছেন!

আজ আমার সৌভাগ্যের দরজার শীর্ষে যেন সুদিনের সূর্যটা এখনো জ্বল জ্বল করছে। কি দুর্লভ ভাগ্য আমার যে আজ সর্বপ্রথম আমি হাতিমের মধ্যে নামায আদায় করার জন্যে একটু স্থান পেয়ে গেলাম। হাতিমের মধ্যে নামায পড়ার অর্থই হল কাবা শরীফের ভিতরে নামায পড়া। হাতিম হল মূল কাবারই অংশ। প্রথম যখন নামায শুরু করলাম, বিশেষ কিছু মনে হয়নি কিন্তু দ্বিতীয় রেকাত শেষ হতেই নিজের মধ্যে কেমন যেন একটা ভাবান্তর অনুভব করলাম। তারপর ধীরে ধীরে অশ্রুর উৎসমূল উন্মুক্ত হয়ে গেল। মুনাযাতে এমন হল যে আমি ডুকরে সশব্দে কাঁদতে শুরু করলাম এবং কাঁদতেই থাকলাম। দীর্ঘ সময় ধরে কাতর মুনাযাত করলাম। আমার বারবার মনে হলঃ কাবা এমনই একটা পবিত্র স্থান, এখানে বসলে সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহর সঙ্গে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে যায়। এই যোগ যেন স্বতঃসিদ্ধ এবং অবিচ্ছেদ্য। ধীরে ধীরে এখন কিছুটা উপলব্ধি করতে পারিঃ নিখিল বিশ্বের মানুষ কোন্ মহাআকর্ষণে কেন পাগলের মত কাবায় ছুটে আসেন।

১৪ অক্টোবর ৮২। ২৭ আশ্বিন ৮৯। ২৬ জিলহজ ১৪০২। বৃহস্পতিবার।

মঞ্জুর জন্যে আজ একটা শাড়ি কিনলেন স্ত্রী। প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘড়ি এবং দু-একটা কলম হয়ত কিনতে হবে এবং নিশ্চয়ই ব্যবসার জন্য নয়, সস্তায় পাচ্ছি বলেও নয়। পবিত্র মক্কার স্মৃতি সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে থাক এটাই প্রধান ইচ্ছা, দ্বিতীয় বাসনা হল মক্কার ব্যবসায়ীগণও কিছু মুনাফা করুন, তাঁরাও ত সারা বছর ধরে হজ মরশুমের অপেক্ষায় বসে থাকেন। একই নিয়তে কিছু জিনিস মদিনা থেকেও ক্রয় করব ইনশাআল্লাহ।

হাশমি ইশরাত শয্যাশায়ী। আজ বিকেলে হজ অফিসের ডাক্তারখানায় মাথাঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে স্ত্রী রীতিমত ব্যস্ত এবং কিছুটা বিব্রতও। তবে তাঁর মধ্যে একটা আন্তরিক সেবার মনোভাব শুরু থেকেই বর্তমান যা আমি আমার চলার পথেও বারে বারে লক্ষ্য করেছি এবং যেটি সাধারণতঃ অন্যত্র দুর্লভ। এই মনোভাবের জন্যেই স্বদেশ ভূমি থেকে বহুদূরে অচেনা আরব মরুতে বসে অক্লান্ত ভাবে এক অপরিচিত জনের সেবা করে চলেছেন তিনি। এমন কি এই কাজের জন্যে তাঁকে কাবার জামাত ত্যাগ করতে হচ্ছে, আরো একটি মহৎ বাসনা বুকের মর্মরিত দীর্ঘ-শ্বাসে অকাল মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেল আজ। দুদিন আগে থেকে দুজনে ঠিক করে রেখেছিলাম আজকের সারা রাতটা আমরা কাবা শরীফে কাটাব, গভীরতম রাতে কাবার অবস্থা কেমন থাকে, কে কোথায় বসে কেমন ভাবে এবাদত করেন, সারারাত কতলোক কেমন ভাবে তওয়াফ করেন, বায়তুল্লাহকে দেখতেই বা কেমন হয় তখন, যে সকল কর্মচারী কর্তব্যরত থাকেন তাঁরাই বা কি করেন সব কিছু দু জনে দেখব তন্ন তন্ন করে। কিন্তু কিছুই হল না, হাশমি ইশরাতের এই জ্বর আমাদের সব বাসনাকে বরবাদ করে দিলে। স্ত্রী তাঁকে নিয়ে ডাক্তারখানা থেকে সোজা বাসায় চলে এলেন, আর আমি যোগ দিলাম তওয়াফে।

তওয়াফের সওয়াব হয়ত তিনি পেলেন না কিন্তু আমার বিশ্বাস

আল্লাহ তাঁর উপর অধিকতর সন্তুষ্ট। তওয়াফের বৃত্তরেখায় এগিয়ে আসবেন অনেকেই কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে একজন অসহায়া রুগ্না বৃদ্ধার শুশ্রূষায় আন্তরিক ইচ্ছায় অগ্রসর হবেন ক জন? স্ত্রী হয়েছেন। আল্লাহর নিকট এটিই সম্ভবতঃ অধিকতর অভিপ্রেত আর হজের একটি প্রধান শিক্ষাও তাই। নিঃসন্দেহে যে শিক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হতে পারি নি।

১৫ অক্টোবর ৮২। ২৮ আশ্বিন ৮৯। ২৭ জিলহজ ১৪০২। শুক্রবার।

সারা রাত কাবায় কাটাতে পারলাম না ঠিকই কিন্তু রাত তিনটেয় উঠে পড়লাম এবং একা একা পাগলের মত চলে এলাম বায়তুল্লায়। পথঘাট একেবারেই জনবিরল, কাবার প্রবেশ পথ একেবারেই জনশূন্য, অন্দরেও তাই। রাত সোয়া তিনটায় কাবা শরীফের ভিতরের দৃশ্য মোটামুটি এই রকমঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে বহুলোক নামাযে রত, নিদ্রামগ্ন যাঁরা তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। কেউ খোলা রেহেলে মাথা দিয়ে, কেউ ব্যাগ তলায় দিয়ে, কেউ খালি কার্পেটের উপরেই, কেউ চোখ ঢেকে, কারও চোখ খোলা, মহিলারাও ঘুমুচ্ছেন, বসে কোরআন পড়ছেন অনেকেই, গল্পগুজবও করছেন কেউ কেউ কিন্তু তওয়াফ চলেছে ঠিকই—যেমন চলে অন্য সময়—বিরামহীন। আল্লাহ প্রেমে দিওয়ানা একটা জনস্রোত যেন উদ্বেল হয়ে ভেঙে পড়ছে কাবার কূলে কূলে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে এমনি ধারা—ছেদহীন গতিমুখর। এ এক আশ্চর্য ঘটনা এবং কাবার জ্বলন্ত মোযেজা। কোথা থেকে এত লোক আসেন কেউ জানেন না, কেউ বলতেও পারেন না। জনাব আশরাফ সাহেব একটা প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। ঘটনাটি এই রকমঃ বছর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পূর্বে যখন মক্কায় এরকম জনসমাগম হত না, এক সৌদি ভদ্রলোক ঠিক করলেন যে হজ মওশুম পার হয়ে যাবার কয়েক মাস পর যখন মক্কায় একেবারেই ভিড় থাকবে না, গভীর রাতে উঠে তিনি একা একা তওয়াফ করবেন। সিদ্ধান্ত-মত একদিন রাত একটায় গিয়ে হাজির হলেন কাবায়। গিয়ে

দেখলেন কয়েকজন লোক তওয়াফ করছেন, তিনি থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভাবলেন, আর ত কেউ নেই। এ'দের তওয়াফ হয়ে গেলে কাবা শূন্য হয়ে যাবে আর তখন তিনি জনশূন্য কাবায় একা একা তওয়াফ করবেন। এ'দের তওয়াফ শেষ হব-হব অবস্থা এমন সময় কোথা থেকে একজন লোক নেমে এসে তওয়াফ শুরু করলেন। ভদ্রলোক ভাবলেন যাক আর ত কেউ নেই, এই লোকটির তওয়াফ হয়ে গেলেই আমি তওয়াফের শূন্য বৃত্ত রেখায় একা একা নেমে পড়ব। এমন ভেবে তিনি থামের আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিছুক্ষণ তওয়াফ চলার পর দেখা গেল কোথা থেকে একের পর এক লোক আসছেন এবং একজনের তওয়াফ শেষ হতে না হতে অন্যজন যোগ দিচ্ছেন। ভদ্রলোক থামের আড়ালে আত্মগোপন করে প্রায় সারা রাত অপেক্ষা করলেন কিন্তু তওয়াফের পথ জনশূন্য পেলেন না। এই সব দেখে তাঁর মনে হলঃ আল্লাহর ফেরেশতাগণ দলে দলে আকাশ থেকে নেমে এসে যোগ দেন তওয়াফে, মানুষের সঙ্গে সামিল হয়ে যান একই প্রভুর উদ্দেশ্যে প্রণতি জানাতে। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা দিন-রাতে যে কোন সময় যে কোন মুহূর্তে আজ পর্যন্ত তওয়াফের পথ রেখাকে কেউ জনশূন্য পাননি। মহাকাবায় কি যে ঘটে তা আল্লাহই ভাল জানেন!

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে কাবার দিকে তাকিয়ে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাবাকে তখন আরো উজ্জ্বল আরো হাসি-খুশি জান্নাতের একটা টুকরো বলে মনে হচ্ছিল। মাথার উপর স্তব্ধ সুবিস্তীর্ণ সুনীল আকাশ, মৃত্তিকায় ধ্যানগম্ভীর বিশাল কাবা, ধ্যানগম্ভীর কিন্তু খুশিতে উদ্বেল পরম এক পবিত্রতায় প্রশান্ত।

আমার সমগ্র চিত্ত ও চেতনা যখন কাবায় কেন্দ্রীভূত, এক অসাধারণ মধুর গুঞ্জরণ সেই মগ্ন চিত্তের উপর তার আশ্চর্য প্রভাব ছাড়িয়ে দিলে। উৎকর্ণ হলাম। কোন দিক থেকে ভেসে আসছে এই আশ্চর্য সম্মোহনী সুর! অনতিদূরেই একজন কালাম পাক পাঠ করছেন, এক মনে নিবিষ্ট চিত্তে। চৌম্বক আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে

আমি নিকটস্থ হলাম, তারপর ডুবুরির মত সেই মহাসাগরের অতলে ডুবে গেলাম। বিশ্বমানসে কোরআন শরীফের এই অসাধারণ প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করবে সাধ্য কার!

সে দিনও রসুলুল্লাহ স কাবায় বসেছিলেন একাকী। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগের সেই বিপদ সংকুল দিনগুলিতে বায়তুল্লায় তিনি আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতেন প্রায়ই, সেদিনও ছিলেন। কিছুদূরে যথারীতি জটলা চলছিল কুরেশদের, জটলা হট্টগোল এবং তারই মাঝে কুটিল চক্রান্ত শলা-পরামর্শ। তাদের শক্তি সামর্থের বড় স্তম্ভটি সম্প্রতি সমূলে স্থানচ্যুত, হযরত হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছেন, সত্যধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন অনেকেই। এবার বোধহয় মানসম্মান সব যায়, কুরেশ প্রধানগণ তাই চিন্তিত, কিছুটা বিচলিত। আজকের জটলা-সভার প্রধান কণ্ঠ আবুজেহেল বললে, যেমন করে হোক মুহম্মদ স-কে থামাতে হবে। উতবা ইবনে রাবিয়া হঠাৎ সকলের নিকট প্রস্তাব দিলেনঃ আপনারা যদি বিষয়টা একবার সম্পূর্ণ আমার উপর ছেড়ে দেন তা হলে আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি মুহম্মদ স-কে নিরস্ত করা যায় কি না। এই উতবা ইবনে রাবিয়া ছিলেন অত্যন্ত সম্পদশালী আর মিষ্টভাষী, সমাজের মধ্যে তাঁর প্রতাপ অপরিসীম। তা ছাড়া আমীর মুয়াবিয়ার মাতামহ ছিলেন তিনি। কি ভাবে মুহম্মদ স-কে প্রভাবিত করবেন সে পরিকল্পনাটিও ব্যক্ত করলেন যথাসময়ে। সকলে একবাক্যে তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকেই প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে দিলেন অনতিদূরে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন রসুলুল্লাহ স-এর দরবারে। উতবা যথেষ্ঠ শিষ্টাচারের সঙ্গে নবীজীর সম্মুখে উপবেশন করে আন্তরিক কণ্ঠে কথাবার্তা শুরু করলেনঃ বাবা মুহম্মদ স! আপনি আমাদের পর নন বরং নিকট আত্মীয়, তাই আমরা আপনার মঙ্গল চাই। আপনি যে সব কথাবার্তা বলছেন সমাজে তার প্রতিক্রিয়া ভাল নয়, উল্টো ক্রিয়াকর্মে আপনি একটা বিপ্লব আনতে চাইছেন কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কি যে বহু লোক আপনার বিপক্ষে চলে গেছে। এমন বিরোধ সৃষ্টি না করে আপনার মনোবাসনা আমাকে স্পষ্ট করে বলুন,

বলুন আপনি কি চান! যদি আপনি ধনসম্পদের প্রত্যাশী হন, সারা আরবের রত্নরাশি আমরা আপনার পদতলে রাশিকৃত করে দেব, আপনি হবেন আরবের সব চেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি। যদি কোন অভিজাত পরিবারে শ্রেষ্টতম সুন্দরীকে বিবাহ করার বাসনা থাকে বলুন, আপনার মুখের বাণী সমাপ্ত হবার সংগে সংগে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী যুবতী আপনার শয্যাসঙ্গিনী হয়ে যাবে। যদি যশ মর্যাদার আকাংখা থাকে তাও বলুন, আমরা আপনাকে অচিরেই মক্কার প্রধানের পদে অভিসিক্ত করব। আর যদি সম্রাট হবার বাসনা থাকে তাও ব্যক্ত করুন, সমগ্র আরবের একচ্ছত্র মহাসম্রাটের আসনে অভিসিক্ত করে আমরা আপনার সিংহাসনের সম্মুখে নতজানু হয়ে যাব। শুধু করজোড়ে একটি নিবেদন, আপনি আপনার এই অদ্ভুত কথাগুলি আর উচ্চারণ করবেন না, আমাদের দেবদেবীর নামে অপবাদ রটাবেন না। ব্যাস শুধু এইটুকুই—আর কিছু নয়।

আল্লাহর রসুল এতক্ষণ অবিচল শান্তভাবে উতবার বক্তব্যগুলি শ্রবণ করছিলেন, এখন শুধালেন, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?

উৎফুল্ল উতবা নিশ্চিত সাফল্যের জন্য অসম্ভব রকম উদ্বেলিত। নবীজীর খুশি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, ঔষধের সুন্দরতম ক্রিয়া শুরু হয়েছে। মানুষ ত অর্থ সম্পদ সুন্দরী যুবতী আর মানসম্মান প্রতিপত্তির দাস। কায়ার সংগে ছায়ার মত এই লালসাগুলির সংগে সব রক্ত মাংসের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। মুহম্মদ স যাবেন কোথায়? উল্লাসে আটখানা উতবা জবাব দিলেন, হ্যাঁ আমার যা বলার বলেছি, এখন আপনার মতামত শুনতে চাই। লজ্জা সংকোচের কারণ নেই, প্রাণ খুলে আমার সংগে আপনি প্রাণের কথাই বলুন। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তেমনি প্রশান্ত মুখ রসুলুল্লাহ স-এর, এই মুহূর্তে এক জ্যোতির্ম্ময় জান্নাতি জ্যোতি এসে সেই মুখকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। এক অদৃশ্য অলৌকিক শক্তিতে সেই মুখ ক্রমেই দুর্বার অকার্ষণীয় হয়ে উঠেছে। উতবা অপলকে তাকিয়ে আছেন সেই মুখের দিকে। নিরক্ষর 'উম্মি' মুহম্মদ স-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হল

শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের আলোকিত উচ্চারণ, সূরা হা-মীম মধুর মধুর হয়ে ছড়িয়ে গেল কাবার চত্বরেঃ

"হা মীম, এ অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালুর নিকট হতে অবতীর্ণ। ...এর বাক্যসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে।...বল ,আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদের (এবং আমাদের সকলের) উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্য যারা যাকাত প্রদান করে না এবং ওরা পরকালে অবিশ্বাসী। যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার রয়েছে। বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দু দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি ত বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।"...

সুললিত সুরে হা মীম সূরা পাঠ করে চলেছেন রসূলুল্লাহ্ স, উতবা তাঁর সামনে বসেছিলেন। প্রথম দিকের উসখুস ভাব কালাম পাকের প্রভাবে অচিরেই স্তব্ধ হয়ে এল, তারপর গ্রীষ্মের সুকঠিন মৃত্তিকায় শুরু হল ঘন শ্রাবণের সজল বর্ষণ, সিক্ত মৃত্তিকা নরম হয়ে এল ধীরে ধীরে, পাষাণ-হৃদয় উতবা বিগলিত, এক অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তাঁর সারা দেহ মন উথাল পাতাল, একি শুনলাম! এ কি শুনলাম!! রসূলুল্লাহ্ স আবৃত্তি করে চললেনঃ "হা মীম যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কাজ করে এবং বলে, 'আমি ত আত্মসমর্পণকারী' তার কথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কথা আর কার? ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্টম্বারা মন্দ প্রতিহত কর, ফলে যারা তোমার সাথে শত্রুতায় আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহা-ভাগ্যবান। ...তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যেই রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না, সিজদা কর আল্লাহ্‌কে যিনি এগুলি সৃষ্টি করেছেন ,যদি তোমরা তাঁরই দাসত্ব

কর।" ৪১ঃ১—৩৭। এই পর্যন্ত পাঠ করে সিজদার জায়গায় রসুলুল্লাহ স কাবার সম্মুখে পরম প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন। সেই অবকাশে আয়াত-মুগ্ধ উতবা গাত্রোত্থান করলেন তারপর কেমন যেন এক ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করলেন। যে সব মহা মহা অতিলুব্ধ প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, শেষ পর্যন্ত সে সব ভুলেই গেলেন তিনি। হযরতকে বধ করতে এসে নিজেই মনে প্রাণে কেমন যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে ফিরে গেলেন।

প্রতিনিধি হিসাবে উতবাকে পাঠিয়ে দিয়ে কুরেশগণ বুকভরা আশা নিয়ে বসে আছেন। সেই প্রতিনিধিকে চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে ফিরতে দেখে তাঁদের উদ্বিগ্ন এবং ব্যাকুল কণ্ঠগুলি এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপর, কি সংবাদ? ফলাফল শুভ ত?

কালাম পাকের প্রভাব তখনো উতবার উপর সম্পূর্ণ বর্তমান। কিছুটা আবেগকম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, মুহম্মদ স-এর মুখে যা শুনে এলাম তা অনির্বাচনীয়, অতুলনীয়। পঞ্চমুখে তিনি ঘোষণা করলেন, এ কোন কবির রচনা নয়, যাদুমন্ত্রও নয়—এ অবশ্যই আল্লাহর বাণী। কোন সন্দেহ নেই এ বিষয়ে। একটু বিরতির পর তিনি জানালেন তাঁর সিদ্ধান্ত, আমার মনে হয় মুহম্মদ স যা করছেন তাঁকে তা করতে দেওয়া উচিত। তিনি তাঁর নিজের পথে নিজের মত কাজ করুন, এতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত হবে না। আরবের অন্যান্য জাতিরা যদি তাঁকে পরাজিত করতে পারে তবে ত তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন আর যদি জয়লাভ করেন তাতে আমাদের সকলের গৌরব।

উতবার পরিবর্তিত কণ্ঠস্বরে সমবেত কুরেশগণ সন্দেহাকুল প্রশ্ন ছুঁড়ল. মাত্র এইটুকু সময়ে মুহম্মদ স-এর যাদুতে এমন করে আটকে গেলে? বলি মুহম্মদ স-এর ধর্ম গ্রহণ করে এলে নাকি?

উতবা বললেন, তা নয়। তবে আমার কথা আমি বললাম, গ্রহণ করা না করা তোমাদের ব্যাপার।

কুরেশরা উতবা ইবনে রাবিয়ার এই সৎ পরামর্শ গ্রহণ করে নি,

তারা নতুনতর উদ্যমে মুহম্মদ স ও ইসলাম নিধনের কাজে লিপ্ত হয়ে গেল।

গভীরতর নিঝুম রাত। আমি বসে আছি স্তব্ধ হয়ে। সম্মুখে চন্দ্রালোকিত কাবা স্বপ্নময়, পার্শ্বে কালাম পাকের মধুর গুঞ্জরণ। উতবার সে দিন কি হয়েছিল জানি না, এই মুহূর্তে আমার মনে হল, আকাশ বাতাস চন্দ্র তারকা গ্রহ নক্ষত্র সাগর নদী বন উপবন নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অনুপরমানু ভেদ করে অবিরাম ধ্বনি উঠছেঃ হা মীম. .

গভীর রাতে হিমশীতল এক ঝলক বাতাস বয়ে গেল হঠাৎ, কাবার গেলাফ কম্পিত হল, কেঁপে উঠলাম আমি। এই হাওয়ার সঙ্গে আমি যেন কোথায় কত দূ-উ-উ-রে হারিয়ে গেলাম!

২৭.

১৬ অক্টোবর ৮২। ২৯ আশ্বিন ৮৯। ২৮ জিলহজ ১৪০২। শনিবার।

আজ সকালে প্যাটেলজীরা চলে গেলেন মদিনায়, এত আগে যাবাব প্রয়োজন ছিল না, তবুও গেলেন। মুয়াল্লিমের সঙ্গে ঝগড়া কবেছেন, আরো নানান কান্ডকারখানা কবে শেষ পর্যন্ত বিদায় হলেন। অবশ্য আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহাব করেছেন। হজে এসে কেন যে মানুষ এভাবে মেজাজ হারিয়ে ফেলেন!

বায়তুল্লায় ভিড় নেই একেবারেই, আল্লাহর মেহমানগণ দ্রুত ফিরে যাচ্ছেন, স্বদেশে আপন পরিজনদের মাঝে, জোয়ার যেমন ফিরে যায় ভাঁটার টানে। আগের মত চত্বরে আবার কার্পেট পড়েছে, বরফ-শীতল খাবার পানির ব্যবস্থা হয়েছে অঢেল। আমাদের যাতায়াতের পথের মাঝেই পড়ে বাংলাদেশের হজ অফিস। মিনা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই ওখানে যাবার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, বিবেকই আমাকে ওখানে যাবার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছিল বারবার। আজ বাংলাদেশের হজ অফিসে গেলাম জোহরের পর। প্রধান অফিসার জনাব হাওলাদারের সঙ্গে দেখা হল। অমায়িক ব্যবহার। হজের সময় মিনাতে বাংলাদেশের সংযত এবং সার্থক প্রচারের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি আমার সম্পর্কে জানতে চাইলেন। প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে আমি বললাম, একটা ছোট্ট দরিদ্র দেশ যা করেছে তা মনে রাখার মত, বাহুল্য নয় অথচ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলের।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। আজ আসরের পর কাবা শরীফের দিকে তাকিয়ে বসেছিলাম আমি। বিস্ময়কর এই ঘর, যত দেখি ততই আচ্ছন্ন হয়ে যাই, রহস্যময় মনে হয় ততই। যেন তল নেই কিনারা নেই, আদি নেই অন্ত নেই। একবার প্রশ্ন জাগল, দরজা খুলে একটিবারের জন্য আমি কি অন্দরে যেতে পারি না? শুধু একটি

বার? দু'চোখ ভরে ভিতরের অনন্ত রহস্যগুলি প্রত্যক্ষ করে আবার চলে আসব। এমন কথার সঙ্গে সঙ্গে মনটা ভীষণ রকম আন্দোলিত হয়ে উঠল, প্রথমেই মনে এল চাবির কথা। চাবি থাকে কার কাছে?

রসুলুল্লাহ স-এর আমলে চাবি থাকত উসমান ইবনে তালহার নিকট। 'হাযাবা' অর্থাৎ কাবার চাবি সংরক্ষণ ও দরজা খোলার একমাত্র এখতিয়ার ছিল তাঁর, এমন কি কাবা সংক্রান্ত প্রতি কাজে পৌরহিত্যের অতি সম্মানজনক পদটিও ছিল এই উসমানেরই। অষ্টম হিজরিতে মক্কাবিজয় সম্পূর্ণ হয়ে গেল। পরাজিত কুরেশদল নতজানু হয়ে রসুলুল্লাহ স-এর পদপ্রান্তে। এখন আর নেতৃত্বের লালসা নেই তাঁদের, কাবার অধিকারও নয়। কোন পদ নয়, কেবল প্রাণটুকু বেঁচে গেলেই ধন্য হয়ে যান একদা মহারাজাধিরাজ কুরেশ নেতাগণ। তাঁরা এখন অধম ভিখিরি, জীবন-ভিখিরি। সকলে কাতর কণ্ঠে জীবনের জন্য অনুনয় করছেন রসুলুল্লাহ স-এর নিকট। অন্যদিকে বিজয়ী দলের কোন কোন নেতার মনে দুলে উঠল অন্য চিত্র।

'সাকাবা' অর্থাৎ জমজম কূপের পানি বিতরণের ভার পূর্ব থেকেই ন্যস্ত ছিল হযরত আব্বাসের উপর। তাই তিনি আজ, মক্কাবিজয়ের এই উল্লসিত ও উত্তেজিত মুহূর্তে, কাবার চাবিটিও হস্তগত করার জন্যে বিশেষ রূপে তৎপর হলেন। জমজমের উপর অধিকার ত তাঁর ছিলই আজ এই চাবিটি পেলে কাবার উপর হাশেমী বংশের, যে বংশে রসুলুল্লাহ স জন্মগ্রহণ করেছেন, পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ঠিক একই উদ্দেশ্যে হযরত আলিও চাবিটি পাওয়ার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চরিত্র করছিলেন। যথাসময় বিষয়টি ন্যায় বিচারক মহানবীর দৃষ্টিতে এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিশাল জনসমাবেশে ঘোষণা করলেনঃ

...''আজ হতে অন্ধকার যুগের সর্বপ্রকার গর্ব অহংকার, পূর্বের সমস্ত রক্তের প্রতিশোধ এবং রক্ত পণের দাবী আমার এই পদতলে দলিত মথিত হয়ে গেল। তবে কাবা ঘরের তত্ত্বাবধান ও হাজিদের পানি পান করান এ হতে পৃথক।''...

আলি এবং আব্বাস সংক্রান্ত সংবাদটি যাঁরা বহন করে এনেছিলেন, নবীজী তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, উসমান ইবনে তালহা কোথায়?

সংবাদ পেয়ে অংশীবাদী উসমান ইবনে তালহা নত মস্তকে রসুল পাকের দরবারে অপরাধীর মত দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর মুখ ম্লান, শঙ্কায় শীর্ণ। কুরেশদের এই আকস্মিক দলবদ্ধ পরাজয়ের প্রচণ্ড আঘাত ছাড়াও আর একটি বিশেষ ঘটনার দুর্বিসহ স্মৃতি তাঁকে প্রতি পলে জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করছিল।

ইবনে সাদের বর্ণনায় পাইঃ জাহেলিয়াত যুগে উসমান ইবনে তালহা, সপ্তাহে কেবল দুদিন—সোমবার এবং বৃহস্পতিবার, কাবার দরজা খুলতেন। বিশেষ একটি কারণে নির্দিষ্ট দিন ছাড়া অন্যদিনে দরজা খোলার প্রয়োজন হওয়ায় রসুলুল্লাহ স উসমানের নিকট গেলেন এবং বিনীতভাবে চাবি চাইলেন। উসমান ইবনে তালহা সেদিন অত্যন্ত রূঢ়ভাবে হযরতকে প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রত্যাখ্যানের পথে রসুলুল্লাহ স স্বভাব সুলভ নম্রকণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ চাবি দিলে না কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন চাবি আমার হাতে থাকবে এবং আমি যাকে চাবি দেব সেই তার অধিকারী হবে। ততোধিক উদ্ধত ও কর্কশ কণ্ঠে উসমান ইবনে তালহা প্রত্যুত্তর দিলেন, এমন দিন সত্যই যদি আসে সেদিন হবে কুরেশদের ধ্বংসের দিন। অধিকতর নম্র অথচ দৃঢ় কণ্ঠে রসুলুল্লাহ স বললেন, না— সেদিন হবে কুরেশদের সত্যিকার গৌরবের দিন, ইজ্জত ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার দিন।

নতমুখী উসমান ইবনে তালহার মনে হল আজ সেই দিন, প্রকৃতপক্ষে এই দিনের সম্ভাবনার কথা সারা জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যেও তিনি চিন্তা করেননি। আজ মুহম্মদ স বিজয়ী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, কাবার অতি সম্মানীয় চাবির গোছা তাঁর হস্তগত। এ চাবি তিনি যাঁর হাতে তুলে দেবেন তিনিই পাবেন। উসমান তালহা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেনঃ এখনো তিনি পৌত্তলিক এবং এখনো প্রাণপণে মুসলমানদের ঘৃণা করেন। সুতরাং এ

চাবি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই তাঁর, কেবলএকটি প্রাপ্যই বাকি আছে এবং তা হল সেদিনের বদলি লাঞ্ছনা। শঙ্কায় লজ্জায় যখন মৃতপ্রায় অবস্থা, অবিশ্বাস্য ভাবে তিনি শুনলেন মধুর কণ্ঠে রসুলুল্লাহ্ স তাঁকে ডাকছেন, উসমান!

উসমান ইবনে তালহা নিকটস্থ হলেন। চাবির গোছাটি স্বয়ং উসমান ইবনে তালহার হস্তে অর্পন করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রসুলুল্লাহ্ স বললেন, এই নাও চাবি, আজ থেকে এ চাবি তোমাদের হাতেই থাকবে। এবং যে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করবে সে যালিম বিবেচিত হবে।

উসমান ইবনে তালহা বিস্মিত, তিনি নির্বাক। মুহম্মদ স এত বড় তাঁর মন! চাবির গোছা সহ কম্পিত হাত দুটি প্রসারিত করে দিলেন রসুলুল্লাহ্ স-এর দিকে। ভোরের হাওয়ায় শেফালির মঞ্জুরিত হয়ে ওঠার মত তাঁর ওষ্ঠ দুটি কম্পিত হল। সেখানে সেই মুহূর্তেই কলেমা তৈয়ব ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে। একটি বাঁকাচোরা শীর্ণ পথ বিষাক্ত সরীসৃপের জঙ্গল থেকে উঠে এসে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত ও ঋজু হয়ে গেল—অন্ধকার থেকে আলোর দিকে সে পথের অভিসার।

[বুখারী শরীফের একটি হাদিস থেকে অবগত হচ্ছিঃ হযরত ইবনে তালহা আগেই মুসলমান হয়েছিলেন।]

১৭ অক্টোবর ৮২। ৩০ আশ্বিন ৮৯।...২৯ জিলহজ ১৪০২। রবিবার

মহাকালের অবিরাম ঋতুপরিক্রমায় দিনরাত্রির আবর্তন চলে, ফুল ফোটে পাখি গায় জোয়ার ওঠে চাঁদ হাসে। অসংখ্য দিনরাত্রির মধ্যে কোন একটি বিশেষ দিন কোন একটি বিশেষ মুহূর্ত আমাদের জীবনে তার অমলিন উজ্জ্বল প্রভাব রেখে যায়, মনে হয় এই মুহূর্তটির জন্যই আমরা ধন্য আমাদের জীবন সার্থক।

এমনই এক মহান মুহূর্তের মুখোমুখী হলাম আজ। মনে হল দেড় হাজার বছর অতীতের সেই উজ্জ্বল মুহূর্তটি আজ

একান্ত বাস্তব হয়ে আমার সম্মুখে উপস্থিত, আমি মা আমিনার কুটির প্রান্তে দন্ডায়মান, কুটিরের মধ্যে তওয়াল্লাদ হয়েছেন শিশু নবী মুহম্মদ স—এই শুভ মুহূর্ত যে মুহূর্তটির জন্য কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবী তার পরিক্রমা শুরু করেছিল, যে শুভক্ষণটির জন্য চন্দ্র-সূর্য স্মরণাতীত কালধরে দিনরাত্রি আবর্তন করে চলেছে, যে শুভক্ষণটি প্রত্যক্ষ করার জন্য সুদূর নভোলোক হতে নক্ষত্ররাজি ও নিহারিকাপুঞ্জ অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে ধূলিমলিন পৃথিবীর দিকে—এই সেই পরম বাঞ্ছিত মুহূর্ত। সেই প্রতীক্ষিত মহামানব এসেছেন পৃথিবীতে, অশান্ত বস্তুপুঞ্জে তাই ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে শান্তির আভাস, বাঞ্ছিতজনকে বুকে পেয়ে অতৃপ্ত পৃথিবী আজ পরিতৃপ্ত, আপ্লুত।

আমার সম্মুখে মা আমিনার কুটির, আমি শান্ত পায়ে এসে দাঁড়ালাম তার স্নিগ্ধ ছায়ায়।

আমি এবং আমার স্ত্রী, রীতিমত শঙ্কাতুর চিত্তে বাড়ি থেকে বার হয়েছিলাম আজ। পরপর যে সব সংবাদ সংগ্রহ করেছি, সেগুলি বিশেষ স্বস্তিকর নয়, বরং বেশ কিছুটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। রসুলুল্লাহ স-এর স্মৃতিচিহ্নগুলির প্রতি সৌদি সরকারের অবহেলা আমাকে রীতিমত পীড়িত করেছে। আমাদের দেশে সামান্য একজন কবি সাহিত্যিক বা দেশনেতার স্মৃতিগুলি কত যত্নসহকারে রক্ষিত হয় অথচ এ'রা রসুলুল্লাহর বহুস্মৃতির প্রতি ঠিকমত যত্ন নিচ্ছেন না বরং কোন কোনটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। এ বিষয়ে সৌদি সরকারের নিশ্চয়ই জোরালো কিছু বক্তব্য আছে, সে বক্তব্য পেশ করার আগে দু একটি ঘটনার উল্লেখ করে নিতে চাই।

হুদাইবিয়ার 'বাইয়াতে রিজাওয়ান'—এক আশ্চর্য বাইয়াত, এক অলৌকিক শক্তিতে উদ্দীপ্ত মুসলিম মুজাহিদদের এই অনন্য শপথ গ্রহণ, ইসলামের ইতিহাসকে গৌরবোজ্জ্বল করেছে। ঘটনাটি বিশদ রূপে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, অতি সংক্ষিপ্তভাবে আবার স্মরণ করছিঃ চৌদ্দ শ সাহাবী নিয়ে ষষ্ঠ হিজরিতে রসুলুল্লাহ স হজের

মানসে মক্কাভিমুখে যাত্রা করেন কিন্তু চিরশত্রু কুরেশরা তাঁকে শহরে প্রবেশ করতে দেয়নি। তিনি সাহাবীদের নিয়ে মক্কার অনতিদূরে হুদাইবিয়ায় অবস্থান করতে থাকেন। আপোষ মীমাংসার জন্য নানান পক্ষ হতে চেষ্টা চরিত্র চলতে থাকে। স্বয়ং রসুলুল্লাহ স আলাপ আলোচনার জন্যে হযরত উসমানকে প্রতিনিধি করে মক্কায় কুরেশদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। এক সময় সংবাদ এল যে কুরেশরা হযরত উসমানকে হত্যা করেছে। যে যুদ্ধকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন রসুলুল্লাহ স, এই সংবাদে তা অনতিক্রম্য ও অনিবার্য হয়ে উঠল। ফলে তীর্থযাত্রী সাহাবীগণ দৃঢ় পদভরে এগিয়ে এলেন। নিকটেই ছিল একটি বাবলা গাছ, সকলে সমবেত হলেন সেখানে। এই বাবলা বৃক্ষের নিম্নে দাঁড়িয়ে চৌদ্দ শত বীর মুজাহিদ একে একে রসুলুল্লাহ স-এর হস্ত মুবারক স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেনঃ দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমরা পিছু হটব না, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব।

এ এক ভীষণ শপথ, জীবন-মৃত্যুর ভয়ংকর শপথ। বৃক্ষের তলদেশে মুসলিম মুজাহিদদের মৃত্যু সংগ্রামের এই কঠিন অংগীকারের কথা অবগত হয়েই কুরেশগণ বিশেষ রূপে দমিত হয়ে গেল। তারা জানত মুসলমানদের এ প্রতিজ্ঞার কোন নড়চড় হবে না। শেষ পর্যন্ত তারা এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল এবং পরবর্তী-কালে যা হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে বিখ্যাত হয়েছে। সন্ধির প্রতিটি সর্ত যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হয়েছিল কিন্তু এরই প্রভাবে তাঁদের অগ্রগতির সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত হল, নতুন গতিতে শুরু হল ইসলামের মহান জয়যাত্রা। আলকোরআনে এই সন্ধিকে বলা হলঃ 'ফাতেহুম মুবিন'—মহাবিজয়।

কালক্রমে এই বাবলা বৃক্ষটি মানুষের শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মহান বৃক্ষের নিম্নে বাইয়াতে রিজাওয়ানের মাধ্যমে ইসলামে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছিল বলে সকলের গোপন মনে

বিশ্বাস জন্মাল যে এ বৃক্ষটি দারুন পয়মন্ত। এই পয়মন্তের মনোভাবে বৃক্ষের প্রতি সাধারণ মানুষের আবেগ যুক্ত হল সুতরাং বৃক্ষটি এখন অন্যান্য সকল বৃক্ষ থেকে পৃথক হয়ে গেল। এমনি করে সে সকলের অসম্ভব শ্রদ্ধার এবং মর্যাদার পাত্র হয়ে উঠল। রসুলুল্লাহ স-এর ওফাতের পর তাঁর অবর্তমানে কেউ কেউ বৃক্ষের নিকটে এসে নবীজীর অশরীরী উপস্থিতি অনুভব করতে শুরু করলেন। শেষে এমন হল যে দূর দেশ থেকে মানুষ হজে এসে সর্বপ্রথমে সমবেত হতে শুরু করলেন ঐ বৃক্ষের পদদেশে. এই বৃক্ষের প্রতি সকলের মনে ইসলাম বিরোধী এক পূজার মনোভাব দানা বাঁধতে শুরু করল। দ্বিতীয় খলিফার আমলে এই অনৈসলামিক ক্রিয়াকান্ড অসম্ভব বেড়ে গেল। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ হযরত উমর সবটা লক্ষ্য করে বিচলিত হলেন। তারপর একদিন এই ইস্পাত-কঠিন খলিফা রসুলুল্লাহ স-এর স্মৃতি বিজড়িত এই বৃক্ষের নিকট হাজির হলেন এবং অসম্ভব দৃঢ়কণ্ঠে বৃক্ষটির আমূল উৎপাটনের নির্দেশ দিলেন। কুঠার দিয়ে বৃক্ষটি কাটা হল এবং তাঁর সম্মুখেই সে স্থানের মাটি সমতল করে দেওয়া হল। এইভাবে রসুলুল্লাহ স-এর একটি স্মৃতিচিহ্ন ধ্বংস হল ঠিকই সেই সঙ্গে সম্ভাব্য পৌত্তলিকতার পাপ থেকে বেঁচে গেল অসংখ্য মানুষ।

রসুলুল্লাহ স-এর আমল থেকেই চলে আসছে এই ধারা, এই তৌহিদবাদ. এই ইসলামি তাকওয়া। সৌদি সরকারও এই তৌহিদ-বাদের উপর বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন। স্মৃতিচিহ্নগুলি মানুষের দৃষ্টিকে মূল বিষয় থেকে বহুদূরে সরিয়ে দিয়ে তার মনে ধীরে ধীরে জাগ্রত করে পূজার মনোভাব, এবং এই মনোভাব দেহ-মন-আত্মা-ধর্ম-সমাজ কোন কিছুর জন্য কোন উপকার বয়ে আনে না। গান্ধীজীর চটি জোড়া সংরক্ষণের জন্য আমরা অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারি কিন্তু একজন হরিজনকে সঙ্গে নিয়ে আহার করতে কুণ্ঠিত হই। পুকুরে গরুর পাল নামিয়ে হরিজনদের পানীয় জল নষ্ট করতে আমরা উল্লাসিত, তাদের কুটিরগুলিতে অগ্নি

সংযোগ এবং তাদের হত্যা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে যেমন উৎসাহ ভরে এগিয়ে যাই, হরিজনদের রক্ষার জন্য গান্ধীজীর সামান্য বাণীর বাস্তব রূপায়ণের দিকে আমরা ঠিক ততখানি নিরুৎসাহ হয়ে পিছিয়ে আসি। অথচ একটি চেয়ার বয়ে আনার জন্য আমরা আস্ত একখানা প্লেন পাঠিয়ে শত শত ফুলমালা নিয়ে বিমানবন্দরে সাগ্রহে অপেক্ষা করি। এই মনোভাব আর যাই হোক মঙ্গলপ্রসূ নয়। এই জন্যে ইসলামে স্মৃতিচিহ্নের কোন গুরুত্বই নেই, এসব মানুষের মন মানসিকতাকে পঙ্গু করে দেয়।

একথা সত্য যে রসুলুল্লাহ স-এর তহবন চাদর জুতো লাঠি ঢাল তরবারি সংরক্ষিত হয়নি, কিছুকাল সংরক্ষিত হবার পর তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। এতে একজন প্রকৃত মুসলমানের বেদনাবোধ করার কোন কারণ নেই। তেমনি দৈবাৎ সংরক্ষিত হলেও উল্লসিত হবার কোন কারণ থাকত না। প্রকৃতপক্ষে এগুলি সংরক্ষণের গুরুতর প্রয়োজন ছিল না বলেই ঝরা পাতার মত ঝরে গেছে। বরং আমাদের প্রতিদিনের জীবনাচরণে তাঁর বাণীর প্রতিফলন হওয়াটাই বড় কথা, তা না হলে আমরা তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হব এবং সেটাই হবে ইসলাম ধ্বংসের মূল কারণ। রসুলের স্মৃতিচিহ্নের সংরক্ষণ অপেক্ষা তাঁর বাণীর সংরক্ষণ অধিকতর জরুরী। মুহাদ্দেসগণ আজীবন সাধনায় সে চেষ্টাই করে গেছেন। স্মৃতি আঁকড়ে পড়ে থাকলে রসুলের আদর্শকে পাওয়া যায় না, বাণীর অনুসরণের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

কাবা শরীফের চত্বরে একটি গেট ছিল। গেট বলতে দু দিকে দুটি হালকা পিলার—তার উপরে অর্ধবৃত্তাকার একটি খিলান, অতি সাধারণ ব্যাপার। কাবা শরীফের পুরাতন ছবিতে এই গেট স্পষ্ট দেখা যায়। রসুলুল্লাহ স কাবার চত্বরে নেমে এই গেট দিয়ে অন্দরে প্রবেশ করতেন। এতদিন এই গেটটি রসুলুল্লাহর স্মৃতি-চিহ্ন হিসেবে বর্তমান ছিল কিন্তু হজ উপলক্ষে সমবেত তীর্থযাত্রীগণ এই গেটের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন, গেটে চুমু খাওয়া, গেট ধরে কাঁদা কোনটিও বাদ গেল না। এই অন্ধ রসুল

প্রীতি সীমা অতিক্রম করে পূজার পর্যায়ে যাবার উপক্রম হতেই সৌদি সরকার সেটিকে ভেঙে ধূলিস্মাৎ করে দিলেন। কাবার চত্বরে রসূলুল্লাহ স-এর স্মৃতিচিহ্ন বিনষ্ট করা সহজ ব্যাপার নয় কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের জন্য নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রায় বছর পনের পূর্বে সৌদি সরকারকে এই অনভিপ্রেত কর্মটি সম্পন্ন করতে হয়েছে।

রসূলুল্লাহ স স্বয়ং তাঁর স্মৃতি নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে কঠোর-ভাবে নিষেধ করেছেন। মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে তাঁর জবান মুবারকে উচ্চারিত হল এই সাবধান বাণীঃ "আমি তোমাদের নিষেধ করে যাচ্ছি, তোমরা আমার কবরকে সিজদার স্থানে (পূজার জায়গায়) পরিণত করো না।"

স্মৃতি নিয়ে একেবারেই বাড়াবাড়ি নয়, তোমরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কর আমার বাণীকে তোমাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রতিফলিত করতে। বিদায় হজে আরাফাতের বিশাল প্রান্তরে তাঁর কণ্ঠে আন্দোলিত হল এই চিরন্তন ঘোষণাঃ আমি তোমাদের জন্য রেখে যাচ্ছি আল্লাহর কালাম আর আমার বাণী। যতদিন তোমরা এদুটি ঠিক মত ধরে থাকবে কেউ তোমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।

এখানেও সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি, স্মৃতি নয় সম্মান কর বাণীকে, শশ্মান নয় সংরক্ষণ কর উপদেশকে।

স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সৌদি সরকারের এই সুকঠোর মনোভাব অবগত হয়েই আমরা দু জনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে রসূলুল্লাহ স-এর জন্মস্থানের দিক পা বাড়িয়েছিলাম, কি জানি হয়ত গিয়ে দেখব সে গৃহের কোন চিহ্ন নেই, একেবারে ধূলিস্মাৎ হয়ে একখন্ড সমতল জমিতে পরিণত হয়েছে।

প্রায় নব্বই ভাগ তীর্থযাত্রীদের মনে এই গৃহটি নিয়ে, রসূল পাকের জন্মভূমি নিয়ে কোন রকম জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল আছে বলে মনেই হল না, পবিত্র মক্কা শহরে এমনকি কাবার অতি সন্নিকটে এমন একটি গৃহের অস্তিত্ব আছে এটাই অবগত নন তাঁরা। অবগত হবার

চেষ্টা করলে ভাল করতেন, পূজার মনোভাবে নয়, রসূলুল্লাহ স-এর স্মৃতি বিজড়িত স্মরণচিহ্ন হিসেবেই তাঁরা এটি দেখে এলে ধন্য হতেন।

জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসায় অবশেষে আমরা নির্দিষ্ট স্থানে পেঁছে গেলাম। কাবা শরীফের সন্নিকটে, পায়ে হেঁটে চার পাঁচ মিনিটের পথ, দ্রুত চললে তাও হবে না। আসলে এটি সাফা পাহাড় সংলগ্ন যে জাবলে কুবাস বা বিলাল পাহাড় (হযরত বিলালের নামানুযায়ী এই পাহাড় এবং যার শীর্ষদেশে বিলাল মসজিদ রয়েছে) তার প্রান্তদেশে অবস্থিত। এলাকাটিকে সুগুল্লাইল বা গাজ্জা এলাকা বলে। রসূলুল্লাহ স-এর ঘরের সম্মুখ দিয়েই চলে গেছে বিশাল রাস্তা, মক্কার অন্যতম প্রধান রাজপথ। রাস্তার ঠিক পশ্চিম প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে গোগাছিয়া এলাকা।

আনুমানিক দশ কাঠা জমির উপরে গৃহটি স্থাপিত, সৌদি সরকার বর্তমানে দুতলা করেছেন সুতরাং বুঝাযায় ঘরটির প্রতি মনে মনে আমরা যতটা অবহেলার আশঙ্কা করেছিলাম ততটা অবহেলিত নয় এবং আরো আনন্দের কথা বর্তমানে এখানে একটি লাইব্রেরী স্থাপিত হয়েছে—কোরআন এবং হাদিস যেখানে একমাত্র পাঠ্য ও গবেষণার বিষয়। সুতরাং ঘরটির যোগ্য মর্যাদাই হয়েছে। যে ঘরে তওয়াল্লাদ হয়েছিলেন রহমাতুল্লিল আলামিন, নিখিল বিশ্বের মজলুম মানুষের মুক্তিদাতা, যেখানে অন্ধকারের বিরুদ্ধে উজ্জ্বল আলোর মশাল হয়ে এসেছিলেন মুহম্মদ মুস্তাফা স—সেই আলোকিত ঘরে আলোর চর্চা, কোরআন-হাদিসের উচ্চতর গবেষণা, এর চেয়ে আর যোগ্য ব্যবস্থা কি হতে পারে?

আমরা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালাম গোলাপী রঙের সেই ঐতিহাসিক গৃহটির পবিত্র আঙিনায়। সন্ধ্যার কোমল আলোয় স্বপ্নময় হয়ে উঠেছিল গৃহটি। আমার বুকে আবেগ ছিল, দৃষ্টিতে ছিল অসীম শ্রদ্ধা, বিকেলের আশ্চর্য আলোয় কোন চোখে যে আমি গৃহটিকে দেখেছিলাম! সেই ক্ষণিক দেখাকে এখনো যেন স্বপ্ন আর

অলৌকিক মনে হয়। কত রাত এল ; কত দিন চলে গেল কিন্তু সেই দেখাটি সাত মহলার গোপন পুরে সোনার কৌটাটির মত আমার স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রইল।

এই গৃহের বাইরের দিকটা ধরে রাখার জন্যে একজন ফটোগ্রাফার অনুসন্ধান করলাম, ইন্দোনেশিয়ান এক ফটোগ্রাফারের সন্ধানও পেলাম কিন্তু সন্ধ্যার মুখে আলোকের স্বল্পতার জন্যে তিনি ফটো তুলতে অসম্মত হলেন। বিনীতভাবে বললেন, সকালে এলে ভাল তসবির তুলে দেব।

ফটো পাওয়ার আশায় একদিন পর অর্থাৎ মঙ্গলবারে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হলাম, অবশ্য সকালের দিকেই। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ান সেই যুবক ফটোগ্রাফারটির কোন সন্ধান পেলাম না। আমার যেতে একটু দেরি হয়েছিল, সম্ভবতঃ সকালের যে রোদে ফটো তোলা যায় তা আর ছিল না। যাক একদিক দিয়ে ভালই হল, মনের ক্যামেরায় গৃহটির যে ফটো তুলে নিয়েছিলাম, বাস্তব ফটোর সঙ্গে তার কোনদিন মিল হত না।

এদিন দেখলাম আমার মত আরো কয়েকজন দর্শনার্থী জুটেছেন, সকলেই সব কিছু জানার জন্যে বিশেষ উৎসুক কিন্তু জানাবেন কে? আমরা সকলে ভীষণ কৌতূহলে সেই পবিত্র গৃহের চারপাশে ঘোরা ফেরা করছি, হঠাৎ দরজা ঠেলে অন্দর থেকে বার হয়ে এলেন এক সৌদি। খাঁটি সৌদি, যেমন লম্বা তেমনি রঙ তেমনি লেবাস—আমরা সকলেই তাঁকে ঘিরে ধরলাম। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষা তিনি বোঝেন না কিন্তু আমাদের আকুলতায় তিনি উপলব্ধি করলেন যে আমরা নবীজীর জন্মস্থান দেখতে এসেছি। অবশেষে চলে যেতে যেতে একটি বিশেষ ঘেরা জায়গার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আল হামদোলিল্লাহ। অর্থাৎ ঐ জায়গাটা দেখুন, ঐ সেই পবিত্রতম স্থান যেখানে নবীজী ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, দেখুন আর শুকরিয়া জানাতে পড়ুন আলহামদো লিল্লাহ। আমরা সকলে এক অসম্ভব উল্লসিত উত্তেজনায় মুহূর্তে সেখানে সমবেত হলাম। জায়গাটি খুবই ছোট, গৃহাভ্যন্তরের এই অংশটি অত্যন্ত সুরক্ষিত,

ভিতরে ছোট্ট একটি বাল্ব জ্বলছে আর কিছু না। অর্থাৎ ঐ বাল্বটি নির্দেশ করছে নির্দিষ্ট স্থানটির, এখানেই তওয়াল্লাদ হয়েছিলেন রসূলুল্লাহ স। যেটুকু দেখা যায় সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার, দেখার কিছু নেই আর। সৌদি ভদ্রলোক তিন চার বার আলহামদো লিল্লাহ কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন, আমরাও আলহামদো লিল্লাহ পড়তে পড়তে বার হয়ে এলাম।

আসন্ন সন্ধ্যার সেই স্বপ্নিল আলোয় জাবলে কুবাসের প্রান্তদেশে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন অপলকে সেই ধ্যানের স্বপ্নর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের সম্মুখে একে একে খুলে গেল ইসলামের ইতিহাসের সূচনা-পর্বের পৃষ্ঠাগুলিঃ

এই সেই গৃহ সুবেহ সাদেকের আলো আঁধারে যেখানে তওয়াল্লাদ হলেন মুহম্মদ মুস্তাফা স, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ। নতুন পথের দিশারী, নতুন জীবনদর্শনের স্রষ্টা, শান্তি ও সাম্যের সফল প্রবর্তক, যাঁকে পেয়ে ধন্য হয়েছে নিখিল বিশ্ব, ধন্য হয়েছে মানুষ এবং মহাজীবন। অথচ এই মহামুহূর্তটিকে বটতলায় মুদ্রিত 'ইসলামি কিতাব' সমূহ কি কদর্য ভাবেই না বিচিত্র করেছেঃ 'হযরতের ভূমিষ্ট হবার সময় পৃথিবীর সমস্ত পশু আনন্দে মানুষের মত কথা কয়েছিল, সূতিকাগৃহ হতে এক আশ্চর্য নূর ঝলকিত হয়েছিল এবং সেই আলোকে সিরিয়ার বুসরা শহর পর্যন্ত সকলের চোখে ধরা পড়েছিল, কাবা শরীফের ৩৬০ ঠাকুর সহ পৃথিবীর সকল প্রতিমা খন্ড খন্ড হয়ে ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছিল।' আশ্চর্যবোধ করি যখন দেখি আল্লামা শিবলী নোমানীর মত অভিজ্ঞ লেখককেও তাঁর সিরাতুন নবীতে (প্রথম খন্ড, সম্পাদনা মাওলানা মুহিউদ্দীন খান) লিখেছেনঃ "সেই মহিমামণ্ডিত শুভপ্রভাতের আগমনের পূর্বমুহূর্তে পারস্য সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী রাজপ্রসাদের চৌদ্দটি মিনার ধূলায় লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মুহূর্তে নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল অগ্নিউপাসকদের সহস্র বর্ষব্যাপী প্রজ্বলিত সেই ঐতিহ্যবান মহাঅগ্নিকুন্ড। শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল শ্বেত সাগরের অথৈ বারিরাশি!" পৃ ১৬১-৬২।

মরহুম আল্লামা শিবলী নোমানি হাদিস জানতেন না এমন কথা বলার মত ধৃষ্টতা আমার নেই অথচ ছিয়াসেত্তা, ছটি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থে কোথাও এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ নেই। মাওলানা শিবলীও কোথা থেকে এই তথ্যটি সংগ্রহ করেছেন তার উদ্ধৃতি দেননি। প্রকৃতপক্ষে এই বিবরণগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অনৈসলামিক গল্প-কেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর কিছু না হোক সমগ্র শ্বেতসাগরের পানি শুকিয়ে গেলে পৃথিবীর ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে তা অবশ্যই উল্লেখিত হত। ইসলামের ইতিহাস এবং হাদিসগ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় হযরত উমর রা কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত অগ্নিপূজকদের অগ্নিকুণ্ডগুলি একদিনের জন্যও নির্বাপিত হয় নি। তাছাড়া কাবার প্রতিমা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারটি ত সরাসরি মিথ্যা। অষ্টম হিজরিতে মক্কাবিজয়ের পর রসুলুল্লাহ স-এর উপস্থিতিতে যে এগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছিল বুখারী শরীফের বিশুদ্ধ হাদিসে তার বহু প্রমান রয়েছে। পৃথিবীর পশুপাখি আনন্দে মানুষের মত কথা কয়ে উঠল আর নিখিল বিশ্বের একটি মানুষও তা শুনতে পেলেন না অথবা এমন মহাশ্চর্য ঘটনা শুনতে পেয়েও সকলে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এ কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। অর্থাৎ যুক্তি ও বিবেকহীন এই আবেগ নির্ভর লেখাগুলি রসুলুল্লাহ স-এর আবির্ভাবের মহান মুহূর্তটিকে কিছুমাত্র উজ্জ্বল করেনি বরং কলঙ্কিত করেছে। এ বিষয়ে সকল সীরাত লেখকের সতর্ক ও সচেতন হওয়া উচিত।

রসুলুল্লাহ স জন্মগ্রহণ করলেন মরুর ধূলিতে। অসম্ভব সুন্দর এক শিশু, আকাশের চাঁদ অথবা আরো নয়নশোভন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধাত্রী হালিমার গৃহে যাননি, প্রথম দু-তিন দিন শিশু নবী মহানন্দে আপন মাতৃদুগ্ধ পান করেন। হযরতের চাচা আবু লাহাবের এক দাসি ছিল, তার নাম সোয়াইবা। দু তিন দিন মা আমিনার দুগ্ধ পানের পর এই সোয়াইবাই শিশু নবীকে বুকে তুলে নিলেন তারপর। হালিমার গৃহে না যাওয়া পর্যন্ত এই সোয়াইবাই আপন স্তন্যদুগ্ধে নবীজীর সেবাযত্নের অবিস্মরণীয়

সৌভাগ্যলাভ করেন। এই স্তন্যদান মাত্র তিন-চার দিনের, অথবা তারও কম, অথবা তারও কিছু বেশি। একজন ক্রীতদাসী এক সদ্যজাত শিশুকে মাত্র কয়েকদিন স্তন্য দান করেছে, একজন কুরেশের চোখে এটা কোন ব্যাপারই নয়, এর কোন স্বতন্ত্র মূল্যও নেই। ক্রীতদাসী—সে ত অধম, তার আবার মর্যাদা কি? বরং একজন কুরেশ সন্তানকে স্তন্যদান করতে পেরে সেই ধন্য হয়েছে। মরুর বালু এবং বাতাস যখন এমনতর চিন্তায় উথাল-পাতাল, সেই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে সেই বালুতে পা ফেলে এলেন রসূলুল্লাহ স, উপকারীর উপকার স্বীকারে কৃতজ্ঞ চিত্ত এক মহান মানব। সামান্য এই কয়েক দিনের স্তন্যপানের কথা যখন সকলেই ভুলে যায়, সেই পরিবেশে কি করলেন রসূলুল্লাহ স? হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত সোয়াইবাকে ক্রয় করে আযাদ করার চেষ্টা করেন কিন্তু আবুলাহাবের কঠোর মনোভাব ও বিরোধীতায় তা সম্ভব হয়নি। হিজরতের পর মাঝে মাঝেই নানাবিধ বস্ত্র সহ অন্যান্য সামগ্রী সোয়াইবাকে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন রূপে পাঠিয়ে দিতেন। খায়বার বিজয় হতে প্রত্যাবর্তনের পথে এই মহিলার প্রতি রসূলুল্লাহ স-এর শ্রদ্ধা শত বর্ণরাগে ঝরে পড়তে দেখি। প্রত্যাবর্তনের পথে অসম্ভব ব্যস্ততার মাঝে তিনি জানতে পারেন যে সোয়াইবা ইন্তেকাল করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর পুত্র মাসরূহের অবস্থা জানতে চান এবং গভীর বেদনার সঙ্গে এবারও তিনি অবগত হন যে মাতার মৃত্যুর পূর্বেই পুত্র ইহলোক ত্যাগ করেছেন। অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে কোন আত্মীয়স্বজন আছে কি না জানতে চাইলে জানান হয় বিশাল পৃথিবীতে এই হতভাগ্য ক্রীতদাসীর তেমন কোন আপনজন নেই।

আমরা বাইরের সুন্নতগুলিতে গভীর ভাবে মগ্ন থাকি। কার দাড়ি কতটুকু, কার পিরহান কত বড়, কে গোলটুপি পরল কার মাথায় লম্বা টুপি এ সবের উপর অসম্ভব গুরুত্ব দিয়ে আমরা ইসলামকে জিন্দা রাখার হাস্যকর চেষ্টা করছি, হায় সত্যকার সুন্নতগুলিকে যদি আমরা ঠিকমত পালন করতাম!

দিনে দিনে শিশু নবী বড় হয়ে উঠছেন। শৈশবের মধুর দিনগুলি কেটেছে মা হালিমার বাড়িতে। দিগন্তজোড়া ধু ধু মরুর মাঝে শিশু নবী বালক হয়ে ওঠেন ধীরে ধীরে। শয়ন শয্যা ছেড়ে একদিন বসতে শেখেন শিশু নবী, হামা টানতে শেখেন তারপর। বাংলার এই শান্ত কুটির থেকে আবেগ-উল্লাসে আমি কেঁপে উঠি, বড় সাধ যায় সেই দৃশ্যগুলি দেখতে। ধীরে ধীরে একটি দুটি শব্দ ফোটে, তারপর আরও একটি, আরো একটি। সূর্যডোবা সন্ধ্যার আকাশে একটি একটি অসংখ্য তারা ফোটার মত আধো আধো বোলে মা হালিমার কুটির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। তাঁর নিদ্রার সঙ্গী শায়মা, জাগরণের সঙ্গী শায়মা, খেলার সঙ্গী শায়মা হঠাৎ আনন্দে চিৎকার করে ওঠেন, অ মা—এই দেখ, আমার মুহম্মদ স হাঁটিতে শিখেছে। মেয়ের আনন্দে কাজ ফেলে ছুটে আসেন হালিমা, অবাক চোখ মেলে দেখেন, সত্যই তো—মুহাম্মদ স হাঁটছে যে! মরুভূমিতে বোধ হয় সেদিন খুশির তুফান বয়ে গিয়েছিল। শায়মার বুক উথাল পাতাল। তিনি ছুটে এসে তাবৎ বিশ্বের মজলুম মানুষের শিশু নেতাকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে গান ধরেনঃ

মুহাম্মদ বেঁচে থাক তরুণ কিশোর
হে খোদা তারে দাও অশেষ কল্যাণ
দুষমণ তার যত হোক অধঃমুখ
দাও তারে চিরন্তন যশ সম্মান!

শৈশবের সেই সৌন্দর্য লীলার পবিত্র দৃশ্যগুলি পৃথিবীর আর কেউ দেখেনি, হে শায়মা! কেবলমাত্র আপনি দেখেছেন। কতবড় সৌভাগ্যবতী আপনি। হায়, এই অধম গুনাহগার যদি সেদিন আপনার পাশে থাকত! শুধু একবার সেই সোনার অঙ্গকে বুকে নিতাম, জড়িয়ে ধরতাম! শুধু একবার!!

দাঁত ওঠার বয়স। শোনা যায় এমন দিনে দুধবোন শায়মার পিঠে (হাতে?) শিশু মুস্তফা একবার দংশন করেছিলেন।এই দংশনের ক্ষত দীর্ঘদিন তাঁর পৃষ্ঠে বর্তমান ছিল। প্রচলিত এই ঘটনাটি সত্য হতে পারে কেননা দাঁত ওঠার বয়সে সকল শিশুর মধ্যেই

দেখা যায় দংশন ক্রিয়ার স্বাভাবিক বিস্তার।

কেমন ভাবে খেলাধুলো করতেন রসুলুল্লাহ স! সাধারণ বালকবালিকার মত, নাকি অস্বাভাবিক কিছু? আমার সম্মুখে যে চিত্র রয়েছে তা ত নিতান্তই স্বাভাবিক।

বৈধব্যে বিষণ্ন জীবন মা আমিনার। বুকে ছ বছরের আনন্দ সুন্দর কুসুমতনু মুস্তফা। কতদিন পর ম্লান গৃহ যেন চাঁদের আলোয় ঝলমল করে ওঠে। নিদ্রা নেই মা আমিনার চোখে, এমন দিনে বড় বেশি করে মনে পড়ে স্বামীর কথা। স্বামী নেই, তাঁর কবর আছে মদিনায়। হৃদয় মন বিমোথিত হয়। দাসী উম্মে আয়মনকে সঙ্গে নিয়ে শিশুপুত্র সহ যাত্রা করেন মদিনার দুর্গম পথে, উদ্দেশ্য স্বামীর কবর জিয়ারত।

ছ বছরের সুন্দর শিশু পা রাখলেন মদিনার মাটিতে। চাঁদ নিয়ে লোফালুফি পড়ে গেল চেনা অচেনা সকলের মধ্যে। বড়রা যে দেখেন সেই কোলে তুলে নেন, বুকে জড়িয়ে ধরেন। সমবয়সীরা দলবদ্ধ হয়ে কাছে আসে, নিজস্ব আদরের ভাষায় ডাকে, এই মুহম্মদ খেলবি আয়। এই বয়সটা ডানা মেলার বয়স, জগৎ ও জীবনের সঙ্গে পরিচিত হবার বয়স। রসুলুল্লাহ স সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মিশে যান, খেলতে চলে যান। কি খেলতেন রসুলুল্লাহ স? সাথীদের সঙ্গে প্রচলিত প্রায় সকল খেলাতেই যোগ দিতেন তিনি। খেলায় হার আছে, জিত আছে। কখনও তিনি হারতেন কখনো জিততেন।

মদিনায় মাত্র একমাসের অবস্থান। কিন্তু এই একটি মাস বালক মুস্তফার নিকট হয়েছিল বড় মধুর বড় আনন্দের। এই একমাসে তিনি পেলেন নতুন সঙ্গী, সাঁতার শেখার নতুন সাথী, ধু ধু মরুতে উধাও হয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ একটি নতুন দল। গান গাওয়া পাখিরা যেমন মুক্ত ডানায় উড়ে বেড়ায়, দলবদ্ধ বালক নবীও তেমনি আজাদ হাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছেন এপ্রান্তর সেপ্রান্তর, অচেনা মদিনার রহস্যময় পথে ঘাটে। সঙ্গীদের সঙ্গে থেকেও অবাক দুটি চোখ মেলে কখনো দেখেছেন তিরতির করে নেচে ওঠা খুর্মাগাছের পাতার

কম্পন, কখনো দেখেছেন সুনীল আকাশে ভাসমান মেঘপুঞ্জের অবাধ বিচরণ, কখনো ছুটে গেছেন পাহাড়ের পাদদেশে, কখনো নেমে এসেছেন ঝরণার পানিতে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! অভূতপূর্ব কৈশোর রোমাঞ্চ! এক মাসের সেই সুমধুর শৈশব স্মৃতি সারা জীবনেও বিস্মৃত হননি রসূলুল্লাহ স। হিজরতের পর কোন একদিন সাহাবীদের নিয়ে মদিনার পথ বেয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ তাঁর গতি মন্থর হয়ে এল, তিনি তখন বনি আদিরের গৃহগুলির নিকটবর্তী হয়েছিলেন। সাহাবীরা লক্ষ্য করলেন, মুস্তফা স-এর মুখমন্ডলে যেন বহুদূর অতীত থেকে ছুটে আসা এক অদ্ভুত আলো ভেসে উঠেছে। ঐ গৃহগুলির একটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি বললেন, এই গৃহটিতে আমার স্নেহময়ী আম্মা কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। আর এই পুকুরে আমি সাঁতার শিক্ষা করেছি। নিকটেই ছিল এক উন্মুক্ত প্রান্তর। সেদিকে দৃষ্টিপাত করে খুশি খুশি গলায় বললেন, এই মাঠে আমি আনিসা নাম্নী এক বালিকার সঙ্গে খেলা করেছি।

এই তথ্যটুকু পরিবেশন করেই তাবকাতে ইবনে সাদ নীরব, কি ক্ষতি ছিল বালক নবীর অন্যান্য খেলাগুলির আরো একটু পরিচয় দিলে, সেই মহান সঙ্গী-সাথীদের আরো কিছু পরিচয় তুলে ধরলে, সৌভাগ্যবতী আনিসা সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানালে?

মরীচীকায় পিপাসা বাড়ে। আমাদের সমুদ্র-পিপাসা মন শুধু জানলঃ বালক নবী কেবল সাঁতার শিখেছেন আর আনিসা নাম্নী জনৈকা মদিনাবাসী এক মহান বালিকার সঙ্গে খেলা করেছেন। হায়! আমাদের আর কিছু জানা হল না, আমরা পিপাসিত রয়ে গেলাম।

বালক মুহাম্মদ স-কে এরপর পেলাম রাখাল নবী রূপে। রাজা নন, বাদশাহ নন—একজন রাখাল মাত্র। রাখাল বেশেই তাঁকে আমরা দেখলাম দীর্ঘদিন। সকাল হতেই জাব্বুল কুবাসের পাদদেশে এই জীর্ণ কুটির থেকে বার হয়ে চাচা আবু তালিবের ছাগল-মেষ-দুম্বার

পাল নিয়ে রাখাল নবী চলে যেতেন দূর মরুতে, শহরতলীর পাহাড়ী-উপত্যকার চারণ ভূমিতে। মেষ-ভেড়ার পাল চরে বেড়ায়, তিনি তাকিয়ে থাকেন দূরে গাছগাছালির দিকে। টিলার উপরে কাঁটা ঝোপ থেকে কখনো ভেসে আসে পাখির গান, কখনো পাহাড়ি ফুলের মধুর সুবাস। বিরল মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল রোদে ভরে যায় চার দিক, বিকেলে এই তাপ আবার রোগা হয়ে আসে, সন্ধ্যার সারা আকাশ জুড়ে তারা ফোটে, ঝিকমিক করে, চাঁদ ওঠে, আলো দেয়। এসব দেখতে দেখতে বালক মুস্তফার মনে দোলা জাগেঃ কে তৈরী করল এই আকাশ? এই মরু? এই পাখি? এই চাঁদ? কার তৈরী এসব?

প্রকৃতপক্ষে এই রাখালী করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের অগোচরে বিশ্বের বিশাল পাঠশালায় তাঁর গভীর অন্তরঙ্গ পাঠ শুরু হয়ে গেল। একান্ত নির্জনে অনন্তের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ মুখোমুখী হওয়ার সুযোগ সম্ভবতঃ অন্য কোন কাজের মধ্যে থাকে না। অথচ পাশ্চাত্ত্য লেখকেরা মেষ চরানোর এই ব্যাপারটি নিয়ে কত না উপহাস উপহার দিয়েছেন। কোরআন মজিদে স্বয়ং আল্লাহ্ এই পেশাটিকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেনঃ "অলাকুম ফিহা জামালুন হিনা তুরিহুমা অ হিনা তুছরেহুন"—অর্থাৎ মেষ রাখালীর এই কাজটি প্রকৃতপক্ষে বিশ্বরাখালীর পটভূমি। কাল যিনি নিখিল বিশ্বের মানবমণ্ডলীকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবেন, ছাগ-মেষকে অন্যের ফসলাদি বিনষ্ট করা থেকে সংযত রাখার মাধ্যমে রাখাল-জীবনে সেই অনাগত বিপুল ভবিষ্যতের মহৎ সূচনা হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যায় পাখিদের ওড়াউড়ি মাথায় নিয়ে রসূলুল্লাহ্ স ছাগ মেষের পাল নিয়ে বাড়িতে ফিরে আসতেন। পেশাটি যেহেতু স্বাধীন সুতরাং আনন্দের। সমসাময়িক এই আনন্দঘন মুহূর্তগুলির রোমাঞ্চকর স্মৃতি, রসূলপাকের পরিণত জীবনেও বিস্ময়কর রকমে উজ্জ্বল হয়ে ছিল। এই সময় তিনি বালক সুলভ চাপল্যে কখনো কখনো বনের মধ্যেও চলে যেতেন, স্বযত্নে সংগ্রহ করতেন বনফুল, পাকা কুলের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম ছিল না, সেগুলি কুড়িয়ে

একত্রিত করতেন, খেতেন এবং কোনগুলি টক কোনগুলি মিষ্টি সে সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ মানুষের মত তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠেছিল। পরিণত বয়সে এই সময়ের আনন্দমুখর স্মৃতিগুলি মাঝে মাঝেই সাহাবীদের মধ্যে বর্ণনা করতেন।

একদিন সাহাবায়ে কেরামদের নিয়ে মক্কার কোন একটি জঙ্গলে প্রবেশ করলেন রসুলুল্লাহ। জঙ্গলের মধ্যে অনেকগুলি বুনো কুল গাছ ছিল। তখন কুলের মরশুম। গাছ ভরা কুল পেকে উঠেছে, কাঁচাও আছে কিছু। তাবৎ সাহাবী সকলেই হঠাৎ যেন তাঁদের বালক-বয়স ফিরে পেলেন। সাহাবীরা আনন্দের সঙ্গে সেই কুল খেতে শুরু করলেন, কেউ কাঁচা খাচ্ছেন, কেউ পাকা—যাঁর হাতে যেমন উঠছে তিনি তাই খাচ্ছেন। ঈষৎ দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা লক্ষ্য করলেন রসুলুল্লাহ স, তারপর সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, যেগুলি পেকে কালো-কালো হয়ে উঠেছে ওগুলি খাও, কেননা অন্যদের তুলনায় এগুলি বেশি মিষ্টি। রসুলুল্লাহ স-ও যেন হঠাৎ সুদূর অতীতে ফেলে আসা তাঁর সেই বিমল কৈশোর জীবন ফিরে পেলেন, তাঁর চোখে মুখে সর্বত্র এক অতীত ভেদী উজ্জ্বল আনন্দ খেলা করে ফিরছিল। তাঁর উল্লসিত স্বরে অঙ্কিত হল অতীতের সেই নানা রঙের দিনগুলির মধুর রেখাচিত্র। বললেন, বাল্যকালে আমি যখন এখানে বকরী চরাতে আসতাম, সেসময় আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাবকাতে ইবনে সাদ, বুখারী শরীফঃ কিতাবুল হিজারাহ।

ইয়া রসুলুল্লাহ স! শ্যামল বাংলার এই নির্জন কুটিরে বসে বহুদিন আমার মনে হয়েছে...

বেয়াদবী হলে মাফ করবেন, আমি আমার মনের কথাটি এতদিন কাকেও বলতে পারি নি, আজ আপনাকে নিবেদন করছিঃ

এ দুটি পাপকলঙ্কিত হাতে কখনো কখনো চাঁদ স্পর্শ করার দুঃসাহস হয়েছে।...

ছোট বেলায় আমি আপনার সম্পর্কে কিছুই জানতাম না, প্রথম কবে আপনার নাম শুনেছিলাম তাও মনে নেই। আমাদের গ্রামে

তখন মিলাদ হত, নানান অঞ্চলের মৌলবী মাওলানা সাহেবেরা এসে ওয়াজ করতেন। তাঁদের মুখেই আমি আপনার পরিচয় পাই, সে এক মধুর পরিচয়।

মহফিলে শোঁ শোঁ শব্দে ডে-লাইট জ্বলত, উজ্জ্বল আলোয় ফালা ফালা হয়ে ছিন্নভিন্ন হত রাতের আঁধার। মৌলবী সাহেব সুর করে বলতেন ঃ নূরের চেহারা তাঁর। তাঁনার নূরে এই পৃথিবী পয়দা, আদম পয়দা। কচি মনটা দুলে উঠত, কেমন সেই নূর? এই ডে-লাইটের মত? (ডে-লাইটের আলোর চেয়ে তীক্ষ্ণ কোন আলোর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ঘটেনি)। নাকি আরো উজ্জ্বল? সুদূর হেজাজ হতে বহু দূরে ভারতের এক দূরতম প্রান্তে সোলেমানপুরের সেই মিলাদ মহফিলে বসে আমার বালক মন আপনার আয়ব কল্পনা করে ব্যাকুল হয়ে উঠত।

একদিন এক মাওলানা মিলাদে বললেন, মজলিসে বসেছিলেন রসুলুল্লাহ স, এমন সময় এক সাহাবী চাদরে করে অনেকগুলো পাখির বাচ্চা ধরে এনে তাঁর সামনে রাখলেন। সেগুলি দেখে তিনি ব্যথা পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, এদের মা কোথায়? যাও এখুনি এগুলিকে এদের মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এস। সেদিন আমার মনে হয়েছিল সাহাবীরা বড় বোকা। আমি হলে অমন করতাম না। দখিন মাঠের অশথ গাছের কোটরে একটা পাখির অনেকগুলি হলুদ হলুদ বাচ্চা হয়েছিল। হাত বাড়িয়ে ওদের সবগুলি ধরা যায়। আমি হলে ওদের মা সমেত বাচ্চাগুলিকে ধরে নিয়ে আপনার দরবারে হাজির হতাম। মা নেই বলে আপনি তখন আর আমাকে বকাবকি করতে পারতেন না। আপনি ত পশুপাখি পছন্দ করতেন। সুন্দর সুন্দর এতগুলো হলুদ পাখির বাচ্চা দেখে আপনি নিশ্চয়ই আমাকে ভালবাসতেন। বাসতেন না? কি করতেন ইয়া রসুলুল্লাহ?

আপনি যদি আমার বড় ভাই হতেন! আপনাকে নিয়ে আমি সারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরতাম। সোলেমানপুরের দিগন্তজোড়া মাঠের সবুজ ঘাসে পা ডুবে যায়, আপনার পায়ে একটুও আঘাত লাগত

না। সোনামুখীর জঙ্গলে যেতাম পাকা 'বোচ' তুলে খেতে, খুব মিষ্টি। দখিন দিকের ঝোপটায় কিছুতেই যেতে দিতাম না আপনাকে, পিছনে দাঁড় করিয়ে রেখে আমি যেতাম আগে। বড় একটা সাপ থাকে ঐ ঝোপটায়, ঢিল মেরে তাকে সরিয়ে দিয়ে তবে নিয়ে যেতাম আপনাকে। ঐ জঙ্গলটার ভিতরে অনেক মিষ্টি ফুলের গন্ধ আছে, আর আছে জঙ্গলের নিজস্ব নির্জনতা। ওর ভিতরে বাইরের জগতের কোন শব্দ যায় না, হাওয়া গাছপালা সব কিছু কেমন নীরব, আশ্চর্য নীরব। একটু বসলে আপনার খুব ভাল লাগবে। তারপর ধান পাটের ক্ষেত ঘুরে দুপুরে এসে গোসল করতাম পদ্ম ফোটা পুরো পুকুরে, আপনি সাঁতার জানতেন না, হাত ধরে কলমি লতার পাশ দিয়ে আমি সাঁতার শেখাতাম। কি মজা হত!

রাইপুরের মৌলবী একদিন ওয়াজে আপনার সুন্দর পরিচয় তুলে ধরলেন, আপনি দয়ালু আপনি হৃদয়বান আপনি করুণাময়। কেউ এসে ফিরে যেত না আপনার দরবার থেকে। একদিন রাতের বেলা এল এক ভিখিরি। সামান্য খাবার ছিল সেদিন আপনার সারা পরিবারের জন্য, খুবই সামান্য খাবার। সেটুকুও সেই ভিখিরির মুখে তুলে দিয়ে আপনারা অভুক্ত রইলেন সারা রাত। আর একদিন এল এক ভিখিরি। বাড়িতে কিছু নেই জেনে আপনি চলে গেলেন মা ফাতেমার বাড়িতে, সেখানেও বাড়তি কিছু নেই কেবল হাসান-হোসেনের জন্যে আছে এক বাটি দুধ, বাছাদের সেই মুখের খাবারটুকুও আপনি তুলে দিলেন ভিখিরির হাতে। অনেক দিন গেছে, খিদের জন্যে আপনি পেটে পাথর বেঁধেছেন, মসজিদের ধুলোয় এপাশ ওপাশ করে খিদের যন্ত্রণা সহ্য করেছেন...

সেদিন এসব শুনতে শুনতে অনেকের চোখ সজল হয়ে উঠেছিল, পাগলের মত হয়ে উঠেছিলাম আমিও। তখন ছিল আমের মৌসুম গাছে গাছে পাকা আমে ডাল নুয়ে পড়েছে। মনে আছে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলামঃ এখুনি গিয়ে বাগান থেকে আম কুড়িয়ে এনে আপনাকে খেতে দিতাম। কুড়িয়ে না পাওয়া গেলে চলে যেতাম

অহিদদের বাগানে, বড় বড় আম পেকে 'মজনু' হয়ে আছে সব গাছে। একটাতে উঠে, চুপি সাড়ে এক 'ভগলি' নিয়ে আসতাম পেড়ে, কেউ জানতেও পারত না। কেটে থালা বোঝাই করে আপনার সম্মুখে ধরতাম। খেতে খেতে আপনি শুধাতেন, কোথা থেকে এনেছিস রে এ আম, আমি বলতাম, চুরি করে। তখন কি করতেন আপনি? বকতেন? মারতেন? মার খেয়ে অবোধ শিশুর মত সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনার গলা জড়িয়ে ধরতাম। আপনি আরো মারতেন আর আমি কাঁদতে কাঁদতে আপনার বুকের সঙ্গে মিশে যেতাম। মায়ের হাতে মার খেয়ে শিশু যেমন মায়ের বুকে নিঃশেষে মিশে যায়!

ইয়া রসুলুল্লাহ স! এই অধম পাপী জাহেল এ জীবনে ত আপনার দর্শন পেল না, কাল কিয়ামতের দিনে তাকে দূরে ঠেলে দেবেন না, আপনার কদম মুবারকের নিচে যেন তার এতটুকু ঠাঁই হয়!

২৮.

১৮ অক্টোবর ৮২। ৩১ আশ্বিন ৮৯। ৩০ জিলহজ ১৪০২। সোমবার

তাহাজ্জদ শেষ করে কাবার চত্বরেই বসেছিলাম ফজরের আশায়। বাইরে তখন রীতিমত অন্ধকার। মনে পড়ে একদিন এমন অন্ধকারে এই চত্বরে বসেছিলেন আবু উমাইয়াহ ইবনে মুগীরাহ সহ একদল উৎকণ্ঠিত যুবক, তাঁরা বসে বসে অপেক্ষা করছিলেন সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তির যিনি সেদিন সর্বপ্রথম কাবায় আসবেন এবং এসে ভার নেবেন হাযরে আসোয়াদ সংক্রান্ত জটিল মীমাংসার। নব-নির্মিত কাবায় এই সম্মানিত পাথরটি কোন গোত্র এনে স্থাপন করবেন এই নিয়ে দেখা দিল প্রচণ্ড উত্তেজনা। বাকবিতণ্ডা এবং হট্টগোলে চারদিন কেটে যাবার পর 'শোণিত শপথ' পর্ব পর্যন্ত উদ্যাপিত হয়ে গেল। 'শোণিত শপথ'—'রক্ত পণ' ছিল আরবের ভীষণ শপথ। যখন কোন বিষয়ের মীমাংসা হত না, একটি পেয়ালায় তাজা রক্ত ভর্তি করে আনা হত এবং তাতে হাত ডুবিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদল আমরণ যুদ্ধের শপথ গ্রহণ করত। বিচারে তখন বাণীর স্থান দখল করত অস্ত্র, রক্তঝরা মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মীমাংসা হয়ে যেত সব কিছুর। হাযরে আসোয়াদের ব্যাপারে দু-একটি গোত্র 'শোণিত শপথ' গ্রহণ পর্যন্ত করে ফেলেছিল। চারদিক থেকে অস্ত্রের ঝনঝনা বেজে উঠেছিল। সেই ভীষণ মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া দুই হাত উপরে তুলে যুদ্ধোন্মাদনায় অস্থির যুবকদলের উদ্দেশ্যে বললেন, থাম। নিজেরা অযথা নিজেদের হত্যায় মেতে উঠো না। আমি বলি কাল প্রত্যুষে যিনি সর্বপ্রথম কাবায় আসবেন তাঁর উপর ভার দাও এই সমস্যা মীমাংসার। তিনি যা মীমাংসা করে দেবেন, তাই মেনে নেব সকলে। সে কথায় সম্মত হয়ে সকলে দারুন উদ্বেগের মধ্যে নিষ্পলকে তাকিয়ে রইলেন কাবার প্রবেশ দ্বারের দিকে। এমনি আধা অন্ধকারে সুবেহ

সাদেকের উজ্জ্বল মুহূর্তে সকলে আনন্দ উল্লাসে চিৎকার করে উঠলেন একসাথেঃ

"হাজা আল আমীন! কাদ রাজিনাহ!"

Lo it is the faithfull one এই ত আমাদের আল আমীন! আমরা তাঁর কথা মেনে নেব! এর পরের ঘটনা ত সকলেই অবগত।

আগে আমি ভাবতাম রসূলুল্লাহ হয়ত ঐদিন হঠাৎই এসে গিয়েছিলেন এবং এই আগমন নিতান্তই আকস্মিক কিন্তু জব্বুল কুবাসের পাদদেশে জন্মস্থলটি দেখে আমার সমুদয় সংশয় দূর হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহর এই আগমন একেবারেই হঠাৎ বা আকস্মিক নয়, তাঁর গৃহটি ছিল কাবার নিকটে। তাছাড়া নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব থেকেই তিনি কাবার সঙ্গে গভীর ভাবে সংযোগ রেখে চলছিলেন। সকাল-সন্ধায় তিনি কাবায় আসতেন, যখন মন চাইত চলে আসতেন এই মহাতীর্থে। কাবার সঙ্গে তাঁর এক অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। আগামী দিনে যে কাবাকে কেন্দ্র করে শুরু হবে তাঁর মহান জীবন-সংগ্রাম এ যেন তার পূর্বসূচনা!

দুই পুত্রের জন্য সামান্য কিছু জামার কাপড় কিনলেন স্ত্রী, আমি কিনলাম এক ডজন টুপি। মুয়াল্লিম সংবাদ দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি মদিনা মনোয়ারায় যাবার সুস্পষ্ট দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন। এ সংক্রান্ত কিছু প্রাথমিক কাজও এগিয়ে গেল। আগামীকাল আবার আসতে হবে।

১৯ অক্টোবর ৮২। ১ কার্তিক ৮৯। ১ মুহররম ১৪০২। মঙ্গলবার

কত সামান্য কারণে না আমরা ক্রুদ্ধ হই, কত তুচ্ছ বিষয়েই না আমরা সংযম হারিয়ে ফেলি। অথচ ক্রোধ হারাম। এই হারামকে যেন আমরা কিছুতেই হজম করতে পারি না। যিনি পারেন তিনি মানুষ! তিনি মহৎ!

অতি সামান্য কথায় দু'জন হাজি সাহেবের মধ্যে ক্রোধের পাহাড় নেমে আসতে দেখলাম। অথচ দু'জন এক সঙ্গে হজে এসেছেন, এক সঙ্গে থেকেছেন, এক সঙ্গে হজ করেছেন। একদিন দু'জনে বেরিয়েছেন একটি বিশেষ গন্তব্যে যাবার জন্যে। মক্কার পথঘাট দু'জনেরই অচেনা। যেতে যেতে একজন বললেন, এদিকে। অন্যজন বললেন, ওদিকে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি, মতপার্থক্য এবং দারুণ উত্তেজনা। অবশেষে গরজাতে গরজাতে দু'জনে দুই দিকে ছিটকে গেলেন—ঠিক যেন আদিম দুই বন্য পশু! মনে মনে তাঁরা 'শোণিত শপথ' গ্রহণ করে ফেললেও অবাক হবার কিছু ছিল না। আর কি আশ্চর্য দু'জনেই হাজি সাহেব!

অথচ রসুলুল্লাহ?

সাহাবীদের সঙ্গে বসেছিলেন তিনি, বসে বসে দ্বীন-দুনিয়ার কথা আলোচনা করছিলেন। এমন সময় সেই মজলিশে এলেন এক বেদুইন সর্দার। তাঁর চোখে মুখে ভ্রান্তি ও উদ্বেগের চিহ্ন। বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি অমুক গোত্রের সর্দার। পূর্বেই মুসলমান হয়েছিলাম আমি এবং আমার গোত্রের সকলেই দ্বীন ইসলামে দীক্ষা নিয়েছে। আমি তাদের বলেছিলাম, যদি তোমরা মুসলমান হও তা হলে তোমাদের কোন অভাব থাকবে না, সকল সময় আল্লাহর রহমত ও সাহায্য পাবে। তারা বড় সরল কিন্তু একরোখা। আমার কথায় বিশ্বাস করে তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। এদিকে অনাবৃষ্টির জন্যে দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছে আমার গোত্রের উপর। সকলে বড় কষ্টে দিনকাটাচ্ছে। তাদের এখনই যদি কিছু সাহায্য করা না হয়, মনে হয় তাদের বিশ্বাসের ভিত নড়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় দয়া করে কিছু ব্যবস্থা করুন।

সকলেই স্তব্ধ হয়ে বেদুইন সর্দারের কথাগুলি শুনছিলেন। কথা শেষ হলে সকলেই এক সঙ্গে তাকালেন রসুলুল্লাহর মুখের দিকে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আল্লাহর রসুল হযরত আলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। এই অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন হযরত আলি। তাঁর স্বরে বিষন্নতার ছোঁওয়া। তিনি বললেন,

ইয়া রসূলুল্লাহ! বায়তুলমাল থেকে দেবার মত এখন কিছুই নেই।

খুবই বিপর্যস্থ পরিস্থিতি। সকলেই গভীরভাবে নীরব হয়ে গেলেন আবার। যায়েদ ইবনে সাহনাহ নামে একজন ধনাঢ্য ইহুদি বসেছিলেন সেখানে। তিনি রসূলুল্লাহকে বললেন, আপনি যদি অমুকের বাগানের এত মণ খেজুর এত দিনের মধ্যে আমাকে পরিশোধ দেন তাহলে আমি আপনাকে আশি মিশকাল সোনা দিতে পারি।

প্রস্তাব শুনেই সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করে দিলেন রসূলুল্লাহ। বললেন, পরের বাগানের খেজুরের জিম্মাদারি আমি নিতে পারি না। তবে তুমি ভাল খেজুর পাওয়ার সর্ত করতে পার।

শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাল খেজুর পাওয়ার সর্তে যায়েদ ইবনে সাহনাহ আশি মিশকাল সোনা দিয়ে দিলেন। সেই সোনা বেদুইন সর্দারের হাতে তুলে দিয়ে রসূলুল্লাহ বললেন, ইমানদারির সঙ্গে এই অর্থ তুমি সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিও।

দিন যায়। ইহুদির ঋণ পরিশোধের তখনো কয়েকদিন বাকি আছে। এক সাহাবীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তার জানাজার জন্যে সেখানে গেলেন রসূলুল্লাহ। সঙ্গে গেলেন হযরত আবুবকর, হযরত উমর এবং আরো অনেকে। রসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছেন, সেই জনতার মধ্যে এসে হাজির হলেন যায়েদ ইবনে সাহনাহ। হঠাৎ তিনি রসূলুল্লাহর কুর্তা আর চাদর ধরে অভদ্রভাবে ঝাকানি দিয়ে রূঢ় কণ্ঠে ঋণের তাগাদা শুরু করে দিলেন। তাঁর কথাবার্তা ক্রমেই উদ্ধত হয়ে উঠছিল এবং এক সময় তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। অশোভন ভাবে চাদর ধরে এক সময় কর্কশ কণ্ঠে বলে ফেললেন, তোমরা ত আবদুল মোত্তালেবের বংশধর, তোমাদের স্বভাবই এই! একবার নিলে আর শোধ দিতে চাও না!

কঠিন মানুষ হযরত উমর ক্রোধে কম্পমান। চকিতে অগ্রসর হয়ে ততোধিক কঠোর কণ্ঠে ফেটে পড়লেন, রে আল্লাহর দুষমন! তুই জানিস কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস? যদি রসূলুল্লাহর

কোন ভয় না থাকত তা হলে আমি এখুনি তোর মাথাটা কেটে আলাদা করে দিতাম।

এতগুলি মানুষের সম্মুখে এমন হীন অপমান সূচক ব্যবহারেও রসূলুল্লাহ নীরব। তিনি ইচ্ছে করলে এখনই এই উদ্ধত ইহুদির দেহকে খন্ড বিখন্ড করে ধুলায় লুটিয়ে দিতে পারেন অথচ আশ্চর্যের বিষয় এতটুকু উত্তেজনা নেই তাঁর মধ্যে। সেই পবিত্র মুখে ক্রোধের সামান্যতম চিহ্ন পর্যন্ত নেই! সংযমের আবরণে হিমালয়ের মত স্থির, ভোরের আকাশের মত শান্ত। সব ক্রোধ উত্তেজনাকে তিনি সহনশীলতায় সংযত করেছেন, ক্ষমার ঔদার্যে উপেক্ষা করেছেন। এতবড় একটা মিথ্যা অপবাদ এবং মূর্খ ব্যবহারের বিনিময়ে তাঁর মুখে ফুটে উঠল পবিত্র এক প্রসন্ন দীপ্তি। হযরত উমরের ব্যবহার তাঁর ভাল লাগেনি। যে পাওনাদার তার পাওনা তাগাদা করার নাহ্য অধিকার আছে অথচ হযরত উমর তাকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান। উমরের দিকে সেই শান্ত মুখটা তুলে তিনি বললেন, আমার এই পাওনাদার সম্পর্কে তোমার যা করা উচিত ছিল তা করলে না। তাকে এভাবে ধমকাতে গেলে কেন। সে ঋণ দিয়ে ত কোন অন্যায় করেনি বরং তার ঋণ আমাদের অনেক উপকারে এসেছে। সুতরাং ভর্ৎসনা না করে আমাকে বলা উচিত ছিল যে আমি যেন তাড়াতাড়ি নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যেই তার পাওনা পরিশোধ করে দিই। আর তাকে বলা উচিত ছিল সে যেন সকলের কাছে ভদ্রভাবে তার ঋণের তাগাদা করে।

মজলিশের তাবৎ লোক এই মহৎ ঘোষণায় এক আশ্চর্য দিগন্তের সন্ধান পেলেন যে সোনালী দিকচক্রবালের নিশানা তাদের জানা ছিল না।

হায়! সংযমের এই মহৎ সজ্জায় আমরা সকলেই যদি সজ্জিত হতে পারতাম!

ক্রোধকে সংযত করতে পারলে, হারামকে হত্যা করতে পারলে, তার ফল যে কেমন আশ্চর্য রকমে স্বর্ণপ্রসূ হয়ে ওঠে, সেই পরিচয় রয়েছে এই হাদিসটির পরবর্তী অংশে।

উমরকে উপদেশ দেওয়ার পর রসূলুল্লাহ নির্দেশ দিলেন, যাও একে সঙ্গে করে নিয়ে বায়তুল মাল থেকে এখুনিই ঋণ পরিশোধ করে দাও। আর বিশ সা (প্রায় দু মণ) খেজুর অতিরিক্ত দিও।

বায়তুল মাল থেকে খেজুর ওজন করে দেবার সময় লোকটি হযরত উমরকে শুধালেন, আপনি কি আমাকে চেনেন? হযরত উমর বললেন, না। লোকটি বললেন, আমার নাম যায়েদ ইবনে সাহনাহ। এই নামটির সঙ্গে হযরত উমরের পরিচয় ছিল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে শুধালেন, ইহুদিদের মধ্যে আপনি না সব চেয়ে বড় আলেম? যায়েদ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। এবার কিছুটা ক্ষোভ ফুটে উঠল হযরত উমরের কণ্ঠে। বললেন, এত বড় জ্ঞানী ব্যক্তি হয়ে রসূলুল্লাহর উপর অহেতুক এমন একটা মিথ্যা অপবাদ দিতে আপনার বিবেকে বাধল না? উত্তরে যায়েদ ইবনে সাহনাহ বললেন, অপবাদটি মিথ্যা কিন্তু অহেতুক না, একটা উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এমন ব্যবহার করেছি। আমার কথাগুলি স্থিরভাবে শুনলেই আপনি সব উপলব্ধি করতে পারবেন। তওরাত গ্রন্থে শেষ নবীর আগমনের কথা আছে এবং তার বিস্তারিত বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। সেই বিবরণগুলির সব কটিই আমি রসূলুল্লাহর মধ্যে পেয়েছি, কেবল বাকি ছিল দুটি। এর একটি হলঃ তৌরাতে বলা আছে, শেষ নবী সকল সময় হবেন ক্রোধের উপর জয়ী। ক্রোধ সকল সময় তাঁর কাছে পরাজিত হবে। আর দ্বিতীয়টি হলঃ তাঁর সঙ্গে যত বড় মূর্খের মত ব্যবহার হোক, সহনশীলতায় তিনি তারও উপরেও জয়ী হবেন। এ দুটি নিদর্শনের পরীক্ষা বাকি ছিল, আজ হয়ে গেল। যায়েদ ইবনে সাহনাহ এরপর আবেগপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, হে উমর আপনি সাক্ষী থাকুন—আমি এই মুহূর্ত থেকে একজন মুসলমান—আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অ আশহাদো আন্না মুহম্মাদার রাসূলাল্লাহ। উদ্বেলিত কণ্ঠে যায়েদ ইবনে সাহনাহ আরো ঘোষণা করলেন, হে উমর আপনি আরো সাক্ষী থাকুন, আজ হতে আমি আমার সমুদয় অর্থ সম্পদ ধনদৌলতের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম।

সংযমের জমজমে ক্রোধের অনল নিভিয়ে দিতে পারলে সোনার ফসল এমনি করেই ফলে! হজের একটি বড় শিক্ষা এই সংযম। আজ থেকে সংযম আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সত্য হয়ে উঠুক!

সময় দ্রুত শেষ হয়ে আসছে। কেনাকাটার বিশেষ সময় পাওয়া যাবে না, অবশ্য আমাদের কেনাকাটাও নেই তেমন কিছু। যা আছে, দু-একটা করে তাই কিনছি প্রতিদিন। দুটি নামায পাটি, তিনটি হাজি রুমাল, একটি ছবির বই ছাড়াও স্ত্রী কিনলেন পার্কার পেন আর আমি কিনলাম একটি সেফার্স। এই পেন দিয়েই বেহেশতের পাখিরা এবং কাবার পথের দীর্ঘ অংশ লিখেছি।

২৯.

২০ অক্টোবর ৮২। ২ কার্তিক ৮৯। ২ মুহররম ১৪০২। বুধবার

অনেক স্মরণীয় দিনের মধ্যে আজকের দিনটিও আমাদের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকল। কাল থেকেই নিয়েত করেছিলাম এবং সেইমত ফজরের নামায সমাপ্ত করেই হেরা পর্বতের উদ্দেশ্যে কাবার পাদদেশ থেকে এগার নাম্বার বাসে রওনা হলাম। বাবুল উমরা থেকে বাস ছাড়ল ভোর পাঁচটা তেত্রিশে। কাবা শরীফে একটা চক্র দিয়ে মারওয়া অতিক্রম করে সাফার দিকের জনবিরল পথে বাস দ্রুত এগিয়ে চলল। রসূলুল্লাহর বাড়ির (জন্মস্থানের) পাশ দিয়ে বিয়া জামির স্ট্রীট হয়ে আমাদের যানটি ক্রমেই মক্কা নগরীকে পিছনে ফেলে পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করছে। একসময় দেখলাম পূবের আকাশে সুবেহ সাদেকের চিহ্ন, অন্ধকার দীর্ণ করে আশ্চর্য এক লালিমা ফুটে বেরুচ্ছে। দিগন্ত বিস্তারিত কালো পাহাড়ের তলদেশ থেকে যেন নূরের একটা চমক, জিবরাইলের ডানা থেকে ঝরে পড়ছে পৃথিবীর বুকে। সেই লালিমা আভা গাঢ় মেহেদি রঙের মত মনোরম হতে হতে এক সময় হালকা গোলাপী হয়ে গেল। সকাল হচ্ছে। আকাশে হালকা মেঘের আস্তরণ। স্বচ্ছ আয়না যেন। সুবেহ সাদেকের তরুণ তপন সেই আয়নায় আড়াল থেকে সংগোপনে আপনার মুখ দেখছে। মুখের জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে বিশ্বভুবনে। মেঘহীন আকাশ এত মনোরম নয়। আকাশে মেঘের প্রয়োজন আজ নতুনতর ভাবে উপলব্ধি করলাম। মেঘ আকাশের অলংকার।

ছটা পাঁচ মিনিটে হেরার পাদদেশে বাস থামল। মক্কার একমুখী রাস্তায় ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ইতিমধ্যে প্রায় আট-ন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসেছি আমরা। অথচ কাবা থেকে সোজা পথে হেরার দূরত্ব চার কিলোমিটারের বেশি নয়।

আমাদের সঙ্গে বাংলাদেশের কয়েকজন হাজি সাহেব ছিলেন।

তাঁরা বাস থেকে নেমেই পাহাড়ে উঠতে শুরু করলেন। বিসমিল্লাহ বলে আমরাও তাঁদের অনুসরণ করলাম। দু-তিন মিনিটের পথ উপরে উঠেই স্ত্রী তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করলেন। আমিও আর কোন রকম জোর জবরদস্তি করলাম না। তাঁর পক্ষে পাহাড়ে ওঠা সত্যই সম্ভব ছিল না। নিচে একটি দোকান দেখিয়ে বললেন, আমি ওখানেই বসে আছি। আমার পক্ষেও বিলম্ব করা উচিত নয়। সঙ্গীরা ইতিমধ্যেই পাহাড়ি পথের বাঁক ঘুরে অনেকটা উপরে উঠে গেছেন। আমি দ্রুত চলতে শুরু করলাম। কিন্তু কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই উপলব্ধি করলাম এখানে দ্রুত চলা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। দ্রুত হাঁটলে পাথর পিছলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তার থেকেও বড় বিপদ হাঁফে-দমে বেদম হয়ে একাকার হওয়ার। সুতরাং ব্যস্ত সঙ্গীদের ছেড়ে ধীরে সুস্থে ওঠার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সেও এক বিপদের। পথের নিশানা নেই ঠিক মত। তাই পিছনে পড়লেও সঙ্গীদের যাত্রা পথের দিকে যতটা সম্ভব নজর রাখলাম আর ধীরে ধীরে পাক খেয়ে খেয়ে সর্পিল গতিতে পাহাড়ি পথ ভেঙে উঠতে লাগলাম। ছোট ছোট নুড়ি আছে কিছু কিন্তু বড় পাথরের সংখ্যাই বেশি। শিলং দার্জিলিং দক্ষিণ ভারত বা কাশ্মীরে যে সবুজ গালিচা বিছানো পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তা এখানে নেই। এ পাহাড় তৃণলতা শূন্য মরুর মসৃণ 'নেড়া' পাহাড়, মাঝে মাঝে দু-একটি কাঁটা গাছ—স্থানীয় একটি ছেলে বললে 'বাওয়া'—ঠিক আমাদের বাবলা গাছের মত কণ্টকাকীর্ণ। এই শেষ অক্টোবরে ফুলে ভর্তি হয়ে আছে, ভারি মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে বাতাসে। কিন্তু এই বিশাল পর্বতগাত্রে সংখ্যায় এগুলি এত নগন্য যে চোখেই পড়ে না। ছোটগুলি যে আর কোন দিন বাড়তে পারবে তা মনেই হয় না। একটা চারা 'বাওয়া' গাছে অন্ততঃ সাত-আটটা বকরি-দুম্বার মমতাহীন আক্রমণ দেখলাম। মনে হল ওরা কেবল ওর কচি পাতা নয়, ছাল-চামড়া পর্যন্ত খেয়ে ফেলছে। হ্যাঁ পাহাড়ের এত উপরে, একেবারে মাথাতেও দশ বারটি বকরি খাসীকে চরতে দেখলাম। আমরা, অনভ্যস্ত বাঙালিরা,

যেখানে উঠতে ভয় পাচ্ছি, সেখানে পাহাড়ি ছাগলের দল নির্বিকার চিত্তে তাকে চারণ ভূমিতে পরিণত করেছে।

পথের দুপাশে অনেকগুলি ছোট ছোট বরিদ (বরফ শীতল পানি) আর পেপসি-কোকাকোলার দোকান গড়ে উঠেছিল ঠিক জমজমাটি হজের সময়, কেনাবেচাও যে ভাল হয়েছিল তা পাশের স্তূপীকৃত প্লাস্টিকের বোতল ও টিনের কৌটো দেখলেই বোঝা যায়। নিচের দিকের কয়েকটি দোকান এখনো চালু আছে, উপরের দিকে দোকান নেই আছে তার কাঠামো।

ধীরে ধীরে আমরা হেরা পর্বতের উপর আরোহণ করতে লাগলাম। বিশাল পর্বত। কতটুকুই বা উঠেছি—লক্ষ্য করলাম নিচে থেকে কোন শব্দ আর আমাদের কানে আসছে না। আস্তে আস্তে পর্বতের একটা নিজস্ব নির্জনতায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। মনে হল পার্থিব কোন কোলাহল সেই গভীর নির্জনতাকে কোনদিনই স্পর্শ করতে পারবে না। পর্বতারোহণের প্রতি পদক্ষেপে আমি রসুলুল্লাহর কথা মনে করছিলামঃ এই জনমানব শূন্য বিজন পর্বতে তিনি কেন আসতেন বার-বার? কি সেই মহা আকর্ষণ? কি পেতেন এখানে?

সীরাত এবং হাদিস গ্রন্থ সমূহে দেখতে পাচ্ছি, বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নির্জনতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রবল ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে যেমন এই নির্জনতার প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন হযরত ইবরাহিম আ। তাঁর বয়স যখন পঁয়ত্রিশ, রসুলুল্লাহর মধ্যে এই আকর্ষণ লক্ষণীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সূচনা হয়েছিল দু বছর পূর্ব থেকে। প্রকৃতপক্ষে বাল্যকাল থেকেই যার উঁকি ঝুঁকি, যৌবনের প্রারম্ভে যার শুভ সূচনা, তেত্রিশ বছরে যার উদ্বেলিত শিহরণ, পঁয়ত্রিশ বছরে তার স্বর্ণময় বহিঃপ্রকাশ। প্রধানতঃ নির্জনতার জন্যই রসুল পাক লোকালয়ের কোলাহল হতে দূরে জনমানবহীন ধ্যানগম্ভীর হেরাকে নির্বাচিত করেছিলেন। পাদদেশে শব্দশূন্য দিগন্ত বিস্তারিত মরু প্রান্তর, উপরে তারা ভরা নির্জন নীল আকাশ আর ঝির ঝির শান্ত

হাওয়া—গুহার মধ্যে বসে তিনি ধ্যান সমাহিত হয়ে যেতেন, কোন অনন্তের জ্যোতির্ময় স্পর্শে তিনি পুলকে শিহরিত হতেন, চেতনা হারাতেন। অনেকে প্রশ্ন তুলেছেনঃ হেরার গুহায় বসে রসুলুল্লাহ যে এবাদতে মগ্ন হতেন এই উপাসনা কেমন? তখন ত নামায তসবিহ পাঠ আধ্যাত্মিক অন্তর্লীনতা এসবের সঙ্গে কোন পরিচয় ছিল না তা হলে সে উপাসনার স্বরূপ কি? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত ইব্রাহিম আ যেভাবে উপাসনা করতেন, রসুলুল্লাহর উপাসনার স্বরূপ ছিল ঠিক সেই রকম। আকাশের উজ্জ্বল তারকা নক্ষত্ররাজিকে দেখে ইবরাহিম আ মনে করলেন, এরাই আমার প্রভু। চন্দ্রালোকে নীলাকাশ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে অপলকে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন, এই ত আমার রব। একসময় চন্দ্র অস্তমিত হল, অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশে দেখা দিল সূর্য। হযরত ইবরাহিম আ বললেন, এই হল আমার খোদা। শেষ পর্যন্ত সূর্যও অস্ত গেল নিরাশ কণ্ঠে তিনি বললেনঃ "লা উহেব্বুল আফেলিন"—আমি অস্থায়ী জিনিস চাই না। উদ্বেলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হল "ইন্নি অজজাহ্তু অজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাও অতে অল আরদা"—যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আমি তাঁর দিকেই মুখ ফেরালাম। সূরা আনআম, রুকু ৯।

নির্জনতার আকর্ষণেই রসুলুল্লাহ হেরা গুহায় চলে আসতেন, তারপর ধ্যানগম্ভীর হেরা পর্বতের মত তিনিও ধ্যানমগ্ন হয়ে যেতেন। এ সময় তিনি ভাবতেন আমি কে? কোথা থেকে এলাম? এই পৃথিবী কে সৃষ্টি করলেন? এই নক্ষত্র এই চাঁদ এই সূর্য? পশুপাখি লতাবিতান নরনারী এসব কার সৃষ্টি? তিনি কে?

অর্থাৎ সেই অনন্তের প্রশ্ন। অনন্ত আকুল জিজ্ঞাসা।

এসব প্রশ্নের উত্তর তিনি পেতেন স্বপ্নের মধ্যে। স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর চিত্তে চকিতে জেগে উঠত অনন্তের আভাস, একটি দীপ্তি, নূরের চমক। কখনো কখনো স্বপ্নে যা দেখতেন পরদিন

বাস্তবে তা সত্য হয়ে উঠত। এমনি ভাবে সকলের অলক্ষ্যে রসূলুল্লাহর মনপ্রাণ এবং দেহ বিশাল দায়িত্বপূর্ণ অহি গ্রহণের উপযুক্ত হয়ে উঠছিল। সুতরাং হেরাগিরি-গুহায় এই সাধনার কালটি হল চিত্ত ও চেতনার গঠমান যুগ। আধার গঠন সম্পূর্ণ হলে সেই আধারে প্রথম এসে পড়ল হযরত জিবরাইল আ-এর নূর, পবিত্র আধারে পবিত্রতম জিনিষের প্রতিফলন!

হ্যাঁ এই সেই পবিত্র হেরা পর্বত, যার পবিত্র প্রস্তর খণ্ডের উপর এই মুহূর্তে আমি দণ্ডায়মান। এমনি দেখলে এটি একটি পাহাড়, শিলা খণ্ডের এক বিশাল স্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন একটি পাহাড়ে উঠতে কোন মানসিক কষ্ট নেই কিন্তু যেই একটু গভীরে নামা যায় দেখতে পাই রসূলুল্লাহকে, দেখতে পাই জিবরাইলের নূরের ঝিলিক, কালাম পাকের পবিত্রতম বাণীর আলোড়ন আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম হয়ে যাই, পা তুলতে পারি না, সারা দেহ কাঁপতে থাকে, মনে হয় আমি নিজেই যেন হেরা পাহাড়ের থেকেও ভারি হয়ে উঠেছি!

মাঝপথে, যে বাংলাদেশী তীর্থযাত্রীর দল পূর্বে উঠেছিলেন তাঁদের একজন, যাত্রায় বিরতি টেনে বসে আছেন দেখলাম। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাতেই তিনি বললেন, মাথা ঘুরছে—আর বোধহয় উঠতে পারব না। একটু থেমে বললেন, দু রাকাত নামায পড়ব কিন্তু কোন দিকে ফিরে? এই দিকভ্রান্ত হাজি সাহেবকে আমি কাবা দেখিয়ে দিলাম।

মনজিল এখনো দূর অস্ত। সুতরাং থামা চলে না। সঙ্গীদের আর দেখতে পাচ্ছি না, মনে হল তাঁরা অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। আমার দম ভারি হচ্ছে ক্রমশঃ, বুঝতে পারছিলাম ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। হঠাৎ বাঁক ফিরেই দেখলাম এক ভদ্রলোক বিশাল পাথরের উপর বসে কি যেন করছেন। আমিও বিশ্রাম নিতে দাঁড়িয়ে গেলাম সেখানে। হাতে ক্যামেরা দেখেই বুঝলাম ইনি গাহরে হেরার ফটোগ্রাফার। পাঁচ রিয়েলের বদলে ফটো তুলে দেন। আমিও ফটো তুলতে চাই জেনে ভদ্রলোক খুব খুশি হলেন। ইতিমধ্যে

পশ্চিম পাঞ্জাবের এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গী হলেন। তিনি একাই পাহাড় চড়ছিলেন, আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি। আল্লাহর কাছে আমার জন্য বার বার দোওয়া করলেন। অথচ আমি তাঁর সঙ্গী হওয়া ছাড়া আর কোন উপকারই করতে পারলাম না। কিই বা করার ছিল? সংকীর্ণ পাহাড়ি পথে হাত ধরে এগুবার উপায় ছিল না। শুধু তিনি আমায় অনুসরণ করছিলেন আর কথা বলছিলেন অনর্গল—আল্লাহর কথা, রসুলের কথা। বুঝলাম মানুষ সঙ্গী চায়, শ্রোতাও। সাহচর্য মানুষকে ভয়হীন করে, উদ্দীপ্ত করে, দুর্গম পথে সামনে এগুবার শক্তি জোগায়।

কথায় কথায় অর্ধেকেরও বেশি পথ চলে এসেছি আমরা। কিন্তু এক জায়গায় এসে পথ হারিয়ে ফেললাম। কোনদিকে কোন পদচিহ্ন নেই, সামনে খাড়া পাহাড়। সঙ্গীসাথীদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। কোন দিকে যাই? উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আমার পিছনে দাঁড়িয়ে প্রায় কেঁদে ফেললেন। এই মারাত্মক বিপদের সময় সৌদি সরকারের কথা মনে পড়লঃ এ পথ ত ঠিক করে দেবার দায়িত্ব তাঁদেরই। তাঁরা তো জানেন লক্ষ লক্ষ রসুল-প্রেমিক এ পথে আসেন প্রতিদিন প্রতি মাস প্রতি বছর। এই কষ্টসাধ্য দুর্গম পাহাড়ি পথে তীর্থযাত্রীরা নিশ্চয়ই কোন আনন্দ করতে আসেন না, তাঁরা আসেন সেই মুবারক জমিনটুকু জিয়ারত করতে যেখানে বসে রসুলুল্লাহ নীরবে নির্জনে একান্ত একলা হয়ে আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, সেখানে বসে যুগের নকীব লাভ করেছিলেন আল কোরআনের প্রথম আয়াত। এই পবিত্র এবং ঐতিহাসিক স্থানটির যাত্রাপথকে ত সৌদি সরকারের উচিত একেবারে সকলের জন্য সুগম করে দেওয়া। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল তাঁরা তা করবেন না। রসুলুল্লাহর কোন স্মৃতিচিহ্নকে তাঁরা প্রধান দ্রষ্টব্য করে তুলতে চান না, দ্রষ্টব্য ত দূরের কথা কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলে তাঁরা খুশি হন। তাঁদের ভয় পরবর্তীকালে মানুষেরা হয়ত এগুলিকেই প্রধান অবলম্বন হিসেবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি শুরু করে দেবে। এমন হলে

তা হবে শেরেকের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং জবলে হেরা নিয়ে তাঁদের কোন মাথা ব্যথা নেই। যাত্রীদের জন্য পথ সুগম করা ত দূরের কথা, নিতান্ত একটা বিশাল পর্বতকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলেই হয়ত হেরা পর্বত তার ঐতিহ্য নিয়ে আজও বর্তমান।

সৌদি সরকারের কথা পরে ভাবা যাবে, এখন উর্ধ পাহাড়ের সংকট থেকে কিভাবে উদ্ধার পাব সে চিন্তা প্রবল হয়ে দেখা দিল। সতর্ক দৃষ্টি ফেললাম চারদিকে। দেখলামঃ ঠিক আমাদের মাথার উপরে কয়েক হাত দূরে একটা শাদা রঙের তীরচিহ্নে যাত্রাপথের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। যে সদাশয় যাত্রী এই সামান্য কাজটুকু করেছেন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। মনে হল আমরা যেন জীবন ফিরে পেলাম। বুঝতে পারলাম, কোন কাজই তুচ্ছ নয়।

সতর্কতা পরিশ্রম এবং রীতিমত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে স্থির পদক্ষেপে পা ফেলে অবশেষে তীরচিহ্ন স্পর্শ করা গেল। ওখান থেকে কয়েক পা এগিয়ে আর এক বিপদ। আমরা এক কিনারায় এসে পৌঁছলাম যেখান থেকে তলদেশ একেবারে খাড়াই দেখা যায়। অর্থাৎ কোন কারণে পা পিছলে পড়লে অন্ততঃ আধ কিলোমিটার নিচে গিয়ে কঠিন পাথরে আছাড় খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। নিচে তাকাই আর সারা দেহ কাঁপতে থাকে, আর একটু দাঁড়ালে পা না পিছলেই যে গড়িয়ে পড়ে যাব সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। সুতরাং আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে হাঁটি-হাঁটি পা-পা শুরু করলাম। কয়েক মিটার এগিয়ে যেতেই সংকট সাময়িক ভাবে দূর হয়েছে মনে হল। সংকীর্ণ গিরিপথ এখন ঈষৎ প্রশস্ত, যাত্রীদের প্রতি কিঞ্চিত প্রসন্নও। এখন একেবারে নিশ্চিন্তে না হলেও পথ চলা যায়।

ভাবতে অবাক লাগে এই পথে, এই খাড়াই অতি সংকীর্ণ দুর্গম পাহাড়ি পথে রসূলুল্লাহ প্রতিনিয়ত যাতায়াত করেছেন। হাতে মা খাদিজার দেওয়া কয়েক দিনের খাদ্যসামগ্রী, কতদিন অন্ধকারেই এই পথ অতিক্রম করেছেন তিনি। অটল এবং নির্ভিক। ভাবা যায় না। আর মা খদিজার সঙ্গলাভও হযরতের জীবনে এক মহাসৌভাগ্যের

সূচনা করেছিল। এ সবই আল্লাহর দান। এই মহীয়সী নারী সুখে-দুঃখে রসুলুল্লাহর পাশে আদর্শ জীবন সঙ্গিনী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিবাহের পরেই আপনার বিপুল ধনরত্ন রসুলুল্লাহর পায়ে লুটিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে মক্কায় ,সেই সম্পদ দু হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন রসুলুল্লাহ। একটি বারের জন্যও ক্ষোভ আপত্তি ফুটে ওঠেনি তাঁর মুখে। বরং খুশি হয়েছেন তিনি। খুশি হয়ে দুঃখের ডালি মাথায় তুলে নিয়েছেন হাসিমুখে। দুদিন আগেও যাঁর চারপাশে দাসদাসীর ভিড় থাকত, আজ সব কাজ তিনি সমাধা করেন আপন হাতে। সাধনপথেও প্রধান সহায় হয়ে ওঠেন স্বামীর, সযত্নে খাদ্যসামগ্রী হাতে তুলে দিয়ে বলেন, নিঃশঙ্ক চিত্তে আপনার পথে এগিয়ে যান। কোন চিন্তা করবেন না সংসারের, আল্লাহ আছেন। রসুলুল্লাহ যেন নতুন মনোবল ফিরে পান, অনুভব করেন অদম্য উৎসাহের। স্ত্রীর এই প্রেরণা ও প্রেম রসুলুল্লাহর জীবনে এক অফুরন্ত শক্তির উৎস হয়ে দেখা দিয়েছিল।

পা-পা করে পা ফেলে ইতিমধ্যে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। একটাবিশাল পাথরের বেড় ঘুরেই একেবারে চূড়ার পথে পা রাখলাম। আর কয়েক মিনিট পরেই বাঞ্ছিত জায়গায় পৌছে যাব। উল্লাসে পথের ক্লান্তি ভুলে যাচ্ছি ধীরে ধীরে, খুশির জোয়ার এসে বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জনাকে যেন ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছে।

একটু দূরে লক্ষ্য করলাম, একটা খসে পড়া বিশালতর পাথর ক্ষুদ্রতর একটি পাথরের গা স্পর্শ করে যেন আরামে বিশ্রাম নিচ্ছে। কোন কারণে এই সামান্য অবলম্বনটুকু বিচ্যুত হলে মনে হয় পাহাড়ের একটা বিশাল এলাকা ধ্বসে নিচে পড়ে যাবে।

ছ-টা সাতান্ন মিনিট। আমরা একেবারে হেরা পর্বতের শীর্ষদেশে উঠে এলাম। চূড়া থেকে মক্কা শহর পরিষ্কার চোখে পড়ে, সাতটা মিনার সহ কাবা সুস্পষ্ট, মক্কা হোটেল, হোটেল বদরের বিশাল বিল্ডিংগুলি অনায়াসে চেনা যায়।

কিন্তু গুহা কই? গাহরে হেরা? নবীজীর তপস্যার সেই নির্জন-নিবাস? একজন ইশারা করে নিচে নামার পথ দেখিয়ে দিলেন। অর্থাৎ তপস্যার সেই তীর্থভূমিতে যেতে হলে অল্প একটু নিচে নামতে হবে। এই পথটুকু অত্যন্ত বিপজ্জনক। হোক বিপদ-সংকুল, এত দূর এসে গুহার মাটি স্পর্শ না করে ফিরে যাব একথা ভাবতেই পারছি না। সুতরাং আল্লাহর নাম নিয়ে আমরা সন্তর্পণে নিচে নামতে শুরু করলাম। গুহার দূরত্ব চূড়া থেকে বিশ পঁচিশ হাতের মধ্যে। দশ-বার হাতের মত নেমে খানিকটা সুড়ঙ্গ পথ অর্থাৎ চারদিকেই পাথর তার মধ্য দিয়ে গলে যেতে হবে। খুব সাবধানে পার হতে গিয়েও দেখলাম আমার পিঠে ও পেটে উভয় দিকে পাথরের চাপ পড়ছে। আমার মত একহারা মানুষের এই অবস্থা আর রসুল পাক দু-বেলা এপথে যাতায়াত করতেন! তিনি অহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন চল্লিশ বছর বয়সে। সুতরাং আমাকে দিয়ে বিচার করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে চল্লিশ বছর বয়সেও, যে বয়সে বাঙালিদের ত বটেই, অনেক সৌদিকেও ভুঁড়িবহুল ও চর্বিসর্বস্ব হতে দেখছি—রসুলুল্লাহর দেহে কোন মেদ ছিল না, এক সুঠাম সুন্দর দেহের অধিকারী ছিলেন তিনি। মেদ না থাকার আরো প্রমাণঃ এই বিশাল পর্বতে রাত্রে এবং দিনে—তিনি ওঠা-নামা করতেন অনবরত। একজন মেদবহুল মানুষের পক্ষে এটি কখনই সম্ভব নয়।

সকাল সাতটা আট মিনিট। অবশেষে আমরা আমাদের বহু কাঙ্খিত হেরা গুহায় এসে পেঁছিলাম। আলহামদো লিল্লাহ। গুহাটি একেবারেই বড় নয়—অপ্রশস্ত, চার থেকে পাঁচ হাত লম্বা, আড়ে আড়াই তিন হাত, একটি চোঙের মত যার শেষ প্রান্ত আরো সংকীর্ণ। প্রবেশ-মুখে একটি লোক দাঁড়াতে পারে, ভিতরে দাঁড়ান যায় না কিন্তু বসে নামায পড়ায় কোন অসুবিধা নেই। নামায পড়ার জন্যে একাধিক মসল্লা পাতা আছে, দর্শনার্থীরা দু রাকাত করে নামায পড়ছেন শুকরিয়ার।

পর্বতের শীর্ষদেশে বসলে চারদিকেই উন্মুক্ত আকাশ সুন্দর-

ভাবে দেখা যায় অথচ রসূলুল্লাহ চূড়ায় না বসে কষ্টকর বিপজ্জনক পথ বেয়ে নিচে নেমে এসে এই গুহাটিকেই তপস্যার জন্যে নির্বাচন করলেন। স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগে, কেন এই নির্বাচন? কিছুক্ষণ চিন্তার পর আমার মনে হল, চিন্তার গভীরতা এবং চিত্তের একাগ্রতার—Concentration of mind —জন্যে গুহানিবাস অনিবার্য ছিল। চূড়ায় বসলে সম্পূর্ণ মক্কা উন্মুক্ত হয়ে দেখা দেয়, দিনে লোক চলাচল উটসহ কাফেলার গমনাগমন চোখে পড়াও বিচিত্র নয়, রাতে আলো। এ অবস্থায় চিত্তের একাগ্রতা থাকে না. একমুখী চিন্তা শতছিন্ন হয়ে যায়। তা ছাড়া প্রচণ্ড সূর্যতাপ থেকে বাঁচার জন্যে মাথাব উপর কিছু আড়ালের প্রয়োজন। শীর্ষদেশে এসব কিছুই ছিল না। গুহায় বসলে পার্থিব সকল কিছু আড়াল হয়ে সম্মুখে কেবল ভেসে উঠত তারা ভরা উন্মুখ আকাশ. অনন্ত লোকের অলৌকিক রাজ্য—রহস্যময় প্রকৃতি মানুষকে আবো গভীর ভাবে চেতনার রাজ্যে তলিয়ে দেয়, প্রভুর নৈকট্য লাভের সহায়ক হয়।

এই সেই পবিত্র পূতস্থান যেখানে চৌদ্দশো বছর পূর্বে ঝলকিত হয়ে উঠেছিল হযরত জিবরাইল আ-এর নূরের চমক, যার থেকে এই জবল বা পাহাড়ের নাম হয়েছে জবলে নূর—নূরের পাহাড়। ভাবতে ভাল লাগছেঃ রসূলুল্লাহ ধ্যানমগ্ন হয়ে আছেন নিস্তব্ধ হেরা গুহায়, আবেশে অবশ চিত্ত ভাবে বিহ্বল, হঠাৎ জিবরাইল আ এলেন, জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠল কালো পাহাড়, হেরার বুক আন্দোলিত হয়ে উঠল নব উল্লাসে। কিছুদিন ধরেই এক নতুন চেতনায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিলেন রসূলুল্লাহ, চিন্তার কোন রহস্য রাজ্যে তিনি যেন ভেসে চলেছেন, অন্তরে কেবলই কম্পন, কেবলই স্পন্দন, সেই অসীম শেষ পর্যন্ত বাঙময় হয়ে উঠল সীমার মাঝে, জ্যোতির্ময় আলোকে আলোকিত হয়ে গেল অনন্ত আকাশ, সেই নূরের সাগর থেকে ধ্যানমগ্ন তপস্বীকে মধুর কণ্ঠে সম্ভাষণ জানালেন জিবরাইল আ, ইয়া মুহম্মদ। আন্তা রসূলুল্লাহ! হে মুহম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল! অসম্ভব সেই বিস্ময়কর পবিত্র মুহূর্ত! সামান্য কটি কথা বলে জিবরাইল মিলিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর আবার

এলেন আল্লাহর প্রধান দূত, অবতীর্ণ হল কালাম পাকের প্রথম আয়াত এক্‌রা বিস্‌মে রাব্বিকাল লাজি...হেরার কঠিন পাথর ফেটে ঢল নামল আবে কওসরের, নবুয়তের মহান মর্যাদায় অভিসিক্ত হলেন রসূলুল্লাহ!

এই পবিত্র হেরার মাটিতে সেই আকাশী অলৌকিকগুলি ঘটে গেল একের পর এক। তারপর মিলিয়ে গেল সেই নূর, সেই আলোক,,, সেই কণ্ঠ। রসূলুল্লাহ ভীতিবিহ্বল, তাঁর দেহ কম্পমান। সম্মুখে দৃষ্টিপাত করলেন, কিছুই দেখতে পেলেন না। বিশাল হেরা পাহাড় জুড়ে আবার নেমে এসেছে নিঃসীম অন্ধকার, অখন্ড নির্জনতা। সব যেমন ছিল তেমনি, সবই স্বাভাবিক। অথচ কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এখানে কি অপার্থিব ঘটনাই না সংঘটিত হয়ে গেল! ঘটনার কথা যত মনে করেন ভয়াতুর ভাবটা চেপে আসে তত, আরো জোরে কাঁপতে থাকেন রসূলুল্লাহ। এমন কি সেখানে দাঁড়াবার মানসিকতাও ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেল তাঁর। গুহা থেকে দ্রুত নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির পথে ছুটতে থাকেন তিনি। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিবি খদিজাকে বলেন, আমাকে কম্বল দিয়ে আবৃত কর। মা খদিজার হাতে ছিল মায়ের শুশ্রূষা। মা যেমন ভীত সন্ত্রস্ত পুত্রকে বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে জড়িয়ে ধরেন, তেমনি তিনি স্নেহ ভালবাসার গভীর উত্তাপে রসূলুল্লাহকে ব্যাকুল আগ্রহে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। দৈহিক অস্থিরতা এবং কম্পন মুক্ত হয়ে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত বিবি খদিজা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে? কিছুটা অসহায় আর উদ্বেগাকুল কণ্ঠে সব ঘটনা বিবৃত করে রসূলুল্লাহ বলেন, আমার নিজের সম্পর্কে ভয় করছে।

আসন্ন সংঘাত সংকুল বিপুল জীবনের প্রারম্ভে এই অপার্থিব অলৌকিক ঘটনায় রসূলুল্লাহ যখন মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্থ এবং অবসন্ন, এই মহীয়সী নারী অদম্য মনোবল জোগালেন তখন। অন্যান্য রমণীর মত ভেঙে না পড়ে অটল মনোবলে এগিয়ে এলেন স্বামীর পাশে। অত্যন্ত দৃঢ় এবং প্রত্যয় নির্ভর কণ্ঠে উচ্চারণ

করলেন আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ভয়ের কোন কারণ নেই। একজন সত্যকার মহৎ মানুষ আপনি, অতিথির সেবা করেন, আত্মীয়তা বজায় রাখেন, এতিমকে সাহায্য করেন, ক্ষুধাতুরের মুখে অন্ন দেন, অসহায়ের সহায় হন, দাসদাসীকে বুকে ধরেন, একজন ভিখিরিও ফিরে যায় না দুয়ার থেকে, এতিম-আতুরের এমন আশ্রয়স্থলকে আল্লাহ্ কখনই অপদস্থ করবেন না। নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে একজন সত্যকার দরদী বন্ধুর মত দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন মা খদিজা, যা ঘটছে অবশ্যই মঙ্গল জনক। কোন ভয় নেই, আল্লাহ্ আপনাকে কখনই ছেড়ে যাবেন না।

হৃত মনোবল যেন ফিরে পেলেন রসুলুল্লাহ্। অধিকতর নিশ্চিন্ত হতে চান মা খদিজা। স্বামীকে নিয়ে গেলেন তৌরাত অভিজ্ঞ চাচাত ভাই ওরকা ইবনে নওফলের কাছে। আনুপূর্বিক বিবরণ অবগত হয়ে উল্লসিত স্বরে ওরকা বললেন, কুদ্দুস—কি পবিত্র সংবাদ! মুসার প্রতি আল্লাহ্ যে 'নামুস'—বড় ফেরেশতা—প্রেরণ করেছিলেন এ ত সেই নামুস, সেই ফেরেশতা।

শান্ত চিত্তে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন রসুলুল্লাহ্, সঙ্গে জীবন-সঙ্গিনী মা খদিজা। কেবল জীবন-সঙ্গিনী নন, কর্ম এবং মর্ম সংঙ্গিনীও। দাম্পত্য জীবনের বিগত পনের বছরের ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপ ধরে দাঁড়াল তাঁর সামনে, রসুলুল্লাহ্র ভিতর বার এমন নিবিড় ও প্রত্যক্ষভাবে আর কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তিনি উপলব্ধি করলেন এই সুদীর্ঘ কালে একটি মুহূর্তের জন্যও সত্য-বিচ্যুত হননি তাঁর আল-আমীন, সুতরাং আজই বা তিনি মিথ্যার আশ্রয় নেবেন কেন। সুতরাং কোন দ্বিধা নয়, শঙ্কা নয়, সংশয় নয়, পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি আবেগপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ। এভাবে একজন মহিয়সী রমণী হলেন পৃথিবীর প্রথম মুসলমান। বাংলা ভাষায় এই মহিয়সী রমণীর মহান মর্যাদাকে আজ পর্যন্ত সঠিক ভাবে তুলে ধরা হয়নি। এই ধনাঢ্য মহিলা তাঁর ধনসম্পদ ত পূর্বেই রসুলুল্লাহ্র পায়ে লুটিয়ে

দিয়েছিলেন, নবুয়তের গঠমান যুগে এই অসাধারণ মহিলা সকলের অলক্ষ্যে নেপথ্যে থেকে আল-আমীনকে যথাযোগ্যভাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। প্রথম পর্বের সেই সংশয়াকুল দিনগুলিতে শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন, তাঁর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছে কলেমা তৈয়বের মহান উচ্চারণ, শেবে আবুতালিবে বন্দী দশায় সুদীর্ঘ তিনটি বছর এই ধনীর দুলালী উপবাসে-অনাহারে ভিখারীরও অধম হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন তবুও একটি মুহূর্তের জন্য মুখে মালিন্য পড়েনি, কোন অভিযোগ শোনা যায়নি স্বামীর বিরুদ্ধে। অর্থ ও সম্পদ, সাহায্য ও সেবা, জীবন ও যৌবন দিয়ে এমন নিবিড় ভাবে রসুলুল্লাহকে ভালবেসে আপন করে নিতে পেরেছেন আর কে? পৃথিবীতে এই সাহচর্য ও ভালবাসার সম্ভবতঃ আর কোন দ্বিতীয় নেই।

আর তাই পরবর্তীকালে রসুলুল্লাহ মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, দুজনের ধনসম্পদে আমি যেভাবে উপকৃত হয়েছি এমনটি আর কারও সম্পদে নয়। এঁদের একজন হল খদিজা আর দ্বিতীয় জন হল আবুবকর। বুখারী শরীফ।

মা আয়েশা বলেন, খদিজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হত, ততটা ঈর্ষা নবী স-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি হত না। অথচ আমাকে বিয়ে করার তিন বছর পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। এই ঈর্ষার কারণ হল আমি প্রায়ই নবী স-কে তাঁর কথা আলোচনা করতে শুনতাম। যখন কোন বকরী জবাই হত তিনি তা থেকে খদিজার বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন। এতে আমি রসিকতা করে নবী স-কে মাঝে মাঝে বলতাম মনে হয় পৃথিবীতে খদিজা ছাড়া আর কোন স্ত্রীলোক নেই। ..মা আয়েশা বলেন, একদিন খদিজার কথা উঠতে আমার ভারি ঈর্ষা হল। আমি বললাম, কুরাইশ বুড়িদের এক লাল-মাড়ি (ফোকল) বুড়ি (খদিজা), যে শেষ হয়ে গেছে কতকাল আগে, তার আবার কি উল্লেখ করেন!...এ কথায় নবী স বিশেষ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন এবং বলেন, খদিজা খদিজাই—তাঁর কোন তুলনা নেই। মা আয়েশা বলেন, নবী স-এর ক্রুদ্ধভাব লক্ষ্য

করে আমি বলি, আল্লাহর কসম ! ভবিষ্যতে তাঁর (খদিজা) সম্পর্কে উত্তম ছাড়া অন্য কোন মন্তব্য করব না। বুখারী শরীফ।

কেবল রসূলুল্লাহ নন, হযরত জিবরাইল আ এমন কি স্বয়ং আল্লাহ, মা খদিজাকে এক অবিস্মরণীয় মহান মর্যাদা দান করেছেন। বুখারী শরীফের কিতাবুল মানাকিব অধ্যায়ে আবু হুরাইরা রা বলেনঃ "(একদা) জিবরাইল নবী স-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসুল! এই যে খদিজা একটা পাত্র নিয়ে আসছেন যাতে তরকারি কিংবা খাবার অথবা কোন পানীয় দ্রব্য রয়েছে। যখন তিনি আপনার নিকট আসবেন, আপনি তাঁকে তাঁর প্রভুর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম বলুন এবং তাঁকে বেহেশতের মধ্যে মনিমুক্তাখচিত এমন একটা প্রাসাদের সুসংবাদ দিন—যেখানে না কোন শোরগোল এবং না কোন কষ্ট-ক্লেশ থাকবে।

একজন রমণীকে স্বয়ং আল্লাহ সালাম জানাচ্ছেন—ভাবা যায়!

এই সেই হেরা, পবিত্র কালামের প্রথম অবতরণ স্থল। সেই যে শুভ সূচনা, তারপর একে একে ঢল নেমে এল। তিন বছর গোপন প্রচারের পর অবতীর্ণ হল এই আয়াতঃ "ফাসদায় বেমা তুমারু"—আপনার উপর প্রদত্ত আদেশ প্রকাশ্যভাবে প্রচার করুন।

এই আয়াত অবতীর্ণ হবার পরের ইতিহাস সুদীর্ঘ. আমরা কেবল একটি মাত্র ঘটনার কথা উল্লেখ করব। এর পরই 'পর্বতের ওয়াজ' ব্যর্থ হয়, পরপর দুটি ভোজ সভাতেও বিশেষ কাজ হয় না, কুরেশদের দুর্ব্যবহার বেড়েই চলে। শেষে চাপ আসে আবু তালিবের উপর। প্রথম দিকে তিনিও রসুলুল্লাহকে নিরস্ত হবার কথা বলেন কিন্তু একদিনের ঘটনায় তিনি প্রচন্ড রকম উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ওমরা বিন অলিদ নামক এক সুদর্শন তরুণ যুবককে সঙ্গে নিয়ে কুরেশ নেতাগণ একদা আবু তালিবের নিকট এসে উপস্থিত। তাঁরা বিনীত ভাবে বলতে শুরু করেন, এই যুবকটিকে আপনি গ্রহণ করুন আর এর বিনিময়ে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দিন। আপনি ত পুত্রের বদলে পুত্র পেলেন

সুতরাং কিছু বলার নেই আপনার। আর আমরা, একটু থেমে তাঁরা বললেন, মুহম্মদকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করব, তা হলে সব ঝামেলা চুকে যাবে, আপনার সঙ্গে আর কোন বিবাদ থাকবে না।

উত্তেজিত স্বরে আবু তালিব উত্তর দিলেন, বা চমৎকার! তোমাদের ছেলেকে আমি ভাতকাপড় দিয়ে মানুষ করব আর তোমরা আমার ছেলেকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে!

কুরেশদের তাড়িয়ে দিয়ে সেই মুহূর্তে হাশিম বংশের সকলকে আহ্বান করলেন আবু তালিব। আদ্যোপান্ত ঘটনা বিবৃত করে তিনি যুবকদের জিজ্ঞেস করলেন, এই অবস্থায় তোমরা মুহম্মদকে রক্ষা করতে প্রস্তুত আছ কি? সকলে এককণ্ঠে জবাব দিল প্রস্তুত, প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত। জীবনপন দিয়ে আমরা মুহম্মদকে রক্ষা করব।

ঘরশত্রু বিভীষণ আবু লাহাব সেই দল থেকে বার হয়ে কুরেশদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিল, যুবকেরা যখন মানসিক দিক দিয়ে এমনি ভাবে প্রস্তুত, সেদিন সন্ধ্যায় অকস্মাৎ সংবাদ এল রসুলুল্লাহকে পাওয়া যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত কৃপাণে সজ্জিত হয়ে দলে দলে বার হয়ে এল হাশিম গোত্রের নওজোয়ানেরা। অসম্ভব উত্তেজনাকে দমন করে দীপ্ত কণ্ঠে আবু তালিব ঘোষণা করলেন, আমার সঙ্গে এখুনি সকলে চল কাবার চত্বরে। কুরেশদের অধিকাংশ নেতারা সেখানে বসে গল্প করছে। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে তরবারি গোপন করে এক এক জন এক এক নেতার পিছনে বসে পড়বে, সাবধান ইবনুল হানজালিয়া (আবু জেহেল) যেন বাদ না যায়। আমি কথার সূত্রপাত করব এবং যদি বোঝ যে মুহম্মদ নিহত হয়েছে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কর্তব্য সম্পাদন করবে।

ভীষণ পণ, ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা। সকলে যখন প্রস্তুত হয়ে অগ্রসরমান, হঠাৎ যায়েদ ইবনে হারেসা এসে উপস্থিত। তিনি সকল কিছু অবগত হয়ে বললেন, শান্ত হোন সকলে। ভয়ের কোন কারণ নেই। রসুলুল্লাহ সুস্থ আছেন, জীবিত আছেন তিনি, এতক্ষণ আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম।

না তোমরা কেউ তরবারি থেকে নিজেদের পৃথক করো না, অবিশবাস্য দৃঢ় কণ্ঠে হুংকার দিয়ে উঠলেন আবু তালিব, আল্লাহর কসম আমি নিজ চোখে হযরতকে না দেখা পর্যন্ত নিরস্ত হব না।

অবস্থা ও পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে কাকেও কিছু না বলে যায়েদ অতিদ্রুত রসুলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। এক গোপন স্থানে হযরত তখন সাহাবীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। সব কিছু শ্রবণ করে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন তিনিও। মুহূর্তকাল সময় অপচয় হলে মারাত্মক কাণ্ড ঘটে যেতে পারে সুতরাং কালক্ষেপ না করে রসুলুল্লাহ স্বয়ং আবু তালিবের সম্মুখে এলেন। আর তাতেই আশ্বস্ত হলেন হাশেমি গোত্রের যুবকবৃন্দ, আশ্বস্ত হলেন আবুতালিব। কিন্তু তাঁর উত্তেজনা তবুও বুঝি স্তিমিত হয় না। খড়্গ কৃপাণে সজ্জিত যুবকবৃন্দের সঙ্গে নিয়ে তিনি সেই মুহূর্তে চলে এলেন কাবার চত্বরে। কুরেশ নেতৃবৃন্দ গল্পগুজবে মশগুল, অকুতোভয় যুবকেরা এক একজন এক এক নেতার পৃষ্ঠদেশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলেন। মধ্যস্থলে আবু তালিব, দীপ্ত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন, শুনেছিলাম তোমরা হযরতকে হত্যা করেছ, তা যদি সত্য হত তা হলে তোমরা তোমাদের সম্ভাব্য পরিণাম নিজ চোখেই দেখে রাখ।

কুরেশরা ফিরে দেখলেন তাদের প্রত্যেকের পিছনে নিশ্চিত মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে হাশেমি বংশের নওজোয়ানেরা দণ্ডায়মান। কাবার বিশাল খিলানে তাঁরা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাঁরা ভেবে পেলেন না রসুলুল্লাহর জন্যে এমন একটি সংগঠিত শক্তি হঠাৎ প্রস্তুত হয়ে গেল কি করে!

সমসাময়িক কালে রসুলুল্লাহর আর একটি নির্দেশ আমাদের প্রত্যেকের জন্য একান্তভাবে স্মরণীয়। "আপনার উপর প্রদত্ত নির্দেশ প্রকাশ্যভাবে প্রচার করুন" এই আয়াতের সঙ্গে অবতীর্ণ হয় কালাম পাকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশঃ "আনযের আশিরাতাকাল আকরাবিন"—আপনি আপনার পরিবার পরিজন ও

নিকট আত্মীয়দের (আল্লাহর) ভয় দেখান (শুয়ারা, ১১ রুকু)। বুখারী শরীফের কিতাবুল অসায়া—আসিয়ত অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই আয়াত অবতীর্ণ হলে রসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে যান এবং আপন গোত্রের সকলকে "হে বনু আবদ মানাফ, হে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, ওহে বনু কেহর, ওহে বনু আদি" প্রভৃতি সম্বোধনে ডাক দিতে থাকেন এবং বলেন তোমরা নিজেদের আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাও।" এমন কি নিজেব ফুফু ও কন্যাকে সম্বোধন করে তিনি বলেনঃ "হে রসূলের ফুফু সুফিযা, আমি আপনার জন্যে আল্লাহর নিকট কিছু কবতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা, তুমি আমার অর্থসম্পদ যা ইচ্ছা চেয়ে নাও কিন্তু আমি আল্লাহর নিকট তোমার জন্য কিছু কবতে পারব না।" বর্ণনায় আবু হুরাইরা।

এই অসাধারণ হাদিসটির ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই, চন্দ্রালোকের কোন ব্যাখ্যা হয় না। আল্লাহ আমাদের শক্তি দিন আমরা যেন প্রত্যেকেই এই হাদিসের মর্মানুযায়ী আমল করে যেতে পারি।

আমি যখন হেরা গুহায় পৌঁছলাম, তিনজন ফটোগ্রাফার নাশতা করছিলেন। এঁরা পাকিস্তানী। নাশতা করতে কবতে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। ফটো তুলব কিনা জানতে চাইলে আমি সবিনয়ে অবগত করালাম, ফটো স্পষ্ট হলে তুলতে পারি। ইতিপূর্বে ফটো সম্পর্কে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তানঈমে ফটো তুলেছিলেন এক ভদ্রলোক, একেবারে অস্পষ্ট, অথচ তাঁকে পুরো দাম মেটাতে হয়েছিল। আমার সর্তেই তাঁরা সম্মত হলেন এবং নাশতা সমাপ্ত করে ফটো তুললেন। জাপানী ক্যামেরা, সঙ্গে সঙ্গে ছবি প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে এল। দেখলাম, যথারীতি ফটো একেবারেই অস্পষ্ট। এ কথা তাঁরা নিজেরাও স্বীকার করলেন এবং আগ্রহভরে দ্বিতীয় ফটো তুললেন। এবারেও ছবি স্পষ্ট হল না এবং নীট ফল হল যে তাঁরা আমার সঙ্গে এই পবিত্র স্থানে বসে ঝগড়ার সূচনা করলেন এবং ডবল চার্জ আদায় করলেন। বুঝলামঃ এরা ত

আমাদের আবহাওয়ার সৃষ্টি সুতরাং এদের কাছ থেকে বড়বাজারি ব্যবহার ছাড়া আর কি আশা করা যেতে পারে। রসূলুল্লাহর স্মৃতি বিজড়িত এই মুবারক গুহায় বসে কথা কাটাকাটি করতে আমার আদৌ প্রবৃত্তি হল না, দাম মিটিয়ে দিয়ে একলা হতে চাইলাম। কিন্তু একলা হতে চাইলেই একলা হওয়া যায় না।ইতিমধ্যে অনেক দর্শক এসে গেছেন, পাহাড়ের উপরেও দাঁড়িয়ে আছেন অনেকে। যত বেলা হবে ভিড় বাড়বে তত। ছোট্ট জায়গা, আমরা সরে না গেলে দ্বিতীয় কাফেলার জায়গা হবে না, সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও পবিত্র হেরা গুহা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হল। সাতাশ মিনিট ছিলাম ওখানে। ফেরার মুখে ঘড়ি দেখলাম, সাতটা পঁয়ত্রিশ।

হেরাতে এসে বড় লাভ হল এই যে আমি রসূলুল্লাহর দৈহিক শক্তি এবং মানসিক দৃঢ়তার কিছুটা অনুমান ও অনুভব করতে পারলাম। তিনি যে কতবড় বীর্যবান পুরুষ ছিলেন এখানে এলে যে কেউ তা উপলব্ধি করতে পারবেন।

হেরায় আমি আধ ঘণ্টার মত বসেছিলাম কিন্তু এই আধ ঘণ্টায় আমি অনেক কিছুই ভেবেছি, দেখার ও বোঝার চেষ্টা করেছি। রসূলুল্লাহ এখানে আসতেন চৌদ্দ শো বছর আগে, হেরার আশে-পাশে তখন জনপ্রাণীর কোন চিহ্ন ছিল না বরং কিছু বন্য জন্তুর উপদ্রব থাকা সম্ভব ছিল। নির্জন নিশীথে নবীজী গভীর ধ্যানে মগ্ন, একাকী। আমার মত বীরপুরুষকে অচৈতন্য করার জন্যে শিয়াল বা ততোধিক ইতর প্রাণীর কিছু আকস্মিক চিৎকারই যথেষ্ট। আল্লাহর রসূলের সামনে ঘটে গেল এক অলৌকিক ব্যাপাব, হঠাৎ আকাশ পথে জিবরাইল এলেন,কথা বললেন আপনার স্বরে রসূলকে ডাক দিলেন অথচ সেই বহু ভূতপ্রেত বিশ্বাসীর দেশে এমন একটি অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে দেখেও নবীজী জ্ঞান হারালেন না, অচৈতন্য হলেন না, কেবল ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। এবং সেই অবস্থাতেই তিনি গুহা থেকে বার হয়ে সেই সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে চূড়ায় উঠে এই সংকীর্ণ দুর্গম গিরিপথ বেয়ে নিম্নে অবতরণ করলেন, নিশ্চয়ই আধঘণ্টার আগে তিনি অবতরণ করতে পারেন নি

এবং এই অবতরণের সময় তাঁর পদস্খলন ঘটেনি। তারপর সেই জনমানবহীন বিজন নিশীথে তিনি দীর্ঘ চার কিলোমিটার বা ততোধিক পথ অতিক্রম করে এলেন মা খদিজার কাছে। তখনো তিনি কাঁপছেন, এসে বললেন, কম্বল, আমাকে কম্বল দিয়ে জড়িয়ে ধর।

এই ঘটনাটি একটু বিশেষভাবে চিন্তা করলে, দৈহিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়ে যে তিনি কতবড় বীর্যবান ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তার আভাস পাওয়া যায়। দৈহিক শক্তির মোটামুটি পরিচয় ত তার পর্বত আরোহণ-অবরোহণ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়, সজ্ঞানে এইপরিত্যক্ত প্রান্তরে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করা এবং এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে মক্কায় পৌছানোর ভিতর দিয়ে তাঁর অসম্ভব দৃঢ়তা এবং অবিশ্বাস্য আত্মিক শক্তির পরিচয় ফুটে ওঠে। সত্যই এই ধরনের ধী সম্পন্ন বীর্যবান পুরুষ সে যুগে দ্বিতীয় ছিল না। হযরত মুহাম্মদ স-এর কোন দ্বিতীয় নেই।

হেরার চূড়ায় দাঁড়িয়ে রসুলজীবনের আর একটি পর্বের প্রতিও আমরা দৃষ্টিপাত করতে পারি—সেটি হল প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে হযরত মুহাম্মদ স-এর প্রস্তুতি পর্ব। বাল্যকাল থেকেই রসুলুল্লাহ ছিলেন চিন্তাশীল। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে ওঠে। ত্রিশ বছরের পর তিনি আর লোকালয়ের নির্জনতায় পরিতৃপ্ত হতে পারতেন না, বেরিয়ে পড়েছিলেন জনমানবহীন নির্জনতার সন্ধানে। তখনই তিনি পেয়ে যান হেরা গুহার অনুকুল পরিবেশ। সেই বয়স থেকেই তিনি গাহরে হেরায় যাতায়াত শুরু করেন। এখানে এসে নিবিষ্ট চিত্ত হতে পারলেই এক অলৌকিক জ্যোতির্মালায় তাঁর সমগ্র দেহমন আত্মা ভেসে যেত, তিনি সেই অনির্বাচনীয় আলোকে মিশে যেতেন। তাঁর মনে হত এখুনিই যেন তিনি কিছু শুনতে পাবেন, কিন্তু পেতেন না। ধ্যান ভেঙে যেত, তিনি উপলব্ধি করতেন, তাঁর মধ্যে কিসের যেন অভাব থেকে যাচ্ছে। আসন্ন গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য প্রকৃতপক্ষে দেহে এবং মনে উভয় দিকে তাঁর আরও প্রস্তুতির

প্রয়োজন ছিল। মহান আল্লাহ ধীরে ধীরে তাঁকে প্রত্যাদেশ লাভের উপযুক্ত করে তুলছিলেন। অনুভূতির নিবিড়তা যত বৃদ্ধি পায়, হেরাতে আগমন ও অবস্থানের পরিমান তত বেড়ে যায়। অবশেষে হেরাতে তিনি রাত্রি যাপন শুরু করলেন। শেষের দু মাস ত তিনি হেরাতেই পড়েছিলেন। নবুয়ত প্রাপ্তির জন্যে এই প্রস্তুতি ও সাধনা—এ যে কত কঠিন এবং ব্যাপক তা হেরার পবিত্র প্রান্তর দর্শন করলে উপলব্ধি করা কিছুটা সহজ হয়। জীবন এবং যৌবনের শ্রেষ্ঠ ছ-টি বছর—পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ—অতন্দ্র সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন রসূলুল্লাহ। কোন কোন সময় এমন হয়েছেঃ অদৃশ্য অনুপ্রেরণায় অন্তর্দেশ আলোকবন্যায় ভেসে যাচ্ছে অথচ তিনি কোন বাণীপ্রাপ্ত হচ্ছেন না, প্রচণ্ড মর্মবেদনায় পাহাড়ের উপর থেকে নিচে পড়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছেন, নিরস্ত হয়েছেন সহধর্মিনী খদিজার সান্ত্বনায়, তারপর আবার অচৈতন্য হয়েছেন অনন্ত অসীমের প্রেমে। রসূলজীবনের এই নীরব নিভৃত প্রস্তুতি পর্ব—এটি গাহরে হেরার এক অবিস্মরণীয় অবদান।

ফেরার পথে গুহা থেকে চূড়ায় উঠে পবিত্র কাবাকে দুচোখ ভরে দেখে নিলাম, তারপর নামতে শুরু করলাম। যে পথ দিয়ে উঠেছিলাম নামতে শুরু করলাম সেপথ দিয়েই। নামাটা খুব সহজ হবে ভেবেছিলাম কিন্তু তা হল না। ওঠার মতই সতর্কতায় নামতে হল, পাথর থেকে পা পিছলে গেলেই সর্বনাশ!

হেরা-দর্শন সমাপ্ত করে যখন নেমে আসছি, পথে অনেকের সঙ্গে দেখা হল। সকলেই তীর্থ-পথিক, গাহরে হেরার দর্শনপ্রার্থী। আমার শেষ, তাঁদের শুরু। যিনি শীর্ষদেশের কাছাকাছি তিনি জিজ্ঞেস করছেন, আর কতটা? যাঁর সঙ্গে মাঝ পথে দেখা তাঁরও আকুল প্রশ্ন, আর কতটা? যিনি প্রায় তলদেশে অর্থাৎ সবে যাত্রা শুরু করেছেন তাঁরও ব্যাকুল প্রশ্ন, আর কতটা? মৃদু হেসে সকলকেই স্বাগত জানিয়ে উত্তর দিলাম, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন, ধীরে ধীরে এগিয়ে যান, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।

দেখলাম যাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তবে এঁরা অধিকাংশই

ভারত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের। জানিনা আমাদের মধ্যে কোনটি প্রবল, স্মৃতিপূজা না রসূলের প্রতি মহব্বত?

আটটা পঁচিশ। পাহাড়ের তলদেশ স্পর্শ করলাম। মক্কাগামী বাস দাঁড়িয়ে ছিল সামনে। স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে সেই বাসে উঠে পড়লাম। বাসে বসে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে হেরা পর্বতের দিকে তাকালাম। দেখলাম সকালের পর্যাপ্ত রোদ গায়ে মেখে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল হেরা পর্বত। আর কোনদিন এখানে আসতে পারব কিনা আল্লাহ জানেন। হয়ত এই-ই শেষ। কত ইতিহাস কতপুণ্যস্মৃতি বুকে নিয়ে যুগে যুগে এখানে এইভাবে স্থির হয়েয় দাঁড়িয়ে থাকবে হেরা পর্বত, কেবল আমি আর আসব না। চোখ মুছে নিয়ে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললাম, বিদায় হেরা গুহা! বিদায় হেরা পর্বত!!

বাস তখন মক্কার পথে চলতে শুরু করেছে।

৩০.

২১ অক্টোবর ৮২। ৩ কার্তিক ৮৯। ৩ মুহররম ১৪০৩। বৃহস্পতিবার।

মাঝে আর একটি মাত্র দিন, তারপর আমাদের এই পুণ্যভূমি থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে মদিনায়। আসন্ন সন্ধ্যায় উজ্জ্বল বিকেলের মাঝে যেমন একটা ছায়া ছায়া বিষণ্ণতা নেমে আসে, আমার সমগ্র সত্তা জুড়ে তেমনি এক বিধুর বিষণ্ণতা তার অমোঘ মলিন প্রভাব বিস্তার করছে। মহাশূন্য ব্যাপী এক অনন্ত হাহাকারের বেদনাতুর ক্রন্দনে আমি যেন কোথায় হারিয়ে যাচ্ছি। চলা-ফেরা ওঠা-বসা সবই করছি তবু যেন বাস্তব পৃথিবীতে আমার কোন অস্তিত্ব নেই।

হেলা-ফেলা করে দিনগুলি শেষ হয়ে গেল। কত কি-ই করার ছিল, কিছুই করা হল না। 'ঘুমিয়ে ছিলাম ছিলাম ভাল, জেগে দেখি বেলা নাই'—সেই ভোগ-বিলাসীর মত করুণ দশা আমার। অনেকগুলি উমরা করার বাসনা ছিল, তা আর হবে না। অন্ততঃ আজ যদি একটা সম্পন্ন করা যায়। ফজরের নামায শেষ করে সে উদ্দেশ্যেই অন্ধকার মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তানঈমের পথে। মসজিদ আয়েশা থেকেই উমরা আনতে হবে।

মক্কা শহর পার হতে না হতেই চারিদিক বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল। জনবিরল পথ, বাড়িঘরের জানালাগুলি সম্ভবতঃ অধিকতর আলোর প্রত্যাশায় বন্ধ, কেবল বহিরাগত হাজি সাহেবদের রাস্তায় দেখতে পাচ্ছি ইতস্ততঃ! সব মিলিয়ে সুবেহ সাদেকের উজ্জ্বল মুহূর্তে মক্কার এই প্রান্তদেশকে বেশ নীরব আর নির্জন মনে হল। অথচ মগরিবের পর যখন এ পথ দিয়ে গিয়েছি জনতার কোলাহলে গাড়িতে আলোয় এলাকাটাকে কি জমজমাট মনে হয়েছে। সেই মানুষ উপচান দোকানগুলি বন্ধ, আলো নিভে আছে, পথিক নেই ফলে সব কিছুই কেমন যেন প্রাণশূন্য, রিক্ত। বুঝতেই পারছি পথিক না থাকলে পথ সৌন্দর্যহীন। পথিকই পথের শোভা।

নির্জনতা ভেঙে ভেঙে আমরা তানঈমের দিকে এগিয়ে চললাম।

মক্কার এক ইঞ্চি মৃত্তিকাও বোধহয় ইতিহাস শূন্য নয়। এর পাথরে পাথরে, এর মৃত্তিকায়, এর ধূলিকণায় কত সংঘর্ষ কত বেদনা কত অশ্রু আর কি বিপুল ইতিহাস! এক প্রাচীর বেষ্টিত নির্জন স্থান দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগলঃ এই কি সেই নির্দয় নির্জন স্থান যেখানে হেশাম ও আইআশকে বন্দী রাখা হয়েছিল? হয়ত তাই, হয়ত নয়। এই স্থানটি না হলেও এর আশেপাশের কোন একটি স্থানে ত বটেই!

হিজরতের আদেশ দিয়েছেন রসূলুল্লাহ। বহু মুসলমান চলে গেছেন মদিনায়, প্রতিদিন এখনো যাচ্ছেন কিছু কিছু করে, অবশ্যই গোপনে। কুরেশদের সম্পূর্ণ অগোচরে চলছে এই হিজরতের আয়োজন। হযরত উমর, হেশাম, আইয়াশ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবী স্থির করলেন যে তাঁরাও হিজরত করে মদিনায় চলে যাবেন। গোপনে পরামর্শে স্থির হল রাত্রের নিবিড় অন্ধকার নেমে এলে সকলে এক বিশেষ নির্দিষ্ট গোপন স্থানে মিলিত হবেন, তারপর যাত্রা শুরু করবেন মদিনা মনোয়ারার দিকে। যথা সময়ে, হযরত উমর এলেন, কয়েকজন সাহাবীও এলেন নির্দিষ্ট সময়ে, গোপন পথে যাত্রা করে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন আইয়াশ কিন্তু হেশাম ধরা পড়ে গেলেন কুরেশদের হাতে। শুরু হল তার উপর অকথ্য নির্যাতন। হেশামের অস্বাভাবিক বিলম্ব দেখে তাঁর সম্পর্কে অকল্যাণকর কিছু একটা অনুমান করলেন সকলে তারপর সঙ্গীর জন্যে অপেক্ষা না করে আল্লাহর নামে সকলে মদিনার পথে অগ্রসর হলেন। রহমত আল্লাহর, এক সময় তাঁরা নির্বিঘ্নে মদিনায় পৌঁছে গেলেন। একজন করে মুসলমান হিজরত করেন আর গাত্রদাহ বেড়ে যায় কুরেশদের, আইয়াশ চলে যাওয়ায় প্রায় অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল তারা। বিশেষ করে আবু জেহেল ত ক্ষেপে লাল। আইয়াশ হল তার বৈপিত্রেয় ভ্রাতা অর্থাৎ তার মায়ের পূর্বস্বামীর ঔরসজাত সন্তান। সুতরাং আপনার ভাই মুসলমান হয়ে এভাবে নাগালের বাইরে চলে

গেলে অন্যান্য কুরেশদের কাছে তার সম্মান থাকে না। সে গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিল। অবশেষে সে এক উপায় স্থির করে তার ভাই হারেসকে সঙ্গে নিয়ে মদিনা যাত্রা করল। সে সময় মুসলমানেরা মদিনায় হিজরত করলেও তাঁদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা গড়ে ওঠে নি। রসুলুল্লাহ তখন মক্কায়, মদিনায় এসে মুসলমানেরা যে যার নিজেকে স্থিতি করার কাজেই ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় এসে হাজির হল আবু জেহেল। সে তার ভাই আইয়াশের কাছে গিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল, ভাই আইয়াশ.! তুমি চলে আসার পর মায়ের অবস্থা অসম্ভব খারাপ হয়ে পড়েছে। তোমার শোকে তিনি খাওয়া দাওয়া ছেড়েছেন, চুলে তেল দেন না, এখন একেবারে মৃত প্রায়। রাতদিন তোমার নাম করছেন, একটি বারের জন্য না গেলে তিনি বাঁচবেন না। তিনি একটু সুস্থ হলেই তুমি চলে আসবে।

যথা সময়ে সম্পূর্ণ বিবরণ হযরত উমরের কানে গেল। আইয়াশ তাঁর পরামর্শ চাইলেন। সব দিক চিন্তা করে উমর বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছে আদৌ ভাল মনে হচ্ছে না, ঘটনার মধ্য থেকে কেমন যেন দুর্গন্ধ পাচ্ছি। আমার মনে হয় তোমার না যাওয়াই ভাল। আইয়াশ একটু চিন্তা করে বলল, মায়ের এমন অবস্থা শুনেও আমি এখানে থাকি কি করে? একবার দেখা করেই চলে আসব। তা ছাড়া মক্কায় আমার অনেক টাকা-পয়সা পড়ে আছে, সেগুলোরও একটা হিল্লে হয়ে যাবে এই সঙ্গে। খাল্লেদুনের বিবরণ থেকে অবগত হচ্ছি, এই কথার উত্তরে হযরত উমর বলেন, তুমি চাইলে আমার সম্পত্তির অর্ধেক তোমাকে দিয়ে দিতে পারি তবুও তোমার কিছুতেই সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু আইয়াশকে কিছুতেই হযরত উমর নিরস্ত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, একান্ত যেতেই যদি চাও, আমার এই দ্রুতগামী উটটি নিয়ে যাও। পথে কোন রকম বিপদ দেখলে দ্রুত উট চালনা করে মদিনায় ফিরে এস। সে কথাই শিরোধার্য করে হযরত উমরের দেওয়া উটের পিঠে সওয়ার হয়ে ভাইদের সঙ্গে মক্কার পথে যাত্রা করল আইয়াশ।

যাবার পথে সকলে খুবই অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলছিল।

মক্কাও তখন খুব দূরে নয় হঠাৎ আবু জেহেল বিনীত গলায় বলল, আইয়াশ! আমাদের উটটি একেবারে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের একজনকে যদি তোমার উটে তুলে নাও খুব ভাল হয়। আইয়াশ সরল মনে তাদের কথা বিশ্বাস করল। হযরত উমরের উপদেশ ভুলে গিয়ে নিজের উটকে বসিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে দুই ভাই ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় আইয়াশকে উটের উপর থেকে নিচে ফেলে দিল, দড়ি দড়া দিয়ে তৎপরতার সঙ্গে নিজেদের পরিকল্পনা মাফিক হাত পা বেঁধে ফেলল তারপর। নিরুপায় আইয়াশ তখন আবু জেহেলের বন্দী। মক্কায় তার সঙ্গীসাথীদের কাছে ফিরে এসে আবু জেহেল তাচ্ছিল্যভরে ঘোষণা করল, এই সব নির্বোধ নাস্তিকগুলোকে এমনি করেই শায়েস্তা করতে হয়।

অবশেষে হেশাম ও আইয়াশ দুই বন্দীকে লোহার কঠিন বেড়ি পরিয়ে নগর প্রান্তে প্রাচীর ঘেরা ছাদ শূন্য এক কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করানোর সকল রকম চেষ্টা চলল। সকাল-সন্ধ্যায় নির্মম প্রহারে জর্জরিত করে সেই অর্ধমৃত রক্তাক্ত দেহ দুটিকে মরুর কঠিন রোদে সারা দিন ফেলে রাখা হত। এই ভাবে এক দিন নয়, দুদিন নয়—মাসের পর মাস অত্যাচার চলেছে তাদের উপর তবুও তারা এক মুহূর্তের জন্য ইসলামের শান্ত শীতল ছায়া থেকে সরে যাননি। অবশেষে এই মহান সাহাবীদ্বয়ের উপর অত্যাচারের করুণ কাহিনী শ্রুতিগোচর হল রসুলুল্লাহর। একদিন মুসলিম জনসমক্ষে খুতবা দিতে উঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে আছ ইসলামের বীর খাদেম যে এই দু জন অত্যাচারিতকে জালেম কুরেশদের হাত থেকে উদ্ধার করে এনে দেবে? নও মুসলিম বীর মুজাহিদ অলিদ সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রাণ উৎসর্গ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি প্রস্তুত। রসুলুল্লাহ তার জন্যে দোয়া করলেন।

যথা সময় মদিনা থেকে বার হলেন নওজোয়ান অলিদ। তারপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় পেঁৗছে গেলেন এক সময়। আইয়াশের

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের অন্তরীন অবস্থানও জেনে নিলেন। বলাই বাহুল্য এসব কাজ তাঁকে করতে হল অতিসংগোপনে। হেশাম ও আইয়াশের আত্মীয় স্বজনেরা কুরেশদের অনুমতি নিয়ে প্রতিদিন কিছু কিছু খাদ্যসামগ্রী দিয়ে আসতেন কারাগারে, তাই খেয়ে কোন রকমে তাঁরা অর্ধমৃত হয়ে জীবিত ছিলেন। যা হোক একদিন গভীর নিশীথে অলিদ উপস্থিত হলেন সেই কারাগারের দ্বার প্রান্তে তারপর প্রাচীর পার হয়ে প্রবেশ করলেন অন্দরে। হেশাম ও আইয়াশের সন্ধান পেতেও বিলম্ব হল না। তাদের হাতের বাঁধনগুলি কেটে দিলেন তরবারি দিয়ে কিন্তু পায়ে ছিল লৌহের কঠিন বেড়ি, মুক্ত করা খুবই কঠিন, তিনি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে খুঁজে খুঁজে একটি শ্বেত পাথর নিয়ে এলেন কোত্থেকে। সেই পাথরের উপর শৃঙ্খল রেখে তিনি বিসমিল্লাহ বলে সর্বশক্তিতে তরবারির আঘাত হানলেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হল সঙ্গে সঙ্গে আর দু টুকরো হয়ে গেল লৌহের কঠিন শৃঙ্খল। মুক্ত হয়ে গেল হেশাম ও আইয়াশ। তাঁরা প্রাণ ফিরে পেলেন। মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করলেন অলিদ, তারপর সকলে একসঙ্গে মদিনার পথে পা বাড়ালেন। এই ঘটনার পর থেকে বিখ্যাত হয়ে যান অলিদ, তাঁর তরবারিও একটা বিশেষ নামকরণ হয়ে যায়।

তানঈম থেকে উমরা নিয়ে ফিরে এলাম যথাসময়, সোয়া আটটার মধ্যেই উমরার সব কাজ শেষ হয়ে গেল। কাবা শরীফ থেকে বার হয়ে এলাম এক সময়। স্ত্রী চলতে পারছিলেন না, বার নম্বর বাসে উঠে অনেক খানি হাঁটার শ্রম থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম।

এক হাজি সাহেবের মুখে একটি বিশেষ সংবাদ শুনে একেবারে মর্মাহত হয়ে গেলাম। সংবাদটি ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে এবং নাটের গুরু আমাদেরই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী। তিনি হজ করতে এসেছেন এবং সঙ্গে এনেছেন ল্যাংড়া খঞ্জ বিকলাঙ্গের একটি দল। এই পবিত্র নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে বসিয়ে দিয়েছেন তাদের, আকর্ষণীয় ভংগিতে করুণা গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করছে সকলে। এভাবে তিনি

হাজার হাজার রিয়েলের দোজখী আয় নিয়ে হাসি মুখে ঘরে ফিরবেন। মাঝে মাঝে ভাবি এসব মানুষের বিবেক বলে কি কিছুই নেই? ইসলাম কি এদের অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহ কোণে এতটুকু আলো ফেলতে পারে নি? ন্যায়-অন্যায় হারাম-হালাল ভুলে আজ এরা বিশ্বগ্রাসী লোভের শিকার! অথচ হাকিম ইবনে হেযাম?

একবার গনিমতের মাল এলে হাকিম ইবনে হেযাম রা রসুলুল্লাহর নিকটে তা থেকে কিছু দেবার জন্য অনুরোধ জানান। তাঁর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে নবী স বেশ কিছু সম্পদ তাঁকে দান করেন। হাকিম ইবনে হেযাম রা বলেন, পুনরায় আমি তাঁর কাছে কিছু চাই। এবারেও তিনি আমাকে তা দেন। তারপর তিনি আমাকে বলেন, "ওহে হাকিম, এই অর্থ সম্পদ মিষ্টি ঘাসের মত। যে ব্যক্তি তা বিনা লোভে নেবে, তাতে বরকত হবে এবং যে ব্যক্তি তা লোভ করে নেবে তাতে বরকত হবে না। এবং সে ঐ ব্যক্তির মত যে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয় না।" এরপর নবী স-এর পাক জবান হতে উচ্চারিত হয় সেই চির অম্লান জ্যোতির্ময় বাণীঃ "উপরের হাত (দাতার হাত) নিচের হাতের (ভিক্ষুকের বা দান গ্রহীতার হাত) চেয়ে উত্তম।" এ কথা শুনে হাকিম ইবনে হেযাম রা বলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! সেই সত্ত্বার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি পৃথিবী ত্যাগ করার পূর্বে আপনার ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করব না। কেবল শপথ গ্রহণ নয়, এই প্রতিজ্ঞা তিনি আমৃত্যু অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। হযরত আবুবকর রা-র খেলাফতের সময় তিনি হাকিমকে কিছু দেবার জন্য ডেকেছেন কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। হযরত উমর রা-র সময় গনিমতের মাল থেকে কিছু দেবার জন্যে হাকিম ইবনে হেযামকে ডাকা হলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। সকল মুসলমানের মধ্যে এই নির্লোভ মানুষটির মহৎ আদর্শকে তুলে ধরার জন্য একদিন হযরত উমর রা এক জনসমাবেশে বলেন, হে মুসলমান সকল! আমি হাকিমের নিকট আল্লাহ প্রদত্ত তাঁর গনিমতের প্রাপ্য পেশ করেছি কিন্তু তা তিনি অস্বীকার করেছেন। বুখারী শরীফ ২৫৪৮, ২৯০৮।

রসূলুল্লাহর একটিমাত্র-কথায় হাকিম ইবনে হেযামের আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল, তিনি অবলীলায় আলোয় ফিরে এলেন। আর আমরা? লোভের সহস্র শুঁড় বর্ধিত করে ক্রমাগত অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করছি। একটি পাপের সঙ্গে আর একটি পাপ জড়িয়ে ক্রমান্বয়ে অতলে তলিয়ে যাচ্ছি।

বাতানুকুল বাসে মদিনায় যাওয়ার ব্যাপারে মায়সারা (মুয়াল্লিমের প্রধান কর্মচারী) অনেক উপদেশ দিলেন আমাদের। মদিনা থেকে জেদ্দায় প্রত্যাবর্তনের সময়ও তাঁর উপদেশ আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান বিবেচিত হয়েছিল। বাস কিংবা ট্যাক্সি হজ যাত্রীদের জেদ্দা বিমান বন্দরের যেখানে সেখানে নামিয়ে দেয়, কিন্তু তিনি আমাদের বার বার সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন আমরা যেন হজ টার্মিনালের ছ নম্বর গেটে নামি, এয়ার ইণ্ডিয়ার অফিসও আছে ওখানে।

অর্থাৎ মহাবিদায় আসন্ন হয়ে আসছে, আমাদের কাজ-কর্মে চলা-ফেরায় এমন কি বন্ধুবর্গের উপদেশও তার সকরুণ রেশ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে। আমরা অতি দ্রুত সেই বিদায় লগ্নের নিকটবর্তী হচ্ছি।

২২ অক্টোবর ৮২। ৪ কার্তিক ৮৯। ৪ মুহররম ১৪০৩। শুক্রবার

আজই আমরা পবিত্র কাবা শরীফে শেষ জুমআর নামায পড়ব।

তাহাজ্জদ এবং ফজর পড়ে হাশমি ইশরাতকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রী চলে গেলেন উমরার জন্যে। গতকালও তিনি আমার সঙ্গে উমরায় অংশ গ্রহণ করেছেন। গায়ে অল্প উত্তাপ থাকায় আমি যেতে পারলাম না। বাসায় এসে শুয়ে পড়লাম চুপচাপ। উমরা সম্পন্ন করে এসে স্ত্রী আমাকে ডেকে তুললেন ন-টার সময়। সকালে এই ঘুমটা হয়ে যাওয়ায় শরীর বেশ ঝরঝরে মনে হল। এক সঙ্গে সকলে নাশতা করে একটু বিশ্রামের পর জুমআর নামাযের জন্য বেরিয়ে এলাম।

নামায শেষ করে বার হবার মুখে হন্তদন্ত হয়ে স্ত্রী এসে

বললেন, দেখুন কি বিপদ! প্রায় ঘণ্টা দুই আগে এক মালেয়েশিয়ান ভদ্রমহিলা তাঁর এই ব্যাগটি আমার কাছে রেখে আসছি বলে চলে গেলেন, আর এলেন না। এখন কি করি? স্ত্রী ঠিক করেছিলেন যেখানে বসে উনি নামায পড়েছেন সেখানেই রেখে আসবেন কিন্তু এক হাজি সাহেব বললেন, কারো কিছু হারিয়ে গেলে হাতিমের উপর রাখতে হয়। এটাই নিয়ম। কেননা তওয়াফের সময় সকলেই ওখানে সমবেত হবেন, তারপর যে যার জিনিষ দেখে তুলে নেবেন। সুতরাং স্ত্রী ব্যাগটি হাতিমের উপর রেখে এলেন। ভার মুক্ত ভাবে ফিরে এসে তিনি বললেন, আজ আমি আরো একটি অভিজ্ঞতা সংগে করে এনেছি। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলে তাঁর মুখের দিকে চাইতে বললেন, এক হাজি সাহেবা একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু নিয়ে এসেছেন নামায পড়তে। নামাযের আগেই বাচ্চাটি ঘুমিয়ে গেল। তাকে পাশে শুইয়ে রেখে আমাদের সকলের সঙ্গে সেই মহিলাও নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। মাঝখানে হঠাৎ শিশুটি জেগে কেঁদে উঠল আর সেই মহিলা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পা দিয়ে আলতোভাবে বাচ্চাটির বুকে চেপে ধরলেন, অবাক কাণ্ড বাচ্চাটাও থেমে গেল প্রায় সাথে সাথেই।

বেরুবার মুখে দেখি এক হুলুস্থুলু কাণ্ড। যত মানুষ নামায পড়তে এসেছিলেন, প্রায় সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেছেন বাবে আবদুল আজীজের সম্মুখে। কি ব্যাপার? অনুসন্ধানে অবগত হলাম একজন অপরাধীর কোতল হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে কোথাও তার বাড়ি, কোন কারণে সে একজনকে হত্যা করে ধরা পড়েছে। সৌদি আরবে আল্লাহর আইন মোতাবেক বিচার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এই আইনের রায়ঃ হত্যার বদলে হত্যা, খুনের বদলে খুন, কোতলের বদলে কোতল। সুতরাং লোকটির কোতল হচ্ছে। যাঁরাই এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই বিদেশীদের অধিকাংশই কোতলের কথা শুনেছেন কিন্তু চোখে দেখেননি কোনদিন। সুতরাং আজ এই সুযোগটা কেউ হাত ছাড়া করতে চান না। অসম্ভব ভিড়, এক ইঞ্চি জমিন ছাড়তেও কেউ রাজি নন। আর আমি আছি প্রায় সকলের পিছনে। কয়েক সহস্র কালো মস্তক ছাড়া আমার আর কিছুই দৃষ্টি

গোচর হচ্ছে না। এই সুন্দর মস্তকাটা একেবারে মাঠে মারা যাবে বলে যখন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছি হঠাৎ চোখে পড়ল কাঠের একটি সিঁড়ি। সম্ভবতঃ মসজিদের ঝুল-ময়লা ঝাড়াই-সাফাইয়ের জন্যই এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তখন কোন কিছু ভাববার মত মানসিকতা ছিল না আমার, সেই সিঁড়ি বেয়েই উপরে উঠে গেলাম। আমার দেখাদেখি উঠে এলেন আরো কয়েকজন কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। উন্মুক্ত দিবালোকে কয়েক সহস্র মানুষের সুস্পষ্ট দৃষ্টির সম্মুখে এই কোতল পর্ব অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। কালো কাপড়ে দু টুকরো দেহকে ঢেকে গাড়িতে তুলে নিলেন কিছু পুলিশ কর্মী। রক্তের উপর কিছু একটা স্প্রে করে দেওয়া হল দেখলাম, পরিষ্কারও করে নেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর সকলের দৃষ্টির উপর দিয়ে পুলিশের কালো গাড়িটি সেই অভিশপ্ত দেহটিকে নিয়ে তার গন্তব্যে চলে গেল। শেষ হয়ে গেল বিচার পর্ব। ভিড়ও পাতলা হতে শুরু করল ধীরে ধীরে।

দেশে ফিরে এই ঘটনাটি আমার এক অমুসলিম বন্ধুকে শোনাতে শিউরে উঠে তিনি মন্তব্য করেছেন, কি অমানবিক! অগ্রপশ্চাৎ কোন কিছু বিবেচনা না করেই তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেছেন, যেমন করেন অন্য সকলে। আমিও স্বীকার করছি নিরপরাধ একজন মানুষকে হত্যা করা অমানবিক কিন্তু একজন খুনী গুণ্ডাকে? মানবিকতার দোহাই দিয়ে এই খুনীগুলোকে ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে এরা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠবে এবং তখন আর একটিতে সন্তুষ্ট না থেকে দশটা খুন করবে। এ ধরনের নজির আমাদের সম্মুখে হাজারে হাজার। আমাদের প্রশ্ন, একজন গুণ্ডা যখন একের পর এক মানুষকে নির্মমভাবে খুন করে যায় সেটা কি খুব মানবিক? আমাদের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীগণ কি বলেন?

১৯৩২ সালের ২২ অক্টোবরের ঘটনা ডাইরি দেখে আমি লিখছি আজ ১৯৩২ সালের ৪ ডিসেম্বর। এ বছর নভেম্বরের শেষ সপ্তায় আমাদের দৈনিকগুলোতে যে সংবাদগুলি পরিবেশিত হয়েছে তার সারাংশ এই রকমঃ বীরভূমে ৩ জন খুন, মালদহে ২ জন, বর্ধমানে

৪ জন, ২৪ পরগণায় ১ জন এবং এক কিশোরীর উপর ৫ জন পাষণ্ডের ধর্ষণের পর তাকে হত্যা, নদীয়ায় ৩ জন—এ ছাড়া ধান কাটা এবং গৃহ বিবাদে বিভিন্ন স্থানে ৭ জন খুন। এক সপ্তার বিবরণ যদি এই হয় তা হলে কি ভাবব আমরা এক মহান মানবিক চেতনার উজ্জ্বল স্বর্গরাজ্যে বাস করছি! দৈনিক সংবাদগুলিতে আরো কিছু অমানবিক (!) সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং তা এইঃ নদীয়ায় নকশালদের হত্যা করার জন্য গোপন রিপোর্ট গেছে। খুনী গুণ্ডাদের শায়েস্তা করার একমাত্র পথ দেখামাত্র গুলি। চিঠিপত্র কলমে এ সপ্তায় লেখা হয়েছেঃ এ সব অপরাধীদের ছেড়ে দেওয়া উচিৎ নয়, বিচারের জন্য পাঠানোও ঠিক নয়, কেননা বিচারের নামে যা হয় তা আমরা অবগত আছি ; এদের একমাত্র বিচার ধরা মাত্র খুন করে ফেলা। নইলে, আজ কেবল আমরা নিশ্চিন্তে বাইরে বেরুতে পারছি না কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন আমরা আর ঘরেও বাস করতে পারব না।

বর্তমানে আমরা যে নৈরাজ্যের নরকে বাস করছি, রসুলুল্লাহ স-এর সমকালীন হেজাজের অবস্থা তদপেক্ষাও ভয়াবহ ছিল। খুন জখম ছিনতাই ডাকাতি ব্যাভিচার এসব ছিল মুখের কথা। অথচ সামান্য কয়েক বছরের মধ্যে এসব গুরুতর পাপগুলি আরবের মৃত্তিকা থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করল। এ সব অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর নির্দেশিত নিয়ম নীতি অনুযায়ী বিচার মীমাংসা করে। এখানে আমরা দু-একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি।

অলংকার পরিহিত অবস্থায় একজন বালিকা প্রয়োজন বশতঃ মদিনার বাইরে গেল। পথিমধ্যে এক পরিচিত ইহুদির সঙ্গে তার দেখা হল। বালিকার অলংকারগুলি দেখে লোকটি ভীষণভাবে লুব্ধ হয়ে পড়ল। অল্প বয়স্ক এই বালিকাটিকে ধরাশায়ী করতেও তার বেগ পেতে হল না কিন্তু অলংকারগুলি খুলে নেওয়া সহজে হল না। শেষ পর্যন্ত মাথায় পাথর মেরে মেয়েটিকে গুরুতর ভাবে জখম করে সমুদয় অলংকার খুলে নিয়ে সে চলে গেল। বিচারের

জন্য সেই মুমূর্ষু মেয়েটিকে তার আত্মীয়-স্বজন রসূলুল্লাহ স-এর নিকট নিয়ে এলেন। কয়েক জন সন্দেহজনক লোকের নাম করে তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি তোমাকে জখম করেছে? সে মাথা নেড়ে ইশারায় জানাল, না। আরো কয়েক জনের নাম নিয়ে হুযুর স দ্বিতীয় দফায় একই প্রশ্ন রাখলেন মেয়েটির কাছে। এবারেও সে বলল, না। তৃতীয় বারে কেবল ইহুদির নাম নিয়ে জিজ্ঞেস করতে সে হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। সংগে সংগে ইহুদিকে ধবে আনা হল এবং যতক্ষণ না সে স্বীকার করল, হুযুর স নানাভাবে তাকে প্রশ্ন করলেন। তারপর যখন নিশ্চিন্ত হলেন যে এই ইহুদিই মেয়েটির হত্যাকারী, আল্লাহর আইন মোতাবেক তিনি নির্দ্বিধায় তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হাম্মাম রা বলেন, দুটি পাথরেব মাঝখানে রেখে ইহুদির মাথাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে হত্যা করা হল। বুখারী শরীফে এই হাদিসটি অন্ততঃ দশ-বার জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে। একজন মানুষকে ধরাশায়ী করে তার মাথাকে দুটি পাথর দিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করা নিশ্চয়ই অমানবিক কিন্তু সে যখন নিরাপবাধ বালিকাটিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল সেটা কি খুব মানবোচিত কাজ হয়েছিল? খুন জখম ছিনতাই যেখানে প্রতি মুহূর্তের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এই সব দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কঠোর বিচারে সেখানে সহজেই শান্তি এবং নিরাপত্তা ফিরে এসেছিল।

কাকেও হত্যার নির্দেশ দিতে গিয়ে রসূলুল্লাহ স বিশেষরূপে চিন্তিত হতেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করতেন। আবু কিলাবা বলেন, তিনটি অপরাধ ছাড়া তিনি কাউকে হত্যার নির্দেশ দিতেন না। ক. কোন ব্যক্তি কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে খ. কোন বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচারে লিপ্ত হলে এবং গ. কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে অথবা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করলে (মুরতাদ হলে) রসূল্লাহ স কিসাসের নির্দেশ দিতেন। আনাস ইবনে মালেক রা বলেন, একদা উকল গোত্রীয় একদল লোক নবী স-এর নিকট এল এবং স্বেচ্ছায়

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। মুসলমান হবার পর তারা মসজিদের চত্বরেই অবস্থান করত কিন্তু মদিনার আবহাওয়া তাদের সহ্য হল না। তারা ক্রমান্বয়ে শীর্ণ হয়ে গেল। অবশেষে রসূলুল্লাহ স তাদের বায়তুল মালের উট যেখানে রাখা হত সেখানে পাঠালেন এবং নির্দেশ দিলেন তারা যেন নিয়মিত সেই উটের দুধ এবং প্রস্রাব পান করে। এই নির্দেশ পালন করায় তাদের রোগ সেরে গেল, অল্প দিনের মধ্যেই তারা বেশ সুস্থ্য ও সবল হয়ে উঠল। তারপর শয়তানী কুহকে পড়ে তারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করল। কেবল তাই নয় সুযোগ বুঝে রাখালকে হত্যা করে বায়তুল মালের উটগুলি নিয়ে রাতের অন্ধকারে সরে পড়ল। যথা সময়ে সংবাদ এল নবীজীর নিকট। তাদের ধরার জন্যে লোক বেরিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এবং মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাদের বেঁধে আনা হল। এরপর বুখারী শরীফ থেকে হুবহু অনুবাদটি আমি তুলে দিচ্ছি। রসূলুল্লাহ স "লৌহশলাকা আনার নির্দেশ দিলেন। পরে তা গরম করে তাদেব চোখে ফুঁড়ে দিলেন। এবং তাদের হাত পা টুকরো টুকরো কবে কাটলেন কিন্তু পট্টি লাগালেন না। অতঃপর তাদের মরুভূমিতে ফেলে রাখা হল। তারা পানি চাইল কিন্তু তা পান করান হয়নি। অবশেষে তারা এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল।"

আর একটি ঘটনা ব্যাভিচারের। সে বিবাহিত সুতরাং এ অবস্থায় আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন রসূলুল্লাহ। অবশেষে মদিনার বিখ্যাত গোরস্থান জান্নাতুল বাকির জানাজার নামায পড়ার স্থানে তাকে দাঁড় করিয়ে পাথর মারা শুরু হল। কিন্তু পাথরের আঘাতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে রক্তাক্ত অবস্থায় সে ছুটে পালাল, শেষ পর্যন্ত তাকে হারবা নামক স্থানে ধরা হল এবং রজম করে হত্যা করা হল।

উপরে যে দুটি বিচারের কথা উল্লেখিত হয়েছে, এর যে কোন একটি যদি আজ ভারতে অনুষ্ঠিত হয়, নিশ্চিন্তভাবে আমি জানি আমাদের মানবতাবাদি বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে বিচার বিভাগ এবং পার্লামেন্ট পর্যন্ত উত্তাল হয়ে উঠবে, তাঁরা সকলেই সমস্বরে

চিৎকার করবেন এ ত আদিম যুগের বর্বর বিচার। আমি অবাক হয়ে যাই এমনতর বিচারের বর্বরতাটুকু সহজেই তাঁদের চোখে ধরা পড়ে কিন্তু যখন বালিকাটি হত্যা হয়, রাখালের দেহটি লুটিয়ে পড়ে এবং মহিলাটি ধর্ষিত হয় তখন তাঁদের দৃষ্টি উন্মুক্ত থাকে কি? এ সবের মধ্যে কি তারা কেবল সভ্যতারই মহিমাময় প্রকাশ দেখতে পান? এবং এ ধরনের হাজার ঘটনা ঘটতেই থাকে।

এখানে প্রথম দলটির অপরাধের গুরুত্ব লক্ষ্য করার মত। তাদের দ্বারা চারটি গুরুত্বপূর্ণ পাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমতঃ তারা রসুলের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দ্বিতীয়তঃ ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়েছে, তৃতীয়তঃ রাখালকে হত্যা করেছে এবং চতুর্থতঃ চুরি করেছে। দ্বিতীয় ঘটনায় দেখতে পাচ্ছি ব্যভিচার করে সে সামাজিক এবং পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত করেছে। এ ধরনের গর্হিত কাজ তখন যে কোন সময় যেখানে সেখানে অনুষ্ঠিত হত। অথচ এমনতর সীমাহীন অপরাধের কোন বিচার ছিল না। সেই নির্মম আচরণের নির্মম বিচার করলেন রসুলুল্লাহ। নির্মম কিন্তু ইনসাফ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। এইরূপ দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কয়েকটি মাত্র বিচারে সমগ্র হেজাজ থেকে এ ধরনের অপরাধ চিরতরে দূর হয়ে গেল।

আমাদের পুলিশ বিভাগ, বিচার এবং প্রশাসন কেউই দেশে শান্তি স্থাপন করতে পারছেন না। নিতান্ত অন্ধ না হলে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে দেশ এবং সমাজের সর্বত্র অশান্তির আগুন জ্বলছে, খুন-জখম ধর্ষণ অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে এবং বিচার বিভাগের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রতি মুহূর্তে এই অপরাধগুলি বর্তমান। অথচ আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস আল্লাহর আইন মুতাবিক খুনের বদলে খুন, ব্যভিচারে রজম এবং চুরির অপরাধে হাত কাটা প্রভৃতি নিয়ম চালু হলে মাত্র এক পক্ষ কালের মধ্যেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে। এর জন্যে বেশি রক্তপাতেরও প্রয়োজন নেই, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাত্র কয়েকটি বিচার পর্ব অনুষ্ঠিত হলেই আমরা অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব

ইনশাআল্লাহ। সংবাদপত্রের কথা যদি সত্য হয়, নকশাল হত্যার জন্য সরকারের গোপন রিপোর্ট এবং অতিষ্ঠ ভুক্তভোগীর চিঠিতে প্রকারান্তরে আল্লাহর আইনকেই সমর্থন করা হয়েছে। তাঁরাও দেশে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের চিরতরে পৃথিবী থেকে অপসারণের দাবী জানিয়েছেন। কয়েক দিন পূর্বে সকল দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে দেখতে পাচ্ছি রাজস্থান হাইকোর্টের এক বিচারক বধূ হত্যার আসামীকে প্রকাশ্যে সর্বজন সমক্ষে ফাঁসিতে লটকাবার আদেশ দিয়েছেন। এ আদেশে এই মহান বিচারক সরাসরি আল্লাহর আইনকেই সমর্থন করেছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ হোক কাল হোক এ আইন না মেনে আমাদের উপায় নেই।

নামায শেষ করে বাড়িতে এসে মধ্যাহ্নের আহার সমাপ্ত করলাম সকলে কিন্তু কোন কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না আমি। বুকের গভীরে যেন কোথায় একটা কাঁটা ফুটে আছে, অবিরাম এক দুঃসহ ব্যথার প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে। খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম এবং কিছুক্ষণের জন্য ঘুমিয়েও গেলাম। কিন্তু অনুভব করলাম আমার খাওয়াও যেন ব্যথায় ভরা, শোওয়াও যেন কণ্টক শয্যা এবং নিদ্রাও যেন অনন্ত বেদনায় ম্রিয়মান। যে দিন প্রথম এই পবিত্র নগরীতে প্রবেশ করেছিলাম আশায় উচ্ছ্বাসে আনন্দে বুকটা জোয়ারের মত ভরে উঠেছিল আজ সেখানে শুষ্ক এক বিশাল বালিয়াড়ির স্তূপ। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই, ধূ ধূ প্রান্তর জুড়ে এক দুঃসহ বেদনা পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সমগ্র দেহটা যেন কাটা সতেজ লাউ ডগার মত দুমড়ে ভেঙে চূর্ণ ও ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ জানেন! এই ব্যথা আমি সহ্য করব কি করে।

এশার নামাযের পর দুটি কম্বল কিনলাম আর তিনটি প্লাস্টিকের জারে ভরে নিলাম জমজমের পানি। স্বদেশে প্রিয় পরিজনদের কাছে এই হবে আমাদের বিতরণ তোহফা। কাল সকালে একেবারেই সময় পাওয়া যাবে না, সুতরাং বাড়িতে ফিরে দু'জনে গোছ-গাছে মন দিলাম। ঘরময় বিছিয়ে আছে সব কিছু, বেশ সময়ের

ব্যাপার। ধীরে সুস্থে পরিপাটি করে কাজ করে যাচ্ছি দুজনে আর ভাবছি হিজরতের রাতের কথা, সেই রাত—সেই বিপদসংকুল ভয়ঙ্কর রাতে, শত্রুপরিবেষ্টিত হয়ে কি করেছিলেন রসুলুল্লাহ? আমাদের মত সে রাতও ছিল রসুলুল্লাহর মদিনা যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব। আমরা ত বেশ নিঃশঙ্ক চিত্তে কাজ করে যাচ্ছি, জীবনহানির ভয় নেই, ঘাতকের কথা ত কল্পনার বাইরে। অথচ রসুলুল্লাহর?

সঙ্গী সাথী মুসলমানেরা সকলেই প্রায় হিজরত করে চলে গেছেন মদিনায়। তাঁদের উপর লোমহর্ষক অত্যাচার চালিয়েও নিরস্ত করা যায়নি। বেলালকে রক্তাক্ত করা, খাববাবকে জলন্ত কয়লায় পোড়ান, দুপায়ে দড়ি বেঁধে বিপরীত দিকে দুটি উটকে তাড়না করে ইয়াসিরের দেহকে চিরে ফেলা, স্ত্রী অঙ্গে বর্শার আঘাতে সামিয়াহকে শহীদ করা, চাবুকে চাবুকে রক্তাক্ত করে সুহাইবকে বারে বারে অচৈতন্য করা ছাড়াও নানান জনকে মরুর উত্তপ্ত বালুতে শোয়ান, অঙ্গারের দাগ লাগান, চেটাইতে জড়িয়ে নাকে লঙ্কার ধোঁয়া দেওয়া প্রভৃতির মত অমানবিক নির্মম অত্যাচার চালিয়ে একজনকেও ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা যায় নি, বরং সকলে মদিনায় গিয়ে নতুন করে প্রতিষ্ঠা ও শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করছেন। এ সব কথাই গভীরভাবে চিন্তা করছিল কুরেশরা। তারা সকলে আজ একত্রিত হয়েছে দারুন নাদওয়ায়, তাদের গোপন পরামর্শ কক্ষে। এই গৃহে বসেই তারা ঠিক করত ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে কোন মুসলমানের উপর কি ধরনের নিপীড়ন ও অত্যাচার চালান হবে, রসুলুল্লাহকেও তাঁর কর্মপদ্ধতিতে বাধা দেওয়া ও সংযত করার জন্যে তাঁর উপর কেমন ভাবে মানসিক পীড়ন ও দৈহিক ক্লেশ প্রয়োগ করা যায় তারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হত এই পরামর্শ কক্ষেই। সেই পরামর্শ কক্ষে সকলে আজ গভীর ভাবে চিন্তামগ্ন। কি আছে লোকটার মধ্যে যে কোন কিছুতেই তাঁকে টলানো যাচ্ছে না, অটল এবং নির্ভিকভাবে তিনি তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেই চলেছেন। খাববারের প্রতি রসুলুল্লাহর সেই অসম্ভব উক্তিটিও তাদের কানে গেছে। তাতে

তারা আরো চিন্তিত। মানুষটির স্থিরতা ও ধৈর্যের কোন তলই খুঁজে পাচ্ছে না তারা।

চারদিকেই মুসলমানদের উপর চলছে অমানুষিক উৎপীড়ন। প্রহারে অত্যাচারে সকলের দেহ রক্তাক্ত জর্জরিত। গায়ের চাদরকে বালিশের মত গুটিয়ে মাথায় দিয়ে কাবার ছায়ায় শুয়েছিলেন রসুলুল্লাহ। এলেন অত্যাচারিত খাববাব। পীড়নে নির্যাতনে তিনি জীর্ণ, মৃতপ্রায়। নবীজীকে একান্ত নিরালায় পেয়ে বললেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি কুরেশদের উপর অভিশাপ দিন। এ কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে রসুলুল্লাহর মধ্যে ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হল, তাঁর মুখমন্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। তিনি বললেন, তোমাদের আর এমন কি দুর্দশা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে এমন অনেক ঈমানদার ছিল কারো কারো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে পোতা হত তারপর করাত দিয়ে মাথা থেকে চিরে দ্বিখণ্ডিত করা হত। "আবার লোহার চিরুনী দ্বারা কারো শরীরের হাড় থেকে যাবতীয় মাংস ও স্নায়ু আঁচড়ে তুলে ফেলা হত। তবুও এটা তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর কসম! এ দ্বীন (ইসলাম) পূর্ণতা লাভ করবেই। (সর্বত্র এতটা নিরাপত্তা বিরাজ করবে যে) তখন যে কোন উষ্ট্রারোহী সানআ হতে হাযরা মাওয়ত পর্যন্ত (এই সুদীর্ঘ পথ নির্বিঘ্নে) অতিক্রম করবে। তখন সে (নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে) আল্লাহ ব্যতীত অপর কারও এবং নিজের মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে ব্যতীত অন্য কিছুরই ভয় করবে না। তোমরা কিন্তু এ ব্যাপারে (বড্ড বেশি) তাড়াহুড়া করছ।" বুখারী শরীফ, ৩৩৪৪।

অর্থাৎ যত অত্যাচারই হোক, সবর এবং ধৈর্য সহকারে তার মুকাবিলা করতে হবে। "আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"—আল কোরআনের এ বাণীর মূর্ত প্রতিচ্ছবি রসুলুল্লাহর জীবনাচরণ। পাথর মেরে রক্তাক্ত করা, পথে কাঁটা ছড়িয়ে ক্লেশ দেওয়া, গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যার চক্রান্ত, মাথায় উটের ভুঁড়ি চাপিয়ে নিহত করার প্রচেষ্টা সব কিছুই তাঁর উপর প্রয়োগ করা হয়ে গেছে,

অথচ ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মুস্তফা এক আল্লাহতে পরম আস্থাশীল এবং ওহোদ পর্বতের মত অটল। কোন কিছুতেই লোকটিকে যখন পরাস্ত করা গেল না, এখন তাই দারুন নাদওয়ায় বসে, কুরেশদের প্রধান চিন্তা, কিভাবে মুহাম্মদ স-কে ধ্বংস করা যায়। এ সভায় কুরেশ ছাড়াও মক্কার অন্যান্য গোত্রের প্রধানদেরও আহ্বান করা হয়েছিল আর যোগ দিয়েছিল নজদ দেশের এক বৃদ্ধ। সে ছিল প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সম্ভবতঃ ব্যবসা উপলক্ষে বা অন্য কোন কারণে ঐ বৃদ্ধ এ সময় মক্কায় এসেছিল। তার ব্যক্তিত্ব, কূটবুদ্ধি এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ লক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ কুরেশরা তাকে এ সভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়েছিল। আলোচনা সভা নানা জনের বিবিধ মতামতে মুহূর্তকালের মধ্যেই সরগরম হয়ে উঠল। একজন বললে, কবি জহির, নাবেগাদের যেভাবে কারাদণ্ডে নিষ্ঠুর নির্যাতন করে নিহত করা হয়েছিল, আমাদের এই শত্রুর জন্যেও সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। প্রথমে এর হাত-পা বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করা হোক তারপর প্রবেশ পথটি গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হোক। এভাবে ধীরে ধীরে অশেষ যন্ত্রণাভোগ করতে করতে শেষ হয়ে যাবে। প্রস্তাবটি কিছু কিছু অদূরদর্শী মানুষের মনঃপুত হলেও, সেই বৃদ্ধ শোনা মাত্রই নাকোচ করে দিল। সে তার বিজ্ঞ মস্তক আন্দোলিত করে বলল, তোমরা মুহাম্মদকে ধরে বন্দী করবে, হাত-পা বাঁধবে, কারাগারে নিক্ষেপ করে পাঁচিল গেঁথে তুলবে আর ভেবেছ ততক্ষণ হাশেমি গোত্রের লোকেরা বসে থাকবে চুপচাপ? সংবাদ তাদের কানে উঠবে যথা সময় এবং যেমন করে হোক মুহাম্মদকে তারা উদ্ধার করে নিয়ে যাবেই। চাই কি একটা বড় রকমের যুদ্ধবিগ্রহও বেধে যেতে পারে। তখন সকলে দ্বিতীয় উপায় চিন্তা করতে শুরু করল। একজন বললে, সবচেয়ে ভাল হয় যদি মুহাম্মদকে অন্য কোন দেশে নির্বাসিত করা হয়। তাহলে মক্কায় কোন উৎপাত থাকবে না! আমরা যে যার ঘর-সংসারে কাজে-কর্মে মন দিতে পারব। এ মতও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হল না। প্রতিবাদকারীদের সঙ্গে সেই বৃদ্ধ একমত হয়ে বলল, যদি

মুহাম্মদকে বিদেশে নির্বাসিত করা হয় তাহলে সে যে রকম মনোমুগ্ধকর কথা বলতে পারে ও মানুষের মন জয় করতে পারে, অসংখ্য অনুগত সঙ্গী ও ভক্ত জুটতে একেবারেই বিলম্ব হবে না। তারপর সেই বিপুল শক্তি নিয়ে একদিন সে মক্কার উপর হামলা চালিয়ে কড়ায় গণ্ডায় প্রতিশোধ নিয়ে নেবে। তখন নিজেদের ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না। আবার সকলের মধ্যে নতুন করে তৃতীয় পর্যায়ের চিন্তা চলতে থাকে। অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের নির্মম প্রস্তাব এল চিরশত্রু আবুজেহেলের নিকট থেকে। সে বলল, সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে শত্রু নিষ্কণ্টকের সবচেয়ে ভাল পথ হল এখুনিই মুহাম্মদকে হত্যা করে ফেলা। মুহূর্তকাল বিলম্ব করা মানে তার শক্তিকে বৃদ্ধি করা। একটু হেসে পরম বিজ্ঞের মত সে বললে, তবে এ কাজ কেউ একা করলে সর্বনাশ, হাশেমি গোত্রের যুবকেরা তাকে আর রক্ষা রাখবে না। আমার মতে, প্রতি গোত্রের একজন করে লোক এই হত্যায় অংশগ্রহণ করবে তা হলে রক্তমূল্য সকল গোত্রের মধ্যে সমান ভাগ হয়ে যাবে। আর হাশেমি গোত্র একা কিছুতেই আমাদের সকলের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে সাহস পাবে না। সেই বৃদ্ধ মস্তক আন্দোলিত করে বললে. হ্যাঁ এটা একটা প্রস্তাবের মত প্রস্তাব বটে। তার সঙ্গে অন্য সকলে আবুজেহেলের এই জঘন্য প্রস্তাবকে একযোগে সমর্থন করল। স্থির হল মুহাম্মদকে কোনমতেই স্থানান্তরে যেতে দেওয়া হবে না, তাঁর গৃহই হবে তাঁর মৃত্যু শয্যা। সঙ্গে সঙ্গে প্রতি গোত্রের একজন করে শক্ত সামর্থ যুবক তরবারি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল।

কুরেশদের এই হত্যা চক্রান্তের গোপন বার্তা দয়াময় আল্লাহ যথাসময় তাঁর রসুলকে জানিয়ে দিলেন। ইতিপূর্বে হযরত আবুবকর হিজরতকারী অন্যান্য মুসলমানদের সঙ্গে মদিনায় যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু রসুলুল্লাহ তাঁকে নিরস্ত করে বলেছিলেন, অপেক্ষা কর। আমি আশা করছি যে আমাকেও হিজরতের আদেশ দেওয়া হবে। সেই রসুলুল্লাহ আজ চাদরে মুখমণ্ডল ঢেকে মধ্যাহ্নের ঘন উত্তাপ মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়ালেন আবুবকরের

বাড়িতে। মা আয়েশা বলেন, আমাদের বাড়িতে রসূলুল্লাহ আসতেন সাধারণত সকাল সন্ধ্যায়, দুপুরে কোনদিন তাঁকে আসতে দেখিনি। অসময়ে তাঁকে আসতে দেখে আব্বা (আবুবকর) বললেন নিশ্চয়ই কোন জরুরি কাজে তিনি এ সময় এসেছেন। মা আয়েশা বলেন, "অতঃপর রসূলুল্লাহ এসে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হল। তিনি অন্দরে প্রবেশ করলেন। (তারপর) নবী সঃ আবুবকরকে বললেন, এখানে যারা বসে আছে তাদের বাইরে যেতে বল। তখন আবুবকর বললেন, আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক। (যারা বসে আছে) তারা ত আপনারই আপনজন। তিনি বললেন, আমাকে হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।" বুখারী শরীফ ৩৬১৮। একথা শুনে আবুবকর বললেন, হিজরতে আমি কি আপনার সহগামী হবার সৌভাগ্য লাভ করব? রসূলুল্লাহ স বললেন, হ্যাঁ। প্রত্যক্ষদর্শী মা আয়েশা বলেন, হযরতের নিকট থেকে অনুমতি পাওয়ার পর আনন্দে আমার আব্বা এমন ভাবে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন যে আমি জীবনে এভাবে আর তাঁকে কোনদিন ক্রন্দন করতে দেখিনি। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এই আনন্দ কিসের আনন্দ? কেন আনন্দিত হয়েছিলেন হযরত আবুবকর? কেন অবিরল আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেছিলেন তিনি? প্রকৃতপক্ষে খুশি হবার মত কোন পরিবেশই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। চারদিকেই শত্রু, পথঘাট দুষমন পরিবেষ্টিত, যেকোন মুহূর্তে জীবন চলে যেতে পারে। বিপদসঙ্কুল সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে যেখানে যেতে চাইছেন সেটাও কোন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি নয়। অচেনা পরিবেশ, অজানা মানুষজন, তাঁরা কিভাবে গ্রহণ করবেন তাও অনিশ্চিত। সব মিলিয়ে এক দুর্বিষহ অবস্থা। অথচ আবুবকর আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করছেন। আসলে এই আনন্দ কোন জাগতিক আনন্দ নয়, পার্থিব কোন লাভ লোকসানের হিসাব দিয়ে এই আনন্দ স্পর্শ করা যাবে না— এই আনন্দ হল রসূলের সঙ্গলাভের আনন্দ, আশেকে রসূলের হৃদয় নিঃসৃত এক অনাবিল আনন্দ। অজানা দুর্গম পথে রসূলের

সঙ্গী হয়ে তিনি তাঁকে হয়ত কিছু সাহায্য করতে পারবেন, তাঁর সুখদুঃখের অংশী হবেন, বিপদ এলে রসূলকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে নিজেই বুক পেতে দাঁড়িয়ে যাবেন, প্রয়োজনে জীবন দেবেন। আর রসূলুল্লাহর মহব্বতে জীবন দেওয়ার সঙ্গে নিখিল বিশ্বের তাবৎ কোন কাজের তুলনা হতে পারে না। সেই অতুলনীয় মহান কর্মে অংশীদার হওয়ার আনন্দই আবুবকরের আনন্দ। এই আনন্দ সাত্মিক। আবুবকরের অশ্রু তাই আত্মার মর্মমূল থেকে উৎসারিত!

প্রকৃতপক্ষে এই আনন্দের সূচনা হয়েছিল চার মাস পূর্ব থেকে, সেই যেদিন রসূলুল্লাহ বলেছিলেন, "অপেক্ষা কর। আমি আশা করছি আমাকেও হিজরতের আদেশ দেওয়া হবে"—সেই মহান ঘোষণার দিন থেকে। মা আয়েশা বলেন, রসূলুল্লাহর এই ঘোষণার পর আমার আব্বা মদিনায় যাওয়া স্থগিত রাখলেন এবং হিজরতে নবী স-এর সহযোগী হয়ে দূরপথ পাড়ি দেবার জন্যে দুটি উটকে চারমাস পর্যন্ত নিয়মিত বাবলা পাতা খাইয়ে হৃষ্টপুষ্ট ও শক্তিশালী করলেন। বুখারী শরীফ ৩৬১৮।

কথাবার্তা সমাপ্ত করে রসূলুল্লাহ প্রত্যাবর্তন করলেন আপনার গৃহে। মা আয়েশার বড় বোন হযরত আসমা অতি দ্রুত নিপুনতার সঙ্গে যাত্রা পথে গ্রহণের জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করে দিলেন। এই খাবার ছিল বকরির রান্না করা গোশত। চামড়ার একটি থলির মধ্যে খাবার দিয়ে তার মুখ বাঁধার জন্যে আর কিছু খুঁজে পেলেন না হযরত আসমা। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর কোমরবন্দ চিরে দ্বিখণ্ডিত করে একটি দিয়ে থলির মুখটা বেঁধে দিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয়ে গেল 'যাতুন নিতাকাইন', দুই কোমরবন্ধ বিশিষ্টা।

আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে করণীয় কাজগুলি সমাপ্ত করে ফেললেন রসূলুল্লাহ। ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সশস্ত্র পৌত্তলিক যুবকেরা রসূল হত্যায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে সেই পবিত্র গৃহটি বেষ্টন করে ফেলল। নবীকে হত্যা না করে তারা এ স্থান ত্যাগ করবে না। এখানে অবশ্যই স্মরণযোগ্য বিষয়, কুরেশদের প্ররোচনায় বিভিন্ন গোত্রের যুবকেরা হযরত মুহাম্মদ স কে

হত্যা করতে এসেছে ঠিকই কিন্তু এই চরম মুহূর্তেও তারা আল-আমীনের প্রতি বিশ্বাস হারায় নি। ভয়ংকর সেই হনন মুহূর্তেও তাদের অনেকের অর্থ সম্পদ গহনাদি তাদের চিরবিশ্বস্ত আল-আমীনের নিকট গচ্ছিত ছিল। কেননা মক্কায় এই ধরনের সর্বজন-জয়ী আন্তরিক বিশ্বাস আর কেউ অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহর রসূলও কোনদিন এই বিশ্বাসের অমর্যাদা করেন নি। আজ মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তিনি তাঁর কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না। তাঁর নিকট যার যে জিনিষ গচ্ছিত ছিল, হযরত আলিকে পর পর সেগুলি দেখিয়ে ও বুঝিয়ে দিলেন। এই অবিস্মরণীয় মহত্ত তাঁর সন্দেহাতীত নবুয়তের এক জ্বলন্ত প্রকাশ। আলির উপর এগুলি তাদের যথার্থ মালিকদের নিকট প্রত্যাপনের দায়িত্ব ন্যাস্ত হল। অবশেষে নিজের বিছানায় নিজের চাদর গায়ে দিয়ে হযরত আলিকে শয্যা গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। দূর থেকে দেখলে যে কেউ মনে করবে যেন স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ স নিদ্রা যাচ্ছেন। দরজার ফাটল দিয়ে দেখে হত্যাকারীদেরও তাই মনে হয়েছিল। তারা বিভ্রান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এদিকে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে, কথিত আছে, রসূলুল্লাহ এক মুঠো ধুলিতে সূরা ইয়াসিনের প্রথম রুকুর কয়েকটি আয়াত পড়ে অবিশ্বাসীদের প্রতি নিক্ষেপ করেন আর তাতেই তাদের দৃষ্টিশক্তি সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত হয়ে যায় এবং হুযুর স নির্বিঘ্নে শত্রু বেষ্টন ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তাঁর নিষ্ক্রমণ সম্পর্কে আরো একটি মত প্রচলিত আছে। হাফেজ ইবনে হাজর, ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ, হাফেজ ইবনে আবদুল বার, এমনকি হাল আমলের মোহাম্মদ আকরাম খাঁ পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহর পরিচারিকা হযরত মারিয়ার একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। এই হাদিসে হযরত মারিয়া বলেন, "হিজরতের রাতে আমি অবনমিত হলে হযরত আমার পিঠে পা দিয়ে প্রাচীরের উপর উঠেছিলেন।" সম্মুখের সদর পথ পরিত্যাগ করে এভাবে রসূলুল্লাহ বাড়ির পিছন দিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে নির্বিঘ্নে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনা যাই ঘটুক নবীজী যে নিরাপদে পার হয়ে এসেছিলেন সে

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মক্কার পথে চলতে চলতে সেই গভীর নিশীথে চিরবাঞ্ছিত কাবা শরীফের দিকে মুখ তুলে অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে রসুলুল্লাহ উচ্চারণ করলেনঃ হে মক্কা নগরী! সমগ্র জগৎ অপেক্ষা তুমি আমার অতি প্রিয় কিন্তু তোমার সন্তানেরা আমাকে থাকতে দিল না।

ওদিকে বাঞ্ছিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করেও রসুলুল্লাহর দেখা না পেয়ে অবশেষে তাঁর বাড়িতেই এসে হাজির হলেন আবুবকর এবং চাদর আবৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে ডাকলেন, হযরত! যথাসম্ভব নিচুস্বরে শায়িত ব্যক্তি উত্তর দিলেন, আমি হযরত নই—আলি। রসুলুল্লাহ আপনার জন্য 'বির মাউনায়' অপেক্ষা করছেন, আপনি এখুনি সেখানে চলে যান। সেমতে হযরত আবুবকর সেখানে গিয়ে রসুলুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হন। কিন্তু অনেকেই মনে করেন নবী স সরাসরি হযরত আবুবকরের গৃহে যান এবং সে রাতে সেখানে দু'জনে একত্রিত হয়ে সুর (সওর) গিরি গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করেন।?

এর পরের অংশটি আমি বুখারী শরীফ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি। মা আয়েশা বলেনঃ "অতঃপর রসুলুল্লাহ স এবং আবুবকর সুর পর্বতের একটি গুহায় গিয়ে উপনীত হলেন। সেখানে তাঁরা তিন রাত আত্মগোপন করে থাকলেন। রাতের বেলা আবুবকরের পুত্র আবদুল্লাহ তাঁদের কাছে থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন চতুর এবং তীক্ষ্নবুদ্ধি সম্পন্ন যুবক। ভোরে তাঁদের নিকট থেকে রওনা হয়ে তিনি মক্কার কুরেশদের সঙ্গে সকালবেলা এমন ভাবে মিলিত হতেন যেন এখানেই তিনি রাত কাটিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে (কুরেশরা) যেসব চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করত তার যা কিছু তিনি শুনতেন তাই মনে রাখতেন এবং যখন আঁধার ঘনীভূত হত ঐ সংবাদটা তাঁদের নিকট পেঁৗছে দিতেন।

"আবুবকরের ক্রীতদাস আমের ইবনে ফুহাইরাহ (দিনের বেলা) তাঁদের নিকটেই (সুর পর্বতের সন্নিহিত অঞ্চলে) দুধেল বকরির পাল চরিয়ে বেড়াত এবং রাতের কিয়দাংশ অতিবাহিত হলে

সে বকরি নিয়ে তাঁদের কাছে যেত আর তাঁরা দু'জনে অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই বকরির দুধ পান করে নিশ্চিন্তে রাত কাটিয়ে দিতেন। তাঁরা তাঁদের দুধেল বকরিগুলোর দুধ দোহন করার সঙ্গে সঙ্গেই পান করতেন। আবার তার মধ্যে উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ডুবিয়ে গরম করেও পান করতেন। তারপর শেষ রাতের অন্ধকারে আমের ইবনে ফুহাইরাহ বকরিগুলোকে হাঁকিয়ে (চরাতে) নিয়ে যেত। এভাবে ঐ তিন রাতের প্রতিটি রাতে সে এরূপ করতে থাকে।'' বুখারী শরীফ ৩৬১৮। খাদ্য সরবরাহের অতিরিক্ত পন্থা হিসেবে ইবনে হিশামে আরো বলা হয়েছে যে মমতাময়ী হযরত আসমা প্রতিদিন সন্ধ্যায় খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করে রাতের অন্ধকারে গুহায় দিয়ে আসতেন। এভাবে সেই ভয়ংকর দুঃসহ তিনটি দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

অবশেষে দিনের আলোয় নরাধম ঘাতকদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে রসুলুল্লাহ গৃহত্যাগ করেছেন এবং খাটের উপর যিনি শায়িত তিনি হযরত নন—আলি। জালিমরা শেষ পর্যন্ত হযরত আলিকেই বন্দী করে কাবায় নিয়ে যায় এবং নানা পীড়নের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে থাকেঃ বল মুহাম্মদ কোথায়? ভুললে চলবে না যে বন্দী লোকটি ছিলেন স্বয়ং আলি। তিনি ত নতি স্বীকার করলেনই না বরং নির্ভিক কণ্ঠে এবং কিছুটা ধমকের সুরে উত্তর দিলেন, তোমরা কি মুহাম্মদ-এর গতিবিধি নিরীক্ষণ করার জন্যে আমাকে নিযুক্ত করেছিলে যে এখন জিজ্ঞেস করছ? কুরেশরা কিছুক্ষণ বাঁকাচোরা প্রশ্নের পর হযরত আলিকে মুক্তি দিল। এরপর আবুজেহেল অতিদ্রুত তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হল আবুবকরের বাড়িতে। আসমাকে পেয়েই ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, বল তোর বাপ কোথায়? হযরত আসমা ধীর স্থির। শান্ত এবং অবিচলিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, আমি ত জানি না। জানি না! বিকট মুখভঙ্গী করে ক্রোধ কম্পিত ইতর আবুজেহেল এমন প্রচণ্ড বেগে হযরত আসমার গণ্ডে চড় মারল যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানবালি খসে মাটিতে পড়ে গেল।

কিন্তু এসব নিপীড়নে ত মূল সমস্যার সমাধান হবে না। মক্কার অলিতে গলিতে তখন বিঘোষিত হয়ে ফিরছে, মুহাম্মদ স মদিনায় চলে গেছেন। মুহাম্মদ স হিজরত করেছেন। পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে হযরত মুহাম্মদ স-কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই যার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই দিকভ্রান্ত নেতা আবুজেহেল অবশেষে ঘোষণা করলঃ মুহাম্মদ বা আবুবকরের মুন্ডু যে আনতে পারবে, একশত উষ্ট্র পুরস্কার। এক শো উট! কম কথা নয়। মক্কার যুদ্ধোন্মাদ যুবকদের কাছে দুর্ধর্ষ আরব বেদুইনদের নিকট এ এক বিপুল প্রলোভন। সুতরাং মুহূর্তকাল বিলম্ব না করে অসংখ্য-পুরস্কার পিয়াসী জোয়ানেরা পদব্রজে উষ্ট্রে এবং সশস্ত্র হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। মুহূর্তে হিজরতের পথ ভয়ঙ্কর রকমে বিপদ সঙ্কুল ও সংঘর্ষ মুখর হয়ে গেল।

কেবল পুরস্কার ঘোষণা করেই নিরস্ত থাকল না আবুজেহেল, সে তার দলবলের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে সমকালীন মক্কার শ্রেষ্ঠ কায়িক—পদচিহ্নবিশারদকে নিযুক্ত করল। ধূলির উপর হযরত এবং আবুবকরের পদচিহ্ন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ ও বিশ্লেষণ করে সেই পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকল, তার সঙ্গে গেল অস্ত্র সজ্জিত একদল অত্যুৎসাহী কুরেশ—যারা তখনো রসূল-নিধনে উন্মুখ। শেষ পর্যন্ত সেই বিশেষজ্ঞ সুর পর্বতের পাদদেশে এমন কি গুহার সন্নিকটে পৌঁছে গেল। এত নিকটে যে হযরত আবুবকর বলেন, 'এক সময় আমি আমার মাথাটা উপরে তুলে তাকাতেই কিন্তু লোকের পদতল দেখতে পেলাম।' বুখারী শরীফ ৩৬৩২। মৃত্যুকে এভাবে সাক্ষাৎ করে হযরত আবুবকর ভীষণভাবে ভীত হয়ে পড়লেন। প্রকৃতপক্ষে বাঁচার আর কোন আশাই ছিল না, জীবনের শেষ মুহূর্তের সংকেত ধ্বনি দিয়ে আজরাইল যেন গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। অসম্ভব ভীত স্বরে হযরত আবুবকর বললেন, কি হবে ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা মাত্র দুজন। কাতর কণ্ঠে তিনি যেন ব্যথায় ভেঙে পড়লেন, "তাদের কেউ যদি তার দৃষ্টিটা একটু নিচের দিকে করে তাহলে সে আমাদের

দেখে ফেলবে।'' বু. শ. ৩৬৩২। যত বিপদ আসুক রসূলুল্লাহ সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর সুগভীর ও অবিচল বিশ্বাসে অটল থাকতেন, কোন আঘাত কোন ভয় তাঁকে এই গভীর বিশ্বাস থেকে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও টলাতে পারে নি। যত পীড়ন যত বিপদ এসেছে, এই অগাধ বিশ্বাসের উপর এই সুদৃঢ় ঈমানের উপর তিনি তত বেশি আস্থাশীল হয়েছেন, নির্ভরশীল হয়েছেন। আবুবকরের কথার উত্তরে তিনি অসম্ভব সংযত ও ধীর স্থির হয়ে গেলেন। তারপর তার জবান মুবারক থেকে উচ্চারিত হল গভীর ঈমানে দীপ্ত এই চিরন্তন ঘোষণাঃ ''চুপ কর আবুবকর। সেই দুজনের ভয় কি যাঁদের সঙ্গে তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ।'' বু. শ. ৩৬৩২। এই কণ্ঠস্বর ঈমানের সুগভীর মর্মমূল থেকে উৎসারিত। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে এমন প্রত্যয় দৃঢ় কণ্ঠ উচ্চারণ করতে পারেন একমাত্র তিনি, জীবন মৃত্যু যিনি অবিসংবাদিত ভাবে এক আল্লাহতে সমর্পন করেছেন। এই ঈমানী আলোকিত ঝলক, আমাদের জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গলি পথকে আমূল আলোকিত করে যায়। ঈমানের এই তেজ এই দীপ্তি নিখিল বিশ্বে আর কোথাও কোন চিত্তে এমনভাবে ঝলকিত হয়ে ওঠেনি।

হিজরতের পথে ব্যবহারের জন্যে যে দুটি উটকে হযরত আবুবকর হৃষ্ট পুষ্ট করেছিলেন, সঙ্গী হবার অনুমতি পেয়ে সে দুটি রসূলুল্লাহর সম্মুখে দাঁড় করিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললেন, ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার আব্বা আপনার প্রতি কুরবান হোক। আপনি এ দুটির একটি গ্রহণ করুন। কিন্তু ভক্তের এমন বিনীত সেবাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হলেন না রসূলুল্লাহ। বললেন, একটি গ্রহণ করতে পারি—যদি তুমি উচিত মূল্যে বিক্রয় কর। শেষ পর্যন্ত আট শো দিরহামের বিনিময়ে তিনি আল কাসোয়াকে হযরত আবুবকরের নিকট থেকে ক্রয় করলেন। এখানে একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণ করা প্রয়োজনঃ এমন সংকটময় মুহূর্তেও আল্লাহর রসূল আপনার কর্তব্য বিস্মৃত হলেন না, বিনা মূল্যে উটটিকে গ্রহণ করলেন না, করলে তা বিশ্বের সম্মুখে

অনভিপ্রেত একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকত। এ ছিল তাঁর নীতি ও স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে যারা নেতা হবেন, পীর হবেন, শাসক হবেন, জনগণের পথপ্রদর্শক হবেন, এই গুণগুলি তাঁদের চরিত্রে বিশেষ রূপে থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশের বর্তমান পীর ও নেতাদের অধিকাংশের মধ্যে রসূলুল্লাহর এই মহোত্তম সুন্নত ও আদর্শের বড় অভাব, তাঁদের অনেকেই লোভী এবং স্বার্থপর ফলে তাঁদের কোন বক্তব্য ও আদেশ জনগণের মধ্যে কোনই প্রভাব বিস্তার করে না, মরুর রিক্ত হাওয়ায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ারকাহ নামে জনৈক পৌত্তলিক ব্যক্তিকে হিজরতে পথপ্রদর্শনের কাজে নিযুক্ত করেন হযরত আবুবকর। লোকটি যদিও কুরেশদের মতাবলম্বী হযরত আবুবকর তাঁকে অর্থ দিয়ে বিশেষ রূপে বশীভূত করেন। এই আবদুল্লাহর কথা উল্লেখিত হয়েছে বুখারী শরীফেঃ "রসূলল্লাহ স এবং আবুবকর রা বানুদিল ও আবদ ইবনে আদি গোত্রের একজন বিচক্ষণ পথ-প্রদর্শককে—যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও সরু গলিপথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও অবগত ছিল—মজুর 'নিয়োগ' করেন।" বু. শ. ২১০৩। রসূলুল্লাহ এবং আবুবকর দুজনেই তাঁদের সওয়ারী উট দুটিকে এই লোকটির হাতে সমর্পণ করে তিন রাত পর সূর গুহার সন্নিকটে উপস্থিত হবার নির্দেশ দিয়ে যান। আবদুল্লাহ ইবনে ওয়ারকাহ যথাসময় অতি সন্তর্পনে এবং সতর্কতার সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। গুহা থেকে বার হয়ে আসেন আল্লাহর রসুল এবং আবুবকর। আমির ইবনে ফুহাইরা—আবুবকরের আযাদকৃত ক্রীতদাস—পূর্বেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুতরাং দুটি উটের একটিতে (আল কাসোয়ায়) চড়লেন রসূলুল্লাহ, অন্যটিতে আবুবকর এবং তাঁর ক্রীতদাস আর পদপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ছিল নিজের উটে। আল্লাহর নাম স্মরণ করে সেই শত্রু পরিবেষ্টিত ভয়ঙ্কর রাতের অন্ধকারে তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন মদিনার পথে। অবশ্যই মদিনা যাওয়ার সর্ব সাধারণের পথকে বর্জন করে তাঁরা

চললেন অজানা অচেনা উপত্যকা অধিত্যকা সংকুল লোহিত সাগরের উপকূলের দুর্গম সংকীর্ণ পথ ধরে।

আকাশে নিশীথ রাতের তারা জ্বল জ্বল করে, শত্রু পরিবেষ্টিত সেই ভয়ংকর পথে চলতে চলতে মাতৃভূমির মমতায় অকস্মাৎ চোখ দুটি সিক্ত হয়ে আসে রসুলুল্লাহর। এইখানে তিনি খেলা করেছেন, এই উপত্যকায় তিনি বকরি চরিয়েছেন, এই জঙ্গলে তিনি কুল কুড়িয়ে খেয়েছেন! এই দেশ এই মাটি কত প্রিয় তাঁর। আজ সব শেষ হয়ে গেল! অকস্মাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন মক্কার দিকে তাকিয়ে তিনি ফিস ফিস করে বললেন, বিদায় মক্কা! বিদায় কাবা! বিদায় বায়তুল্লাহ! যেন অগাধ জোৎস্নার গলায় আসমুদ্র নিঃসঙ্গতা! ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন রসুলুল্লাহ। পরক্ষণেই চোখ মুছে ধীর স্থির হয়ে সম্মুখে প্রসারিত সুদীর্ঘ পথের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনটি উট আর চারজন মানুষের এই মহান ঐতিহাসিক কাফেলাটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল মদিনার পথে।

২৩ অক্টোবর ৮২। ৫ কার্তিক ৮৯। ৫ মুহররম ·১৪০৩। শনিবার

রসুলুল্লাহ এবং আবুবকর যখন সুর গিরিগুহায় আত্মগোপন করেন রাত গভীর হয়েছিল, আশ্চর্য আমরা দুজনেও যখন মদিনা-যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে শয্যা গ্রহণ করলাম তখনও গভীর রাত। এ সব ব্যাপারে কোন তুলনাই চলে না কিন্তু কেমন ভাবে যেন একটা অদ্ভূত মিল দুলে উঠল আমার চোখের পাতায়। আমাদেরও দেহ মন আত্মা গভীর ভাবে শোকাচ্ছন্ন, মক্কার পবিত্র মৃত্তিকায় শয়ন করে মক্কার বিচ্ছেদ বিরহে কাতর। এ এক অদ্ভূত বিষণ্নতা, এ এক অদ্ভূত শোকোচ্ছ্বাস। সব থেকেও কি যেন নেই, কি যেন হারিয়ে গেল, কোথায় যেন সব কিছু শেষ হয়ে গেল। এক অনন্ত হাহাকারে আকাশ ভুবন পরিপূর্ণ হয়ে রইল। এই কাতর শয্যায় শয়ন করে ঘুম আসতে পারে না। গুহার অন্ধকারে রসুলুল্লাহ এবং আবুবকর কি ঘুমিয়েছিলেন? সম্ভবতঃ না। আধো ঘুম আধো

জাগরণে অবশেষে তিনটে পঞ্চান্ন মিনিটে উঠে পড়লাম, ডেকে তুললাম স্ত্রী এবং হাশমি ইশরাতকে। অযু করে পাক সাফ হয়ে চারটে বাইশে সকলে বেরিয়ে পড়লাম কাবার উদ্দেশ্যে।

হাওয়ায় শীতের আমেজ। কাবার বিশাল চত্বর এখন অনেক সময় অপূর্ণ থেকে যায়। দেশবিদেশের সকল মানুষই প্রায় স্বদেশ স্বজনের মাঝে ফিরে গেছেন, দু চারজন যাঁরা আছেন যাবার পথে। আমরা সেই হালকা জামাতে মিশে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাহাজ্জুদের পর ফজর। কাবার জামাতে এই আমাদের শেষ নামায। মন ক্রমেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে, পৃথিবীর এই পবিত্রতম গৃহ থেকে আমাদের বিদায় আসন্ন। কয়েকদিন বন্ধ থাকার পর আজ নামায শেষ হতে একটি জানাজা হল আর তাতেই মনটা অশেষ রকমে ব্যথাতুর হয়ে উঠল। মনে হল, এই জানাজা যেন আমার। আজ থেকে আমার দেহটা মক্কা থেকে বেরিয়ে যাবে, মদিনা মনোয়ারা ঘুরে হয়ত এক সময় সোলেমানপুরেও পৌঁছুবে কিন্তু আমার আত্মা পড়ে থাকবে এখানে, এই হেরেম শরীফে, এই কাবায়। এই বিশাল চত্বরে ধুলি-মাটিতে ঘুরে ঘুরে সে হয়ত অনন্তকাল ধরে রসুলুল্লাহর পদরেণুর অনুসন্ধান করতে থাকবে, সুমহান বায়তুল্লাহর আকাশে বাতাসে হয়ত বিচরণ করবে কিয়ামত পর্যন্ত!

অবশেষে এল বিদায় তওয়াফের পালা। আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে শেষ বারের মত বিদায় পরিক্রমা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমরা একত্রে একসঙ্গে বিদায় তওয়াফ করছিলাম। দেখলাম, আমার চেয়ে আমার স্ত্রী গভীর ক্রন্দনে আকুল। দেহমন উথাল-পাতাল। কেঁদে কেঁদে তওয়াফের মধ্যেই দুজনে প্রার্থনা জানালাম প্রভু আমার! আপনার এই পবিত্র গৃহের পবিত্রতম মহফিলের সব চেয়ে অযোগ্য মূর্খ পাপী এবং অপবিত্র অংশগ্রহণকারী দুজন আজ ফিরে যাচ্ছে। আমরা পাপী কিন্তু আপনার রহমত ত অসীম বিস্তৃত। আমরা ভিখারি কিন্তু আজ আমাদের হৃদয় পূর্ণ হয়েছে, এই পবিত্র ভূমিতে এনে আপনি আমাদের ধন্য করেছেন।

আমরা ধন্য হলাম। যখন যেখানেই থাকি আপনার অনন্ত রহমত ও সদাপ্রসন্নতা থেকে যেন নিরাশ না হই, বঞ্চিত না হই।

অশ্রুসজল চোখে শেষবারের মত চির অম্লান কাবাকে দেখে তওয়াফে বেদা শেষ করে নিলাম তারপর ছ-টা সাঁইত্রিশে ফিরে এলাম বাসায়। এসে দেখি এক বাংলাদেশী ভদ্রলোক কয়েক কিলো আঙুর আর নানাবিধ তাজা পাকা ফল নিয়ে হাজির হয়েছেন। মিসফালা বাজারে এক সৌদি ভদ্রলোকের একটি মুদিখানার' দোকান আছে, তিনি কোনদিন দোকানেও আসেন না, যাবতীয় জিম্মাদারী এই ভদ্রলোকের। বাজার করতে গিয়ে আলাপ, আমার স্ত্রীকে 'বোন' ডাকলেন, দেশে ফিরলে কলকাতায়—আমাদের বাসায় অবশ্যই আসবেন এমন কথাও দিলেন—আজ বিদায় মুহূর্তে এই সব এক রাশ তাজা তোহফা নিয়ে হাজির। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমাদের সঙ্গে থাকলেন এবং অশেষ উপকার করলেন। কুলি ঠিক করা, ট্যাক্সি ডাকা, জিনিষপত্র তুলতে সাহায্য করা, এমন কি আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে ট্যাক্সি পর্যন্ত যাওয়া সবই করলেন তিনি। এই মহৎ মানুষটির কথা জীবনে কোনদিন ভুলতে পারব না। অথচ ক দিনেরই বা আলাপ! গুলবাগের পাশ দিয়ে গেলে গোলাপের গন্ধ চকিতে আপনা থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অবিস্মরণীয় হয়ে যায়।

ঠিক সাতটা একত্রিশ মিনিটে আমাদের যাত্রা শুরু হল। মাত্র চার মিনিটে দেড় মাসের অতিপরিচিত মিসফালা বাজার, সেই সব দোকান পসারি এবং পরিচিত পথঘাট পার হয়ে একেবারে কাবা-শরীফের দরজায় এসে পড়লাম। শেষ বারের মত দেখলাম হেরেম শরীফের দেওয়াল বাবে আবদুল আজীজ, বাবুল উমরা, বাবুস সালাম এবং স্বপ্ন ঝিলমিল সাত মিনার। ঘড়িতে তখন সাতটা পঁয়ত্রিশ।

ইতিমধ্যে ট্যাক্সি নবীজীর জন্মস্থান অতিক্রম করে গেল। শেষ বারের মত দেখে নিলাম গোলাপী রঙের সেই দ্বিতল বাড়িটিকে। সজল চোখ দুটি এবার পরিপূর্ণ হয়ে এল আপনা থেকেই। জীবনে এই পথে, এই পবিত্র নগরীতে হয়ত আর কোন

দিনই আসা হবে না। এই-ই শেষ! পিছনের দিকে তাকিয়ে পরিচিত পথঘাট দেখতে দেখতে আমি বেদনার্ত স্বরে ফিস ফিস করে যেন অনন্তের কানে কথা কইলাম, হে মক্কা! তোমাকে বিদায়! হে মহান কাবা! তোমাকে বিদায়! হে সুর হেরা সাফা মারওয়া তোমাদের সকলের প্রতি বিদায়!

মনে হল বিশ্বপ্রকৃতির মর্মমূল থেকে এক অবিরাম করুণ রাগিনী উত্থিত হয়ে সমগ্র চরাচরকে যেন বেদনাবিধুর করে তুলছে। এবং সেই বেদনোচ্ছ্বাসের মধ্য থেকে অবিরাম ধ্বনি উঠছেঃ

আলবেদা! আলবেদা!!

বিদায়! বিদায়!!

সুর গুহা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রসূলুল্লাহ চলেছিলেন মদিনাব পথে। সব কিছু হারিয়ে শূন্য ও ব্যথাতুব চিত্তে ধীরে ধীরে আমরাও মদিনার পথে পা বাড়ালাম।

সমাপ্ত